মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ

আজহারউদ্দীন খান • ভবতোষ দত্ত
সংকলিত ও সম্পাদিত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭৬ অক্টোবর ১৯৬৯

প্রচ্ছদ-চিত্র : শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্রাংশ
প্রচ্ছদ-লিপি : শ্রীসুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

অধ্যাপক তারাচরণ বসুর স্মৃতিতে

'তোমারে যা দিতে পারি সে তোমারি দান'

বিষয় সূচী

নাম সূচী

পত্র প্রাপকের নাম		প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা
তারাচরণ বসু	”	১০.
সাহিত্য-চিন্তা ১৯, ২০, ২১, ২২ ॥ পৃঃ ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৫৩		
দেশ ও সমাজ ৩, ৪, ৫ ॥ পৃঃ ১১৩, ১১৫, ১১৬		
শিক্ষা-দর্শন ১ ॥ পৃঃ ১৪৭		
ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ১৬, ২৯ ॥ পৃঃ ১৮৮, ২০৭		
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	”	১.
সাহিত্য-চিন্তা ৩১ ॥ পৃঃ ৭৯		
দিলীপকুমার রায়	”	৩.
সাহিত্য-চিন্তা ২৯, ৩০ ॥ পৃঃ ৭৬, ৭৭		
ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ১৫ ॥ পৃঃ ১৮৬		
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	”	৯.
দেশ ও সমাজ ১৭ ॥ পৃঃ ১৪৩		
ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৫০, ৫১ ॥ পৃঃ ২৪২, ২৪৩		
বিবিধ ৫০, ৫৫, ৫৮, ৬১, ৬৬, ৭০ ॥ পৃঃ ২৯৫, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০৪, ৩০৬		
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	”	১.
ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৫ ॥ পৃঃ ১৭১		
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	”	৬.
সাহিত্য-চিন্তা ৫, ৬, ৭, ১১, ২৪, ২৬ ॥ পৃঃ ১৪, ১৬, ১৭, ২৬, ৫৯, ৬৮		
পরিমল গোস্বামী	”	১.
বিবিধ ৪ ॥ পৃঃ ২৫৫		
পৃথ্বীশ নিয়োগী	”	৫.
সাহিত্য-চিন্তা ৩৮ ॥ পৃঃ ৯৭		
দেশ ও সমাজ ১০ ॥ পৃঃ ১২৭		
শিক্ষা-দর্শন ৩ ॥ পৃঃ ১৫৪		
ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ২১, ৩৪ ॥ পৃঃ ১৯৩, ২১৬		
প্রবোধচন্দ্র সেন	”	৬.
সাহিত্য-চিন্তা ২, ৩, ৪ ॥ পৃঃ ৪, ৭, ৯		
বিবিধ ১৬, ১৭, ১৯ ॥ পৃঃ ২৬৮, ২৬৯, ২৭২		
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)	”	১০.
সাহিত্য-চিন্তা ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ॥ পৃঃ ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪১		
দেশ ও সমাজ ২ ॥ পৃঃ ১১০		
শিক্ষা-দর্শন ১ ॥ পৃঃ ১৪৭		

পত্র প্রাপকের নাম — প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা

নিবেদন

"মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ" বেরুবার কথা অনেক আগে, বেরুল অনেকদিন পর। ছাপা হতে প্রায় এক যুগ লেগেছে। বইটির প্রতীক্ষায় অনেকেই ছিলেন। মোহিতলাল-সম্পর্কিত আমার বইটি পড়ে অনেকেই পত্রগুচ্ছের খোঁজখবর নিয়েছেন, আর যাঁদের কাছ থেকে মোহিতলালের চিঠি নিয়েছি তাঁরা আমার প্রতিশ্রুত প্রকাশের নির্দিষ্ট মেয়াদ বার বার উত্তীর্ণ হবার ফলে অধৈর্য হয়ে পত্রাঘাত করেছেন, কখনও রূঢ়ভাষায় কখনও নিছক কৌতূহলে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিলম্বের কারণ নানাবিধ—যতটা ব্যক্তিগত তার চেয়ে বেশী যন্ত্রগত, কিছু প্রকাশকের অনিচ্ছাকৃত হিমশীতল ঔদাসীন্য।

বই বেরুনোর একটা প্রীতিকর উত্তেজনা আছে। প্রতিটি বইয়ের পিছনে আমার সেই আনন্দ ছিল। আজ এই বইটি বেরুনোর মধ্যে আনন্দের সঙ্গে একটা বিষাদ জড়িয়ে রয়েছে। আমি কিছুতেই সহজ হতে পারছি না। বারবার একজনের কথা মনে পড়ছে। এ বই বেরুলে যিনি সব চেয়ে বেশী খুশী হতেন আর আমি তৃপ্তি পেতাম, তিনি নেই। মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ধূপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি, অধ্যাপক তারাচরণ বসু যেরূপ আগ্রহ ও সহযোগিতা দিয়ে পত্র সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে নিরন্তর উৎসাহ ও তাগাদা দিতেন সেরূপ আত্মীয়সুলভ উষ্ণ ব্যবহার আমি জীবনে কদাচিৎ পেয়েছি। তাঁর অবর্তমানে পত্রগুচ্ছ বেরুল, তাই আমার বেদনার অন্ত নেই। তাঁর নামে এই পত্রগুচ্ছ উৎসর্গ করে আমার বেদনার ভার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করতে চেয়েছি। এ-প্রসঙ্গে মোহিতলালের আজীবন সুহৃদ কবিরাজ জীবনকালী রায় ও 'কালি-কলমে'র সম্পাদক মুরলীধর বসুর কথা মনে পড়ছে, তাঁদের বইটি দেখার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। প্রকাশে বিলম্বহেতু আমি তাঁদেরও হারিয়েছি। তাঁদের অমিত আত্মা জ্যোতির্ময় আলোকের সমীপবর্তী হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মোহিতলালের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পত্রগুচ্ছের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন লেখকের পত্রাবলীই তাঁর জীবন ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য এবং যথোপযুক্ত প্রতিচ্ছবি। এই প্রয়োজনে দশবছর ধরে আমি তাঁর শ তিনেক চিঠি সংগ্রহ করেছিলাম। পৃথকভাবে পত্রগুচ্ছের প্রকাশক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ যে-দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কাটতি নেই সে-দেশে মোহিতলালের পত্রগুচ্ছের প্রকাশক পাওয়া সোজা

ব্যাপার নয়। তদুপরি মোহিতলাল মতান্তরকে মনান্তরে নিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সবাইকে শত্রু করে তুলেছিলেন। তাই মনে করেছিলাম "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিছু চিঠি জুড়ে দেব। কিন্তু বইটির স্বাভাবিক আয়তন ক্রমশ বিপুল হয়ে যাবার ভয়ে সে-সংকল্প ত্যাগ করতে হয় এবং আমার সৌভাগ্যবশত বিদগ্ধ-প্রাণ শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড পৃথকভাবে পত্রগুচ্ছ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। "মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ" যদি পাঠক-সমাজে সমাদর পায় তাহলে ধন্যবাদ প্রাপ্য হবে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনীর।

সমকাল এবং সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে মোহিতলালের খোলাখুলি ধারালো তীক্ষ্ণ মন্তব্য-প্রকাশে অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—এই আশঙ্কায় কাউকে বিব্রত করা কিংবা প্রকাশককে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকায় কিছু চিঠি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়েছে; কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ বর্জন, কোন কোন স্থানে নাম-ধাম-পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ করতে হয়েছে। তাই কোন কোন পত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু আমি নিরুপায়।

পত্রগুচ্ছকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সাহিত্য-চিন্তা, দেশ ও সমাজ, শিক্ষা-দর্শন, ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন এবং বিবিধ। প্রত্যেক বিভাগের চিঠি যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। কয়েকটি চিঠির তারিখ নেই, অভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতের সহায়তায় আনুমানিক নির্ভরযোগ্য তারিখ দিয়েছি। চিঠিগুলিতে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি প্রসঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। চিঠিপত্রের বিন্যাসকরণে অনেকে হয়ত এক বিভাগের চিঠি আর এক বিভাগে দিলে ভাল হত এমন অভিমতও মনে মনে লালন করতে পারেন এবং তাঁদের অভিমতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকার করছি। সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারব, এ দুরাশা আমার নেই। তবে মার্জনা ভিক্ষা করে একটি কথা মনে রাখতে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, প্রত্যেকের রুচিকে শ্রদ্ধা জানিয়েও সম্পাদককে এক জায়গায় স্থির থাকতে হয়। প্রধানত চিঠির মূল সুর লক্ষ্য রেখেই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আর ভাগাভাগির কথা বাদ দিয়ে সার কথা হল যে মোহিতলালের চিঠি পড়ে দোষ-গুণ মিশিয়ে তাঁকে জানবার আগ্রহ যদি ব্যাপক ও গভীর হয়, তবে সেটাই সুখের কথা হবে। প্রাপ্ত পত্রগুলি পর্যালোচনা করে এবং নয়টি অধ্যায়ে ভাগ করে পত্রগুচ্ছের দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। কবি ও সমালোচক, দেশ-ভাবনায় মগ্ন পত্রশিল্পী মোহিতলালের যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আভাস ফুটে উঠেছে

পত্রে, তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর সেই ব্যক্তিরূপটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে ভূমিকায়।

'কপিরাইট আইন' অনুযায়ী পত্রের স্বত্ব প্রাপকের নয়, লেখকের। তাই পত্রগুচ্ছ প্রকাশের অনুমতি জরুরী হয়ে পড়ে। শ্রদ্ধেয়া কবিপত্নী শ্রীযুক্তা তরুলতা মজুমদার সানন্দে পত্রগুচ্ছ প্রকাশের সম্মতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পত্রগুচ্ছে সংকলিত পত্রের প্রাপকেরা মোহিতলালের চিঠি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমার হৃদয় নিবেদন করে গেলাম। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীমাণিকচন্দ্র দাশকে লিখিত চিঠিগুলি যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীসুনীলকান্তি সেন,শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল চক্রবর্তী, শ্রীমিহিরকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীমণিলাল মজুমদার ও শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত 'তথ্যপঞ্জী' ও পত্র-প্রাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আমি তৈরী করেছি। পত্র-পরিচয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত; যদি কেউ ত্রুটি দূরীকরণে অগ্রসর হন তাহলে খুশী হব।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রুফ দেখেও মুদ্রণপ্রমাদ থেকে রেহাই পাওয়া যায় নি। শেষে যখন আবিষ্কার করা গেল তখন আর যথাযথস্থানে সংশোধন করার উপায় ছিল না। যেমন, ৩০৩ পৃষ্ঠায় বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর স্থলে ছাপা হয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭৪ পৃষ্ঠায় রমেশচন্দ্র সেনের স্থলে সেনগুপ্ত ছাপা হয়েছে, হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে হীরেন্দ্র হয়েছেন, শৌরীন্দ্রনাথের বানান মাঝে মাঝে সৌরীন্দ্রনাথ হয়েছে, ৩৩৫ পৃষ্ঠায় 'The Eve of Saint Agnes' The Ere of Sanit Agnes ছাপা হয়েছে। ৩১৮ পৃষ্ঠায় কবি করুণানিধানের পরিচয় প্রসঙ্গের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় কিছুটা সংযোজিত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা হবে—মোহিতলাল কবি করুণানিধানকে 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন এবং তাঁর বিয়োগে করুণানিধান 'লক্ষ্মণ তর্পণ' নামে এক শোকগাথা রচনা করেন। ৩৮৮ পৃষ্ঠার ২৬ ছত্রে একটি শব্দ বাদ পড়ার ফলে অর্থগ্রহণে বিপত্তি ঘটেছে। সেটি হবে—'বলতে পারো ক'টায় মেলে ব্রহ্মা-ঋষির গদি'। তাছাড়া পূর্বে স্থির হয়েছিল যে চিঠির প্রসঙ্গগুলি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হবে এবং পরে সংখ্যানুযায়ী পরিচয় লেখা হবে। তাই প্রসঙ্গের মাথায় মাথায় সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে উক্ত পরিকল্পনা বাতিল করে পরিশিষ্টে শুধু পত্র ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে পরিচয়

দেওয়া হয়েছে তবে কয়েকটি পত্রে সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল, যা পরে আর বাদ দেওয়া যায় নি। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু কিছু ভুল রয়ে গেল সেগুলি মারাত্মক নয়।

নিবেদন শেষ করার আগে আর একটি কথা বলব। পীড়া দিতে দুঃখ পাই তবু তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই কথাটা বলতে হবে। বলা বাহুল্য বর্তমান খণ্ডে সংকলিত পত্রগুচ্ছই (পত্র সংখ্যা ১৯৩) মোহিতলালের চিঠিপত্রের শেষ নয়—সারাজীবনে তিনি যত চিঠি লিখেছেন তার অর্ধেকও এগুলি নয়। এ-খণ্ডে অনুপস্থিত এমন অনেক পত্র-প্রাপক আছেন যাঁদের নাম আপনাদের মনে পড়বে, তাঁদের অভাবে আপনারা হয়ত কাতর অতৃপ্তি বোধ করবেন ; কিন্তু এমন অনেক অপরিচিত আছেন যাঁদের কাছে চিঠি থাকতে পারে, তাঁদের দেখা পেয়ে বিস্মিত হবেন। আপাতদৃষ্টিতে আপনারা যাঁদের নাম করবেন তাঁদের নাম আমি জানি, তাঁদের কাছে মোহিতলালের অনেক মূল্যবান চিঠিও আছে। কেন জানি না যোগাযোগ করলেও চিঠি দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত। যাঁদের কাছে চিঠি পাবার প্রত্যাশা ছিল বেশী তাঁরাই বিমুখ করেছেন সবচেয়ে বেশী। যাই হোক মোহিতলালের চিঠি যদি কারো কাছে থাকে তিনি যেন অনুগ্রহ করে প্রতিলিপি প্রকাশকের ঠিকানার অবধায়কে আমাকে পাঠান। সংখ্যায় বেশী হলে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। মোহিতলাল সারাজীবনে যত চিঠি লিখেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক তার অর্ধেকও যদি বিলুপ্ত হবার আগেই লোকসমক্ষে আনা যায় তাহলে সে-টি বাংলাসাহিত্যে শুধু অমূল্য সম্পদ হিসেবেই পরিগণিত হবে না, যাঁদের চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁদের প্রতিও বাংলাসাহিত্যের পাঠকের কৃতজ্ঞতা অসীমে গিয়ে পৌঁছবে।

মীরবাজার, মেদিনীপুর
আশ্বিন ১৩৭৬। অক্টোবর ১৯৬৯

আজহারউদ্দীন খান

মোহিতলাল মজুমদার

কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬-এ অক্টোবর নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নন্দলাল মজুমদার। পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার বলাগড়ে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন নন্দলালের জ্ঞাতিভ্রাতা। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে মোহিতলালের মাতুলবংশের সম্পর্ক ছিল।

মোহিতলালের বাল্যকাল কাটে পল্লীগ্রামে। বলাগড় হাইস্কুল থেকে ১৯০৪-এ তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করলেন। মোহিতলাল বি.এ পাশ করেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৩১৬-র ২৫ বৈশাখে তাঁর বিবাহ হয় শ্রীমতী তরুলতা দেবীর সঙ্গে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী জরিপ বিভাগে মোহিতলাল কাজ নেন; কিন্তু তিন বৎসর পরেই (১৯১৭) তিনি এসে নেবুতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন। সে-সময় থেকে প্রধানত তিনি কবি হিসাবেই পরিচিত। ১৯২৮-এ মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪-এ অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত মোহিতলাল সেখানেই ছিলেন। শেষ জীবন তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িশায় নির্জন বাসে অতিবাহিত করেন। ১৯৫২-র ২৬ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালে মোহিতলাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকায় যাওয়ার পর তাঁর সাহিত্যকর্ম সমালোচনা-প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ ছিল।

মোহিতলালের সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন পর্যায় :

বীরভূমি-মানসী-বাণী, ভারতী-প্রবাসী, কালিকলম-কল্লোল, শনি-বারের চিঠি, স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-বঙ্গভারতী।

মোহিতলালের সম্পূর্ণ জীবনকথা এবং গ্রন্থপঞ্জীর জন্য আজহারউদ্দীন খান্ প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' (১৯৬১) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য॥

ভূমিকা

নতুন সাহিত্যের আভাস

'মোসলেম ভারত'-সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের চিঠিটি ইদানীং খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই চিঠি থেকেই রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যের গতি-পরিবর্তনের পূর্বভূমিকা জানা যায় বলে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।

পত্রখানি বাংলাকাব্যের কয়েকটি দিকের ইঙ্গিত দেয়। প্রথমত এতে মুসলমান কবিদের স্মরণীয় দানের স্বীকৃতি আছে। বাংলাসাহিত্যের পাঠকরা জানেন মীর মশারফ্ হোসেন চৌধুরীর মতো সামান্য দু-চার জন মুসলমান লেখকদের কীর্তি থাকলেও বাংলাসাহিত্যের মূল ধারায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব সে-ভাবে কিছু পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্য পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে প্রধানত হিন্দুর পুরাণ, উপনিষদ, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব বিভিন্ন লেখকদের রচনায় দেখা গিয়েছে। সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা—যেগুলি বাংলার লেখকদের গড়ে দিয়েছে—তাদের কথা মনে করলেই এর সার্থকতা বোঝা যায়। বঙ্গদর্শন, সাধনা, সাহিত্য, নব্যভারত, প্রভৃতি পত্রিকাগুলিই এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাসাহিত্যের পোষক ছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ মোজাম্মেল হক[১]। সমিতির অফিস ছিল ৩২ কলেজ স্ট্রীটে। ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ মোজাম্মেল হক ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। এই সমিতিকে কেন্দ্র করেই শক্তিশালী মুসলমান সাহিত্যিকরা সমবেত হয়েছিলেন, যেমন কাজী ইমদাদুল হক, কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল ওদুদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, গোলাম মোস্তাফা, শেখ ফজলল করিম, লুৎফর রহমান, ওয়াজেদ আলী এবং আরো অনেকে। কবি নজরুল ইসলাম তখন করাচিতে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় নজরুলের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৩২৬-এর শ্রাবণ-সংখ্যায় 'মুক্তি' নামে কবিতাটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। সেই বছরেই কার্তিক এবং মাঘে বেরোয় 'হেনা' এবং 'ব্যথার

১ ইনি 'মোসলেম ভারতে'র পরিচালক আফজালুল হক সাহেবের পিতা, শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক নন।

দান' নামে দুটি গল্প। মুজফ্‌ফর আহমেদ এই পত্রিকার দেখাশোনা করতেন। নজরুলের রচনা প্রকাশে তাঁরও সহযোগিতা ছিল।[১]

এই পত্রিকাতে মুসলমান লেখকদের একটা নিজস্ব দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল। সাহিত্য-সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলিতে মাতৃভাষারূপে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার সংকল্প ফুটে ওঠে, অথচ ধর্ম ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহন-ভাষারূপে আরবী-ফারসি শব্দের প্রতিও যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার সংকল্প প্রকাশ পায়। এক কথায় বাংলাভাষায় ধর্মভাষারূপে আরবী অথবা ফারসি শব্দসম্পদকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতেই তাঁরা চাইলেন। ইসলাম সম্বন্ধে গর্ব বোধ যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে অনুরাগও নানাভাবেই ঘোষিত হয়েছে। মুসলমান-সমাজ থেকে ইতিপূর্বেও পত্রিকা বেরিয়েছে, ইসলাম-দর্শন (১৩২৭) আল্ এসলাম (১৩২২) ইসলাম প্রচারক (১৮৯৯) আহ্‌লে হাদিস (১৩২৩) প্রভৃতি। কিন্তু সেগুলিতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষায় বহুবিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এবং সাহিত্যশিল্পীদের সমাবেশ ঘটে নি। এই নতুন পত্রিকায় হিন্দু লেখকরাও যোগ দিয়েছেন।[২] মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকার এই অভিনবত্বের আয়োজন বাঙালি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই।

এই আয়োজন আরো পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল 'মোসলেম ভারত' নামে সুবিখ্যাত পত্রিকায়। এই পত্রিকা ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে মোজাম্মেল হক এবং আফজাজুল হকের সম্পাদনায় মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ নং কলেজ স্কোয়ার থেকে বের হয়। 'মোসলেম ভারতে'র লেখক-পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছিল। এতে লিখতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং মুসলমান লেখকদের মধ্যে ছিলেন তারিকুল আলম, ইমদাদুল হক, শাহদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তাফা, শেখ ফজলল করিম, মহম্মদ বরকতুল্লাহ্, লুৎফর রহমান এবং আরো অন্যান্য। 'মোসলেম ভারত' একটি উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকাটি সাহিত্যসৃষ্টির দিকে অধিকতর জোর দিয়েছিল। সেই জন্যই বাংলাসাহিত্যে এর একটা প্রভাবও পড়েছিল। 'সাহিত্য'-পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক কঠোর আদর্শবান সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন—

'বাঙ্গালা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি। আমাদের দেশধর্ম এক।

১ দ্রষ্টব্য মুজফফর আহমেদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', ১৯৬৭, পৃ ২৪-৩৪।

২ কালিদাস রায় কবিশেখরের ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কবিতা এতে প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙ্গালা ভাষাই যে জাতিধর্মনির্বিশেষে বাঙ্গালীর—বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা, মুসলমান এই সহজ ও স্বাভাবিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান সমাজের শক্তি ও প্রতিভায় পুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় বাঙ্গালী মুসলমান অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যে মুসলমান লেখকগণ মাতৃভাষার সাধনায় যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'মোসলেম ভারত' তাহার প্রমাণ।"[১]

বর্তমান প্রয়োজনে আমাদের আলোচনা 'মোসলেম ভারত'-প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিক থেকেই মুসলমান সাহিত্যিকদের যে-সাহিত্যসচেতনতা ও আন্দোলন গড়ে উঠল তার দৃষ্টান্ত ছিল আরো দুটি পত্রিকা, 'সওগাত' ও মাসিক 'মোহাম্মদী'।

'মোসলেম ভারত'-সম্পাদককে লিখিত মোহিতলালের পত্রে মুসলমান সমাজের নবজাগরণের লক্ষণের কথা আছে। তিনি যে বলেছেন,—'সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনার সিদ্ধির পরিচয় আছে'—মোহিতলালের এই মন্তব্য করা হয়েছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্যেরও পূর্বে। মোহিতলালের এই উক্তিটি শুধু যে মুসলমান সাহিত্য-সাধকদের সাধনার স্বীকৃতি তা নয়, এতে বাংলাসাহিত্যের নূতন একটা পর্যায়ের পূর্বাভাসও সূচিত। মুসলমান সাহিত্যিকেরাই বিষয়-সম্ভাবনা এবং ভাষাসম্ভাবনার নূতন ইঙ্গিত দিলেন। মোহিতলাল এখানে তারই আভাস দিয়ে বলেছেন,

"এইবার এক নূতন রসধারা নবজীবনের আবেগপ্রবাহে আমার এই অতি আদরের আজন্ম-সাধনার, শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গসাহিত্যের অকালপ্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনহিল্লোল সঞ্চারিত করিবে।"

আরব এবং পারস্যের ইসলামী জীবন থেকে যে নতুন ধরনের বিষয় ও কাহিনী সংগ্রহ করে বাংলাসাহিত্যকে নতুন ভাবে সঞ্জীবিত করা যেতে পারে মোহিতলাল সেই সম্ভাবনাতেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। 'বাংলার কবিমালঞ্চে দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে'—এই কথা বলে এতদিনের বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা কিংবা মোহিতলালের প্রিয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের (মৃত্যু ১৯২০) কবিতা যে কাব্যগুণে

১ সাহিত্য. আষাঢ় ১৩২৭, পৃ ২১৬

নিকৃষ্ট, মোহিতলাল নিশ্চয়ই এ রকম ইঙ্গিত করতে চান নি।[১] তবে একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাংলাকাব্যে বাঙালী জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের অতিরিক্ত বিষয় সে রকম দেখা যায় নি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দু পুরাণ-কাহিনী অথবা সমসাময়িক পল্লী অথবা নগর-জীবন, দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যে বাঙালী গার্হস্থ্যজীবন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও অধ্যাত্মবোধ অথবা বাংলার প্রকৃতিজীবনেরই রসমাধুর্য রচিত হয়েছে। এঁদের অনুকরণে আর যে-সব কবি কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যের অভাব অবশ্যই ছিল না, কিন্তু সে-সব নিত্যপরিচয়ে অভিনবত্ব হারিয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে মোহিতলাল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যপরিচয়-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাধনকলা এমনই মনোহর যে নিম্নাধিকারেও তাহা হইতে যেটুকু রস আদায় করা যায় তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াও যেমন সহজ বুঁদ হওয়াও তেমনি অনিবার্য। ইহার ফলে বাংলাকাব্যে একটা নূতনতর কাব্যকলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যের সেই গূঢ় অন্তর্নিহিত রস সাধারণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া রহিল বটে কিন্তু ঐ কাব্যকলাই একটি নূতন কবিসম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহাতে বাংলা কবিভাষা ও কাব্যছন্দের যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিসাধন হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সেই রসকল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে।"

ব্যর্থ রবীন্দ্রানুকরণকে কটাক্ষ করে যতীন্দ্রনাথ নিজেই সুপরিচিত কবিতা লিখেছিলেন; আর লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী[২]।

সবচেয়ে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের নিজেরই উক্তি। তিনি নিজেই যেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যহীনতা এসে যাচ্ছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য গীতালি মোটামুটি একই ভাবের এবং একটি ভঙ্গির কাব্য। কিন্তু বাঙালী কবিরা

১ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি মোহিতলালের শ্রদ্ধা সুবিদিত। তাঁর 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' বইটি ছাড়াও আরো নানা সূত্রেই তিনি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁকে বাংলাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই জানতেন। 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে' 'দেবেন্দ্রনাথ সেন'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৩২৭, পৌষ মাসের ভারতীতে 'কবিবর দেবেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় আছে পূর্বোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে, 'বিচিত্র কথা'র 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধে এবং কবিতায়। এই প্রসঙ্গে আমার 'কাব্যবাণী' (১৯৬৭)-র ৯০-৯৪ পৃষ্ঠায় মোহিতলালের নিজের উক্তি উল্লেখযোগ্য।

২ সনেটপঞ্চাশতে সংকলিত 'উপদেশ' (১৯১২)।

তার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুকরণ করে আসছিলেন, 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এবং 'ভারতী'তে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'ক্ষণিকা' কাব্য হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট তার অনুকরণও কম হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার ব্যাপক অনুকৃতিতে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকলেন না এটাই তাঁর অসামান্য প্রতিভার একটি লক্ষণ। প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে[১] তিনি লিখলেন,

"আমি ত এই দীর্ঘকাল লিখে আসছি—আমার বলবার কথা নানারকম করে বলা হয়ে গেছে—এখন যা বলতে যাব তাতে কেবল পূর্বকথিত কথাকে পুরনো করে তোলা হবে।··· মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়।"

গদ্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' প্রকাশ করে (১৯১৪) বাঙালী চিত্তকে জাগিয়ে রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'বলাকা'র কবিতাগুলিতে নতুন পালা আরম্ভ করলেন। আগের কবিতার থেকে এ-কবিতার রীতি-নীতিই গেল বদলে। যৌবনের নবোৎসাহ হঠাৎ যেন মিল এবং ছন্দের অভ্যস্ত প্রথাকে ভেঙে ফেলে মুক্তকের উচ্ছল স্বাধীনতায় নিজেকে একেবারে অবারিত করে দিল। সুন্দরকে কবি রুদ্রের বেশে পেলেন,

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।

—এমনি সময়ে শক্তিশালী মুসলমান লেখকগণ ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা, চরিতকাহিনা, গল্প ইত্যাদি রচনায় অগ্রসর হয়ে এলেন, তখন মোহিতলালের মতো যুবক-কবিদের কাছে একটা নতুন কল্পনার জগৎ উদ্‌ঘাটিত হল। মোহিতলালের চিঠিতে স্পষ্ট করেই বিষয় নির্দেশ করা আছে—

"অনন্ত বালুরাশির দৈনন্দিন দহনজ্বালা, নিরুদ্দেশ মরুসমীরণের প্রদোষ-কালীন হাহাশ্বাস, নিশীথ আকাশের দিগন্তবিসর্পী মহামৌনী নক্ষত্রসভা জাগরণ-স্বপ্নসুষুপ্তির ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধ মন্ত্রে বঙ্গভারতীর অর্চনারতি হইবে। একটা অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব সম্পদ, নূতন সুরসংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছে।"

এর প্রমাণ পেতে দেরি হয় নি। মোহিতলালের পত্রটি 'মোসলেম ভারত'কে উপলক্ষ করে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু পত্রোক্ত অভিনব সম্ভাবনা যে তাঁর মনে

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ১৮৮-১৮৯।

তার অন্তত দু-বছর আগেই এসেছিল একথা মনে করবার হেতু আছে। মোহিতলালের বিখ্যাত দুটি কবিতা 'নাদিরশাহের জাগরণ' এবং 'নাদিরশাহের শেষ' (দুটিই 'স্বপনপসারীতে' সংকলিত) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে বেরিয়েছিল। ওই বৎসর বৈশাখ মাস থেকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মোহিতলালের ওই কবিতা-দুটির মূলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকা সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথের 'কবর-ই-নূরজাহান' বেরিয়েছিল ১৩২২-এর শ্রাবণ মাসের ভারতীতে। সেই মাসের 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল 'তাজ' কবিতাটি। মোহিতলালের কবিতায় মুসলমানী শব্দ-ব্যবহার এবং জীবনাবেগ এতই তীক্ষ্ণ যে সহসা মনে হয় না সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব এতে আছে। সে দিক থেকে বরং মুসলমান লেখকদের প্রভাবই অনুমান করা যেত, কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় তখনও প্রভাব বিস্তার করবার মতো আকর্ষক লেখা প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিশেষত 'মোসলেম ভারতে' পত্র লেখার সময় পর্যন্ত এই পত্রিকাখানির সংবাদ মোহিতলাল রাখেন নি বলেই মনে হয়। নজরুলকে তিনি 'মোসলেম ভারতে'ই প্রথম চিনলেন।

মোহিতলাল 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' লিখেছিলেন কোন অনুপ্রেরণায়, নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় মোহিতলালের যে-সব কবিতা বেরিয়েছে, তার কোনোটিতেই ইসলামী বিষয় শব্দ অথবা ভঙ্গি নেই। 'মানসী'তে ১৩১৫-র চৈত্র মাসে 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে 'মানসী'তে তাঁর বহু কবিতা ও গদ্যরচনা বেরিয়েছে। তাছাড়া কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'বীরভূমি' পত্রিকাতেও তাঁর অনেক রচনা বেরিয়েছে। কোথাও ঠিক ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বনে কবিতা লিখতে দেখতে পাই না।

ভারতীতে 'নাদিরশাহের জাগরণ' ১৩২৫-এ বেরোলেও ১৩২৭-এর কার্তিক সংখ্যার 'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি আবার মুদ্রিত হতে থাকে।[১] এক সংখ্যায় কবিতাটি শেষ হয় নি; এমন কি পরবর্তী অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেও শেষ হয় নি। সেই সংখ্যায় মন্তব্য ছিল—

১ পাদটীকায় সম্পাদকের মন্তব্য—

কবিতাটি পুরাতন হইলেও উচ্ছল প্রাণের অভিব্যঞ্জনায় ইহা চিরনূতন। কবি প্রাণের কি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ বুকভরা বাণীতে বিশ্বত্রাস নাদিরের বীরমূর্তি বঙ্গভারতীর চিত্রশালায় প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটি আমাদের বড়ই প্রাণে বাজিয়াছে। তাই ইহা 'মোসলেম ভারত'-এর পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে না পারায় 'ভারতী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"কাব্যামোদী পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্যে 'নাদিরশাহ' পুস্তিকাকারে প্রকাশের বন্দোবস্ত হইতেছে। সেইজন্য ইহার অবশিষ্টাংশ 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হইবে না। বলা বাহুল্য পুস্তক নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রিত হইবে।"

এই কবিতাটি 'ভারতী' থেকে 'মোসলেম ভারতে' পুনর্মুদ্রিত হতে দেখে সম্পাদককে-লেখা মোহিতলালের চিঠির বক্তব্যই সমর্থিত হয়। মুসলমান-পরিচালিত পত্রিকা যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, মোহিতলাল নিজে তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ধারাতেই নিজের কাব্যপ্রচেষ্টাকে চালিত করলেন। 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলালের বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি এই—

দিলদার	১৩২৭ কার্তিক
নাদিরশাহের জাগরণ	১৩২৭ কার্তিক
ক্ষ্যাপা	১৩২৭ অগ্রহায়ণ
নাদিরশাহের জাগরণ	১৩২৭ অগ্রহায়ণ
আবির্ভাব	১৩২৭ পৌষ
কবিপ্রিয়া [কোনো কবিবন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত]	১৩২৭ মাঘ
খোরশেদ জাঁহা ['বন্ধুবর মৌলবী এন. এ. কাহের সাহেবের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী খোরশেদ জাঁহাকে দেখিয়া, ক্যাম্প শামশেরপুর, রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারী ১৯১৫]	১৩২৭ ফাল্গুন
পরম ক্ষণ	১৩২৭ চৈত্র
বেদূঈন	১৩২৮ ভাদ্র

—'বেদূঈন' কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' থেকে ১৩২৮, আশ্বিনের 'ভারতী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'কবিপ্রিয়া' এবং 'খোরশেদ জাঁহা' ছাড়া অন্য কবিতাগুলি স্বপনপসারীতে সংকলিত।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত, শুধু 'মোসলেম ভারতে' নয় 'প্রবাসী' এবং 'ভারতী'তেও মোহিতলালের ইসলামী বিষয় এবং ভঙ্গির অনেক কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। 'শেষশয্যায় নূরজাহান' 'গজল গান' 'ইরাণী' 'ফারসী ফরাস' 'কালা পাহাড়' 'শরাবখানা' ভারতীতে ১৩২৮-এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩৩০-এর চৈত্রের মধ্যে বেরিয়েছিল। 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' বেরিয়েছিল প্রবাসীতে ১৩৩০-এর চৈত্র সংখ্যায়।

মোটের ওপর বলা যায় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রকাশের পর থেকে ইসলামী বা ফার্সী বিষয় নিয়ে মোহিতলালের কবিতারচনায় বন্যা আসে। শুধু যে বিষয় বা শব্দনির্বাচনেই মোহিতলাল নতুনতর সম্ভাবনার দিকে ফিরেছিলেন, তা নয়, জীবনাবেগের দুর্ধর্ষতা, মধ্যযুগীয় মোগল জাতির অপরিমিত শক্তি ও সৌন্দর্যলালসার কল্পনা মোহিতলালের মনে আগুন ধরিয়েছিল। এতদিন মোহিতলালের কবিতায় ছিল শান্তি ও স্নিগ্ধতা, এবার এল বলিষ্ঠতা, উদ্দাম ভোগ-লোলুপতা এবং শক্তিসাধনা।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিনির্ভর হলেও সম্পূর্ণ সত্য হবে না যদি-না আমরা অন্য আরো দুটি দিকের উল্লেখ করি। প্রথমত মোহিতলাল যখন ১৩১৫-তে লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন মানসী-সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। ইন্দুপ্রকাশ ফার্সী জানতেন। 'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি জীবনী (১৩১৮) তিনি রচনা করেছিলেন। ইন্দুপ্রকাশের সংসর্গে মোহিতলাল হাফিজ প্রভৃতি ফার্সী কবিদের সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বলে অনুমান করা যায়। তারই ফলে ১৩১৫ চৈত্র সংখ্যার 'মানসী'তে তিনি প্রবন্ধ লেখেন 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম'। মোহিতলাল বহুপঠনশীল কবি ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে ফার্সী কবিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাঁদের লঘু-পেলব কল্পনায় মুগ্ধ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। অতঃপর তাঁর নিজের জীবনযাত্রাও তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করে থাকবে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহিতলালকে সরকারী জরীপ বিভাগের কাজে উত্তরবঙ্গে মাঠে-মাঠে, পদ্মার চরে, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই সময়ের কথা তিনি লিখেছেন,

"জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মধুর মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইতেছিল। বনে-জঙ্গলে মাঠে ও নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেই বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা-বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর—একবার সেখানেই সারা বৎসর কাটাইয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি অবস্থানকালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই এক বৃক্ষচ্ছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"[১]

১ আজহারউদ্দিন খান 'বাংলাসাহিত্যে মোহিতলাল' (১৯৬১) পৃ ৯।

অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লেখা পত্রে মোহিতলাল বলেছেন,

"মরুভূমি'কে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের, The Terrible Sahara-র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি—দুই একটি ইংরাজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু সকলের উপর আমার বেদুইন-জীবন বোধহয় সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। আমি এক সময় পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।"[১]

এর থেকে মনে হয় মোহিতলালের মন প্রস্তুত ছিল, এবং মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনা তাঁর নবীনতর সৃষ্টিপ্রেরণাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

ন জ রু ল ই স লা ম

'মোসলেম ভারত'-সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের পত্রটি বিখ্যাত হয়েছে দ্বিতীয় আর-একটি কারণে—এই পত্রেই নবীন কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি নজরুলের কবিতার সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় সম্ভবত 'মোসলেম ভারত' পত্রেই হয়েছিল। আজহারউদ্দিন উল্লেখ করেছেন কবি করুণানিধানের বাসাতে মোহিতলাল নজরুলের 'বাদলপ্রাতের শরাব' ('নিকটে' নামে 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত) কবিতাটির অপরূপ মিল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ কথা সত্য হওয়া সম্ভব। করুণানিধানের (১৮৭৭-১৯৫৫) সঙ্গে মোহিতলালের ইতিপূর্বেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হেদুয়ার ধারে সকাল বেলা তরুণ মোহিতলালকে ফুল কুড়াতে দেখে করুণানিধান তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। করুণা-নিধান ও মোহিতলাল উভয়েই তখন ওইখানেই একই অঞ্চলে থাকতেন। করুণানিধান অমূল্য বিদ্যাভূষণের 'বাণী' নামে পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। মোহিতলালেরও 'বিফল'[২] নামে একটি কবিতা সেই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই ঘটনা এই শতকের প্রথম দশকে।

'বাদলপ্রাতের শরাব' কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে'র ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। 'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি বেরিয়েছিল পরবর্তী শ্রাবণ সংখ্যায়। মোহিতলাল একই সঙ্গে দুটি কবিতাই পড়েছিলেন। অনুমান করা

১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪৫। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মোহিতলালের 'শিলাইদহে রবীন্দ্রস্মৃতি'—প্রবন্ধ, রবিপ্রদক্ষিণ (১৩৫৬) পৃ ১৮০।

২ বাণী, তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ১৩১৭, অগ্রহায়ণ।

অসঙ্গত নয় যে, 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের আর যে সব লেখা বেরিয়েছিল 'বাঁধনহারা' (পত্রোপন্যাস, ১৩২৭ বৈশাখ), 'সাত-ইল-আরব'[১] (১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ), 'বোধন' (১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ),—এই তিনটিই মোহিতলাল নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি পত্রে আষাঢ় এবং শ্রাবণের কবিতা দুটিরই বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 'বাদলপ্রাতের শরাবে'র মিলের বিশেষত্বেই অভিভূত হয়েছিলেন,

বাদ্‌লা কালো স্নিগ্ধ আমার কান্তা এলো রিম্‌ঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনীয়ে।

—এই মিল মোহিতলালকে এতই অভিভূত করেছিল যে এরই ছন্দোধ্বনি দিয়ে নিজেই একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'ক্ষ্যাপা'—

শিশুর মতন সরল হেসে উঠল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে—
জ্যোৎস্না-মেয়ের ওষ্ঠ চুমি', ঝড়ের সাথে দিল্ মিলিয়ে!
প্রাণের গানের মন্ত্র গেয়ে করলে সোনা ইট-পাথর,
ফুলের মুঠি উঠ্‌ল ফুঁসি সাপের ফণায় কিল্‌বিলিয়ে!
'সোনার লোভে আসিস ছুটে?' বিষের ভয়ে পিছ-পা তোর
বলেই আবার দুধের হাসি হাস্‌লে ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে।
উঠ্‌ল নিশায় কাঁদন তাহার আকাশসেতার ঝুনঝুনিয়ে
ছেঁড়ামেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারার আগুন ফুল বুনিয়ে।

কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতেই ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। পরে 'স্বপনপসারী'তে (১৩২৮) সংকলিত হয়।

মোহিতলাল অবশ্য পত্রে মিলের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেন নি, তিনি প্রশংসা করেছেন কবিতাটির অন্তর্নিহিত উচ্ছল রসাবেশের।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি যে-কারণে মোহিতলালের প্রশংসা আকর্ষণ করেছে, সে-কারণ এর ভাববস্তু নয়, কিংবা নিছক মিল বা শব্দচাতুরী নয়। ছন্দ এবং ভাষার ভিতর দিয়েই কবিতার ভাবটিকে মুক্তি পেতে দেখেই মোহিতলাল এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছন্দ ও ভাষা যদি ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না হয়, তবেই কাব্যধর্মে সে হয় পতিত। এই চিঠিতে তৎকালপ্রচলিত কবিতা সম্বন্ধে এই অভিযোগই তিনি করেছেন—

'বাঙ্গালা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণশিঞ্জন তাহার নটিনীলাঞ্ছন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্বণ

১ কাজী আবদুল ওদুদ জানিয়েছেন, এই কবিতাটি পড়ে বিনয় সরকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিনয় সরকার তখন য়ুরোপে ছিলেন।

মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে।"

ভাব ও ভাষার একীভূত হওয়াই সমালোচক মোহিতলালের মতে কাব্যত্ব। এই মত তিনি সারাজীবনই পোষণ করে এসেছেন। 'রস ও রূপ' (শ্রাবণ ১৩৪১) নামে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"Expression-এর সহজ অর্থ প্রকাশ; কাব্যের এই প্রকাশগুণই যদি বড় হয়, তবে সর্বস্ব নির্ভর করে শব্দ ও ছন্দধ্বনির উপর। এইজন্যই সরস্বতী বা বাক্-ব্রহ্মই বিশেষ করিয়া কাব্যের দেবতা। যাহার এই বাণী-প্রতিভা নাই সে কবি নয়। কাব্যে ভাব-অর্থের কোনও মূল্যই নাই, যদি না তাহা বাণীরূপে প্রকাশ পায়। বাণীকে অর্থাৎ ছন্দধ্বনিময় শব্দবিগ্রহকে পৃথক রাখিয়া কাব্যের বিষয়গত ভাব অর্থের কোনও মর্যাদা নাই।"

এই মানদণ্ডে 'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি মোহিতলালের মতে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। মোহিতলাল এই কবিতার স্টাইলে কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন। এতে যুগ্মধ্বনিযুক্ত সাধু সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার থাকায় ধ্বনিগাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে আরবী শব্দগুলি কোনোরকম অনভ্যাসজনিত সংস্কারবৈষম্যের সৃষ্টি না করে অবলীলায় সাধু বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে যেমন,

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি

অথবা

'শাফায়ত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল
'জান্নত' হতে ফেলে হুরী রাশ রাশ ফুল!

বিদেশী শব্দগুলি বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে আকারে এবং উচ্চারণে সহজেই মিশে গিয়েছে। বিদেশী শব্দগুলি সবই প্রায় চার মাত্রার।

যখন 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে এই চিঠিখানি লেখা হয়, তখনও বাংলা ছন্দের নামকরণ স্থিরীকৃত হয় নি। ১৩২৯-এর পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে ধারাবাহিক পাঁচটি প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ ও নামকরণ করেন। মোহিতলাল এই কবিতার ছন্দের কোন নাম উল্লেখ করেন নি। বস্তুত প্রবোধচন্দ্রের তৎকালীন নামকরণ অনুযায়ী 'খেয়াপারের তরণী' চার মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।—

২ ১ ১　২ ১ ১　১ ১　১১　১১　২
যাত্রীরা ০ রাত্তিরে ০ হতে　এল ০ খেয়া　পার
২ ১ ১　২ ১ ১　২ ১ ১　১ ১ ২
বজ্রেরি ০ তূর্যে এ ০ গর্জেছে ০ কে আবার ?

মোহিতলাল বলছেন, 'ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে।' এই কবিতায় যতির বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত এইরকম—

দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী।

—এখানে দ্বিতীয় 'দমকি'র দ-এর পর যতি প্রচ্ছন্ন থাকায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুণ্য-পথের এযে যাত্রীরা নিষ্পাপ

এখানেও 'পথের' শব্দে প-এর পর যতি লুপ্ত হওয়ায় ছন্দের দোলা লক্ষণীয়।

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর

এখানে 'আবুবকর' এই পর্বটিতে একটি মাত্রা বেশি আছে মনে হয়। 'উমর আলী'—পর্বটিতেও তাই। কিন্তু উচ্চারণে এ-দুটি যথাক্রমে হয় আবুবক-রুসমান উমরালী হায়দার।

আর-একটি জায়গায় কবি কৌশল করেছেন—

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি

মনে হয় এর প্রথম পর্বটিতে এক মাত্রা কম আছে—

তমসা ০ বৃতা ঘোরা ০ কিয়ামত ০ রাত্রি

কিন্তু 'তমসা'র সা দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হওয়ায় মাত্রাসমতা অক্ষুণ্ণ আছে।

এই কবিতায় আরো কয়েকটি কৌশল আছে। কয়েকটি যুগ্ম-পংক্তির শেষ পর্বটি চার মাত্রার না হয়ে তিন মাত্রার। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট—

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ॥

'তরঙ্গ' এবং 'উলঙ্গ' শব্দ-দুটির প্রথম অক্ষরগুলির পরেই যতি লুপ্ত হওয়ায়-রঙ্গ এবং -লঙ্গ বস্তুত তিন মাত্রার পর্ব।

'বাদলপ্রাতের শরাব' কবিতায় যে-মিলের চমক মোহিতলালকে মুগ্ধ করেছিল সে-চমক এই কবিতাতেও আছে। 'খেয়া-পার'-'কে আবার' 'কে বিষাণে'-

'রে ঈশানে' 'নিপাতেও'-'পাথেয়' 'দেয়া-ভার'-'খেয়া পার' 'হায়দর'-'নাই ডর' প্রভৃতি মিলগুলি চমকপ্রদ।[১]

মোহিতলালের পত্রে 'মোসলেম ভারত'-সম্পাদকের কাছে বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়ার যে প্রস্তাব আছে, সে-সম্বন্ধে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় আরও দুই একজন সাহিত্যরসিক বন্ধু আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে ঐ শব্দগুলি আমরা জোর করিয়াই বুঝি বাংলা ভাষায় প্রচলিত করিতে চাহিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মুসলমান জনসাধারণ উঠিতে বসিতে ঘরে বাহিরে সে সমস্ত কথা সদাসর্বদা সহজ ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে সেইগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ গুলি বাদ দিলে বর্ণিত বিষয়ের স্বরূপ (local colouring) ঠিকমত ফুটিবে না। তবে ফুটনোটে ঐ শব্দগুলির অর্থ দিলে সকলের বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও কথা আছে। সর্বপ্রথম কথা হইতেছে এই যে এমন অনেক আরবী ফার্সী শব্দ আছে যে গুলির প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় আদৌ নাই এবং তাহাদের ভাবগত অর্থ প্রকাশ করিতে গেলেও বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমত স্থলে অনেক সময় সমাজচিত্র আঁকিতে বসিয়া ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়। ইহা ছাড়াও ফুটনোটে অর্থ দেওয়া সম্বন্ধে আরও একটু বলিবার আছে। যে সমস্ত কথা আমরা মুসলমানগণ সকলেই বুঝি সে কথাগুলি আমাদের বাড়ির পাশের হিন্দু ভাই বা কেন বুঝিবেন না বা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা যখন তাঁহাদের কথাবার্তা চালচলন এমনকি তাঁহাদের নিত্যকর্মপদ্ধতি স্তব পূজা আরতি গায়ত্রী সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি সর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত, অন্তত সেগুলি কোন কার্যের সূচনা করে তাহা যখন অনায়াসেই বুঝিতে পারি তখন হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের মনের ভাবপ্রকাশক সদা ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় নহে কি?

যাহা হউক ফুটনোটে অর্থ দেওয়া আমাদের অধিকাংশ লেখকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও হিন্দু ভ্রাতৃগণের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাইবে। তবে

১ মুজফফর আমেদ কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন 'নজরুল দেখছি আমাদের আর কবিতা লিখতে দেবে না। সে 'অলস বৈশাখে'র সঙ্গে 'কলস কই কাঁখের' মিল জুড়েছে।'—কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, (১৯৬৭) পৃ ১৬৮

তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন এ বিষয়ে তাঁহাদের মুসলমান বন্ধুগণের নিকট সহায়তা গ্রহণ করেন। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রাতি স্থাপনের পথ সুপ্রশস্ত হইবে—দেশের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে।—সম্পাদক।"

দুই

মোহিতলালের সঙ্গে নজরুল ইসলামের মনোমালিন্য রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধের মতো সাহিত্যিক কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক আলোচনা করেছেন।[১]

'খেয়াপারের তরণী' কবিতা প্রকাশের পরেই নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সেটা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস। নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই আরম্ভ হয়। মোহিতলালের গভীর এবং অতুলনীয় সাহিত্যপ্রাণতা এই তরুণ ও নবাগত লেখকের মধ্যে শক্তির স্ফুলিঙ্গ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। নজরুলকে তিনি স্নেহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি নজরুলকে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত করিয়ে দিতে লাগলেন। 'ভারতী'র আড্ডায় সম্ভবত তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শোনা যায় সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘটনা ১৯২০ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ঘটে থাকবে। মুজফফর আহমেদের বর্ণনা থেকে মনে হয় নজরুলকে পরিণতশক্তি কবিরূপে দেখবার জন্য মোহিতলালের আগ্রহকে নজরুল বুঝতে পারেন নি। এমন কি মোহিতলালের স্বরচিত কবিতার আবৃত্তিকেও তিনি নীরব উপেক্ষায় প্রত্যাখ্যান করলেন।[২]

মোহিতলালের কোন বিশেষ কর্ম বা আচরণ নজরুলকে আহত করেছিল এমন কথা নজরুলের চরিতকারেরা কেউ বলেন নি। মুজফফর আহমদ দেখিয়েছেন দুই কবির মধ্যে সৌহার্দ্যের স্থিতিকাল এক বৎসর, ১৯২০-র আগস্ট থেকে ১৯২১-এর সেপ্‌টেম্বর। তারপরেও আলাপ ও কথাবার্তা ছিল কিন্তু আর

১ দ্রষ্টব্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোলযুগ' (চতুর্থ সং ১৩৬৬,) পৃ ৫২-৫৪ ; আজহারউদ্দিন খান, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (৩য় সং, ১৩৬৫,) পৃ ১৬-২০ ; আজহারউদ্দিন খান, 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল.' (১৯৬১) পৃ ১৫-২২ : মুজফফর আহমেদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', (১৯৬৭) পৃ ২১৪-২৮৮।

২ দ্রষ্টব্য মুজফফর আহমদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৩১-২২

সেই আন্তরিকতা ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই আর একটি ঘটনা ঘটল। ১৯২০-র আগস্ট মাসে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের সাক্ষাৎ পরিচয়ের দেড় মাসের মধ্যেই মোহিতলাল 'মানসীতে' (১৩২১ পৌষ) প্রকাশিত তাঁর 'আমি' রচনাটি পড়ে শোনান। কিন্তু তখনও নজরুলের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় জাগে নি। পরে নজরুলের আচরণে মোহিতলালের কাছে তাঁর অনাগ্রহ ও বিরূপতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তার পরেই ১৯২১-র ডিসেম্বর মাসে নজরুল তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' রচনা করলেন। মোহিতলালের ধারণা হল নজরুল তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান অথচ তাঁরই লেখার ভাব নিয়ে রচনা করছেন 'বিদ্রোহী'।

মুজফ্‌ফর আহমেদ লিখেছেন, "নজরুল ইসলাম যে তাঁর আওতা হতে, তাঁর শাসন হতে বেরিয়ে গেল তার জন্য তিনি তার উপরে খানিকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। নজরুল যদি মোহিতলালের আওতায় থেকে গিয়ে তার 'বিদ্রোহী' রচনা করত (আমার বিশ্বাস, সে কিছুতেই তা পারত না) তা হলে 'আমির' ভাব নিয়ে বা চুরি করে লেখার কোন কথাই তিনি তুলতেন না। সেই অবস্থায় মোহিতলালই হতেন নজরুলের 'বিদ্রোহী'র প্রধান প্রচারক ও গুণগ্রাহক…"[১]

দুঃখের বিষয়, মুজফ্‌ফর আহমেদের এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। মনে হয়, পাঠকসমাজে সমাদরের ফলেই নজরুলের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। মোহিতলালের পোষকতার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নজরুল যতই ঔদাসীন্য দেখান, মোহিতলাল তাঁকে ঠিকই ভালোবাসতেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটিরও তিনি গুণ গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে তিনি 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি' কবিতাটি লিখতেন না। কবিতাটি প্রবাসী ১৩৩০-এর আষাঢ় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের (বিজলী-পত্রিকায় ২২ পৌষ, ১৩২৮) প্রায় দেড়বৎসর পর মোহিতলালের এই কবিতাটি বেরিয়েছে (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ ৩৮৩)। এই কবিতাটি চরিতকার ও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। মোহিতলালও এটি তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলন করেন নি। 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি' সবটাই উদ্‌ধৃত হল।—

১ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৪৩।

কবি-বিদ্রোহীর প্রতি

মাথায় তোমার কৃষ্ণমেঘের নিশান দোলে !
নহে ত অশ্রু !—তরল তড়িৎ চোখের কোলে !
ওকি ও পিপাসা ! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি'
ঘোষিছ প্রলয়-ডমরু-নিনাদ বজ্ররোলে !

মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি ?
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী ?
এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে !—সৃষ্টি শেষ !
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি !

যুগান্তরের বহ্নি-আহবে মশাল জ্বালি'
করোটি-কপালে বিষ-অভিশাপ-আসব ঢালি'
একি সুধাপান ! ভয়ঙ্করের এ কি এ নেশা !
উদ্যত-ফণা ফণীর সমুখে কি করতালি !

তবু যে তোমার ললাটে জ্বলিছে উদয়-তারা !
কণ্ঠে তোমার প্রভাতী রাগিনী দেয় যে সাড়া !
নবজীবনের নবীন নবনী মুঠায় ভরি'—
কোন্ পুতনার স্তনপান করি আত্মহারা !

ওরে উন্মাদ, চিরশিশু, তোর একি এ খেলা !
কি স্বপন তুই দেখেছিস বল্ রাত্রিবেলা ?
সে যে শশিকলা ছুরিকার ফলা নহে সে নহে ?
রোজ-কিয়ামত নয়, সে যে নওরোজের মেলা !

আমি জানি, ওই কণ্ঠে তোমার অমৃত রাজে ;
বিষ যদি থাকে থাক্ না সে ওই বুকের মাঝে !
তার জ্বালা, সে যে জীবনের দাহ, সঞ্জীবনী—
তাহারি দহনে চিত্ত-গহনে দীপক বাজে ।

হাজার বছর মরে আছে যারা তাদের কানে
কি বাণী দানিবে ঘূর্ণীহাওয়ার নৃত্য-গানে ?

জাগরণ নয় !—দণ্ড দু'য়ের দানোয়-পাওয়া !
তার পর ? ছি ছি মড়ার উপর খাঁড়া কি হানে

তুমি নির্ভীক, তুমি দুর্দম, ঝড়ের সাথী ;
তুমি সমীরণ, ফুলেদের সনে কাটাও রাতি ;—
জীবন-মরণ দুই সতীনেরে করেছ বশ—
যখন যাহারে খুশী হয়, দাও চুমা কি লাথি !

রক্ত যাদের নেই এক ফোঁটা দেহের মাঝে—
খুন-খারাবী ও মন্ত্র তাদের দেওয়া কি সাজে ?
পচা দেহে যার কিল্‌বিল্ করে শতেক ক্রিমি,
কোনো আগুনের তাপ তারে কভু লাগিবে না যে !

কারা সে করিবে মরণের মহাগরল পান ?
বিষ-নিশ্বাসে আপনা দহিবে—কোথা সে প্রাণ ?
যারা মরে' আছে তারা কি আবার মরিতে পারে !
ভেবে দেখ নিজে, ত্যাগ কর বৃথা এ অভিমান ।

চেয়ে দেখ দেখি পূর্ব্ব-তোরণে কিছু কি জাগে—
নিশীথের নীল আঁচলে আলোর ছোপ কি লাগে ?
নহে রক্ত !—শতেক ভক্ত ছেয়েছে হোথা
উদয়ের পথ হৃদয়ের প্রেম-পদ্মরাগে !

তুমি গেয়ে চল ওই পথে পথে আপনা-হারা,
জন্ম-বাউল ! আলোকের দূত !—পথিক পারা,
চুলগুলি তুলি চূড়া বাঁধি লও, খঞ্জনীতে
ঝঙ্কার তুলি জাগাও সারাটি ঘুমের পাড়া ।

তুমি শুধু ডাকো—'জাগো সবে জাগো' আলোক জাগে
হিরণ-কিরণ প্রাণের দুয়ারে প্রবেশ মাগে !
মোর মুখে তোরা চেয়ে দেখ্ দেখি, অবিশ্বাসী !
এমন হাসিটি দেখেছিস্ কোনো গোলাপ-বাগে ?

'ওরে কেটে গেছে চিরতরে ঘোর দুঃস্বপন !
কাঁটা যেথা ছিল দেখ্‌রে সেখানে ফুলেরি বন !
মহা-আশ্বাস ছায় নীলাকাশ—দেবতা জাগে !
সাগর-সিনানে যাবি যদি—এই পরমক্ষণ !

'শুধু একবার ডেকে বল্‌ তোরা—মরি নি মোরা !
মরণ !—সে যে গো মহাকাল-হাতে রাখীর ডোরা !
জীবনেরি মোরা পরমাত্মীয় চিনেছি তারে !
জীবনেই জয়, প্রেমেই অভয়—বল গো তোরা !

'মারিয়া যে বাঁচে—বাঁচা তার নয়, সেই ত মরে !
বাঁচাতে যে মরে, মরণ তাহারে প্রণতি করে।
যুগে যুগে এই মহাবাণী এই অমৃত-গীতা
গেয়েছেন যাঁরা—জন্মেছি মোরা তাঁদেরি ঘরে !'

হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্তধারা !
তুমি গাও গান—শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস—অভয়-বাণী
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আঁধার কারা !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এটি একটি চমৎকার কবিতা। এটা পড়লে সন্দেহ হওয়া কঠিন বিদ্রোহী-কবির প্রতি মোহিতলালের বিন্দুমাত্র দ্বেষ আছে।

অতঃপর ১৩৩১-এর শ্রাবণ মাস থেকে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবার জন্যই পত্রিকাটি স্থাপিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ রসিকতা করবার জন্যই সজনীকান্ত এতে লিখলেন বিদ্রোহীর প্যারডি 'ব্যাঙ'। ১৯২৩-এর ডিসেম্বর থেকে সজনীকান্ত বাদুড়বাগানের মেসে বাস করছিলেন। সেখানে থাকতেন মোহিতলাল। মোহিতলালের সঙ্গে কীভাবে তিনি ঘনিষ্ঠ হলেন, তার বর্ণনা সজনীকান্ত আত্মস্মৃতিতে[১] দিয়েছেন। প্রথমে স্বপনপসারীর 'পুরূরবা' তারপর 'ব্যাঙ' পাঠ করেই সজনীকান্ত মোহিতলালের দৃষ্টিতে আসেন। 'ব্যাঙ' ১৮ই

১ আত্মস্মৃতি. ১ম, পৃ ১৩২-১৩৩, ১৩৬-৩৭।

আশ্বিন ১৩৩১ অর্থাৎ ৪ অক্টোবর ১৯২৪-এ শনিবারের চিঠিতে বেরোয়। দেখাই যাচ্ছে, ১৩৩১-এর আশ্বিনের আগে শনিবারের চিঠির সঙ্গে মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। মোহিতলাল লিখেছেন,[১] "এই সময়ে আমি ইহাদের বৈঠকে বসিতাম বটে কিন্তু ঐ পত্রিকায় কিছু লিখি নাই ; আমার বয়সের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইহারাও আমাকে দলে টানিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন।" প্যারডি-রচনায় সজনীকান্তের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, এ-কথা সুবিদিত। তাঁর সেই প্রতিভা নিয়োজিত হল নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায়। নজরুল এটা লঘুভাবে নিতে পারলেন না, মনে করলেন মোহিতলালই লিখেছেন। অতঃপর কয়েক দিনের মধ্যে তিনি লিখলেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা', ১৩৩১ কার্তিকের 'কল্লোলে' বের হল। তার কয়েক দিনের মধ্যে মোহিতলাল লিখলেন 'দ্রোণগুরু', প্রকাশিত হল শনিবারের চিঠির দ্বাদশ সংখ্যায় ১৩৩১, ৮ই কার্তিক। বস্তুত নজরুলের বিরুদ্ধে মোহিতলালের লেখনী প্রথম উদ্যত হয়েছিল 'দ্রোণগুরু'তেই নজরুলের 'সর্বনাশের ঘণ্টা' পড়ে। তারপর প্রবাসীর ১৩৩১-এর অগ্রহায়ণে মোহিতলাল একটি কবিতা লেখেন 'বিস্মৃতি ও স্মৃতি' নামে। কবিতাটি লেখা হয়েছিল 'সুইনবার্ণের অনুসরণে'। 'বিস্মরণী'তে এই নামেই এটি সংকলিত আছে। নজরুলের নাম না থাকলেও নজরুলকে অভিশাপ দিয়েই রচিত বলে এটি পরিচিত। মোহিতলাল-নজরুল সম্পর্কের ঘটনাগুলি[২] ছক করে নীচে সাজিয়ে দেওয়া গেল—

মোসলেম ভারতে 'খেয়াপারের তরণী'	১৩২৭ শ্রাবণ
মোহিতলালের পত্র	১৩২৭ ভাদ্র
মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ	১৩২৭ ভাদ্র-আশ্বিন
'আমি' পড়ে শোনানো	১৩২৭ কার্তিক ?
মোহিতলালের স্বরচিত কবিতা-পাঠ ও নজরুলের ঔদাসীন্য	১৩২৮ আশ্বিন ?
মোহিতলালের 'ঘরের বাঁধন' [নজরুলের উদ্দেশ্যে লেখা] ভারতী	১৩২৮ ভাদ্র
'কবিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নঃ ইঃ র উদ্দেশে' মোহিতলালের কবিতা উপাসনায়	১৩২৮ ভাদ্র
নজরুলের 'বিদ্রোহী' বিজলীতে	১৩২৮ পৌষ
মোহিতলালের 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি' প্রবাসীতে	১৩৩০ আষাঢ়

১ 'শনিবারের চিঠি ও আমি', বিংশ শতাব্দী চতুর্থ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা।

২ এ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদের জন্য ৩১১—৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সজনীকান্তের 'ব্যাঙ' শনিবারের চিঠিতে	১৩৩১ আশ্বিন
নজরুলের 'সর্বনাশের ঘণ্টা' কল্লোলে	১৩৩১ কার্তিক
মোহিতলালের 'দ্রোণগুরু' শনিবারের চিঠি প্রবাসীতে	১৩৩১ কার্তিক
মোহিতলালের 'বিস্মৃতি ও স্মৃতি' প্রবাসীতে	১৩৩১ অগ্রহায়ণ

মোহিতলাল-নজরুল-বিরোধ অতীতের ঘটনা। মোহিতলাল পরে নজরুলের কবিতার সমালোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু সে তাঁর সমালোচনারই আদর্শে। এ রকম সমালোচনা অনেকের সম্বন্ধেই করেছেন। কিন্তু নজরুল তাঁর বই মোহিতলালকে উপহার পাঠাতেন শুনেছি, যদিও উভয়ের প্রত্যক্ষ দেখা আর বেশি হয় নি। মোহিতলালও নজরুলের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

ছন্দ-চিন্তা

মোসলেম ভারত-সম্পাদককে লেখা পত্র বাদ দিলে মোহিতলালের সবচেয়ে পুরনো পত্র আমরা যা পেয়েছি, তা হচ্ছে ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা। প্রবোধচন্দ্র তখন বাংলা ছন্দ নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দসরস্বতী' প্রকাশিত হওয়ার পর। প্রবোধচন্দ্রের এই প্রবন্ধই শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি ছন্দোবিদ্‌দের আলোচনার ধারা নির্মাণ করে বলা যায়। মোহিতলালের মতো কাব্যদেহ-নির্মাণ-কুতূহলী কবিও বাংলা ছন্দের আলোচনায় এগিয়ে আসেন পরবর্তী কালে। বাংলা ছন্দ আলোচনার সমৃদ্ধ ধারার গোড়াতেই মোহিতলালের এবিষয়ে মন্তব্য পরম কৌতূহলোদ্দীপক।

আমাদের অনুরোধে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ইতিহাস বর্ণনা করে আমাদের যে পত্র লেখেন, নজরুল ইসলাম এবং ছন্দচর্চার প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে সেই পত্রখানি সবটাই নিয়ে উদ্‌ধৃত করে দিলাম।—

"মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধুত্বসূত্রে। কবি নজরুলের সান্নিধ্যে আসি ১৯২১ সালে কুমিল্লা শহরে। বন্ধু বীরেন্দ্রকুমার সেনের মধ্যস্থতায় এই সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগে নি। তার ফলও ফলল অচিরেই। কবির 'বিদ্রোহী' ও আমার 'নিশীথে' কবিতা যথাক্রমে প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৮ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। আমার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবিনজরুলের আগ্রহেই 'নিশীথে' কবিতাটি

প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়েই বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তার ফলে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বাংলা ছন্দ' ও 'বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে প্রবাসী পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। প্রবন্ধটি পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পর পর পাঁচ সংখ্যায় (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র ও ১৩৩০ বৈশাখ)। তারই পরিপূরক হিসাবে দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তিন সংখ্যায় (১৩৩০ মাঘ চৈত্র)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, বাংলা ছন্দ-বিষয়ক আমার এই আলোচনা সম্বন্ধেও কবি নজরুলের বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। 'আরবী ছন্দ' সম্বন্ধে তাঁরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৮ চৈত্র)।

আমার প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশের কিছুকাল পরে (ঠিক কোন সময়ে মনে নেই) কলকাতায় কবি মোহিতলালের সঙ্গে আমার দেখা হয় তাঁর বাসস্থানে, সম্ভবতঃ বাদুড়বাগান লেনেই। দেখা করেছিলাম কবি নজরুলের আগ্রহেই, ঠিকানাও তিনিই দিয়েছিলেন। দেখা হল একদিন সন্ধ্যার পরে, কিন্তু গভীর রাত্রির পূর্বে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস বিরত হল না। কবি নজরুলের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ দিয়ে হল আলোচনার সূত্রপাত। তারপরে চলল সাহিত্যের বিচিত্র কথা। তাঁর বাক্যের ব্যঞ্জনায় ও কণ্ঠস্বরের আবেগে যে তন্ময় কবিপ্রাণের পরিচয় পেলাম তা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। বিস্মিত হলাম তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে, আর মুগ্ধ হলাম তাঁর কবিতা-আবৃত্তির লীলাভঙ্গিতে। অনেক কবি সম্বন্ধেই অনেক প্রসঙ্গ উঠল। তবে সে দিন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্বন্ধেই তাঁর উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাই আবৃত্তি করলেন।

এই প্রথম পরিচয়ের পরে নানা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আরও অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। শেষ দেখা হয় প্রকাশক-বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের (জেনারল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স) আপিস ঘরে। তখন ওখানে তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানি ছাপা হচ্ছিল। সেখানেই ওই বই-এর প্রসঙ্গে বাংলা ছন্দের নানা বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনাও চলে। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে তিনি আমার ছন্দ-আলোচনা কখনও পুরোপুরি সমর্থন করেন নি, কঠোর সমালোচনাও করেছেন। তা হলেও আমার প্রতি তাঁর প্রীতি কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি, আর আমার ছন্দ-আলোচনাও কখনও তাঁর অনুকূল মনোভাব থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানি প্রকাশের (১৩৫২ শ্রাবণ) সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে এক খণ্ড বই উপহার পাঠান। গ্রন্থের শিরোভাগে লিখিত উপহারলিপি ছিল এই।—

"পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন করকমলেষু
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
২৬ শে শ্রাবণ, ১৩৫২।"

এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'তেও আমার ছন্দচর্চার কিছু বিরূপ সমালোচনা ছিল। কিন্তু এই বিরূপতা সত্ত্বেও ওই ভূমিকাতেই তিনি লেখেন—

"বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।...সদ্য প্রকাশিত তাঁহার এক গ্রন্থে ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ') আমি তাঁহার আলোচনার ভাষা ও ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি।"

আরও কিছু কাল পরে 'ছন্দপরিভাষা' নামে আমার একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (১৩৫৫ মাঘ)। এই প্রবন্ধের প্রায় পঞ্চাশটি মুদ্রিত কপি বাংলা দেশের অগ্রণী কবি ছান্দসিক ভাষাতাত্ত্বিক ও ছন্দশিক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাই। অনেকের উত্তর পাই। কিন্তু অধিকাংশ উত্তরই সৌজন্যসূচক, আমার বিচারবিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক নয়। মোহিতলালের উত্তরও সহায়ক হয় নি। কিন্তু একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই মামুলি সৌজন্যের পরিবর্তে যথার্থ উৎসাহ পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সে পত্রখানি কোথায় কি ভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে, এখনও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। অজ্ঞাতবাসে একাকী নয়, মোহিতলালেরই আরও দু-একখানি পত্রকেও নিজের সহচর করে নিয়েছে। তার একখানি তাঁর উপহৃত 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানির প্রসঙ্গে লিখিত। এই নিরুদ্দিষ্ট পত্রখানির অভাবে মোহিতলালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের সত্যরূপটি খণ্ডিত হয়ে রইল। আমার পক্ষে এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। যা হক ছন্দপরিভাষা সম্পর্কে তাঁর ওই হারানো পত্রখানির মূল কথাগুলি এখনও মনে আছে। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম এই।—'আমি কবি মানুষ, কবিমনোভাব ও কানের রুচি অনুসারেই ছন্দ আলোচনা করি। আপনি মতামতের অপেক্ষা করবেন না। আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করে থাকেন সুতরাং কারো মতামতের দিকে না তাকিয়ে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারেই পরিভাষা রচনা করুন।'

মোহিতলাল যখন 'বঙ্গদর্শন' (তৃতীয় পর্যায়) সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তখনও তাঁর সঙ্গে আমার যোগ ছিল। পত্রিকার প্রতি সংখ্যা তিনি আমাকে নিয়মিত পাঠাতেন। আমার কাছে লেখাও চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার লেখা দেবার অবকাশ হয় নি। পত্রিকাটিও অল্প কাল পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

মোহিতলালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালব্যাপী হলেও তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর যোগরক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু বারে বারেই তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, সাক্ষাতে বা পত্রযোগে। 'পত্রগুচ্ছ' গ্রন্থে শুধু দুই পর্যায়ের (১৯২৩-২৪ এবং ১৯৪৭) পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অন্য পর্যায়ের অবগুণ্ঠিত পত্রগুলি যদি কখনও আবিষ্কৃত হয় তবে সেগুলিকেও পাত্রস্থ করবার অভিপ্রায় রইল।

'পত্রগুচ্ছে' প্রকাশিত দুই পর্যায়ের পত্রের মধ্যে প্রথম পত্রগুলির (পৃ ৪-১৪) উপলক্ষ প্রথমেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্র-দুটি (পৃ ২৬৮-৭১) সম্বন্ধেও দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা প্রয়োজন। এই দুই পত্রে উল্লিখিত 'ছন্দোমীমাংসা' নামক গবেষণাগ্রন্থখানি নিয়ে আমাকে বেশ একটু মুশকিলেই পড়তে হয়েছিল। মোহিতলালের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে পরীক্ষকতার নিয়োগপত্র আসার পূর্ব থেকেই দুই বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যক্তিগত প্রভাব এসে আমার নিরপেক্ষ বিচারের পথকে দুর্গম করে তোলে। এসব কারণে আমি অতুল গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে বইটি সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং সম্ভব হলে দুইজনে একটি যুক্ত-রিপোর্ট দেবার প্রস্তাব করি। তাতে তিনি সম্মত হন বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যেও তিনি বইখানি পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ পান নি। অবশেষে তাঁর জন্য আর অপেক্ষা না করে আমি স্বতন্ত্রভাবেই রিপোর্ট লিখে পাঠাই। আমার রিপোর্ট গবেষকের অনুকূলই হয়েছিল। কিন্তু মোহিতলাল তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন মনে করি না। তাঁর মধ্যে কখনও অনুদারতার লেশমাত্র দেখি নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, 'ছন্দোমীমাংসা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য[১] (আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক) তাঁর 'ছন্দোবিজ্ঞান' গ্রন্থের (১৯৪৮ সেপ্‌টেম্বর) 'নিবেদন' অংশে এই অপ্রকাশিত গ্রন্থখানির বিষয় উল্লেখ করেছেন।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় পত্রে মোহিতলাল 'কবিতাসঞ্চয়' ও 'প্রবন্ধসঞ্চয়' প্রকাশের যে পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমিও বিশেষ আগ্রহী ছিলাম। তাই এ কাজটি যাতে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য চেষ্টিতও হয়েছিলাম। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় বিশ্বভারতীর অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে মোহিতলালের সংকল্পও অপূর্ণ থেকে যায়।

১ বর্তমান গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দুই

প্রবাসীতে প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পরেই মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় কাজী নজরুল ইসলামের আগ্রহে। সেই প্রথম আলাপের আনন্দোচ্ছ্বাসের উল্লেখ আছে মোহিতলালের প্রবোধচন্দ্রকে লেখা প্রথম পত্রে। সেই সময় প্রবোধচন্দ্র শ্রীহট্টে।

প্রথম পত্রটিতে মোহিতলাল প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ মাত্র করেছেন। তৃতীয় পত্রটিতে (১১ই এপ্রিল ১৯২৪) প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-আলোচনা সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত মন্তব্য জানিয়েছেন। মোহিতলালের এই পত্রটি বাংলা ছন্দ-আলোচনার ইতিহাসে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় বাংলা কাব্য-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যের মতোই গুরুত্বমণ্ডিত। এজন্য এ বিষয়টির কিঞ্চিৎ বিস্তার প্রয়োজন।

প্রবাসীতে প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার আগে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ। বিহারীলাল গোস্বামীর 'কবিতার ছন্দ ও মিল' (ভারতী ১৩০৭ কার্তিক), এবং 'ছন্দ ও মিলের খুঁটিনাটি' (ভারতী ১৩০৭ মাঘ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য'-কাব্যের ভূমিকা (১৩১৪ বৈশাখ), শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাংলা ছন্দ' (প্রবাসী ১৩২১ আষাঢ়) বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'কবিতার ভাষা ও ছন্দ' (প্রবাসী ১৩২২ অগ্রহায়ণ) প্রভৃতি প্রবন্ধে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা ছন্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির কোনোটাই অন্য কোনোটির মতামতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নি। সকলেই নিজের নিজের ভঙ্গিতে আলোচনা করেন। বাংলা ছন্দের কোনো পরিভাষা যেমন ছিল না, তেমনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিক্রম ও বিন্যাসও এতে অনুসৃত হত না। 'বঙ্গবাণী'তে সংকলিত শশাঙ্কমোহন সেনের প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'কবিসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও তত্ত্বকল্পনার প্রভাবে বাংলা ছন্দের সত্যরূপটিকেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং ফলে ছন্দের বিভিন্ন নীতিসূত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।' ('ছন্দপরিক্রমা', নিবেদন)।

১৩২১ থেকে ১৩২৪-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডি. এনডারসনের কৌতূহলের উত্তরে কয়েকটি পত্রপ্রবন্ধ লেখেন ছন্দ নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এনডারসন নিজে দীনেশচন্দ্র সেনের The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal (১৯১৭) গ্রন্থের ভূমিকায়, A Manual of the Bengali Language (১৯২০)-এ বাংলা পয়ার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে-

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে 'বাংলা ছন্দ' নাম দিয়ে যে দুটি প্রবন্ধ লেখেন (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ), তাতে বাংলা ছন্দের কতকগুলি অত্যন্ত মৌলিক লক্ষণের কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ পেল। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেছেন[২],

'তাহাতে তাঁহার সেই ঋষিদৃষ্টিসম্ভূত যে কয়েকটি ঋক্ ছড়াইয়া আছে। তাহার মর্ম কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই…[১]',

সবুজপত্রেই রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'সংগীতের মুক্তি' (১৩২৪ ভাদ্র) এবং 'ছন্দ' (১৩২৪ চৈত্র)। প্রবোধচন্দ্র অনুমান করেন[২] সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুবিখ্যাত 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধের প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের অভিমত[৩] —

'এগুলি সবই ছন্দ-রচনার দৃষ্টি নিয়ে লেখা। ছন্দ-ব্যাকরণের দৃষ্টি নিয়ে নয়। এ-দৃষ্টি স্রষ্টার, বিশ্লেষকের নয়'।

প্রবোধচন্দ্রের এই মন্তব্যটি অন্যদিক থেকেও অর্থবহ, কারণ মোহিতলালের পত্র থেকেই দেখা যাবে তিনি প্রবোধচন্দ্রের লেখার প্রশংসা করেও শুধু বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে নির্ভর না করে কাব্যরস-সৃষ্টির সহায়ক হিসাবেই ছন্দের আলোচনা প্রবর্তন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী'-ও অলংকৃত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক ঋজুতা অর্জন করতে বাধা পেল। অর্থাৎ বাংলা ছন্দ প্রসঙ্গে কেউ যদি যুক্তিসিদ্ধ সমর্থন পেতে চায়, তবে সে-রকম নিঃসংশয় সমর্থন পাওয়া সহজ হল না।

এই পটভূমিতেই প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-বিষয়ক আলোচনার বিশিষ্টতা এবং অগ্রগামিতা বিচার্য। মোহিতলাল বলেছেন 'ঐ প্রবন্ধ তোমার একটা খুব বড় কীর্তি হয়ে রইল—তুমি যশস্বী হয়েছ'।—এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত মাত্র নয়। বাংলা ছন্দের আলোচনার ইতিহাসে এই ধারাবাহিক রচনাগুলি যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, এটি মোহিতলাল ছাড়াও অন্যত্র স্বীকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন—

Retreat
Shahibag
Ahmedabad
৪ এপ্রিল ১৯২৩

১ বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) ভূমিকা
২ ছন্দ (বিশ্বভারতী, ১৯৬২) পৃ ৩৫৬-৩৫৭
৩ ছন্দপরিক্রমা, নিবেদন

কল্যাণীয়েষু,

ছন্দ সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধগুলি আমি পূর্বেই প্রবাসীতে পড়েছি এবং পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার বয়স অল্প কিন্তু তোমার লেখার মধ্যে প্রবীণতা আছে। তোমার লেখাটি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করি এমন সময় আমার নেই—যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয় তবে এ বিষয়ে আমার যা বলবার কথা তা বলতে পারব।

নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম বলে তোমার চিঠি পেতে বিলম্ব হল। আগামী বৎসরের প্রারম্ভে দেশে ফিরব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন তাঁর সুবিখ্যাত Origin and Development of Bengali Language ছাপছিলেন। প্রবোধচন্দ্রকে (3 Sukias Row, Calcutta, 3 December 1923) তিনি লিখলেন—

"আপনার প্রবন্ধগুলিতে যে রীতিতে বাঙ্‌লা ছন্দের প্রকৃতি আলোচিত হ'য়েছে তা আমার খুবই ভাল লেগেছে। বাঙ্‌লা ছন্দের প্রকৃতি আর তার পর্যায় আর শ্রেণীবিভাগ এই রকম যথার্থ বিচারের সঙ্গে "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে" (এই ভয়-দেখান শব্দসমষ্টিটি প্রয়োগ করলুম!) আপনার পূর্ব্বে আর কেউ তো করেন নি। আপনার প্রবন্ধের কথা আমি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র আর বন্ধুদের মধ্যে ব'লেছি। চারুবাবুর কাছে শুনলুম আপনি ঐ বিষয়ে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন আর লিখছেনও বোধ হয়। সেগুলি প্রকাশিত হবার আশায় রইলুম।..."

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতিকুমারের বই প্রকাশিত হল। তাতেও তিনি লিখলেন[১]।

The most systematic study of Bengali versification, hitherto published, is by Prabodh-Chandra Sen in a recent series of articles to the Pravasi (Pausa, Magha, Phalguna and Chaitra, 1329 San and Vaisakha 1330 (1922-23) which clearly distinguishes between

১ Origin and Development of Bengali Language Vol. I Chap. II. pp. 289.90. f. n.

পরেও সুনীতিকুমার লিখেছেন 'প্রবোধবাবু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে করিতেছেন; ওদিকে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার লেখাগুলি এতাবৎ এবিষয়ে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে।'

—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত পঞ্চপুষ্প ১৩৩৮ বৈশাখ পৃ ৮৮।

the three types of metre in Bengali and classifies them on a scientific basis. Some of the examples here quoted are from Mr. Sen's articles.

প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দ' প্রবন্ধ পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথও খুশি হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল, কিন্তু অকালমৃত্যুতে তাতে বাধা ঘটল। প্রবাসীতে প্রেরিত পাণ্ডুলিপি তিনি দেখেছিলেন, মুদ্রিত দেখে যেতে পারেন নি।[১] প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' অনুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২০৯-তে লিখেছিলেন 'শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রবাসীতে ধারাবাহিক-প্রবন্ধ লিখে সুপরিচিত হয়েছেন।' প্রবোধচন্দ্রই বাংলা ছন্দের তিনটি শ্রেণীর অক্ষরবৃত্ত স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত এই নাম দেন। পরে তিনি নাম বদলে যথাক্রমে মিশ্রকলাবৃত্ত, দলবৃত্ত এবং সরল কলাবৃত্ত করলেও তাঁর পুরোনো নামও বহু প্রচলিত হয়েছে।

প্রবোধচন্দ্রের এই প্রবন্ধ মোহিতলালের প্রশস্তি এবং উৎসাহ লাভ করলেও পরে দুজনের মধ্যে মতভেদ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রবোধচন্দ্র বিচিত্রায় 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[২]

এই প্রবন্ধটি একটি স্মরণীয় ছন্দবিতর্কের সূত্রপাত করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি বিষয়ে এর প্রতিবাদে লেখেন 'বাংলা ছন্দ' (বিচিত্রা, ১৩৩৮ পৌষ)।[৩]

তারই উত্তরে প্রবোধচন্দ্র আবার লেখেন 'ছন্দজিজ্ঞাসা প্রথম পর্ব' (বিচিত্রা, ১৩৩৮ মাঘ)। এই পর্যন্ত লিখতেই মোহিতলাল শনিবারের চিঠিতে 'বাংলা ছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটি প্রবন্ধে তীব্র মতভেদ প্রকাশ করেন। অবশ্য প্রবোধচন্দ্র তাতে নিরস্ত না হয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন 'বিচিত্রা' 'প্রবাসী' এবং 'পরিচয়ে'।

প্রবোধচন্দ্রের আলোচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে মোহিতলালের আপত্তির হেতু মূলত দুটি। প্রথমত প্রবোধচন্দ্র ছন্দ-আলোচনায় কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান করছেন—কাব্যরস অনুধাবনের পক্ষে অতিরিক্ত নিয়মনির্ভরতা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুচিত বলেই মোহিতলাল মনে করেন। এই আপত্তির ইঙ্গিত মোহিতলালের পত্রেই আছে—

১ ছন্দপরিক্রমা, নিবেদন

২ বিচিত্রা, ১৩৩৮, অগ্রহায়ণ

৩ দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' (বিশ্বভারতী ১৩৬২) পৃ ৩৮১—৪১৩

"ছন্দ কবিতার প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু ছন্দ রচনা যদি কবিদের মুখ্য চেষ্টা হয়, তবে কাব্যকে তা কতখানি কৃত্রিম করে তোলে বা নষ্ট করে, আজকালকার কাব্য-রচনায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-আলোচনা সম্বন্ধে মোহিতলালের আপত্তি শেষ পর্যন্ত ঘোচেনি। 'বাংলা কবিতার ছন্দে'র (১৩৫২) ভূমিকায় তিনি বলেন প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২) গ্রন্থের ভাষা ও ভঙ্গিতে মুগ্ধ হলেও—

"সেন মহাশয় যে ভাবে ছন্দ-পরিচয় ত্যাগ করিয়া ছন্দতত্ত্বের গহনে যাত্রা সুরু করিলেন এবং 'actual sounds' হইতেই বাংলা ছন্দের অদ্বৈততত্ত্ব আবিষ্কার-মানসে যেরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতে সে আশা অচিরে ত্যাগ করিতে হইল: অথচ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এখনও 'যুগ্মধ্বনি' ও 'যৌগিক' 'মুক্তক' ও 'প্রবহমান' প্রভৃতি মুদ্রাদোষ তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।"

মোহিতলাল ছন্দকে কবির কবিতার 'স্টাইল' হিসাবে দেখতে চান।— 'বাংলা কবিতার ছন্দের' ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন, 'ইহা কোন তত্ত্বঘটিত আলোচনা নয়, যাহাকে ইংরাজীতে Prosody বলে, আমি সেইরূপ 'ছন্দপরিচয়' লিখিয়াছি—বাংলা কবিতার ধ্বনিরসরূপ যাহাতে একটু বুঝিয়া লইতে পারা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি।'

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-আলোচনা সম্বন্ধে মোহিতলালের দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে মতবাদ। একদা রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' (১২৯০) নামক প্রবন্ধে রামপ্রসাদী ছন্দকেই বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ প্রধান ছন্দ বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[১] এই মত প্রকাশের বেশ কয়েক বৎসর পর 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যেই তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপ্রচুর ব্যবহার করেছিলেন। এই ছন্দের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ।[২] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'মন্দ্র' এবং 'আলেখ্য' কাব্যে স্বরবৃত্ত ছন্দ অবলম্বনে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন; কিন্তু সেগুলির অভিনবত্ব অনেকদিন পর্যন্ত কারো চোখে পড়ে নি।

প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৯ ফাল্গুন) 'স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব' প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্র স্বরবৃত্ত ছন্দের সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করলেন স্বভাবতই সেটা মোহিতলাল-প্রমুখ

১ ছন্দ (১৯৬২) পৃ ১৬৯—৭১

২ ছন্দসরস্বতী (১৩৭৪) অলোক রায়-সম্পাদিত, পৃ ২০—২১

সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখনও 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধটি তৎকালীন আলোচকদের চোখ এড়িয়ে ভারতীর পৃষ্ঠাতেই ছিল প্রচ্ছন্ন।[১] ঐ প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্রের যে মন্তব্য মোহিতলালের ভিন্নমত উদ্রিক্ত করেছিল তা এই—

"ছন্দের যে শক্তিতে ইংরেজি ভাষায় Paradise Lost, Childe Harold প্রভৃতি অতি গুরুগম্ভীর বৃহৎ কাব্য রচিত হতে পেরেছে, বাংলা স্বরবৃত্তের সে-ক্ষমতা আছে কিনা তা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বাংলা স্বরবৃত্তে 'পলাতকা'র মতো অতি উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ এবং 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি অপূর্ব কবিতা রচনা করা যায় তা দেখা গেছে। কিন্তু এ ছন্দে 'মেঘনাদবধ'-এর মতো কাব্য বা 'বসুন্ধরা'র মতো কবিতা রচিত হতে পারে কিনা, তা এখনও জানা যায় নি। অর্থাৎ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ ছড়া-পাঁচালি ছেড়ে মহাকাব্যের বাহন হতে পারে কিনা এইটে হচ্ছে প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস ইংরেজি ছন্দে যখন গম্ভীর ও গভীর কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে, তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও তা পারার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, দেখা গেছে যেখানে হসন্ত বর্ণের সংখ্যাটা কিছু বেশি সেখানে নাচুনি তালটাই ওঠে সহজে, গম্ভীর সুর প্রকাশ করা শক্ত। ইংরেজিতেও হসন্ত বর্ণের অভাব নেই এবং ও-ভাষার Trochee ছন্দে নৃত্যেরও অভাব নেই, অথচ ওই ভাষায় যখন Paradise Lost লেখা গেল তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও গম্ভীর কাব্য রচনা করার সম্পূর্ণ আশা আছে বলে মনে করি।"

প্রবোধচন্দ্র 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ' (উদয়ন, ১৩৪০ আশ্বিন) প্রবন্ধে স্বরবৃত্ত ছন্দের অভিনব রূপের বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন, স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যচপলতাকে সংযত করে দ্বিজেন্দ্রলাল অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতোই গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেখানে তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

"দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' (এবং অন্যান্য কাব্যের) ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই একটি Syllabic রূপ দিতে। এই জন্যই দেখতে পাই তাঁর এই Syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশবিধি রক্ষিত হয় নি। এমন কি তাঁর এই

১ ভারতীতে (১২৯০, শ্রাবণ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনার অংশ। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু এর লেখক যে রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন 'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ) তা প্রমাণ করেছেন।

syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত যৌগিক ছন্দকে syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জন্যেই তাঁর এই অভিনব syllabic ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশবিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সুর ধ্বনিগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে অথচ ছন্দটা syllabic বলে তাতে যৌগিক ছন্দে দুষ্প্রাপ্য একটা অভিনব ছন্দবৈচিত্র্যও দেখা যায়।"

স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্তের এই মিশ্রণ যে সম্ভব সে বিষয়ে মোহিতলালও পরে অবহিত হয়েছিলেন। পরে তিনিও বলেন,

"দ্বিজেন্দ্রলাল ছড়ার ছন্দ ও পয়ার এই দুয়ের ভেদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহার কবিতাগুলিকে এইরূপ ছন্দে ঢালিয়া সম্ভবতঃ কাব্যভাষা ও কাব্যছন্দকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন—

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে। (আলেখ্য)

—এ ছন্দ যে খাঁটি ছড়ার ছন্দ নয়, তার প্রমাণ ইহার পর্বগুলির মাত্রা সর্বত্র ঠিক নাই অর্থাৎ চার-চার অক্ষর (syllable) ইহার আবশ্যিক ছন্দভাগ নয় ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছন্দভঙ্গ হয় না। তাছাড়া এই ছন্দে বিশিষ্ট যতির (metrical pause) স্থানও আছে, পর্বচ্ছেদের Rhythmical pause বা ছন্দোমূলক যতি অপেক্ষা সেই যতির প্রভাবই বেশি।"[১]

তৎসত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্রের স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধীয় মতকে মোহিতলাল ওই 'বাংলা কবিতার ছন্দে'র ভূমিকাতে সমালোচনা করে লিখেছেন,

"ছড়ার ছন্দ ও প্রাকৃত ভাষার পদ্যমহিমা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে সে যেন একটা সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এই জন্যই তিনি বাংলা ছন্দসঙ্গীতের ধ্রুবপদী রূপকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারেন নাই, লৌকিক টপ্পাই তাঁহার ছন্দতত্ত্বের মূলসূত্র নির্মাণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

মোহিতলালের নিজের বিশ্বাস এবং আকর্ষণ ছিল অক্ষরবৃত্তের প্রতি। বর্তমান পত্রে তিনি সে বিষয়ে যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এখানে ব্যক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে মোহিতলালের অভিমত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে প্রায় সাতাশ বৎসর পরে প্রকাশিত 'বাংলা কবিতার ছন্দে'। সেখানে এ বিষয়ে তাঁর অবিচলিত সিদ্ধান্ত—

১ বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) পৃ ৪৪

"মধুসূদনের ছন্দ শুধুই একটা নূতন ছন্দ মাত্র নয়, উহা একাই বাংলাছন্দের একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য আর যাবতীয় বাংলা ছন্দ—গীতিচ্ছন্দ, কেবল ভগবানের আশীর্বাদে আমরা ওই একটি অপর ছন্দ লাভ করিয়াছি—যাহার দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই সাগরকল্লোল হইতে তটিনীর কলধ্বনি পর্যন্ত সকল সুরে ঝঙ্কৃত করা যায়; বিশেষ করিয়া জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ রূপরসের অনুভূতিকে মানবকণ্ঠেরই বিচিত্র স্বরব্যঞ্জনায়, ভাষার ছন্দে প্রকাশ করা যায়।"[১]

মোহিতলালের এই পরিণত মত আভাসিত হয়েছে ১৯২৪-এর পত্রে।

নি জে র ক বি তা

মোহিতলাল আত্মসচেতন কবি ছিলেন। কবিতার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে যেমনি, তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধেও তেমনি তিনি তীক্ষ্ণ সজাগ ছিলেন। মোহিতলালের প্রখর সমালোচক মন নিজের কবিতাকে যথাসাধ্য নিখুঁত করে তুলবার চেষ্টা করেছে। তাঁর কবিতার ভাব এবং রূপের পরিপাট্য বিধানের কথা নিজে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। যে কবিতাগুলি তাঁর কাব্যগ্রন্থে সংকলিত, তারা দুবার নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রথমত, কবিতা লেখার সময়ে, দ্বিতীয়ত মাসিক পত্র থেকেও নির্বাচিত হবার সময়ে। তাই মোহিতলাল প্রত্যয়সহকারেই বলেছেন আমি একটি কবিতাকেও কোন গ্রন্থে স্থান দিই নাই যাহা কবিতা হিসাবেও সার্থক নয়। আমার ঐ চারিখানি কাব্যই সমান মূল্যবান্। বস্তুত মোহিতলালের মাত্র চারিখানি গ্রন্থে সংকলিত কবিতার সংখ্যা তত বেশি নয়। তাঁর কাব্যরচনাকাল মোটামুটি ১৯১৬ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত অর্থাৎ কুড়ি বৎসর। তাঁর সমালোচনা-মানদণ্ডে যথেষ্ট গুরু যেগুলি বিবেচিত হয় নি তাদের তিনি গ্রন্থাকারে চিরস্থায়িত্ব দেন নি। এমন আত্মসমালোচক কবি সত্যই কম দেখা যায়। ফলে গ্রন্থে প্রকাশিত প্রত্যেকটি কবিতা সম্বন্ধেই যখন তিনি চরম সিদ্ধি দাবী করেন তখন পাঠক চকিত হলেও এই দাবীর পিছনে কারণ বোঝবারও চেষ্টা করা সঙ্গত।

১৯২৪-এ লেখা চিঠিতে মোহিতলাল লিখেছিলেন, 'আমি popular হতে পারলাম না, পারবও না। আজকালকার দিনে popularity-ই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রমাণ।' মোহিতলালের এই উক্তিতে একটি ঐতিহাসিক অর্থ নিহিত আছে মনে হয়। ইতিপূর্বে নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতোই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত

১ দ্রষ্টব্য ওই গ্রন্থের ২য় ভাগ, 'বাংলা পয়ার ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর'

হয়েছেন। তাঁর পর পর প্রকাশিত কয়েকটি কবিতাতেই তিনি জনচিত্তকে জয় করে নিয়েছেন। নজরুলের প্রবল আবেগ এবং তীব্র উচ্ছ্বাস জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিনে যুবচিত্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সাময়িক উপলক্ষ অনেক সময়েই তাঁর কবিত্বশক্তিকে অসংযত ও অধীর করে তুলেছে। স্বভাবতই নজরুল বহু-উচ্চারিত জনপ্রিয় কবি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মোহিতলাল এ দিক থেকে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর বিষয় নির্বাচনে সাময়িক প্রয়োজন-সাধনের ভাবনা নেই, বরং মনে হয় সে দিকটা তিনি পরিহার করেই চলেছেন। মোহিতলালের কবিতা যদি আস্বাদন করতে হয় তবে বিশুদ্ধ কবিতা উপভোগের জন্যই তা করতে হবে। সেই জনপ্রিয় কবিতা-সমাদরের দিনে মোহিতলালের কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখালে স্বভাবতই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন।

নিজের কবিতা সম্বন্ধে মোহিতলালের প্রাচীন উল্লেখ যা পাওয়া গিয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যেতে পারে কবিতার 'ফর্ম' বা শিল্পরূপ নিয়ে তাঁর ভাবনা। কবিতার ভাববস্তুর অপেক্ষাও কবিতার প্রকাশরূপ নিয়েই তিনি যেন অধিকতর সতর্ক। এটা মোহিতলালের একটি প্রধান বিশেষত্ব। ফর্ম এবং কন্‌টেন্টের হরিহরাত্মা যাঁর আদর্শ, তাঁর নিজের কবিতায় তিনি সে বিষয়ে অবহিত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। ফর্ম সম্বন্ধে এই সচেতনতার উৎস দুটি বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মধ্যাহ্নকাল বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অপরিমেয় রূপকলায় করেছে সমৃদ্ধ। উনিশ শতকের বাংলা কবিতার সঙ্গীতহীন বিবরণাত্মক কাব্যভাষায় রবীন্দ্রকাব্য যে পরিবর্তন নিয়ে এল বাংলা সাহিত্যে তা অভূতপূর্ব। 'মানসী'র সময় থেকে ছন্দে অলংকারে শব্দমাধুর্যে চিত্রকল্পে বাংলা কাব্যে যে আদর্শ স্থির হয়ে গেল তার থেকে স্খলিত হওয়া প্রায় অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রপ্রভাবের পূর্বে এবং রবীন্দ্রপ্রভাব পড়ার পরে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের—এই দুই যুগের সাহিত্যের সঙ্গে সমান প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর। তিনি বলেছেন,

"নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' কিংবা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগেরকবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ-শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয়তো পূর্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষায় এইসব কারিগরি জন্মলাভ করে।

যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি নে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই।"

মোহিতলাল এযুগেরই কবি। কবিতার প্রসাধন-পারিপাট্যে তিনি স্বভাবতই বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন,

"আমি অতি অল্প বয়সে য়ুরোপীয় কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য ইংরাজী Elizabethan ও Romantic কাব্য—আমি মদের মত আকণ্ঠ পান করিয়াছিলাম।"

ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের অতুলনীয় রূপকলা কবি মোহিতলালকে মুগ্ধ করে রেখেছিল, তার প্রমাণ আছে বহু ইংরেজি কবিতার অনুবাদে, তাদের শিল্পরূপের অনুসরণে। ব্রাউনিঙের প্রভাব যেমন আছে নাটকীয় স্বগতোক্তিমূলক রচনায় তেমনি টেনিসন, কীটস, সুইনবার্ণ স্পেন্সরের কখনো উল্লিখিত কখনো অনুল্লিখিত প্রভাব পড়েছে বিচিত্র পদবন্ধ-রচনায়। সনেটমালা-রচনায় স্পষ্টতই অনুসরণ করেছেন রসেটিকে।

এই ভাবে কাব্যদেহ-সজ্জার ব্যাপারে তাঁর সতর্কতার সীমা ছিল না। তাঁর পত্রে শব্দ এবং ছন্দ সম্বন্ধে বারবার উল্লেখ ও অর্থের সঙ্গতি-সন্ধান এ কথাই নিত্যস্মরণীয় করে রাখে যে মোহিতলাল ফর্ম-নিষ্ঠ কবি। ভাবের বিচারহীন আবেগে তিনি কবিতা লেখেন না। ঠিক কোন রীতির প্রকাশভঙ্গিমা আবেগকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সে বিষয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। ম্যাথু আরনলডের 'সোহরাব-রুস্তম' কবিতাটির উল্লেখ তিনি একাধিকবার করেছেন। প্রকাশভঙ্গিমার যথাযথতায় এই কবিতাটি তাঁর মনোহরণ করেছিল—

"Sohrab-এর ভাষা ও ছন্দ, দুই-ই অতিশয় সহজ হৃদয়বেদ্য। উপমাগুলি চিত্রাত্মক এবং ভাষা অর্থ অপেক্ষা ভাবের দ্যোতক, ছন্দও সহজ অথচ গম্ভীর। ভাষায় ও ছন্দে lyric-এর সরলতার সহিত আদি এপিকের গাম্ভীর্য যুক্ত হইয়াছে। কাব্য হিসাবে এমন অপূর্ব বস্তু আর নাই—আমি উহার অতিশয় ভক্ত।"

এর থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়—ফর্ম অর্থে তিনি বস্তুতই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন প্রসাধন-সৌকর্যকে বোঝেন না। এই জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় হতে তাঁর পুরোপুরি সম্মতি ছিল না। 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের কবিকৃতিত্বের দাবী তিনি

করেছিলেন বাংলা ভাষার পরিমার্জনা এবং আলঙ্কারিক বিন্যাস পর্যন্তই। তার বেশি নয়। সত্যেন্দ্রনাথের কুশলতা ছন্দসৃষ্টিতে অপরিসীম, তবু তাঁর ছন্দ মেকানিক্যাল, কবিতার ভাববস্তুর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নয়। একটি পত্রে সত্যেন্দ্রনাথের সমবিষয়ক কবিতার তুলনা করে বলেছেন—

"আমার 'বেদূঈন' ও 'শেষশয্যায় নূরজাহান' দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবমূলক কবিতা আমি একই ছন্দে রচনা করেছিলাম—কিন্তু ঐ একই ছন্দে দুই-এর ভাবগত সুরের বৈশিষ্ট্য আমি বজায় রাখতে পেরেছি বলে বোধ হয়। যুক্তাক্ষর জন্য মাত্রাগৌরব, হসন্তের দ্রুতগতি, স্বরান্তের বিলম্বিত ভঙ্গি এবং যতিনৈকট্যের জন্য পদের আরম্ভে accent—এ সকলের সুযোগে ভাব-অর্থের অনুযায়ী সুর বা ধ্বনিসঙ্গতি অব্যাহত আছে বলে মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান' পড়ে দেখো—একঘেয়ে mechanical হয়ে গেছে কিনা" (পৃ ১২)।

অথচ 'স্বপনপসারী'র কোনো কোনো কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির ছায়া আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই কাব্যে কবিকল্পনার সরল উৎসার এবং সহজ প্রকাশভঙ্গিমাও লক্ষণীয়। 'বিস্মরণী' এবং পরের বই 'স্মরগরলে' কল্পনা ক্রমে গম্ভীর এবং ভাবনামগ্ন, ছন্দও ধ্রুপদী চালের। 'স্বপনপসারী'তে কাব্যশিল্প নিয়ে পরীক্ষার চেষ্টা নেই, প্রধানত বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রকাব্যশিল্পকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। এই শিল্পরীতি ছিল তাঁর ভাবের সহজ আশ্রয় । 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে'র ধর্ম-ভাবুকতা অবশ্য ছিল না, নৈবেদ্যের উচ্চ নৈতিক আদর্শও ছিল না, 'খেয়া'র মিস্টিক গভীরতাও ছিল না, তবু রবীন্দ্রকাব্যে যেমন চিত্রকল্পে, উপমারীতিতে এবং পরিবেশ-রচনায় বাঙলার গ্রাম নদী আকাশ পুকুরঘাট ধানক্ষেতের স্নিগ্ধ ছবিগুলিকে ফিরে ফিরে আসতে দেখি, স্বপনপসারীতেও তেমনি এসেছে সেই বাঙালীরই সরল জীবনধারার সহজসৌন্দর্য। তবে বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রকাব্যে বাঙলার ছবিগুলি অনেকক্ষেত্রেই গূঢ়তর ভাবের প্রতীক, রূপাতীত অনুভবের ইঙ্গিতবাহী। মোহিতলাল বাঙলার সংসার এবং প্রকৃতির বাস্তব-সত্তাতেই লগ্ন, তার সহজসৌন্দর্যরসের রসিক। এ বিষয়ে বরং খানিকটা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গেই তাঁর মিল। চিন্তাবিরহিত সহজ আনন্দভোগে তাঁর কাব্য হেলেনিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। ফলে তাঁর ভাষায় এবং ছন্দে এসেছে উচ্ছলতা, উচ্ছ্বাস শাসন ছাড়িয়ে না গেলেও কখনও কখনও অসংযত। যে স্বরবৃত্ত ছন্দকে তিনি উচ্চশ্রেণীর কবিতার যোগ্য মনে করতেন না, সেই ছন্দেই তাঁর একাধিক কবিতা আছে এই গ্রন্থে।

কিছু অন্য ধরনের কবিতাও আছে, যেমন 'শেষশয্যায় নূরজাহান' 'নাদির-শাহের শেষ' এবং 'বেদূঈন'[১]। এগুলি বাংলাদেশের বিষয় নয়। এতে আছে মুক্ত জীবন বলিষ্ঠ ভোগ দৃপ্ত সাহস এবং সৌন্দর্যসেবা কিন্তু সব মিলিয়েই একটি চিন্তাহীন অকুণ্ঠ সাহসিক সহজতা। দুই শ্রেণীর কবিতাতেই চেতনার নিশ্চিন্ত মুক্তি, অবাধ জীবনভোগ। এই কাব্যকল্পনার রূপায়ণে ছন্দের সহজ গতি, ভাষার সাবলীল দ্রুততা-ই স্বাভাবিক। কাব্যশিল্পের জটিলতাই তার পক্ষে অস্বাভাবিক। 'স্বপন-পসারী'র রোমানটিক কল্পনায় দুঃখের সুর তখনও বাজে নি, জগতের রহস্যচিন্তায় তখনও কবিমন ডুবে যায় নি। তিনি বলেন,

'স্বপনপসারী'ই আমার কবিজীবনের পূর্ণযৌবনকাব্যের Romantic প্রবৃত্তির উচ্ছল-উৎসার হইয়া আছে—অনেকের মতে উহাই আমার শ্রেষ্ঠ কাব্য' (বর্তমান গ্রন্থ পৃ. ৭৬)।

'স্বপনপসারী'র পর 'বিস্মরণী'। দ্বিতীয় গ্রন্থেই রোমানটিক ভাবধারা সংযত ও ঘনীভূত। এই কাব্যে পদবন্ধ ও মিল-রচনায় মোহিতলালের সতর্ক নৈপুণ্যের প্রমাণ আছে, 'মানসলক্ষ্মী' 'ব্যথার আরতি' 'স্পর্শরসিক' 'মোহমুদ্গর' 'পান্থ' 'বাঁধন' প্রভৃতি কবিতায়। এতে কবিতার রূপে এসেছে নির্দিষ্টতা এবং কল্পনায় এসেছে পরিমিতি। ভাষা এখানে 'ভরা আনন্দে ছুটে' যায় নি। নূপুর বেজেছে ধীর লয়ে, চলনে এসেছে নম্রতা, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার ছায়া। মোহিতলাল বলেছেন স্বপন-পসারীতে নিশ্চিন্ত রূপোল্লাস থাকলেও রূপজিজ্ঞাসা যে ছিল না তা নয়। পরবর্তী কাব্য না পড়া থাকলে অবশ্য প্রথম কাব্যে রূপজিজ্ঞাসার বীজ ততখানি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে না।

প্রথম কাব্যে আত্মহারা আনন্দ-কলরবের মধ্যে মধ্যে এমন সব পঙক্তি দেখা দেয়—

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি অমৃতের সন্তান ;
গাহিয়াছে আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্ !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হতে পারে কভু—হতে পারে অপযশ !

—পাপ

১ বেদূঈনের মুক্ত জীবনের কল্পনার উৎস ছিল মোহিতলালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া কাব্য ও ইতিহাস থেকেও এই কল্পনার প্রেরণা এসেছিল। পৃ ৪৫

যত শোভা—সে যে বাসনারি রূপ ! রূপের জগৎ কী সুন্দর !
বাসনায় বাঁশী বেজে উঠে যার. ঘুচে যায় তাহে ইহ ও পর !
আগুনে যেমন সব বিষ যায় প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি—
কামনার কালি তাহার পরশে জল্ জল্ করে হীরার কুচি।

—শেষশয্যায় নূরজাহান

মর্ত্যভোগ, নশ্বর জীবন এবং প্রেম দিয়ে মৃত্যুদীর্ণ জীবনকে অমেয় সৌন্দর্যে মহিমান্বিত করে তোলা—জগৎ ও জীবনের এই রহস্য মীমাংসার আভাস স্বপন-পসারীতেই পাই। আবার যা ছিল আভাস তাই পূর্ণবিকশিত উদাত্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে বিস্মরণীর 'মোহমুদ্গর' 'পান্থ' 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায়। তিনি বলেছেন, 'বিস্মরণী'তে আমার কবিমানস ভাবকল্পনাকে আরও বশীভূত করিয়াছে—যাহা মূলে romantic তাহাকে কঠিন classical বন্ধনে বাঁধিয়াই জীবনের রহস্যবোধকে আরও গভীর করিয়াছে—মৃত্যু ও নচিকেতা আমার নূরজাহানের (স্বপনপসারী) অপর পিঠ'।

এখানে তিনি দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'কবিমানস' ও 'কবিকল্পনা'। কবিমানস সচেতন ভাবনাশক্তির দ্যোতক আর কবিকল্পনা আবেগ এবং অনুভূতির দ্যোতক। বিস্মরণীর কবিতায় জীবনের রহস্যচিন্তা আছে, তত্ত্বভাবনার দিকে ঝুঁকেছেন কবি, আবার সেইজন্য আবেগের বন্যা যেন সংযত। কবিতার রূপকলাতেও মনোযোগী হয়েছেন। 'পান্থে' জীবনের চলিষ্ণুতা এবং নশ্বরতা যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে সেই বেদনারই প্রতিষেধক তিনি পেয়েছেন 'মৃত্যু ও নচিকেতা'য়—উপনিষদের সুপরিচিত কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যায় অর্থাৎ নচিকেতার জীবনপ্রেমের দীক্ষায়। এই কাব্যেই দুঃখের সুর গুঞ্জরিত হল। 'মোহমুদ্গরের' ভোগোল্লাস নশ্বর জীবনের বেদনাকে ভোলবারই করুণ প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্মরণীতে কিন্তু তত্ত্বচিন্তার উগ্রতা নেই। রবীন্দ্রকাব্যেও তত্ত্ব আছে, সীমা-অসীম, ব্যক্তি-বিশ্বের তত্ত্ব,—সে-তত্ত্ব কোনো প্রচলিত বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের চিহ্নাঙ্কিত নয়, অথচ তার সঙ্গে বেদান্ত এবং বৈষ্ণব দুয়েরই হয়তো মিল পাওয়া যায়। মোহিতলালের কাব্যেও তত্ত্ব আছে ; মৃত্যু, জীবন, প্রেম, ত্যাগ ও ভোগের তত্ত্ব। এ-সব প্রসঙ্গ কি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচনাতে আসে না ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এবং মোহিতলালের কাব্যের স্বাদ আলাদা, তার বোধহয় একটি কারণ নির্দেশ করা যায়। মোহিতলাল জীবনকে বাস্তব-কঠোরতার দিক দিয়েই দেখেছেন, তাই দুঃখকে দুঃখরূপেই দেখতে চেয়েছেন। ভোগ যেমন সুখের তেমনি দুঃখেরও।

আর একটি পত্রে মোহিতলাল লিখেছেন, "আমার কবিতায় যে জ্ঞানের বা চিন্তার প্রাধান্য দেখিতে পাও তাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, তাহা প্রাণপুরুষের ঐকান্তিক আকুতিপ্রসূত—পরে তাহার সহিত কোন একটা দার্শনিক তত্ত্বের আশ্চর্য মিল ঘটিয়াছে। জীবনকে যে অতিশয় গভীর ও গুরুতর উৎকণ্ঠার সহিত জানিতে চাহিবে, সে আপনার প্রাণের ভিতর হইতেই একটা তত্ত্বকে আশ্রয় না করিয়া পারে না।·· জীবনের রহস্য যেমন বিরাট তেমনই দুর্ভেদ্য—তাই প্রাণের সেই আকুল জিজ্ঞাসা কোনকালে নিবৃত্ত হয় না। আমি জীবনের যে রূপ দেখিয়াছি, তাহাকেই বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার বিষ ও অমৃত দুই-ই আমি সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছি এবং বিষকে হজম করিবার জন্য একটা তত্ত্ব নিজেই—মস্তিষ্ক নয়—প্রাণের অনুভূতি দ্বারা স্থির করিয়াছি" (পৃ. ৮৩)।

স্মরগরলের 'নারীস্তোত্র' 'বুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতা চিন্তাগভীর সন্দেহ নাই। তবে নারীস্তোত্রের মতো কবিতা সম্বন্ধে যখন কবি বলেন এই কবিতায় ভাবটাই আগে, ভাবকে পূর্ণতা দেবার জন্যই বৈদগ্ধ্য-জনিত শব্দোল্লেখ ঘটেছে, তখন সে-দাবী অবিশ্বাস করবার খুব কি কারণ আছে ?

তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়রাধিকা—
ঘাট হতে চল পথে, নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ তাহারি সাথে—তুমি সখী পরাণ-অধিকা,
নওল কিশোরী প্রিয়া, পরকীয়া-বধূ বরনারী !
রুদ্রের ঘরণী কভু, সতী তুমি, দক্ষের ঝিয়ারী—
দশমহাবিদ্যারূপা—ধূমাবতী, ষোড়শী, কমলা !
তুমি শক্তি সংহারের, শিব নামে চরণে তোমারি—
অসুরনাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা !
তুমি মায়া মাহেশ্বরী, ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী তুমি লোহিতকুন্তলা !

—এই কবিতাংশটিতে নারীরূপরহস্যবোধটাই মূলভাব, সেই ভাবটিকে প্রকাশের জন্য বৈষ্ণব এবং শাক্ততন্ত্রের উল্লেখ। তত্ত্ব-প্রকাশ মূল উদ্দেশ্য হলে কোনো একটি তন্ত্রের ভাবনাপ্রণালীকেই কবি অনুসরণ করতেন। 'বুদ্ধ' কবিতাতেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিণামের ঘটনাটি কেন্দ্র করে কবি তাঁর জীবনদর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন। শূন্যবাদ বৈরাগ্যধর্ম মনুষ্যপ্রকৃতির স্বভাব নয়। বুদ্ধি দিয়ে বিচার দিয়ে মানুষ দুঃখমুক্তির যে পথটি খুঁজে নেয় সে পথ বস্তুত তার প্রকৃতির বিরোধী,

স্বভাবের প্রতিকূল। প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নেবেই, তাই বৌদ্ধধর্মের উদার উচ্চ আদর্শ ব্যর্থ হল। যে-মর্ত্যপ্রীতি মোহিতলালের কাব্যপ্রেরণার উৎস সেই প্রীতিতেই লেখা 'বুদ্ধ'-কবিতাটি। গভীর কণ্ঠে তিনি বলেন,

"আমি মানুষের ভাগ্যকে কোন কিছুর দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারি না; এই জীবনের যত কিছু আধি-ব্যাধিকে মানবাত্মার পরীক্ষা, জগৎকে একটা পাপমোচন-যন্ত্র অথবা ক্রমোন্নতির আরোহণী বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বাধে। যদি কিছু সৎ বা সত্য কোথাও থাকে তবে সে এই জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যেই আছে; যদি না থাকে, তবে তাহা কোথাও নাই—এই বুদ্ধি আমার চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়া আছে।"[১]

এখানে মোহিতলালের কাব্যালোচনার একটি সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'অতি পুরাতন কথা' শীর্ষক লেখাটি এবং তাঁর কবিতা থেকে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে জীবনের বাস্তব-সত্যের সম্মুখীন হওয়া এবং এই সত্যকে ভালোবাসা-ই কবি হিসাবে তাঁর ধর্ম। এ-ভালোবাসার কোনো কৈফিয়ৎ নেই, কিংবা যুক্তি নেই। এ এক সহজ অনুভূতি। তবে কেন পাণ্ডিত্য বা পুঁথিপড়া-বিদ্যার কথা ওঠে? এ দুয়ের মধ্যে যোগটি কোথায়। হয় ওই সহজ জীবনভোগের কথা সত্য, না হয় বিদ্যার অভিমানই সত্য। মোহিতলালের অতি গভীর জীবনপ্রেম তো অস্বীকার্য নয়। সেটাই তাঁর বিচিত্র ভাবমণ্ডলের মাঝখানে সূর্যের মতো ভাস্বর। তাই তাঁর জ্ঞান-পাণ্ডিত্য সবই তাঁর সেই মূল ভাবনার সহায়ক ছাড়া কিছুই নয়, উপনিষদ যেমন রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যকল্পনার সহায়ক। বিদ্যার সহায়তা পেয়েছে বলেই তাঁর কাব্যসাধনা সাময়িক উচ্ছ্বাসের অপমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে—হৃদয় এবং বুদ্ধির সম্মিলনে জীবনোপলব্ধির পূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছে। মোহিতলাল তাঁর কাব্যচর্চা সম্পর্কে এই মর্যাদা দাবী করেছেন; কেননা তাঁর কল্পনা সাময়িক আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের দ্বারা চালিত না হয়ে বরং আবেগকেই আত্ম-অনুকূল করে একটি গভীর অটল ধ্রুবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গভীরতম বিশ্বাস, শাশ্বত সত্যোপলব্ধি। ধর্মসাধক বা দার্শনিকেরাও হয় তো এই সত্যের সাক্ষাৎ পান। সেইজন্যই আমাদের দেশের সহজিয়া তন্ত্রের সাধনার সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন মোহিতলাল। তন্ত্রের পরিভাষায় বলতে গেলে তাঁর কবিধর্ম হচ্ছে দেহাত্মবাদী; তাকে দেহবাদ অর্থাৎ ভোগসর্বস্ব চিন্তার সঙ্গে যেন ভুল না করি এ বিষয়ে তিনি

১ 'অতি পুরাতন কথা', বিচিত্র কথা। জীবন-জিজ্ঞাসা (১৩৫৮) পৃ ১২৪

বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। সত্যই, মানুষের অফুরন্ত প্রেমবৃত্তিতে যাঁর অটল আস্থা, যাঁর 'শেষ শিক্ষা'—

পায় নাই ভালবাসা কেহ কভু এ মর্ত্য আবাসে—
মিথ্যা কথা। ধরণী যে প্রেম প্রীতি স্নেহের নিলয়।
বাসে নাই ভাল কারে যে অভাগা—তারি দীর্ঘশ্বাসে
দিনান্তে ডুবিছে রবি ঘেরি আসে আঁধার নিদয়
আসন্ন রজনীমুখে ; প্রাণ যার ছিল উদাসীন
জীবনে বঞ্চিত সেই—তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয়।

—তাঁকে দেহবাদী বলা যায় না কিছুতেই।

'স্মরগরলে' এসে স্বপনপসারীর যৌবনোচ্ছ্বাস সংযত গাম্ভীর্য অর্জন করল, পরিণতি এল, এল ধীরতা, দার্শনিক প্রশান্তি। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হয়ে কিশোরী কবিতা হল এবার প্রাজ্ঞ গৃহিণী! রূপকলার সংযম প্রতিফলিত করেছে গাম্ভীর্যকে। রোমানটিক প্রেম ক্লাসিকাল সংযমে ধরা পড়ল।

সবশেষের কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্তগোধূলি'। এই বইটি সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্যেরই প্রধানত উল্লেখ করেছেন—এর লিরিক গুণ। 'স্বপনপসারী'র লিরিক গুণের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এখানে আত্মকথনের ভঙ্গিটি প্রবল, দ্বিতীয়ত এর শিল্পরূপও নিখুঁত মার্জিত। এ কথা সত্য 'হেমন্তগোধূলি'তে কবি আবার দার্শনিকতার গুরুভার নামিয়ে দিয়েছেন। এর কবিতায় আবার দেখা দিয়েছে সহজ ভাবনাকেই সহজ করে বলবার রমণীয় ভঙ্গি। তাছাড়া এর অনেক কবিতাই সংযত ভাবাবেগেই উৎসারিত। 'স্বপনপসারী'র যৌবন-মাদকতা এতে নেই কিন্তু তার স্মৃতি আছে। আজ যৌবনের সেই উন্মত্ত লীলাকে স্মরণ করে নিজেকে করুণা করেন না কবি, কেননা পৃথিবীর প্রেম বড়ো অটল হয়েই দেহমনের জ্বালাকে জুড়িয়ে দিয়েছে। জ্বালা নেই, আজ আর তাপও নেই। কবি নিজের অন্তরকেই বিশ্লেষণ করতে বসেছেন। মনের মধ্যে ভীড় করে এসেছে অতীতের ছায়াছবি—অনুবাদ হলেও 'নাগার্জুন' এবং 'প্রেতপুরী'কে কবি সযত্নে চয়ন করেছেন। কুলবধূ যশোধরা বারবধূ বসন্তসেনার স্মৃতি মিথ্যা তো নয়। মোহিতলালের এই শেষ কাব্যগ্রন্থটি সযত্ন-রচিত নিটোল শিল্পরূপ 'বিস্মরণী' এবং 'স্মরগরলে'র পরিণত উত্তরাধিকার। এর পদবন্ধ, শব্দচয়ন, সুচিন্তিত স্থাপত্যকলার মতোই পরিমিত অথচ অর্থময়। মোহিতলাল বলেছেন

তাঁর ছন্দ:সঙ্গীতের কথা। তাঁর ছন্দ ধীর এবং গম্ভীর। তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দও অক্ষরবৃত্তের মতোই যেন ধীর। 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'—এই শ্রেণীর দ্রুততালের মাত্রাবৃত্ত মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য নয়। ছন্দকেই বড়ো করে তুলে ভাবকে ঢেকে ফেললে কবিতা বিনষ্ট হয়। অর্থ ও ভাব যেন শব্দে যথার্থ প্রকাশিত হয়, এবং শব্দ যেন ছন্দের ধ্বনিতে হারিয়ে না যায়—শিল্পী হিসাবে তাঁর মনোযোগ ছিল সেখানেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের সঙ্গে মোহিতলালের কাব্যশিল্পের পার্থক্য আবার বিপরীত পথে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দধ্বনি অপূর্ব পরিমিত। ছন্দকে আলাদা করে পাঠ করতে হয় না—সে কারণে তাঁর কবিতার ফর্মও সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু তাঁর এক একটি নিটোল কবিতায় অর্থরূপের চেয়ে ভাবরূপটাই বড়ো, সুরের ধর্ম তাতে প্রবল। মোহিতলালের কবিতার শব্দের অর্থ অনুচ্ছল ছন্দের সহকারিতায় নিপুণ। অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত মিলটনের ধীর গম্ভীর কাব্যচ্ছন্দ, কীটসের স্তোত্রকবিতার স্নিগ্ধগাম্ভীর্য মোহিতলালের কানে উদাত্ত ধ্বনিসংস্কার রচনা করেছিল। এই জন্যেই চটুল প্রকৃতির ছন্দের প্রয়োজনীয়তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বীকার করলেও অক্ষরবৃত্ত এবং ধীরযতি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। একেই তিনি বলেছেন সত্যকার music। তাঁর ভাষায় 'ইংরেজ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টা Spencer, Milton এবং পরে Shelley ও Keats। অথচ আমরা Tennyson, Swinburne, Rossetti প্রভৃতিকেই পূজা করি (পৃ ৮৫)।'

কখনও কখনও এরকম সন্দেহ হয়, মোহিতলাল বুঝি নিজের কবিতার সমর্থন করতে গিয়েই ফর্ম, শব্দ-ছন্দ-ধ্বনির কথা এনেছেন। কবিতার যে গুণকে ব্যঞ্জনা বলে, মোহিতলাল সে প্রসঙ্গ তেমন বিস্তারিত করেন নি। মোহিতলালের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির বিচার-বিশ্লেষণ বোধহয় অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ভাব ও রূপের অমোঘ প্রকাশভঙ্গিমার বিচারই প্রত্যাশা করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব হিসাবে আমরা এই রীতিকে স্বীকার করে নেব কিনা সে কথা আলাদা ভাবে বিবেচ্য কিন্তু এ-কথা সত্য যে মোহিতলাল তাঁর নিজের প্রত্যয়ের সঙ্গে লুকোচুরি করেন নি। শব্দার্থের বাণীবন্ধ তাঁর মতে কাব্যোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। মধুসূদনের কাব্যালোচনায় বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যালোচনা-পদ্ধতিতে তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তিনি যে রীতিতে আস্বাদন করতেন, প্রচলিত রীতি থেকে তা যে স্বতন্ত্র তাঁর 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' গ্রন্থখানি তার উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি বলে বহুবারই উল্লেখ করেছেন।

এই কাব্যের অমোঘ বাণীবন্ধের জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ। এই নিরিখে মোহিতলালও তাঁর নিজের কবিতার সম্বন্ধে পাঠকের প্রশস্তি প্রত্যাশা করেছেন।

সা হি ত্য ত ত্ত্ব

মোহিতলালের চিঠিগুলির প্রধান আকর্ষণ সাহিত্যবিষয়ে তাঁর চিন্তা। মোহিতলালের অধিকাংশ পত্রই সাহিত্যালোচনায় পূর্ণ। শেষের দিকে জাতি এবং সমাজের চিন্তা তাঁর মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ মোহিতলাল লিখতে আরম্ভ করেন, বলতে গেলে, তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়া থেকেই। মানসীর প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' (চৈত্র ১৩১৫) সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যপ্রবন্ধ। তারপরে এতে রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার প্রশংসামূলক সমালোচনা[১] (অগ্রহায়ণ ১৩১৭) এবং গীদে ম'পসা (ভাদ্র ১৩১৮) প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি লেখার সময়ে তিনি বি-এ পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর এই সব প্রবন্ধ স্বভাবতই আবেগোচ্ছ্বসিত। অতঃপর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় মোহিতলালের বিখ্যাত কবিতাগুলিতে তাঁর কবিত্ব যেমন যৌবনদীপ্তি লাভ করেছে, সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক 'মাসকাবারি' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধেও (১৩২৬-এর অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র) তাঁর সাহিত্য-চিন্তা অনেকটাই পরিণত হয়েছে দেখতে পাই। তা ছাড়া ১৩২৮-এর বৈশাখে ভারতীতে তিনি 'কাব্যকথা' নাম দিয়ে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে সুসম্বদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত করেন, কিন্তু বস্তুত প্রবাসীতে (১৩৩২ পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৩৩ আষাঢ়-আশ্বিন) এই নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'সাহিত্যকথা'র ভূমিকায় তার উল্লেখ আছে। 'কাব্যকথা'য় মোহিতলাল ব্যবহার করেছিলেন ছদ্মনাম সত্যসুন্দর দাস। মোহিতলালের আর একটি ছদ্মনাম ছিল শ্রীমধুব্রত। এই নামে সুশীলকুমার দের History of Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থের সমালোচনা করেন। এটি বেরিয়েছিল ভারতীতে (১৩২৬ ভাদ্র)।

যে-সময় মোহিতলালের কাব্যকথা' প্রবন্ধগুলির পরিকল্পনা ও সম্ভবত লেখা

১ বঙ্গের গীতি-কবিতার দেবতা বাঙ্গালীর Apollo রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার শীর্ষে এই নাম আছে এবং কাব্যশিল্পের একটি অনিন্দ্যসুন্দর কীর্তির অতি সুকোমল রেখাবলি এই নামটির সঙ্গে আমাদের চিত্রপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেছে।

চলেছিল সেই সময়েই পত্রগুচ্ছে সংকলিত তাঁর প্রাচীনতম পত্রেই সাহিত্যালোচনারও সূত্রপাত দেখতে পাই। এতে মোহিতলালের পরবর্তী চিন্তার কয়েকটি বীজ লক্ষ্য করা যায়। প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা পত্রে তিনি তাঁর সাহিত্যচিন্তার কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন যথা—

১. প্রাণ বা হৃদয় দেহসাহায্যে বাস্তবের সহিত সংঘর্ষে জাগিয়া উঠে সত্যকে জানিবার ও লাভ করিবার অন্য পন্থা নাই। এই anti-intellectualism আমার বর্তমান ধর্মমত।

২. বর্তমান যুগ বিশেষ করিয়া দেহ-বাস্তবের যুগ। মানসবিলাসের যুগ নয়—নচিকেতা যেমন যমকে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া দেহের অন্তরালে যে সত্যপুরুষ আছেন জীবনের রহস্যসাগরে ডুব দিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতে হইবে।

৩. মানসিকতা একটি ব্যাধি মাত্র, ওটা প্রবল হইলে, বিদ্যা নয়, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইতে হয় ; ও পথে জ্ঞানী হওয়া যায়, গুণী হওয়া যায় না।

৪. মুক্তি হয় প্রাণের প্রসারে, মনের পরিমার্জনায় নয়। দেহটাকে বেশ করিয়া খোঁচাইয়া না লইলে প্রাণশক্তি বাড়িবে না, ওই প্রাণশক্তিই সত্যদর্শনের একমাত্র উপায়।

এই কথাগুলি মোহিতলাল ঠিক সাহিত্যপ্রসঙ্গে না বললেও পরবর্তী কালে তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে এই ভাবকেই বিস্তৃত করে বলেছেন।

সাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের মতামত গঠিত হয়েছিল ইংরেজি সমালোচকদের বই পড়ে। বাংলাতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে সে রকম কিছু আলোচনা গড়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মোহিতলালের অভিমত একটি চিঠিতে পাই—

"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার ঠিক যুক্তিতর্কের—অর্থাৎ খুব Logical argument-এর ধরনে লেখা নয়। কবির দৃষ্টি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাই লিখে গেছেন। সেগুলো আসলে খুব ঠিক, কিন্তু তাঁর যুক্তিপ্রণালী বা মীমাংসার পদ্ধতি খুব পরিষ্কার নয়" (পৃ ১৯৮)।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনার দ্বারা মোহিতলালের মত তৈরি হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটি বিষয়ে সম্ভবত তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাষাতেই সাহিত্যালোচনায় বিশেষত আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রবর্তিত পদ্ধতির

অনুপযোগিতার কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বলেন নি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"কালিদাসের উপমা ভালো বা ভাষা সরস বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা সুন্দর বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণ রস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ গ্রহণ-বর্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে একটা অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য।" [১]

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রকৃতি থেকে বোঝা কিছুই শক্ত হয় না যে জীবন-প্রকৃতির সঙ্গে কবিকল্পনার যোগ এবং প্রকাশের পদ্ধতিই মুখ্যত তাঁর সাহিত্যভাবনা। জীবনের রূপবৈচিত্র্যকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা সাহিত্যিকের কাজ। আলংকারিকেরা সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের এই যোগটির বিচার করে দেখেন নি। মোহিতলাল আমাদের প্রাচীন সাহিত্যালোচনা-পদ্ধতিকে বর্জন করতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে বলেছেন 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে 'পণ্ডিত' আমরা কেহই নই—বোধহয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও নহেন। সেরূপ 'পণ্ডিত' হইলে 'সাহিত্য' সম্বন্ধে যে রসবোধ জন্মিত তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের দেশের 'পণ্ডিত'গণের মধ্যে পাওয়া যাইবে। সেরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন করিবার সুযোগ যে ঘটে নাই তাহাতে ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ' (পৃ ২৪)।

আলংকরিক পদ্ধতিতে তাঁর বিরাগ মোহিতলালের প্রবন্ধাবলীতে বারবারই পাওয়া যাবে।[২] আলংকারিক সমালোচক কাব্যকে জীবনসত্য-উদাসীন বুদ্ধি এবং রসের 'স্কলাসটিক' চর্চায় পরিণত করেছিলেন বলেই মোহিতলালের আপত্তি। এ বিষয়ে তাঁর অটল বিশ্বাস—সাহিত্য কখনোই জীবনসত্য-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সাহিত্যের এই নিকষ-শিলাটি মোহিতলাল ইংরেজি সমালোচনা থেকে পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মোহিতলাল ট্রাজেডি নাটককেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ বলে মনে করেছেন। ট্রাজেডিতে জীবনেরই দ্বন্দ্ব-অভিঘাতে মানুষের জীবনজ্বালা প্রখর রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তাই ট্রাজেডি মানবজীবনসম্ভব। অ্যারিসটটল এই কথাই ভেবেছিলেন হয়তো তাই সাহিত্যকে তিনি বলেছিলেন প্রকৃতির অনুকরণ।

১ 'সাহিত্যসৃষ্টি' ১৩১৪।

২ বিশেষত 'কাব্য ও জীবন' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

অ্যারিসটটলের এই কথাটির নানা অর্থ হয়েছে ; পরের যুগে এই সূত্রের উপরে জোরও আর ছিল না। তথাপি এই সূত্রটিতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের শাশ্বত প্রকৃতিই প্রকাশিত। তাই উনিশ শতকে ম্যাথু আরনলড সাহিত্যের সংজ্ঞায় 'জীবন' প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। অ্যারিসটটল-প্রযুক্ত অর্থে 'অনুকরণ' এই কথাটি প্রয়োগ না করে বললেন 'সমালোচনা'—সাহিত্য হচ্ছে criticism of life।

মোহিতলালও ম্যাথু আরনলডের সংজ্ঞাটিকে বিভিন্ন স্থলে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ-কথাটির তাঁর একটা নিজের কৃত অর্থ আছে! সমালোচনা বলতে বোঝায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া। জীবন-সমালোচনা বলতে যদি জীবনের ভালোমন্দ বিচার এবং অশুভ বর্জন করে শুভকে মাত্র রূপদান করা বোঝায় তবে মোহিতলালের কাছে সে ব্যাখ্যা নিশ্চয় গ্রাহ্য হবে না। জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে বস্তুগতভাবে ; সে জীবন অনুভূতির মাধ্যমেই কবির চিত্তপটে ধরা দেয়। কোনোরকম মানসক্রিয়ার দ্বারা জীবনের সেই গভীর রূপকে আয়ত্ত করা যায় না।—দর্শন-বিজ্ঞানই হক আর অধ্যাত্মবিজ্ঞানই হক, জীবনের সমগ্র সত্যকে —তার বিচিত্র জটিল রহস্যময় গতিভঙ্গিকে কোনো কিছু দিয়েই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এ জীবন মায়াবিনী। বুদ্ধির শাসনে সে মোহিনী কিছুমাত্র ত্রস্ত হয় না বরং আরো বেশি রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। এই জীবনকে জানতে হলে জীবনের সুখদুঃখ-পাপপুণ্য আনন্দ বেদনার মধ্যে ডুবে গিয়ে এক হয়ে যেতে হবে। এই নিবিড় অনুভূতিলব্ধ সমগ্রতার উপলব্ধিই কবির জীবনবোধ। মোহিতলাল ম্যাথু আরনলডের উক্তিকে এই সামগ্রিক অনুভবের অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

"মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক, তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক, তার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয়, যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে ; সে কাব্য সত্যকার বেদনা, আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। আবার ঐ criticism of life কথাটার তাৎপর্য এই নয় যে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান সেই ব্যবহারিক বাস্তব জীবনকেই কাব্যে যথাযথ চিত্রিত করিতে হইবে। কারণ ম্যাথু আরনলড একথাও বলিয়াছেন যে কাব্যে যেমন truth of substance থাকা চাই, তেমনি high poetic seriousness না থাকিলে তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে না।"[১]

১ 'কাব্য ও জীবন' ১৩৩৫ মাঘ

কাব্য জাগতিক অস্তিত্বের একটি অখণ্ড অনুভূতি নিয়ে আসে, criticism of life কথাটির এই অর্থ হলেও ম্যাথু আরনলড বলেছিলেন, A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life; a poetry of indifferenee towards moral ideas is a poetry of indifference towards life.

জীবনের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক আছেই—সে নীতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নীতি নয়। বিশ্বের অন্তর্নিহিত মঙ্গলময়তার বিশ্বাসে সেই নীতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মোহিতলাল জীবনকে এই নীতির বাঁধনে বদ্ধ বলে মনে করেন না। কবির জীবনকল্পনায় নীতির স্থান নেই, তাঁর দৃষ্টি মুক্ত, অনুভূতি বিশুদ্ধ। সৎ এবং অসৎকে কবি তাঁর বাণীরচনায় সৃষ্টির বাস্তব বলেই মেলে ধরেন। নীতিবাদী জীবনের এই সত্যরূপকে অস্বীকার করে মনোগত আদর্শের অনুকূল করে ব্যাখ্যা করে নেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাটকের আলোচনায় তাঁর এই সাহিত্য-ধারণার প্রয়োগ মোহিতলালের আদর্শের দৃষ্টান্ত। একদা দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। মোহিতলাল শ্লীল-অশ্লীলের নৈতিক প্রসঙ্গকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবান্তর বলে মনে করেন। কারণ জীবনের সত্যকে নীতিবাদীর দৃষ্টিতে দেখার অর্থ সত্তার স্ব-মহিমাকে অস্বীকার করা। কিন্তু জীবনের সত্যকে তো কবি লঙ্ঘন করতে পারেন না। ভোগের বর্ণনা এই কাব্যের পক্ষে কিছুমাত্র অনুচিত হয় নি, অসঙ্গত হয়েছে চিত্রাঙ্গদার এই উক্তি—

মীনকেতু কোন মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া

প্রিয়তমের তৃপ্তির আনন্দ চিত্রাঙ্গদার আনন্দকে পূর্ণ করে তোলে নি। অর্জুনের আনন্দেই তার সর্বসংশয়ের নিরসন ঘটে নি, অতএব তার প্রেমে ফাঁকি ছিল—এ প্রেমে জীবনের সহজতা নেই। দেহের লতায় ফুটেছে যে আনন্দের মঞ্জরী, সে তাকে কিছুতেই নিজের বলে স্বীকার করতে পারছে না।

এ রকম ক্ষেত্রে মোহিতলাল ম্যাথু আরনলডের জীবন-সমালোচনা-তত্ত্ব থেকে সরে এসে শুদ্ধশিল্পবাদীদের সাহিত্যনীতিকে স্বীকার করেছেন, ম্যাথু আরন-লডের অনুসরণে মোহিতলাল সাহিত্যের মহৎ দায়িত্বকে মেনে নিয়েছেন সত্য, মোহিতলালও আরনলডের মতোই সাহিত্যকে প্রায় ধর্মের আসনে বসিয়েছেন। বহু চিঠিতে তিনি বলতে চেয়েছেন সাহিত্যই তাঁর ধর্ম, সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই সত্যকে সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু আরনলড সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ অনুসরণের কাজে লাগিয়েছেন, মোহিতলাল ঠিক সে অর্থে নেন নি। আদর্শ পাঠকের মনে, কবি শুধু

জীবনের একটি বিশাল গম্ভীর মৌন রূপকেই ফুটিয়ে তুলবেন। এতে শ্লীল-অশ্লীলের প্রসঙ্গ গৌণ, কারণ জীবনের সমগ্রতায় সব কিছুই আছে, শুধু সমগ্রের সঙ্গে তাকে সুরে বাঁধা চাই। 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধে মোহিতলাল বলেন—

"অশ্লীলতার জন্যই যে অশ্লীলতা তাহাই vulgar ; কিন্তু যাহাকে ইংরাজীতে obscene বলে তাহাকে কোনও ক্ষুদ্রতর নীতির বা কেবলমাত্র রুচির খাতিরে কোন বড় কবিই কাব্যে আমল দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কবিকল্পনার বিদ্যুতালোকে মানুষের মহিমময় দেহ-নিয়তির অনুধ্যানে, জীবনরস-রসিকতার অপূর্ব আবেশে,কবিগণ দৈবী প্রতিভার গুণে যে পরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, 'তাহাতে দেহ-আত্মার দ্বৈতচেতনা থাকে না, দ্বৈতাশ্রয়ী অদ্বৈতই পরমস্বরূপে প্রতিভাত হয়।"[১]

দেহজীবন-সত্যই সাহিত্যের আশ্রয়। দেহজীবনের কথায় স্বভাবতই প্রাসঙ্গিক ভাবে এমন বিষয়ের উল্লেখ অনিবার্য হয়ে পড়ে যা নীতিবাগীশ তত্ত্ববাদী মানুষের কাছে অশ্লীল বলে প্রতিভাত হয়। মোহিতলালের নিজের কবিতাতেই এমন প্রসঙ্গ সুলভ। 'কল্লোল'-যুগের লেখকেরা তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন 'আধুনিকোত্তম' বলে, সে এই উন্মুক্ত দুঃসাহসিকতার জন্যই। কিন্তু মোহিতলালই আবার তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং সমালোচনা করলেন কঠোর ভাষায়, যখন দেখলেন আধুনিকদের সত্যভাষণ জীবনের অখণ্ডতাবোধকে প্রতিফলিত করছে না। নিবিড় অনুভূতির পরম উপলব্ধি তাঁদের নেই—মনস্তত্ত্বের সূত্র দিয়ে বিজ্ঞানের নীতিকথা দিয়ে সংস্কারের ব্যাকুলতা নিয়ে কিংবা বিশ্ববিচ্ছিন্ন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ধত গর্বে তারা বাস্তব সত্যের নগ্নবিচার করেছে।

উদ্দেশ্যবর্জিত রসসম্ভোগের সাহিত্যাদর্শে মোহিতলাল শুদ্ধশিল্পবাদের (art for art's sake) অনুগামী। কিন্তু শুদ্ধশিল্পবাদীরা জীবনকে বিশ্বাস করে নি, ম্যাথু আরনলড-কথিত 'হাই সীরিয়সনেস'-এর অভাবে জীবন-সত্যকে সাহিত্যের নির্ভর বলে তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আর্টে-র পূর্ণতা জীবনের নেই। Nature is very rarely right, to such an extent even that it might almost be said that Nature is usually wrong : that is to say the condition of things that shall bring about the perfection of harmony worthy of a picture is rare.

অতএব আর্টকে করে তোলা হল চরম এবং পরম। বিষয়-গুরুত্ব গৌণ' রচনাশিল্পই আসল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ক্লাসিক্যাল সমালোচনায় সাহিত্যের অঙ্গ-

[১] 'সাহিত্যকথা'য় সংকলিত 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' (চৈত্র ১৩৩৯)

যোজনাই ছিল মুখ্য আলোচ্য। শব্দ ছন্দ মিল,এবং নাটক হলে তার বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ, চরিত্র ঘটনা—এ সবই আলোচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। একালে রচনা-শিল্পে ভাবনার বিষয়টা কিছু আলাদা। অসকার ওয়াইলড বলতেন form is everything. It is the secret of life. ফরমের প্রতি একান্ত নিষ্ঠায় মোহিতলালের সঙ্গে এদের মিল আছে। মোহিতলাল কবিতার ছন্দ এবং মিলের কলাকৌশলের উপর যে জোর দিয়েছেন—ছন্দ-মিলের নিপুণ বিন্যাসে পদবন্ধের যে সাঙ্গীতিক সুষমার কথা বলেছেন,সে এই শুদ্ধশিল্পবাদীদের অনুরূপ। শুদ্ধশিল্পবাদী প্রকৃতির সাঙ্গীতিক ঐক্য এবং সুষমাটির রূপ রচনা করেন, সেক্ষেত্রে বস্তুগত রূপসাদৃশ্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। জ্যাক ম্যারিতাঁর ভাষায়—

It is by the way in which he changes the shape of the universe passing through the mind, in order to make a form apprehended in thing shine upon a matter, that the artist impresses his signature upon the work.

মোহিতলাল বলতেন 'ভাবের রূপরচনা'। সাহিত্য-তত্ত্বে এই অত্যধিক রূপস্পর্শকাতরতা মোহিতলাল অসকার ওয়াইলড, ওয়ালার পেটার প্রভৃতি শুদ্ধশিল্পবাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই লাভ করেছিলেন, যদিও মোহিতলালের চিন্তা তাঁদের চিন্তার ঠিক প্রতিধ্বনি নয়। তাঁদের কাছে জীবন হয়েছে ছায়াময়, জীবনের কঠোর কঠিনতা তার শুভ-অশুভ চেতনায় অশরীরী হয়ে গিয়েছে। মোহিতলালের কাছে দেহজীবন ও বাস্তবধর্ম অত্যন্ত কঠোররূপেই সত্য। রূপ-রচনা কিসের রূপরচনা? জীবনের সুরটুকুর মাত্রের নয়। তাঁর উক্তি—

"আমি যে রূপসৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলিয়াছি তাহা ঐ দেহের মতই জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুষমার অভিব্যক্তি; সেরূপ ঐ দেহেরই মত জীবনেরই যেন কান্তি; তাহাতে জীবনের সকল বিষমতা ও বিরোধ সকল খণ্ডতা ও অসংলগ্নতা একটি সমগ্ররূপে সমাহিত হইয়া প্রকাশ পায়। দেহের রূপ যেমন কোন একটা অঙ্গবিশেষের রূপ নয়, তাহা সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং অখণ্ড হইলেও তাহা দেহময়—এজন্য তাহা একই কালে বিশেষ ও নির্বিশেষ; জীবনের রূপও তেমনই সাহিত্যে আমাদের চিত্তগোচর হয়।"[১]

একদিকে জীবন আর-একদিকে জীবনের রূপরচনা—এই দুইকে মিলিয়ে মোহিতলাল সাহিত্যের সে মহত্ত্ব নির্ণয় করেছেন তাতে ম্যাথু আরনলডের জীবন

১ সাহিত্যবিতান, 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধ

ভাবনা এবং শুদ্ধশিল্পবাদীর রূপভাবনাই যেন সমন্বিত এ সমন্বয় সার্থক হয়েছে কিনা প্রাজ্ঞ জনেরা বিচার করবেন। কিন্তু পূর্বতন রসজ্ঞদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মোহিতলালের জিজ্ঞাসু কবিমনকে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে প্রবুদ্ধ করেছিল বলেই মনে হয়।

মোহিতলালের সাহিত্যভাবনা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল আর একজন স্মরণীয় সাহিত্য-দার্শনিকের চিন্তাধারায়। তিনি বেনেদেত্তো ক্রোচে। 'সাহিত্য-কথা'র ভূমিকায় তিনি নির্দেশ করে বলেছেন, 'বিদেশের এতদিনের সাহিত্যবিচার-তত্ত্বের উপর অতি আধুনিক কালে বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের যোগদৃষ্টি যে আলোকপাত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে সাহিত্য-সমালোচনার মূল সূত্র এক্ষণে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে.' জীবন-ভাবনা এবং রূপসাধনের মধ্যে সেতু হচ্ছে কবিপুরুষ। জীবনের সমগ্র রূপ যাঁর চিত্তে ধরা দেয় তিনিই কবি। এই উপলব্ধিই সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি বাণীরূপ নিয়ে সমগ্রভাবে কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হয়। মোহিতলালের একটি দৃঢ় অভিমত এই যে, ব্যক্তির বিশিষ্টতাই কবির স্টাইলের অনন্যসাধারণত্বের কারণ। প্রত্যেক কবির অনুভবের ভঙ্গিটি একান্তই তাঁর, তাই তার প্রকাশবাণীও তাঁর। সাহিত্যের সৃষ্টি একটা কখনও আর একটার মতো হয় না। সমালোচক মোহিতলাল এ বিষয়ে থিয়োডর ওয়াটস ডানটন ও মিডলটন মারির তত্ত্বে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

ক্রোচের ইনটুইশন-তত্ত্ব যে মোহিতলালকে অধিকার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। *'সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ' 'চকিত সাক্ষাৎকার'* প্রভৃতি বাক্যখণ্ডগুলি তাঁর সাহিত্যালোচনায় এই প্রভাবের প্রমাণ। বাইরের শাস্ত্রোক্ত নীতিনিয়মের অতীত কবিচেতনার বিশেষ উপলব্ধির ফল বলে বর্ণনা করায় সাহিত্য হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্তরেরই রূপরচনা। রূপ কী হবে তার একমাত্র নিয়ামক কবি-ব্যক্তি। ক্রোচের বিধান ইমপ্রেসনিসটিক সমালোচনার পরিণাম। মোহিতলালের কাব্য-সমালোচনা বস্তুতই অখণ্ড সমগ্রতায় কবির অনুভূতি-স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা। অবশ্য মোহিতলাল বারবার সতর্ক করে বলেছেন, এ ব্যক্তি উৎকেন্দ্রিক আত্মপরায়ণ ব্যক্তি নয়, নিজের অনুভূতির বিন্দুতে বিশ্বের সিন্ধুকে প্রতিফলিত যে করে সেই লাভ করেছে বাণীর শ্রেষ্ঠ জয়মাল্য।

মোহিতলালের সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গে আরও অনেক বিষয় আসতে পারে, তবে মূল কথাটি বোধহয় এই।

'মোসলেম ভারত'-সম্পাদককে মোহিতলাল যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি গভীর প্রত্যাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে। সে কালের রমণীয় কবিতার যুগে উদ্দাম প্রাণ বলিষ্ঠ জীবনাবেগ যেন হারিয়ে গিয়েছিল। মুসলমান লেখকদের রচনায় বৈচিত্র্যহীন প্রাণহীন বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণ স্পন্দিত হয়ে উঠবে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—এই সম্ভাবনাই মোহিতলালকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। বাংলাসাহিত্যের রসহীন প্রান্তর নব অঙ্কুর-জয়পতাকায় সমাকীর্ণ হবে। কবিতা শুধু শব্দ আর ছন্দ নয়। কবিতায় চাই দেহজীবন-সত্যের অকৃত্রিম প্রবল অনুভূতি। কবিকর্মে এবং সমালোচনাবুদ্ধিতে মোহিতলাল বিশ্বাস করতেন এই দেহজীবন-সত্যের উদাত্ত অভিপ্রকাশকে। এ সত্য তো নীতিতত্ত্ব-বুদ্ধি দিয়ে লভ্য নয়। অতএব নজরুল ইসলামের কবিতায় মরুজীবনচারণের এবং আরবীয় সংস্কৃতির অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠতা দেখে মোহিতলাল মুগ্ধ হলেন। তিনি নিজেও এমনি কয়েকটি কবিতা লিখে ফেললেন।

কিন্তু মোহিতলালের প্রত্যাশা সফল হল না। আরম্ভেই সাহিত্যের আদর্শ গেল বদলে। নজরুল ইসলাম বিশুদ্ধ সুস্থ মুক্ত জীবনানুভূতির বাণী রচনা ত্যাগ করে কবিতাকে পরালেন সাময়িকতার শিকল। তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেরণায় কবিতা লিখতে লাগলেন। সেই কবিতা স্বভাবতই হল জনতোষিণী। নজরুল নিজেই এক কৈফিয়ৎ দিলেন—

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি',
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।

কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই, কবি?'
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।

—মোহিতলাল চিরকালই বলে এসেছেন নীতি বা তত্ত্বের প্রেরণায় উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না, নজরুল সেই সামাজিক নীতিবোধের দ্বারাই চালিত হলেন। নজরুল অবশ্য প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন স্বভাবতই, কিন্তু মোহিতলাল বললেন,

"কবিতা ভালই হোক আর মন্দই হোক কেউ পড়ে না। ও জিনিষটার

সমঝদার আজকাল আমাদের দেশে খুব কম আছে বলেই মনে হয়, অন্তত কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আমি বিশেষ সাড়া পাই নে। লিখি খুব কম—ছাপাতে বিশেষ উৎসাহ নেই। যে শ্রেণীর পাঠক ও যে শ্রেণীর সাহিত্য আজকাল সুলভ ও সুপরিচিত—তাদের মধ্যে আমার স্থান নেই—এটা আমি স্পষ্ট বুঝি।...আমি popular হতে পারলাম না, পারবও না। আজকালকার দিনে popularity-ই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রমাণ।"

কিন্তু তাই বলে 'ভারতী'তে সত্যেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সুকুমার এবং ললিত কবিতার আদর্শ গড়ে উঠেছিল, মোহিতলাল সেখানে ফিরতে পারলেন না। সে-কবিতার সম্ভাবনা নিঃশেষিত। এই সময়ে ১৯২৩-এ প্রকাশিত হল 'কল্লোল'। মোহিতলাল তাতে যোগ দিলেন। বস্তুত কবিকল্পনার যে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন মোহিতলাল, তৎকলীন তরুণ সাহিতিকদের দ্বারা পরিচালিত কল্লোলেই তাঁর সেই স্বপ্ন রূপ নেবে। কল্লোলে 'ভারতী'র প্রথাবদ্ধ কাব্যবিলাস ছিল না, তেমনি ছিল না নিছক রাজনীতিক এবং সামাজিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শ। অবশ্য 'কল্লোল' বাস্তবকেই মূল অবলম্বনরূপে রক্ষা করে কবিতায় গল্পে দুঃসাহসিক সত্যভাষণে, নৈতিক সংস্কারকে বর্জন করার স্বাধীন চেতনার পরিচয় দিয়েছিল। ১৯২৬-এ বেরিয়েছে 'কালিকলম'। কল্লোলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরাই যোগ দিলেন কালিকলমে—প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসু। কালিকলমেও মোহিতলালের কয়েকটি উৎকৃষ্ট বিখ্যাত কবিতা বেরিয়েছে। কল্লোলে বেরিয়েছে 'পান্থ' 'প্রেতপুরী', কালিকলমে বেরিয়েছে 'নাগার্জুন', 'রুদ্রবোধন', 'নারীস্তোত্র', 'স্মরগরল' প্রভৃতি।

মোহিতলাল কল্লোল-কালিকলমে তাঁর কবিতার যে সমর্থন পেয়েছিলেন, তার পটভূমি তাঁর মানসিক জীবনে নিহিত ছিল। যে-জীবন সাহিত্যে রূপ নেয়, সে-জীবন বাস্তবহীন কল্পনার জীবন নয়। আমাদের এই দেহজীবনটাই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রেম ঘৃণা ভোগ ও ত্যাগ নিয়ে কবির কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোহিতলাল নিছক বাস্তব এবং সর্বজনীন বাস্তব—এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা টেনেছেন। কল্লোল ও কালিকলমের বাস্তবচর্চায় মোহিতলাল এই আশ্বাস পেলেন—এখানে নীতির কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত অবাস্তব-কল্পনার ভাবস্বপ্নালুতাবর্জিত জীবনই হবে সাহিত্যদেবতার পূজাপীঠ। এই প্রত্যাশার কারণও ছিল। নজরুল তাঁর কবিশক্তিকে সাময়িকতার প্রয়োজনে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু এঁরা তাঁদের শক্তিকে তেমনি রাজনীতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত করবে না বলেই মনে

হয়েছিল। "এই নবীন পত্রিকার তরুণ লেখকেরা সমষ্টি নয়, অকৃত্রিম আত্মগত আবেগেই দেহজীবনের সংগীত রচনা করলেন। মোহিতলাল আকৃষ্ট হলেন বিষয়ে এবং ভঙ্গিতে।

'কল্লোল' 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' বাংলা সাহিত্যে যে অধ্যায়ান্তর ঘটিয়ে তুলল সে-সম্বন্ধে নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। মোহিতলালের বর্তমান পত্রগুচ্ছে এই যুগে লিখিত পত্র সংকলিত করা যায় নি। সে রকম পত্র সংকলিত হলে নিশ্চয়ই তাতে মোহিতলালের মতামত থাকত। 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিয়ে মোহিতলাল সাহিত্য-নীতি নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তার থেকেই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়। তাঁর সেই প্রতিক্রিয়া এ যুগের সাহিত্য-আদর্শের অনুকূল নয়। এই আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কেন তিনি বিরূপ হয়ে উঠলেন তার কারণ অনুসন্ধান করা অসঙ্গত হবে না। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন,

"কিন্তু কতদিন যেতে না যেতেই কেমন বেসুর ধরল বাজনায়। মতে বা মনে কোনো অমিল নেই, তবু কেন কে জানে, মোহিতলাল বেঁকে দাঁড়ালেন— কল্লোলের দল ছেড়ে চলে গেলেন পল্বলের দলে।"

এতে মনে হয় মোহিতলাল এক অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। কোনো কারণ নেই হঠাৎ বেঁকে বসলেন। কিন্তু কারণের আভাস পাওয়া যায় মোহিতলালেরই একটি রচনায়। রচনাটির নাম 'অতিআধুনিক বাংলা কবিতা'। রচনাটি 'সাহিত্য-বিতানে' সংকলিত। ১৩৩৩-এর কালিকলম পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তরুণ সাহিত্যিকদের আদর্শ নিয়ে লেখা এই রচনায় মতামত আলোচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল বলছেন—

"ইহা কবিমনোবৃত্তি নহে; কারণ কোন-কিছুর মানে করিতে না চাহিলেও— জিজ্ঞাসা ইহাতে আছে; নাস্তিক্যবাদও একটা সিদ্ধান্ত—একটা বিচারবিতর্কমূলক তত্ত্ব। এই 'অর্থ চাইনা' যদি রসাবেশমূলক হইত, তবে ইহাকে কবিধর্ম বলা যাইত।··· অর্থ চাইনা অথচ মানসবৃত্তি খুবই সজাগ—এঅবস্থা সুস্থ অবস্থা নয়। সৃষ্টির এই সরল 'পৈশাচিকতা' ও 'নির্বিকার নির্মমতা' মানুষকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এই নিদারুণ নির্মমতাকেই রসরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন— জীবনের সুখদুঃখের তিনিও কোন অর্থ করেন নাই।"

গ্রীক নাট্যকার বলেছিলেন, 'dark mystery of existence'-এর কথা। সত্তার আবির্ভাব জগতের সুখদুঃখের রহস্য, নিয়তির কুটিলগতি কবিদের উপলব্ধিতে

একটা সমগ্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, এর ব্যাখ্যা কবিরা করেন না। শেক্সপীয়রের একটি উক্তি মোহিতলালের প্রিয়,

We must endure
Our going hence, even as our coming hither.
Ripeness is all

জগতের অস্তিত্বে মানুষের বিস্ময় থাকবেই, এই বিস্ময়ই কাব্য বা নাটক। তার ব্যাখ্যা থাকে মনস্তত্ত্বে দর্শনে বিজ্ঞানে। সুখ কি? দুঃখ কি? মুক্তি কোথায়? স্বভাবের ধর্ম কাকে বলে?—এসব তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যের বিষয় নির্ধারিত হয় না। তত্ত্ব যখন কবির চেতনাকে অধিকার করে তখন আর কবিকল্পনার বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না। আধুনিক সাহিতে কবি সমগ্র জীবন এবং 'গোটা-মানুষের' প্রশ্নে ব্যাকুল হয়েছেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সৃষ্ট তত্ত্বপ্রবণতা জীবনবোধকে বিকারগ্রস্ত করে। মানুষের কথা বলতে গিয়ে ফ্রয়েড-মার্কসের সূত্র এসে যায়। তাতে যেন জীবনটাকে ভাগ করে ফেলা হয় কয়েকটি ছকে। হয় তো তাতে পাঠকের একটা বুদ্ধিগত উপলব্ধি হয় কিন্তু রস যায় মিলিয়ে।

'বনফুল'কে লেখা চিঠিতে মোহিতলাল বলছেন,

"বর্তমান যুগে সাহিত্যে বড় আকারের কিছু গড়িয়া উঠিতেছে না, তার কারণ মানুষের মন এখন বিশ্লেষণধর্মী হইয়াছে—বহুর যে বৃহৎ ঐক্য তাহাকে না মানিয়া, খণ্ডকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ঐক্যের অভাবটাকে ঘোষণা করিতে চায়। মন তাহাতেই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। আদি ও অন্তের ভাবনা করিতে হয় না, চলমান জগৎযাত্রার ক্ষণিক ও বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি হইতেই একটু রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহাই অতি আধুনিক বিংশ শতাব্দীর মানবীয় প্রবৃত্তি।"

কথাটা মোটের উপর অস্বীকার করবার নেই। আমাদের আধুনিকতর সাহিত্যের লক্ষণও তাই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দের কবিতায় বুদ্ধিবাদের লক্ষণ পুরোপুরি। সাময়িক বিষয় বা লক্ষ্য যদি-বা না থাকে কিন্তু জীবন ও জগতের উদ্দেশ্যে বিস্ময়ের চেয়েও আছে জিজ্ঞাসা—তীক্ষ্ণ কঠোর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি। মোহিতলাল বলবেন, সৃষ্টির অসঙ্গতিটাই এদের কাছে বড়ো, কিন্তু কিসের তুলনায় অসঙ্গতি? সে কি মনোগত আদর্শের তুলনায় নয়? কীটসের এই অসঙ্গতির পীড়াবোধ ছিল না। সৃষ্টির দুঃখটাই সঙ্গীতের মতো বেজে উঠেছে—

Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs

Whre Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond tomorrow.

সৃষ্টির অসঙ্গতি আবার কবিতা হয়ে উঠতে পারে, বিদ্রূপও রসে পরিণত হয় অর্থাৎ কোন ব্যাখ্যার মধ্যে না এসে শুধু একটা অখণ্ড অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়। 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে যে দুই-তিনজন মাত্র সত্যকার শক্তিশালী কবির অভ্যুদয় হয়েছে তার মধ্যে আপনি একজন। একথা আমি চিরদিন জোর করে বলেছি।' যতীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে মোহিতলাল একাধিকবার তাঁর কবিতার অনন্যসাধারণত্বের উল্লেখ করেছেন। একাধিকবার বলেছেন, যতীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাঁর নিজের কবিতা বিপরীতধর্মী, তথাপি যতীন্দ্রনাথের কবিতার রসাস্বাদন করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। যতীন্দ্রনাথ এবং মোহিতলালের কবিতা যে বিপরীত প্রকৃতির—এটা বাংলাকাব্যপাঠক মাত্রেই জানেন। দুইজনের কাব্যেই সৃষ্টির রহস্যবোধ আছে। কিন্তু একজন যেন জাগ্রত সচেতন থেকেই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সৃষ্টির সেই অসঙ্গতিকে উপভোগ করেছেন, আর একজন বিহ্বল অনুভূতিতে 'যাতনার হাহারবে গান' গেয়েছেন। মোহিতলালে আছে আত্মহারা মত্ততা, যতীন্দ্রনাথে নিরুপায় ব্যঙ্গ। মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিককে নিয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে। দুজনেই বয়োজ্যেষ্ঠ—'ভারতী'যুগের উত্তরাধিকারী। মোহিতলাল এঁদের কাব্যের হৃদয়ধর্ম ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু যে-মানদণ্ড দিয়ে তিনি বড়ো সাহিত্যের বিচার করেছেন, সেটি এঁদের প্রসঙ্গে নিয়ে আসেন নি। এই দুই কবিই সৌন্দর্যপূজারী, কিন্তু সৃষ্টির সেই ভাবনায় সৌন্দর্যের বেদী রচিত হয় নি। কবির নিভৃত ভক্তিচেতনায় তার আসন। এ জন্য দেহবাস্তবের মন্থনজাত অমৃতে তাঁদের কল্পনা অভিষিক্ত নয়, সুকুমার সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা তাঁদের কাব্যকে মধুর করেছে—তার উপভোগ্যতাকে মোহিতলাল অস্বীকার করেন নি। বাঙালী জীবনের সঙ্গে তাঁদের কাব্যের অবিচ্ছেদ্য যোগকেও মোহিতলাল তাঁদের কাব্যমাধুর্যের কারণ বলেছিলেন (দ্রষ্টব্য পৃ ৭২)। এ যেন মোহিতলালের বাসনালোককে স্পর্শ করে।

যতীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে মোহিতলাল উচ্ছ্বসিত হলেও কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের সঙ্গে তুলনা করেন নি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে একান্ত বাঙালী জীবনের প্রতিরূপও তেমন নেই। সুতরাং মনে হয় যতীন্দ্রনাথ এবং কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের কাব্যাস্বাদ এবং কাব্যবিচার স্বতন্ত্রভাবেই কর্তব্য।

মোহিতলাল যে জীবন-সত্যের কথা বলতেন সেই সত্যের আভাস 'কল্লোল'-কবিদের কাব্যে দেখা গিয়েছে, মোহিতলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথকেও এই কবিরা পুরোধারূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

একালের কথাসাহিত্য সম্বন্ধে মোহিতলালের একটি প্রবন্ধ আছে 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য'। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-বিতানে' সঙ্কলিত। একালের উপন্যাস-গল্প সম্বন্ধে তাঁর মত ওই প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে। বর্তমান পত্রগুচ্ছে বনফুলকে লেখা চিঠি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল যে-কবিকল্পনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন নাটক এবং উপন্যাসের শিল্পরূপ তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। নাটক-উপন্যাসে জীবনকে পূর্ণাঙ্গ এবং রূপময় করে তোলা সুবিধাজনক। মোহিতলাল নাটককেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করতেন। বাংলাতে নাটক সে-গৌরব লাভ করতে পারে নি এমন কি মোহিতলালের সমালোচনার বিষয়ীভূত হবার যোগ্যতাও তার আসে নি। বরং উপন্যাসের বিস্তৃতি সে-সুযোগ দিয়েছে। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন।[১] বঙ্কিমের উপন্যাস বিচারেই বরং তিনি শেক্সপীয়রীয় নাটকের মান প্রয়োগ করেছেন। যে-বাস্তবতা গুণ বঙ্কিমের উপন্যাসের সম্পদ সে-গুণ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসেও নেই। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সমালোচনার সমালোচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল উপন্যাসের সংকীর্ণ শিল্পরীতিকে উপেক্ষা করতেই বলেছিলেন। মিডলটন মারি ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস সম্বন্ধেও এমনি কথাই বলেছিলেন।

বনফুল এবং তারাশংকরের মধ্যে মোহিতলাল দেখেছেন সেই সম্ভাবনা। কবিতায় যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল, উপন্যাসে তেমনি বনফুল এবং তারাশংকর। একজন জিজ্ঞাসু, পরিহাসপটু এবং সত্যসন্ধানী, অন্যজন রসবিহ্বল গম্ভীর এবং রহস্যকাতর। শরৎচন্দ্রের পর আধুনিক কথাসাহিত্যে এই দুইজনই মোহিতলালের সমালোচনার উচ্চতম মানে বিচার্য হয়েছেন—সেই জীবনবোধ, সেই সংশয়শূন্য সমগ্রতার চেতনা এবং বস্তু-লীলায় তাকে লীলায়িত করে দেওয়া। বনফুলের রচনা মোহিতলাল প্রথমাবধি লক্ষ্য করে এসেছেন। তাঁর মধ্যে দেখেছেন অমিত সম্ভাবনা—

"চরম দুঃখ ও পরম সুখ ইহার কোনটাই যে সত্য নয়, এমন কি এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও মূল যে এক—ব্যক্তিচেতনার অতি সংকীর্ণ আত্মপ্রীতি, একথা

১ 'সাহিত্য হিসাবে ও শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার'—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫) পৃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

আমরা বুঝি—কিন্তু বাস্তব-অভিভূত চেতনা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। আপনি ত তাহা পারেন, কিন্তু হৃদয়রক্তের তাড়নায় আপনার কবিশক্তি এই গ্রন্থে তাহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে" (পৃ ৩০)।

মোহিতলাল বনফুলকে 'দেহমনের নিম্নভূমি'র প্রবল ভাবের মোহ থেকে মুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন। বনফুল জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতির খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিতে তির্যক অর্থব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছেন—এ যেন বিধাতার হাসি, মানুষের সীমিত বুদ্ধি-বিচার কর্তব্য-অকর্তব্যের ভাবনায়। এই পরিহাসই পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়। অতি সামান্য পরিসরে দৈবনিয়তির নির্মমতার অনুভূতিটি ফুটিয়ে তুলতে বনফুল সিদ্ধহস্ত হয়েছেন বটে, তবে সেটা যেন সেই স্তরে নিয়ে যায় নি, যেখানে বুদ্ধি এবং হৃদয় এক হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে হার্ডির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন, 'Hardy-র উপন্যাস-গুলিতে perfect experience-এর রসপরিণাম নাই, প্রকাণ্ড denial আছে, fulfilment নাই ; এবং তাহা না থাকিলে অমৃতপিপাসু মানুষের আত্মা কখনও পরিতৃপ্ত হইবে না।'

অবশ্য বনফুল উত্তীর্ণ হয়েছেন সিদ্ধির শিখরে। মোহিতলাল অতুলনীয় ভাষায় বনফুলের সেই সিদ্ধির প্রশস্তি করেছেন 'বর্তমান বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধে—

"বনফুল এই আশ্বাস ও বিশ্বাসের কবি, তিনিও এক ধরনের প্রকৃতিবাদী Naturalist। তাঁহার আর্ট মানুষেরই স্নায়ুশিরাশোণিত-বিজ্ঞানের আর্ট। তিনি কেবল রূপের পূজারী নহেন, সেই রূপের চিরচঞ্চল প্রবাহে তিনি প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়াছেন। এই শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি, তাহার মূলে কোন আধ্যাত্মিকতা নাই। বনফুলের কাব্যপ্রকৃতিতে একপ্রকার paganism আছে, সে এই শক্তিপূজারই paganism ; শক্তির যে সৌন্দর্য তিনি সেই সৌন্দর্যের উপাসক।"

তারাশংকর সম্বন্ধে মোহিতলাল পত্রগুচ্ছে সে রকম কিছু উত্থাপন করেন নি। তারাশংকরের উপন্যাসে রাঢ় বাংলার নিগূঢ় প্রকৃতি—তার ধর্ম, তার বিশ্বাস, তার আচার-অনুষ্ঠান, প্রাণের সেই বিশেষ রূপটি আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। সেই বাংলাদেশ সম্বন্ধে তারাশংকরের একটি অপূর্ব স্পর্শকাতরতা আছে। বিগত বৈভবের স্মৃতিতে তাঁর হৃদয় উদ্‌বেল। এই জীবনটিকে তিনি দেখেছেন গভীর প্রেমের দৃষ্টিতে ; সেই সঙ্গে নিখুঁত বাস্তবনিষ্ঠায়। মানুষের চরিত্রের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করতে জানেন, বনফুলের মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রেরণায় নয়, সুকুমার সমবেদনায়। তারাশংকরের অসাধারণ কৃতিত্ব, বিশেষ দেশ এবং কালসীমায় তিনি মানবরূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই বিশেষের রঙ আমাদের সাহিত্য থেকে

অন্তর্হিত হওয়ার-ই পথে। একালের লেখক বাঙালী মনের যুগবাহিত সংস্কার এবং বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হারিয়ে চলতি সমস্যার আলোতে মাত্র তাকে দেখেন। এই তারাশংকরকেই মোহিতলাল স্মরণ করেছেন; পরবর্তী অধ্যায়ে তারাশংকর সেই পূর্বতন বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেন নি, এজন্য মোহিতলালের দুঃখ। দেশ এবং জাতির ভাবনাতেই মোহিতলাল সাহিত্যের শিল্পরসের বিচারকে গৌণ করে ফেলেছেন। 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যে' এই সমালোচনাই ছিল অধিকতর বিশুদ্ধ—

"আমি তাঁহার আর্টের যে objectevity-র কথা বলিয়াছি তাহার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার গল্পের প্রতিবেশ ও ঘটনাসংস্থানের সঙ্গে চরিত্রগুলি এমন অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে সবগুলি একত্রে একমুখে গল্পটিকে রসের পরিণাম-মুহূর্তে পৌঁছাইয়া দেয়;—তাঁহার রসসৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ-ভঙ্গি নাই; গল্পের সকল উপাদানই নাটকীয় পাত্রপাত্রীর মত কাজ করে।"

তারাশংকরের 'কবি' উপন্যাসটি তিনি আলোচনা করেছেন একটি প্রবন্ধে। সে আলোচনাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যবিচার, বিশেষের নির্বিশেষে রূপান্তরণ-রহস্য-বিশ্লেষণ। পত্রগুচ্ছে 'কবি'র উল্লেখ করে বলেছেন, 'দেখা যাইতেছে তারাশংকরের সৃষ্টিশক্তি এখনও অব্যাহত আছে।'

• মোহিতলাল 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে সমসাময়িক আরও কয়েকজন কথাসাহিত্যিকদের কৃতিত্ব আলোচনা করেছেন। এ-আলোচনা সংক্ষিপ্ত যদিও কয়েকজন সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত সূত্র নির্দেশ আছে। তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-সরোজ কুমার রায়চৌধুরীকে লেখা পত্র বর্তমান পত্রগুচ্ছে সংকলিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাস-গল্প সম্বন্ধে মোহিতলালের মনোভাব প্রসন্ন, কিন্তু চিঠিতে তিনি কোনো বিশ্লেষণাত্মক (ক্রিটিকাল) মন্তব্য করেন নি। 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে বলেছেন, মধুর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে থাকলেও মানবাত্মার যে বিক্ষোভে জীবনের সর্বোত্তম মহিমা প্রকাশিত হয় তার পূর্ণ পরিচয় এতে নেই—

"তিনি তাঁহার নিজের স্নায়ুশিরা-গ্রন্থিত সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া, যে প্রেম জীবনের সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়াও মানুষকে আর এক মহিমালোকে বরমাল্য পরাইয়া দেয়—tragic waste-এর মধ্যেও যে সান্ত্বনা আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে নিগূঢ় উৎসমুখে উৎসারিত হয়—চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও ভাবসম্মিলনের যে অমৃত সেই এক বাঁশির সুরেই ক্ষরিত হইতে থাকে—তাহার সন্ধান ইহাতে নাই।"

সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্বন্ধে মোহিতলালের মন্তব্য—

"সরোজকুমারও 'রিয়ালিস্ট'; বাস্তবের অন্তরালে যে-রহস্য আপন অর্থ-গভীরতায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—কাহারও মনঃকল্পিত অর্থ যাহার নাগাল পায় না, সেই রহস্যাবরণের এক প্রান্ত তুলিয়া ধরিবার জন্যই তিনি Real-এর পূজা করেন ; তাহাকে লাঠির আঘাতে ভাঙিয়া মূর্খের মত সকল রহস্য নষ্ট করিবার প্রয়াসী তিনি নহেন।"

এই সমালোচনাতেও মোহিতলাল সাহিত্যতত্ত্বের উচ্চতম মানটির প্রয়োগ করেছেন। রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' উপন্যাসটি সম্বন্ধে মোহিতলালকে প্রশংসামুখর দেখতে পাই, কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য অন্য কোথাও দেখিনি

রবীন্দ্র-ভাবনা

অবশ্য সকলের উপরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে সব পরিবর্তনের স্রোত সাহিত্যের জগতে চলেছে তার কোনো কিছুই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতো সব কিছুর উপরেই আলোক বর্ষণ করেছেন—সেই আলোকেই সকলে পুষ্ট, আবার তাকেই ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টারও বিরাম ছিল না। কল্লোল-যুগের লেখক একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন—এ হচ্ছে মাটির বিরুদ্ধে বীজের বিদ্রোহ ; যার থেকে রস সংগ্রহ করেছে তাকেই নীচে ফেলে উঠে আসবার চেষ্টা। মোহিতলাল প্রথমত 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকেও কল্লোল-কালিকলমে রবীন্দ্র বিরোধীদের পুরোধা হয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিয়ে মোহিতলাল সাহিত্যের যে ধ্রুব আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তাতে 'কল্লোলে'র সাময়িক বিক্ষেপের যেমন, তেমনি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানেরও নানা প্রশ্ন তুলেছেন। পত্রগুচ্ছের একাধিক পত্রে মোহিতলালের রবান্দ্র-সমালোচনা আজকের রবান্দ্রমুগ্ধতার দিনে বিশেষ কৌতূহল জাগায়। সাহিত্যের বিশুদ্ধতা এবং উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য যিনি অবিরাম লেখনী চালনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কোন্ যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয়। একটি পত্রে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মুল সিদ্ধান্তকে সংক্ষেপে নির্দেশ করে বলেছেন (পৃ ১০৩-১০৪)।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়েই বিচিত্র সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছেন। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের বিপ্রতীপ সমালোচনা করার আগে বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্র-সাহিত্যে আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদের বাস্তব-ভিত্তিশূন্য নিরঙ্কুশ প্রভাবের বিস্তৃত

উল্লেখ করেছিলেন। অজিত চক্রবর্তী সে-অভিযোগের উত্তরও দিয়েছিলেন। অবশ্য বিপিন পালের অভিযোগ ছিল কিঞ্চিৎ স্থূল। ধনী পরিবারের সন্তান বলে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবজীবনের মুখোমুখী কখনও হন নি। তিনি আত্মকেন্দ্রিক কল্পনায় মনোহর জগৎ গড়েছেন মাত্র, জীবনের সত্যকার রূপকে তিনি ধরতে পারেন নি। 'উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন ক্বচিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তু-তন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।'[১]

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব আছে—এই অভিযোগ আধুনিক কবিমহলেও উঠেছে। বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথকেও তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল—'ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।' মোহিতলাল ঠিক বিপিন পাল বা পরবর্তীদের অভিযোগ সমর্থন করে সমালোচনা করেন নি। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির সনাতন আদর্শের তুলাদণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। বাস্তবতার অভাব আছে রবীন্দ্র সাহিত্যে—বিপিন পালের এই উক্তিকে তিনি ভিন্নতর দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২] ইন্দ্রিয়জগতের সৎ অসৎকে যে নিরাসক্ত প্রশান্তিতে গ্রহণ করে ধ্বনি ও শব্দের ছবিতে রূপান্তরিত করে শেকসপীয়র চরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-ভাবে বাস্তবকে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবাস্তবেরও অনুসরণ করে নি। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' (১৩৩৮) সংকলিত মোহিতলালের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য'তে এটাই ছিল মূল বক্তব্য—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় উচ্চতর ভাবসিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে মনুষ্যজীবনের যে নবতন মহিমাবোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে, মানুষের অতি ক্ষুদ্র সাধারণ সুখদুঃখের উপরে অতি পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্বাশ্রয়ী রসকুতূহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক

১ 'রবীন্দ্রনাথ' ১৯১১।

২ 'আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম' (শনিবারের চিঠি ১৩৩৬, পৃ ৮২৮—৮৪৪) প্রবন্ধে মোহিতলাল (?) বলেন 'এই অধঃপতনের আর একটা কারণ আছে, সাহিত্যের এই দুরবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথও অনেক পরিমাণে দায়ী। কথাটা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন জানি, কিন্তু কথাটা অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইলে বর্তমান লেখকও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন।'

প্রতিফলিত করিয়াছে, তাহাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলছেন—

"রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরগহনের দীপশিখাকেই বস্তুপরিচয়ের মানস-রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

মোহিতলালের এই মতটিরই সর্বশেষ পরিণাম ঘটেছে সেই তত্ত্বে, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'জগৎব্রহ্মবাদ'। জগদতিক্রান্ত অখণ্ড চিন্ময় সত্তা এবং তার বস্তুপরিণাম এই বিচিত্র বাস্তব—দুইই একই সঙ্গে সত্য এই তত্ত্বের দার্শনিক নাম ছিল বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। রবীন্দ্রনাথও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেই সাধারণত চিহ্নিত হয়ে থাকেন। বিহারীলালের সঙ্গে তুলনা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল বলেছিলেন—

"বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবিহৃদয় এই বিচিত্ররূপিনীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি তাঁহার 'অন্তরব্যাপিনী' হইয়াই আছেন। বিহারীলাল এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী; রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।"

মোহিতলালের সর্বশেষ অসমাপ্ত গ্রন্থ 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্যে' (১৯৫২) এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিবর্তন ও বিশ্লেষণ করে নাম দিয়েছেন 'জগৎ-ব্রহ্মবাদ।' এই চিঠিতে যে 'ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন' করার কথা বলা হয়েছে, সে এই বইয়ে। এতে তিনি এক জায়গায় বলছেন—

"সৃষ্টিতে মৃত্যু নাই, সেই গতিধারা অনন্ত; তাহাতে যদি পরিবর্তন না থাকে, তবেই তাহা অভিশাপ হইয়া উঠে। জীবন রাখে, মৃত্যু চালায়।...এ বিষয়ে লক্ষণীয় এই যে কবি এই বিশ্বপ্রকৃতির বাহিরে কোথাও অপর কোন অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; 'বিশ্ব' অর্থে ঐ সৃষ্টিধারাই অসীম দেশকাল। ঐ অনন্ত জীবনই জড়-প্রকৃতিকে চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ী করিয়া তুলিয়াছে। ঠিক 'জড়বাদ' না হইলেও ইহা ভারতীয় ব্রহ্মবাদ নহে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিনব 'জগৎব্রহ্মবাদ'।"[১]

অন্যত্র বলেছেন—

"এই লীলা কবি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সে দৃষ্টিতে এই রূপজগৎ মিথ্যা মায়া হইয়াও এক অপরূপ রসের আধার। ঐ দৃষ্টিকোণ এক ভারতীয় ভাবসাধনার অনুরূপ হইলেও, এমনকি প্রায় তাহাই বলিয়া মনে হইলেও—উহাতে সেই রবীন্দ্রীয়

১ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ১ম খণ্ড (১৩৫৯) পৃ ৮৫-৮৬

'জগৎব্রহ্মবাদেরই' একটা নূতনতর ব্যাখ্যা আছে। ইহা জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়, আবার স্বীকার করাও নয়—কেবল শূন্যকে বাদ দিয়া একটি সূক্ষ্মরূপে তাহার ধ্যান করা। জগৎই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জে নয়—জীবনের স্থূল বাস্তবতায় নয়—তাহা দেশকালের অনাদ্যন্ত ধারায় সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের পরমানন্দরূপে বিবর্তিত হইতেছে। এই দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টি বা আর্টতন্ত্রই বলা সঙ্গত।"[১]

মোহিতলালের এই 'জগৎব্রহ্মবাদে' কোনো অভিনবত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। মনে হয়, মোহিতলাল এতে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নূতন ব্যাখ্যা দেবার মৌলিকত্ব দাবী করেছেন, পাঠকদের সেটা যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করে নি।

মোহিতলাল এই পত্রে এই তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন একটি ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সংবাদ জেনে। প্রবন্ধটির নাম The Strayed Angel : Tagore At His Best And His Worst. লেখক Ranjee Shahani। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় Sunday Statesman-এ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। এই লেখায় এমন এক দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা আছে যা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠককে আঘাত করে। লেখক প্রথমেই বলে নিয়েছেন,

At one time expositors—both Eastern and Western—told us, at the top of their voices that Tagore was a great Philosopher, a great mystic, a great moralist, a great religious teacher, a great artist, a great amateur of the world, a great great everything. Now, the human head we know, the bovine trunk we also know, but a combination of the two is not to be found in this workaday world of ours. We were asked to believe in a literary monstrosity—a man who united the various gifts of Shakespeare, St Paul, Luther, Goethe and Hegel !

সাহানীর মতে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিকই ছিলেন না। তিনি শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহুযুগ-বাহিত সুলভ ভাবচিন্তাগুলি গুছিয়ে বলেছেন,

Tagor was not even an intellectual. What he did was merely to philosophize in the approved Indian manner. We get in Sadhana, in Personality and in other tomes merely some tit bits from our sacred writings, both ancient and medieval. These

১ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ২য় খণ্ড, ১৩৮০, পৃ ৭৫

tickle our minds as half-remembered beauties. I must say, however, that Tagore played at thinking, and then, unable to proceed further indulged in sentimental leaps which undid all his thinking.

মোহিতলাল সাহানীর মন্তব্য সর্বাংশে স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এক ধরনের তত্ত্বদর্শন ছিল, মোহিতলাল যার নাম দিয়েছেন 'জগৎব্রহ্মবাদ'। 'রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন পুষ্পোদ্যান হইতে তোড়া বাঁধিয়াছেন'—এ বিষয়ে সাহানীর মন্তব্য ছিল—

He stood on the shoulders of others to gain a better view of the cosmos, or, rather he gave us bouquete torn from the gardens of India's marvellous but defunct thinkers and seers. These are so cunningly and beautifully arranged that they give us the impression of new and startling unities.

মোহিতলালের মন্তব্য এবং সাহানীর সিদ্ধান্ত ঠিক একই অর্থ বহন করেনা। সাহানীর বক্তব্য অগভীর, তাতে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অক্ষমতাই যেন ফুটে উঠেছে, কিন্তু মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন এই বলে—

"আর্টের এই যে সক্ষম সৃষ্টিপ্রতিভা ইহাতে অনুকরণ বা অনুসরণের প্রশ্ন অবান্তর; কারণ, রসসৃষ্টির যে গৌরব তাহা ভাবমাত্রের মৌলিকতা হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে ভাবও মৌলিক হইয়া উঠে তাহার প্রকাশভঙ্গিতে। এ কাব্যের গীতিকল্পনাও অতিশয় স্বতন্ত্র। মধুসূদন তাঁহার নূতন মহাকাব্যে বিদেশী কাব্যকল্পনাকে বাংলা ভাষায় তথা বাঙালীর রসসংস্কারে এমন সহজে ধরাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তার কারণ—তিনি সেই বিদেশী ভাববস্তুর প্রাণস্বরূপ যে ছন্দকে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, সেই ছন্দকে বাংলায় গড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন; আদৌ ঐ ছন্দপ্রেরণাই তাঁহার সৃষ্টিপ্রেরণা হইয়াছিল; মিলটনের ছন্দই সে কাব্যের কল্পনাভঙ্গিকে কবির মনেও যেমন বাংলা ভাষাতেও তেমনি প্রতিচ্ছন্দিত করিয়াছিল। এমনই করিয়া বাংলা কাব্যে একটা নূতন আর্টের জন্ম হইয়াছিল।"

অনুকরণও যে মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণায় রূপান্তরিত হতে পারে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-আশ্রিত কল্পনা-ভঙ্গিকে মোহিতলাল তার উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য বস্তুপ্রধান। 'গীতিকাব্যের অতি সূক্ষ্ম রসসংবেদনার আর্ট' আবার ভিন্নতর সৃষ্টিপ্রেরণার ফল।—

"সে যেন দেহের অন্তরগহনে মনোবীণায় অতিপেলব ঝঙ্কার, তাহাকে সুরে

ধরা যায়—ছন্দেরও অন্তরালে। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় গীতিকাব্যের সেই আত্মাকে—তাহার ভাবদেহের সঙ্গীত-রূপটাকে আপন অলৌকিক গীতিপ্রতিভায় আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মৌলিক কবিশক্তি, রবীন্দ্রকাব্য-বিচারে এই শক্তির অফুরন্ত লীলাই সর্বাগ্রে গণনীয়।"[১]

সাহানীর আর একটি মন্তব্য—

Tagore was and ever remain an eclectic. Now this is not the eclecticism of Buddha, Jesus or Ramkrishna who extracted, by some divine art the inwardness of the thought of the ages; but an eclecticism that is very akin to intellectual laziness. It says that all religious and ethical theories are of equal value...Those who accept all things may be said to possess nothing. This is a paradox that most Indians have not yet understood Tagore did not even consider it. He was an easygoing universalist.

সাহানীর মতে দু-একটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রাণহীন কৃত্রিম: মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের মতো প্রাণের চকিত-চমক দেখা গেলেও মোটের উপর এতে সেই সঞ্জীবনী শক্তিরই অভাব আছে। 'Strangely beautiful' গোরা উপন্যাসটি বাদ দিলে তাঁর উপন্যাসেও প্রাণের লক্ষণ নেই। কিন্তু সাহানী রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত—

Some of these are flawless masterpieces, better than anything to be found in English literature. Yes some of Tagores stories are a rich contribution to world literature. I am even inclined to think that his fame will ultimately rest on these, for they can be translated, A few it will be found are finer than anything that Tchekhove or Maupassant has given us.

...Tagore's best poetry is to be found in his earlier volumes 'Sharps and Flats.'

এই প্রসঙ্গে সাহানী রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ঘাটের কথা'র সারানুবাদ দিয়েছেন। সাহানী রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি করেছেন এইভাবে—

First he moved to music. His poetry at its finest is a river of rhythmic energy which takes us beyond this world

১ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ১ম খণ্ড পৃ ৩১-৩২

into realms of ineffable. Then we have his hypersensitiveness. Here he surpasses almost every European poet with the exception of Shakespeare, Blake and Baudelaire.

কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে,

Tagore's manner was suddenly altered and what is worse, even the quality of his literary work. And this was a shock to his wellwishers. They had lost his originality in sharpness of savour.

সাহানীর এই বিচিত্র মন্তব্যগুলি একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করলাম—মোহিতলাল অনেক দিক থেকে তাঁর সঙ্গে একমত বলে। রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং উপন্যাস সম্পর্কে মোহিতলালের মনোভাব অন্য একটি রচনা থেকে দেখানো যায়। 'সাহিত্যের স্বরাজ' (আশ্বিন ১৩৩৮) প্রবন্ধে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সৃষ্টি 'গল্পগুচ্ছ' এবং 'কথা ও কাহিনী'র বিস্ময়কর রূপরচনায় অভিভূত হয়েছেন। আবার অতিরিক্ত গীতিপ্রাণতার ফলে 'রীতিমত নাটক ফাঁদিয়াও তাহাকে গীতিকাব্য করিয়া ছাড়িয়াছেন'। সাহিত্যের স্বরাজ হচ্ছে জীবনধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করায়। রবীন্দ্রনাথের রসকল্পনার মনোহারিত্ব অভূতপূর্ব হলেও জীবনের বাস্তবরূপ সর্বদা উজ্জ্বল হয় নি, কবির কল্পনাই তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কোনো কোনো সময় রবীন্দ্রনাথও আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিকে সংবরণ করতে চেয়েছেন,

"মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও তাঁহার যৌবনকালে সাহিত্যের স্বধর্মের নিকট আত্মসম্বরণ করিয়াছে, উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টির প্রেরণা তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিরোধ করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বে তিনি সর্বত্র সফল না হইলেও এ আদর্শ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। 'নষ্টনীড়'-লেখক 'বৌঠাকুরানীর হাট' লিখিয়াছিলেন; 'মালিনী' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র যে ভাবতান্ত্রিক আদর্শ পরিশেষে স্বাভাবিক পরিণতির বশেই 'ফাল্গুনী' 'অচলায়তন' 'রাজা' 'ডাকঘর' 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'য় জীবনাবেগ-বর্জিত ভাবশরীরের নটলীলায় সাহিত্যে একটি অপ্রাকৃত রসলোকের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই কবিই একদা য়ুরোপীয় রোমান্টিক ট্রাজেডির অনুকরণে পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রকাব্যের দুর্বলতা দেখিয়ে বিপিন পাল প্রভৃতি সমালোচকেরা যে একশ্রেণীর সমালোচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন. মোহিতলাল তারই অনুবর্তন করে আবির্ভূত হয়েছিলেন—এ রকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মোহিতলালের সাহিত্যিক যুক্তি অন্য রকমের, তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেক গভীর।

সাহানী বাঙালী সমালোচক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা ভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ; মোহিতলালের মতের সঙ্গে তার মিল সেই জন্যই উল্লেখযোগ্য। বিদেশী টমসনও রবীন্দ্রভক্ত হয়েও রবীন্দ্রকবিশক্তি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন,

We often feel there is a slackness somewhere probably at the very springs of thought and conception. His poems rarely fail in beauty of style but they often fail in grip.

'সাহিত্যে অশ্লীলতা' (চৈত্র ১৩৩৯) প্রবন্ধে মোহিতলাল এই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন।

দে শ ভা ব না

একটি চিঠিতে মোহিতলাল লিখেছেন, 'আমার সাহিত্যিক জীবন ও সাহিত্যব্রতের একটা বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য কর নাই। বাংলা সাহিত্যের যে সেবা আমি করিয়াছি তাহা দেশ জাতি ও সমাজকে দূরে রাখিয়া নহে—কেবল সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক চালনা ও সাহিত্যরস-চর্চার জন্য নহে ; আমার এই ব্রত ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রেরই মত। বাঙালী জাতির জাতিগত সাধনা ও জাতীয় প্রতিভাকে আমি তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তার কারণ আমি শুধুই সাহিত্যিক নই—আমি বাঙালীর জীবন, তাহার আত্মার বলাধান করিতে চাই।'

মোহিতলাল যতদিন প্রধানত কবিতা লিখেছেন, ততদিন তাঁর এই সাহিত্য-প্রতিভার বিশিষ্টতা স্বভাবতই অলক্ষ্য ছিল। মোহিতলালের কবিতাতে দেশ বা জাতীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নেই। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদ ছিল সেখানেই। এই কারণেই নজরুল জনসমাজের লোকপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন, কিন্তু মোহিতলাল জনজগৎ থেকে একটু দূরে কবিদের কবি হয়ে রইলেন। অবশ্য মোহিতলালের কবিতার যাঁরা সূক্ষ্ম সমালোচক তাঁরা হয়তো বলবেন, তাঁর কবিতার সঙ্গে বাংলাদেশের সাধনা ও সংস্কৃতির গভীরতর যোগ আছে। যোগটা বাইরের সাময়িক উপলক্ষ্যগত নয়। জাতীয় চিত্তপ্রবণতা ও মগ্নচৈতন্যের নিবিড় ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

মোহিতলাল যখন থেকে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন থেকেই তাঁর ব্যাখ্যাপ্রণালীতে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উল্লেখ এবং বৈশিষ্ট্যবিচার সাহিত্যালোচনাকে যুক্তিবদ্ধ করে তুলতে লাগল। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' তাঁর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ (১৩৪৩)। এই বইতে তিনি প্রথম

দিকের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত করেছেন। 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' প্রবন্ধটি ১৩৩৩ (১৯২৬)-এ রচিত। এই প্রবন্ধটি মোহিতলালের রচনার মধ্যে কিছু বিশিষ্ট,—এটি বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা বলেই। ১৯২৯-এ রচিত বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে মোহিতলাল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বঙ্কিমমানসের বিশ্লেষণ করেছেন; শুধু উপন্যাস নয়, জাতীয় জীবনধারায় বঙ্কিমের চিন্তামূল্যও দেখিয়ে দিয়েছেন। একাজ বিপিনচন্দ্র পাল 'নবযুগের বাংলা'র ধারাবাহিক প্রবন্ধে আরম্ভ করেছিলেন। মনে হয় বিপিনচন্দ্রের লেখা থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি ও জাতীয় জীবনের যোগ অনুসন্ধানে তাঁর প্রেরণা জাগে, বিশেষ করে সাহিত্যের মনন-পটভূমি নির্ণয় করবার চেষ্টায়। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচনার আগে মোহিতলালের রচনায় এই শ্রেণীর কৌতুহলের লক্ষণ সুলভ নয়। কিছু আগে প্রকাশিত হতেথাকে বাংলাদেশের জাতীয় মানস সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (বঙ্গবাণী ১৩২৯)। কারণ তার পরেই মোহিতলালের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য' (১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ) 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে ওই প্রবন্ধটি ওই নামের বইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বইয়ের মুখবন্ধে তিনি তাঁর চিন্তার সূত্রটি নির্দেশ করেছেন এই ভাবে—

"আমাদের জীবনে যতটা না হউক, সাহিত্যে—ইংরাজীতে যাহাকে Renaissance বা *পুনরুজ্জীবন বলে* তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু *দেহ* ও *প্রাণধর্ম* দেশেরই, বাহির হইতে আসিয়াছিল কেবল সঞ্জীবনী ভাবপ্রেরণা। অতএব আজ সাহিত্য ও ভাষার এই আদর্শসঙ্কটের দিনে জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায়, তাহার স্বধর্ম, এই নব্য সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

অতঃপর 'জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিকে' নানাভাবে তিনি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস ও তন্ত্রধর্মের ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতিস্বভাব ধরবার চেষ্টা করেছেন। তার ফল জীবনের শেষে রচিত 'বাংলা ও বাঙালী' (১৩৫৮)। 'বাংলার নবযুগ' বইতে তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্যই ছিল বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান ও সাধনার পুষ্পিত রূপকে তুলে ধরা এবং তার সাহিত্যের সাহায্যে আধুনিক বাঙালীর জাগরণ ব্যাখ্যা করে বোঝানো। আঘাত এসেছিল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে কিন্তু জেগে উঠল বাঙালী প্রাণ।

বাঙালীর দেহজীবনপ্রীতি, বাঙালীর আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীন প্রবৃত্তি, তার অনুকরণ-প্রিয়তা—এ রকম কয়েকটি সূত্রের দীপালোকে মোহিতলাল বাঙালীর নবজাগরণের পৃষ্ঠাগুলি পড়ে গিয়েছেন। বাঙালীর চরিত্রের জন্য তাঁর গর্ব ছিল, সেই সঙ্গে ছিল লজ্জা। মোহিতলাল বলেছেন বলিষ্ঠ ভাবেই, নবজাগরণের প্রাণশক্তি ছিল বাঙালার স্বভাবধর্মে নিহিত, তার মানবজীবন-প্রীতিতে, যার প্রকাশ ঘটেছিল তন্ত্র এবং সহজিয়া ধর্মে; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সেই নির্জীব প্রাণকে স্পন্দিত করেছে মাত্র। মোহিতলালের এই ব্যাখ্যা এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা জানি না। কিন্তু সাহিত্যের উৎস রূপে বাঙালী জাতির প্রকৃতি এবং ইতিহাস ধ্যান করতে করতে জীবনের শেষ ভাগে এসে সাহিত্যচিন্তাকেও তিনি গৌণ করে ফেললেন। চোখের উপরেই বাংলা দেশ ও সমাজের বিরাট পরিবর্তন তিনি দেখলেন যাকে তিনি বললেন ধ্বংস। তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর শেষ জীবনে দেখা বাংলাদেশের এক করুণ বিধ্বস্ত মহাবিনষ্টির শ্মশানচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যাতেও দেখা যায় প্রথম দিকের চেয়ে শেষের দিকে তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালী চৈতন্যের অভিপ্রকাশই খুঁজছেন। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বইটি তার উদাহরণ। এ যেন মহাকালের প্রবাহতাড়িত নিমজ্জমান ব্যক্তির অতীতের ভগ্ন অবশেষ-স্মৃতিকে ধরে থাকার করুণ প্রয়াস। এই চিঠিগুলি পড়লে নিঃসঙ্গ স্বজনবর্জিত বৃদ্ধ লেখকের যে ছবিটি ফুটে উঠে, তার সম্মুখে আলো নেই, গান নেই, পথ নেই, দিক নেই, শুধু আছে সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্তহীন অন্ধকার।

১৯২৯-সমকালীন সময় থেকে মোহিতলালের মনকে বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির ভাবনা আচ্ছন্ন করতে থাকে। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘটনা জাতীয় জীবনে ঘটতে দেখলেন, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ। প্রথম যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন সমাপ্ত করলেন। অবসর নেওয়ার এক বৎসর আগে ঘটল রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরণ। এর প্রত্যেকটি ঘটনাই মোহিতলালের মনে গভীর রেখাপাত করল যা তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমাবধি মোহিতলাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ১৯২৩ সালে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি Out of time এবং বোধ হয় out of place-ও বটে। I am fallen on evil days and on evil tongue। আমাকে কেহ বুঝিবে না, আমি বড় স্বতন্ত্র বড়ই একাকা। যাহারা আমাকে ভালবাসিয়াছে এবং বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তাহারাও শেষে বুঝিতে না পারিয়া মর্মাহত হইয়াছে।'

দিকের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত করেছেন। 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' প্রবন্ধটি ১৩৩৩ (১৯২৬)-এ রচিত। এই প্রবন্ধটি মোহিতলালের রচনার মধ্যে কিছু বিশিষ্ট,—এটি বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা বলেই। ১৯২৯-এ রচিত বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে মোহিতলাল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বঙ্কিমমানসের বিশ্লেষণ করেছেন; শুধু উপন্যাস নয়, জাতীয় জীবনধারায় বঙ্কিমের চিন্তামূল্যও দেখিয়ে দিয়েছেন। একাজ বিপিনচন্দ্র পাল 'নবযুগের বাংলা'র ধারাবাহিক প্রবন্ধে আরম্ভ করেছিলেন। মনে হয় বিপিনচন্দ্রের লেখা থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি ও জাতীয় জীবনের যোগ অনুসন্ধানে তাঁর প্রেরণা জাগে, বিশেষ করে সাহিত্যের মনন-পটভূমি নির্ণয় করবার চেষ্টায়। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচনার আগে মোহিতলালের রচনায় এই শ্রেণীর কৌতুহলের লক্ষণ সুলভ নয়। কিছু আগে প্রকাশিত হতে থাকে বাংলাদেশের জাতীয় মানস সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (বঙ্গবাণী ১৩২৯)। কারণ তার পরেই মোহিতলালের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য' (১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ) 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে ওই প্রবন্ধটি ওই নামের বইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বইয়ের মুখবন্ধে তিনি তাঁর চিন্তার সূত্রটি নির্দেশ করেছেন এই ভাবে—

"আমাদের জীবনে যতটা না হউক, সাহিত্যে—ইংরাজীতে যাহাকে Renaissance বা পুনরুজ্জীবন বলে তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু দেহ ও প্রাণধর্ম দেশেরই, বাহির হইতে আসিয়াছিল কেবল সঞ্জীবনী ভাবপ্রেরণা। অতএব আজ সাহিত্য ও ভাষার এই আদর্শসঙ্কটের দিনে জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায়, তাহার স্বধর্ম, এই নব্য সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

অতঃপর 'জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিকে' নানাভাবে তিনি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস ও তন্ত্রধর্মের ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতিস্বভাব ধরবার চেষ্টা করেছেন। তার ফল জীবনের শেষে রচিত 'বাংলা ও বাঙালী' (১৩৫৮)। 'বাংলার নবযুগ' বইতে তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্যই ছিল বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান ও সাধনার পুষ্পিত রূপকে তুলে ধরা এবং তার সাহিত্যের সাহায্যে আধুনিক বাঙালীর জাগরণ ব্যাখ্যা করে বোঝানো। আঘাত এসেছিল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে কিন্তু জেগে উঠল বাঙালী প্রাণ।

বাঙালীর দেহজীবনপ্রীতি, বাঙালীর আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীন প্রবৃত্তি, তার অনুকরণ-প্রিয়তা—এ রকম কয়েকটি সূত্রের দীপালোকে মোহিতলাল বাঙালীর নবজাগরণের পৃষ্ঠাগুলি পড়ে গিয়েছেন। বাঙালীর চরিত্রের জন্য তাঁর গর্ব ছিল, সেই সঙ্গে ছিল লজ্জা। মোহিতলাল বলেছেন বলিষ্ঠ ভাবেই, নবজাগরণের প্রাণশক্তি ছিল বাঙালার স্বভাবধর্মে নিহিত, তার মানবজীবন-প্রীতিতে, যার প্রকাশ ঘটেছিল তন্ত্র এবং সহজিয়া ধর্মে ; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সেই নির্জীব প্রাণকে স্পন্দিত করেছে মাত্র। মোহিতলালের এই ব্যাখ্যা এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা জানি না। কিন্তু সাহিত্যের উৎস রূপে বাঙালী জাতির প্রকৃতি এবং ইতিহাস ধ্যান করতে করতে জীবনের শেষ ভাগে এসে সাহিত্যচিন্তাকেও তিনি গৌণ করে ফেললেন। চোখের উপরেই বাংলা দেশ ও সমাজের বিরাট পরিবর্তন তিনি দেখলেন যাকে তিনি বললেন ধ্বংস। তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর শেষ জীবনে দেখা বাংলাদেশের এক করুণ বিধ্বস্ত মহাবিনষ্টির শ্মশানচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যাতেও দেখা যায় প্রথম দিকের চেয়ে শেষের দিকে তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালী চৈতন্যের অভিপ্রকাশই খুঁজছেন। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বইটি তার উদাহরণ। এ যেন মহাকালের প্রবাহতাড়িত নিমজ্জমান ব্যক্তির অতীতের ভগ্ন অবশেষ-স্মৃতিকে ধরে থাকার করুণ প্রয়াস। এই চিঠিগুলি পড়লে নিঃসঙ্গ স্বজনবর্জিত বৃদ্ধ লেখকের যে ছবিটি ফুটে উঠে, তার সম্মুখে আলো নেই, গান নেই, পথ নেই, দিক নেই, শুধু আছে সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্তহীন অন্ধকার।

১৯২৯-সমকালীন সময় থেকে মোহিতলালের মনকে বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির ভাবনা আচ্ছন্ন করতে থাকে। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘটনা জাতীয় জীবনে ঘটতে দেখলেন, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ। প্রথম যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন সমাপ্ত করলেন। অবসর নেওয়ার এক বৎসর আগে ঘটল রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরণ। এর প্রত্যেকটি ঘটনাই মোহিতলালের মনে গভীর রেখাপাত করল যা তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমাবধি মোহিতলাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ১৯২৩ সালে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি Out of time এবং বোধ হয় out of place-ও বটে। I am fallen on evil days and on evil tongue। আমাকে কেহ বুঝিবে না৹ আমি বড় স্বতন্ত্র বড়ই একাকা। যাহারা আমাকে ভালবাসিয়াছে এবং বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তাহারাও শেষে বুঝিতে না পারিয়া মর্মাহত হইয়াছে।'

তাঁর এই নিঃসঙ্গ প্রকৃতির জন্মই তাঁর আগ্রহের বস্তুকে তিনি সর্বদাই একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখতেন। যতদিন তিনি বিশুদ্ধ আর্টের চর্চা করেছেন ততদিন দেশ ও জাতির চিন্তা বড়ো হয়ে ওঠে নি। সাহিত্যের শিল্পকলাই ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। 'কালিকলম'-'কল্লোলের' গোষ্ঠীতে তিনি আত্মানুকুল পরিবেশ পেলেন, যোগ দিলেন তাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চিন্তাধারা ধাবিত হল ভিন্ন পথে। আধুনিক নবীন সাহিত্যের ভাবভঙ্গি তাঁর কাছে প্রীতিকর বোধ হল না। এই সাহিত্যে জীবনের গভীরতম রূপ ফুটল না। তেমনি বাঙালী জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গেও এদের যোগ রইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছিলেন, 'আজিকার দিনে বাঙ্গালীর জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহা কি বঙ্কিমেরও কল্পনার অগোচর ছিল। আজ আবার যে Renaissance আসিয়াছে—সে রোশনাইয়ে কাহারা মশাল ধরিয়াছে?— ন্যুটহামসুন গোর্কি যোহান বোয়ের মেটারলিঙ্কীয় কাব্যবাদ, নব্য জার্মানির চিন্তাধারা, 'গীতিনাট্য' প্রভৃতির গবেষণায় বাঙ্গালীর ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশানভূমির পচ্যমান আবর্জনায় আলেয়ার দীপ্তি দেখা যাইতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস উদ্ধার করে বাঙালীর প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করা। তিনি জাতির ভিতর থেকেই সেই বীজমন্ত্রটি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, কিন্তু একালের বাঙ্গালী বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে নবপ্রাণশক্তিকে। অর্থাৎ এ প্রয়াস ঠিক প্রাণের নয়, তত্ত্বের। বাঙ্গালীর পক্ষে যা স্বভাবজ নয়, সেই কৃত্রিম তত্ত্ব স্থির করে নিয়ে এদেশের প্রাণের ফুলকে ফোটাবার চেষ্টা চলেছে। মোহিতলাল এ সময়ে বাঙালী জীবন ও জাতি নিয়ে চিন্তা করছেন, তাই সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাবনাটা প্রবল হয়ে উঠছে। সেই সূত্রেই তিনি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র প্রবন্ধটি রচনা করেন। এদিক দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মোহিতলালের মূল সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গেও মিলে যায়। কারণ যা জাতীয় চেতনার ভিতর থেকে আপনা-আপনি কুসুমিত হয়ে না ওঠে, যেটা বুদ্ধি দিয়ে বাইরে থেকে পাওয়া, সেটা কখনই প্রাণবান সাহিত্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ কথা রবীন্দ্রনাথও অনেক আগে বলেছিলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে।

মোহিতলালের ভাবনায় জাতির আত্মিক স্বরূপ বিবেচনা বড়ো হয়ে উঠল, আমরা দেখেছি। যে বাঙালী জাতি উনিশ শতকের সাহিত্য সম্ভব করে তুলেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ে সেই জাতির জীবন ওলট পালট হয়ে গেল। অর্থনৈতিক,

চরিত্রনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যনৈতিক মান বিপর্যস্ত হল। মূল্যবোধও পরিবর্তিত হল। শিক্ষিত বাঙালীর এই পরিবর্তন মোহিতলালকে যেন অবসন্ন করে ফেলল। এই ধরনের ধাক্কায় সমাজের চারদিকের দেওয়াল ভেঙে যেতে থাকে; বাঙালী হিসাবে তার জাতীয় রূপটাও যেন ক্ষয়ে যেতে লাগল। অতঃপর দেশবিভাগে বাংলা দেশের চেহারার শুধু রাজনৈতিক সীমারেখাই বদলে গেল না, বাস্তুহীন অগণ্য নরনারীর ছন্নছাড়া জীবন স্বাধীনতালাভের উন্মত্ততার মধ্যে বড়ো রূঢ় কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে উপহাস করতে থাকে। নিজের দেশখণ্ডকে স্বীকার করতে গিয়ে বাঙালী সেদিন আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, মোহিতলাল তাকে বলেছেন character is destiny। আবার আত্মবিস্মৃতির বশেই ভারত-চেতনায় নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়াও কিছুই অন্যায় মনে করে নি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। মোহিতলালের শেষ জীবনে জাতির জন্য দুশ্চিন্তাকে যে এত প্রবল হয়ে উঠতে দেখি, তার সূত্র সন্ধানের এর বেশি প্রয়োজন নেই। মোহিতলালের নিজের ভাবনা পাওয়া যাবে 'বাংলা ও বাঙালী' বইটিতে। তিনি যে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'বঙ্গভারতী' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা-ভার নিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর সাহিত্যের প্রদর্শনী রচনা করা এবং তার আত্মধ্বংস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাঁর সেই রচনাগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে মোহিতলালের বিরাগ এই সূত্রেই বিচার্য। যে-কালে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি এত বেশি মগ্ন হয়ে পড়েন নি, ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীজির আবির্ভাব সেই সময়ে। সেই গান্ধীর উদ্দেশ্যেই লেখা তাঁর কবিতা 'মহামানব' ও 'আবির্ভাব' 'স্বপনপসারী' (১৩২৮)-তে সংকলিত—

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার!
তুমি নমস্য সবারে করিছ নমস্কার!
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়নকূলে
অন্ধ আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে।
অর্ধঅশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়ালে আসি!

—মহামানব

বর্তমান পত্রগুচ্ছে সংকলিত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লেখা পত্রে মোহিতলাল তীব্র ভাষায় গান্ধীর আদর্শের সমালোচনা করেছেন। জীবনের প্রাকৃতিক সত্যকে স্বীকার না করে একটা উঁচু আদর্শকে—যে আদর্শ জীবনধর্মানুগত

তাঁর এই নিঃসঙ্গ প্রকৃতির জন্যই তাঁর আগ্রহের বস্তুকে তিনি সর্বদাই একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখতেন। যতদিন তিনি বিশুদ্ধ আর্টের চর্চা করেছেন ততদিন দেশ ও জাতির চিন্তা বড়ো হয়ে ওঠে নি। সাহিত্যের শিল্পকলাই ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। 'কালিকলম'-'কল্লোলের' গোষ্ঠীতে তিনি আত্মানুকুল পরিবেশ পেলেন, যোগ দিলেন তাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চিন্তাধারা ধাবিত হল ভিন্ন পথে। আধুনিক নবীন সাহিত্যের ভাবভঙ্গি তাঁর কাছে প্রীতিকর বোধ হল না। এই সাহিত্যে জীবনের গভীরতম রূপ ফুটল না। তেমনি বাঙালী জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গেও এদের যোগ রইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছিলেন, 'আজিকার দিনে বাঙ্গালীর জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহা কি বঙ্কিমেরও কল্পনার অগোচর ছিল। আজ আবার যে Renaissance আসিয়াছে—সে রোশনাইয়ে কাহারা মশাল ধরিয়াছে?—ন্যূটহামসুন গোর্কি যোহান বোয়ের মেটারলিঙ্কীয় কাব্যবাদ, নব্য জার্মানির চিন্তাধারা, 'গীতিনাট্য' প্রভৃতির গবেষণায় বাঙ্গালীর ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশানভূমির পচ্যমান আবর্জনায় আলেয়ার দীপ্তি দেখা যাইতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস উদ্ধার করে বাঙালীর প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করা। তিনি জাতির ভিতর থেকেই সেই বীজমন্ত্রটি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, কিন্তু একালের বাঙ্গালী বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে নবপ্রাণশক্তিকে। অর্থাৎ এ প্রয়াস ঠিক প্রাণের নয়, তত্ত্বের। বাঙ্গালীর পক্ষে যা স্বভাবজ নয়, সেই কৃত্রিম তত্ত্ব স্থির করে নিয়ে এদেশের প্রাণের ফুলকে ফোটাবার চেষ্টা চলেছে। মোহিতলাল এ সময়ে বাঙালী জীবন ও জাতি নিয়ে চিন্তা করছেন, তাই সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাবনাটা প্রবল হয়ে উঠছে। সেই সূত্রেই তিনি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'র প্রবন্ধটি রচনা করেন। এদিক দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মোহিতলালের মূল সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গেও মিলে যায়। কারণ যা জাতীয় চেতনার ভিতর থেকে আপনা-আপনি কুসুমিত হয়ে না ওঠে, যেটা বুদ্ধি দিয়ে বাইরে থেকে পাওয়া, সেটা কখনই প্রাণবান সাহিত্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ কথা রবীন্দ্রনাথও অনেক আগে বলেছিলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে।

মোহিতলালের ভাবনায় জাতির আত্মিক স্বরূপ বিবেচনা বড়ো হয়ে উঠল, আমরা দেখেছি। যে বাঙালী জাতি উনিশ শতকের সাহিত্য সম্ভব করে তুলেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ে সেই জাতির জীবন ওলট পালট হয়ে গেল। অর্থনৈতিক,

চরিত্রনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যনৈতিক মান বিপর্যস্ত হল। মূল্যবোধও পরিবর্তিত হল। শিক্ষিত বাঙালীর এই পরিবর্তন মোহিতলালকে যেন অবসন্ন করে ফেলল। এই ধরনের ধাক্কায় সমাজের চারদিকের দেওয়াল ভেঙে যেতে থাকে ; বাঙালী হিসাবে তার জাতীয় রূপটাও যেন ক্ষয়ে যেতে লাগল। অতঃপর দেশবিভাগে বাংলা দেশের চেহারার শুধু রাজনৈতিক সীমারেখাই বদলে গেল না, বাস্তুহীন অগণ্য নরনারীর ছন্নছাড়া জীবন স্বাধীনতালাভের উন্মত্ততার মধ্যে বড়ো রূঢ় কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে উপহাস করতে থাকে। নিজের দেশখণ্ডনকে স্বীকার করতে গিয়ে বাঙালী সেদিন আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, মোহিতলাল তাকে বলেছেন character is destiny। আবার আত্মবিস্মৃতির বশেই ভারত-চেতনায় নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়াও কিছুই অন্যায় মনে করে নি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। মোহিতলালের শেষ জীবনে জাতির জন্য দুশ্চিন্তাকে যে এত প্রবল হয়ে উঠতে দেখি, তার সূত্র সন্ধানের এর বেশি প্রয়োজন নেই। মোহিতলালের নিজের ভাবনা পাওয়া যাবে 'বাংলা ও বাঙালী' বইটিতে। তিনি যে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'বঙ্গভারতী' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা-ভার নিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর সাহিত্যের প্রদর্শনী রচনা করা এবং তার আত্মধ্বংস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাঁর সেই রচনাগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে মোহিতলালের বিরাগ এই সূত্রেই বিচার্য। যে-কালে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি এত বেশি মগ্ন হয়ে পড়েন নি, ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীজির আবির্ভাব সেই সময়ে। সেই গান্ধীর উদ্দেশ্যেই লেখা তাঁর কবিতা 'মহামানব' ও 'আবির্ভাব' 'স্বপনপসারী' (১৩২৮)-তে সংকলিত—

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার !
তুমি নমস্য সবারে করিছ নমস্কার !
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়নকূলে
অন্ধ আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে।
অর্ধঅশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়ালে আসি !

—মহামানব

বর্তমান পত্রগুচ্ছে সংকলিত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লেখা পত্রে মোহিতলাল তীব্র ভাষায় গান্ধীর আদর্শের সমালোচনা করেছেন। জীবনের প্রাকৃতিক সত্যকে স্বীকার না করে একটা উঁচু আদর্শকে—যে আদর্শ জীবনধর্মানুগত

নয়, তাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা আছে গান্ধীর আদর্শে। মোহিতলাল বলবেন, গান্ধীর মানবধর্ম মনঃকল্পিত ভাবের ধর্ম। এজন্যে এ আদর্শ দেহকে দুর্বল করে, মনকে যতই আদর্শপূর্ণ করুক। ভারতীয় জীবনে মহাত্মার অপরিসীম প্রভাব পড়েছে। বাঙালী জাতিতে এই প্রভাবের ফল এই যে, বাঙালী তার বাস্তব জীবনসত্তাকে ভুলে গিয়ে ভাবময় আদর্শে মগ্ন হয়েছে। 'বুদ্ধ' কবিতাতেও মোহিতলাল এই ট্র্যাজেডির রসসৃষ্টি করেছেন—বুদ্ধের ভাববাদের পরিণাম কি ছিল? বাস্তব-জীবনপ্রকৃতিকে অস্বীকার করায় মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রের দারুণ বীভৎস পরিণাম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মোহিতলালের প্রতিকূলতার কারণও ছিল অনুরূপ। তাঁর বিশ্বপ্রেম মানুষের জীবনে ওপর থেকে ছায়া ফেলেছে, জীবন থেকে তার অভাব-অপূর্ণতা অশক্তি-দুর্বলতা অসৎ-অশুভকে নিয়ে সর্বান্তঃসঞ্চারী হয় নি। এই বিশ্বপ্রেমও মনঃকল্পিত আইডিয়া। মোহিতলাল 'বাংলার নবযুগে' রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব-চেতনায় ভাববাদীর প্রতিরোধ—বিশ্বমানবতার ধ্যানে বাস্তব মানুষকে উপেক্ষা।—

"কবি তাহাকে বঙ্গভারতীর পরিবর্তে বিশ্বভারতীর আদর্শে দীক্ষিত করিতেছেন; দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা-গান শুনাইতেছেন; তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত নৃত্য ও চিত্রকলার নব নবধারায় বেগসঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; সত্যকার রক্তমাংসের চেতনা স্তিমিত করিয়া অরূপ-রূপকের মিসটিক রসে তাহার মরণাহত প্রাণে সান্ত্বনা সিঞ্চন করিতেছেন। তাই মনে হয়, বাঙালীকে লইয়া বিধাতার কি পরিহাস! এত বড় প্রতিভাও জাতির পক্ষে নিষ্ফল হইল! রবীন্দ্রনাথ বাঙালার Renaissance-এর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন!"

সেই মহামৃত্যুর লগ্নেই মোহিতলাল দেখলেন একটি বিরাট অভ্যুদয়। ওই একটি মাত্র ঘটনা নৈরাশ্যপীড়িত মোহিতলালের অন্তরকে ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপ্ত করেছিল— নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ। সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত সাহস ও স্বাধীনচিত্ততা, বাস্তব-বন্ধনদশা নিবারিত করবার জন্য তাঁর অধীর আকাঙ্ক্ষা মোহিতলালের মনে ফুটিয়ে তুলেছিল সত্যকার জননায়কের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে। বাঙালী সুভাষচন্দ্রই সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ দেখালেন, মোহিতলালের সমস্ত অন্তর তাতেই সাড়া দিয়েছিল। ঊর্ধ্বচারী ভাবাদর্শ নয়, বাস্তব অভাববোধ থেকে যে পথ ও আদর্শের জন্ম, সমগ্র মানুষকে নিয়ে যখন সে পূর্ণতার স্বপ্ন দেখে

তখনই সে হয় প্রেম। এই প্রেমের দীক্ষা সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। উদাত্ত কণ্ঠে মোহিতলাল বললেন, 'হোমারের ইলিয়াড বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের 'জয়' মহাকাব্য পাঠ করার পর যদি আর একখানি মহাকাব্য তেমনি পাঠ্য হইতে পারে তবে তাহা এই নেতাজী চরিত।'

সুভাষচন্দ্রকে মোহিতলাল কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তার কিছু আভাস পাওয়া যায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্রে। দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। শ্রীঅরবিন্দের সাধনাও মোহিতলালকে আকৃষ্ট করে নি। তাঁর সম্বন্ধে মোহিতলাল লিখেছিলেন,

"যাঁহারা ধর্ম লইয়া আছেন—বড় বড় মঠ বা আশ্রমে এ জাতির জন্য অমৃত-পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা জাতি, দেশ বা কাল কোনটাকেই ভাবনার মধ্যে স্থান দেন না। কেহ বা পশুদশাপ্রাপ্ত মানুষগুলাকে না বাঁচাইয়া—বলির পশু হইবার জন্য এবং তদ্দ্বারা জগতে মহামানবধর্ম স্থাপন করিবার জন্য এক মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন; কেহ বা মানুষের এই দেহটাই একদিন—সে কত সহস্র বৎসর তাহা বলা যায় না—দেবদেহে পরিণত হইবে সেই মহতী সিদ্ধির জন্য যোগসাধনা করিতে বলিয়াছেন।"[১]

এই দ্বিতীয় উদাহরণটি শ্রীঅরবিন্দ। দিলীপকুমারও নিশ্চয় শ্রীঅরবিন্দের যোগলব্ধ সত্যে বিশ্বাসী, সেটি মোহিতলালের মতে বাস্তব-অস্বীকৃত সাধনা মাত্র। এই সাধনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রাণোৎসর্গকারী অধীর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার পার্থক্য আছে। সুভাষচন্দ্রের অগ্নিদীপ্ত আত্মবিসর্জনেই বাংলার রেনার্শাসের বাণীর সর্বশেষ মহিমা প্রকাশিত।

পত্রশিল্পী

একজন বলেছিলেন, Speech was given to man to conceal his thought. সাহিত্যের প্রসঙ্গে কথাটা অর্থহীন; কারণ প্রকাশেই সাহিত্য। মনের ভাবনা যদি প্রকাশ না পায় তবে সেটা কিসের সাহিত্য?

মনের ভাবনা অকৃত্রিম রূপে ফুটে ওঠে পত্রে। আর সব সাহিত্যশিল্পেরই নানা মাধ্যম থাকে, চরিত্র ঘটনা ছন্দ ইত্যাদি। সাহিত্যের লক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষ কেউ নয়, কিন্তু সবাই। সকলের হৃদয়গ্রাহ্য করতে গেলে বক্তব্য ও রচনাভঙ্গিকে বিশেষের

১ নদীয়া জেলা সাহিত্য-সম্মেলন সভায় সভাপতি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রদত্ত অভিভাষণ, কৃষ্ণনগর ৮ই বৈশাখ, ১২৫৮ পৃ ১৩

নয়, তাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা আছে গান্ধীর আদর্শে। মোহিতলাল বলবেন, গান্ধীর মানবধর্ম মনঃকল্পিত ভাবের ধর্ম। এজন্যে এ আদর্শ দেহকে দুর্বল করে, মনকে যতই আদর্শপূর্ণ করুক। ভারতীয় জীবনে মহাত্মার অপরিসীম প্রভাব পড়েছে। বাঙালী জাতিতে এই প্রভাবের ফল এই যে, বাঙালী তার বাস্তব জীবনসত্তাকে ভুলে গিয়ে ভাবময় আদর্শে মগ্ন হয়েছে। 'বুদ্ধ' কবিতাতেও মোহিতলাল এই ট্র্যাজেডির রসসৃষ্টি করেছেন—বুদ্ধের ভাববাদের পরিণাম কি ছিল? বাস্তব-জীবনপ্রকৃতিকে অস্বীকার করায় মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রের দারুণ বীভৎস পরিণাম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মোহিতলালের প্রতিকূলতার কারণও ছিল অনুরূপ। তাঁর বিশ্বপ্রেম মানুষের জীবনে ওপর থেকে ছায়া ফেলেছে, জীবন থেকে তার অভাব-অপূর্ণতা অশক্তি-দুর্বলতা অসৎ-অশুভকে নিয়ে সর্বান্তঃসঞ্চারী হয় নি। এই বিশ্বপ্রেমও মনঃকল্পিত আইডিয়া। মোহিতলাল 'বাংলার নবযুগে' রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব-চেতনায় ভাববাদীর প্রতিরোধ—বিশ্বমানবতার ধ্যানে বাস্তব মানুষকে উপেক্ষা।—

"কবি তাহাকে বঙ্গভারতীয় পরিবর্তে বিশ্বভারতীর আদর্শে দীক্ষিত করিতেছেন; দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা-গান শুনাইতেছেন; তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত নৃত্য ও চিত্রকলার নব নবধারায় বেগসঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; সত্যকার রক্তমাংসের চেতনা স্তিমিত করিয়া অরূপ-রূপকের মিসটিক রসে তাহার মরণাহত প্রাণে সান্ত্বনা সিঞ্চন করিতেছেন। তাই মনে হয়, বাঙালীকে লইয়া বিধাতার কি পরিহাস! এত বড় প্রতিভাও জাতির পক্ষে নিষ্ফল হইল! রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর Renaissance-এর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন!"

সেই মহামৃত্যুর লগ্নেই মোহিতলাল দেখলেন একটি বিরাট অভ্যুদয়। ওই একটি মাত্র ঘটনা নৈরাশ্যপীড়িত মোহিতলালের অন্তরকে ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপ্ত করেছিল— নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ। সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত সাহস ও স্বাধীনচিত্ততা, বাস্তব-বন্ধনদশা নিবারিত করবার জন্য তাঁর অধীর আকাঙ্ক্ষা মোহিতলালের মনে ফুটিয়ে তুলেছিল সত্যকার জননায়কের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে। বাঙালী সুভাষচন্দ্রই সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ দেখালেন, মোহিতলালের সমস্ত অন্তর তাতেই সাড়া দিয়েছিল। ঊর্ধ্বচারী ভাবাদর্শ নয়, বাস্তব অভাববোধ থেকে যে পথ ও আদর্শের জন্ম, সমগ্র মানুষকে নিয়ে যখন সে পূর্ণতার স্বপ্ন দেখে

তখনই সে হয় প্রেম। এই প্রেমের দীক্ষা সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। উদাত্ত কণ্ঠে মোহিতলাল বললেন, 'হোমারের ইলিয়াড বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের 'জয়' মহাকাব্য পাঠ করার পর যদি আর একখানি মহাকাব্য তেমনি পাঠ্য হইতে পারে তবে তাহা এই নেতাজী চরিত।'

সুভাষচন্দ্রকে মোহিতলাল কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তার কিছু আভাস পাওয়া যায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্রে। দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। শ্রীঅরবিন্দের সাধনাও মোহিতলালকে আকৃষ্ট করে নি। তাঁর সম্বন্ধে মোহিতলাল লিখেছিলেন,

"যাঁহারা ধর্ম লইয়া আছেন—বড় বড় মঠ বা আশ্রমে এ জাতির জন্য অমৃত-পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা জাতি, দেশ বা কাল কোনটাকেই ভাবনার মধ্যে স্থান দেন না। কেহ বা পশুদশাপ্রাপ্ত মানুষগুলাকে না বাঁচাইয়া—বলির পশু হইবার জন্য এবং তদ্দ্বারা জগতে মহামানবধর্ম স্থাপন করিবার জন্য এক মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন; কেহ বা মানুষের এই দেহটাই একদিন—সে কত সহস্র বৎসর তাহা বলা যায় না—দেবদেহে পরিণত হইবে সেই মহতী সিদ্ধির জন্য যোগসাধনা করিতে বলিয়াছেন।"[১]

এই দ্বিতীয় উদাহরণটি শ্রীঅরবিন্দ। দিলীপকুমারও নিশ্চয় শ্রীঅরবিন্দের যোগলব্ধ সত্যে বিশ্বাসী, সেটি মোহিতলালের মতে বাস্তব-অস্বীকৃত সাধনা মাত্র। এই সাধনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রাণোৎসর্গকারী অধীর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার পার্থক্য আছে। সুভাষচন্দ্রের অগ্নিদীপ্ত আত্মবিসর্জনেই বাংলার রেনাশাঁসের বাণীর সর্বশেষ মহিমা প্রকাশিত।

প ত্র শি ল্পী

একজন বলেছিলেন, Speech was given to man to conceal his thought. সাহিত্যের প্রসঙ্গে কথাটা অর্থহীন; কারণ প্রকাশেই সাহিত্য। মনের ভাবনা যদি প্রকাশ না পায় তবে সেটা কিসের সাহিত্য?

মনের ভাবনা অকৃত্রিম রূপে ফুটে ওঠে পত্রে। আর সব সাহিত্যশিল্পেরই নানা মাধ্যম থাকে, চরিত্র ঘটনা ছন্দ ইত্যাদি। সাহিত্যের লক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষ কেউ নয়, কিন্তু সবাই। সকলের হৃদয়গ্রাহ্য করতে গেলে বক্তব্য ও রচনাভঙ্গিকে বিশেষের

১ নদীয়া জেলা সাহিত্য-সম্মেলন সভায় সভাপতি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রদত্ত অভিভাষণ, কৃষ্ণনগর ৮ই বৈশাখ, ১২৫৮ পৃ ১৬

সীমাযুক্ত করতেই হয়। কিন্তু পত্রের উদ্দিষ্ট থাকেন একজন, লেখকের সঙ্গে তাঁর মন-দেয়া-নেয়া। তাই পত্রসাহিত্যের রস অন্য শ্রেণীর সাহিত্যের মতো নয়। এর স্বাদ হয় আলাদা। এ যেন দুজনের নিভৃত অন্তরলোকে বাইরের লোকের হঠাৎ দৃষ্টি-মেলা। লেখকের আবেগ অনুভূতি ও বাসনা যখন পত্রের ভাষায় বেজে ওঠে গানের মতো, তখনই সে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও অন্যকেও আবিষ্ট করে। কীটসের পত্রগুলি ব্যক্তিগত হয়েও এই জন্যেই আশ্চর্য সুন্দর।

কিন্তু পত্র শুধু এক রকমেরই হয় না। কখনও কখনও পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি অন্তরালে চলে গিয়ে লেখকের মনের কল্পনার আলোছায়াই পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। কুমার মনের ছায়াপটে আঁকা হয়ে যায় স্নিগ্ধ কোমল ভাবনার ছবি, লেখক হয়ে ওঠেন আত্মভাবমুখর। বিষয় হয়ে যায় গৌণ, উপলক্ষ্যের বস্তুত্ব অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে লেখকের কল্পনায় যায় হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বহন করছে রূপময় ভাবনার সাহিত্য।

মোহিতলালের পত্র এর কোনোটাতেই পড়ে না। তাঁর পত্র একান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত-চারণ নয়, আবার বস্তুগৌরবহীন অলস কল্পনার শিল্পরচনাও নয়। মোহিতলাল আর্ট সৃষ্টি করবেন বলে পত্র লেখেন নি; ভাষা বা প্রকাশভঙ্গিমার সচেতন কারুকলা কিংবা নিজের মন নিয়ে 'ভারহীন সহজের রস'-রচনা—কোনটাই তাঁর পত্রের বিশিষ্টতা নয়। মোহিতলালের পত্রে বক্তব্যই বড়ো এবং সে বক্তব্য এমন যে তার অভিধা শুধু লেখক এবং উদ্দিষ্টের মধ্যে বদ্ধ থাকে না। এইজন্যই মোহিতলালের পত্রের নৈর্ব্যক্তিকতার গুণ আছে, সাহিত্য মাত্রেরই যা উৎকর্ষের কারণ। মোহিতলালের পত্রের বিষয় মোটামুটি দুটি, সাহিত্য এবং দেশকাল। এই দুটি বিষয়েই সমালোচক ও চিন্তাশীল মোহিতলালের বক্তব্য সকলের শোনবার যোগ্য।

তা ছাড়াও রচনার সাহিত্যগুণযুক্ত হওয়ার আর-একটি কারণ থাকে—ব্যক্তিত্বের সঞ্চার। খুব সাদাসিধে ব্যবহারিক প্রয়োজনের রচনা সাহিত্য হয় না, যদি না তাতে লেখকসত্তার ব্যক্তিত্বের আভা যুক্ত হয়, একটা দৃষ্টিভঙ্গি আসে অর্থাৎ একটা অনুভূতিশীল মনের ছাপ পড়ে লেখায়। রবীন্দ্রনাথেরও এরকম পত্র আছে, জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা। কবির অন্তরের বেদনা ব্যাকুলতা উদ্বেগ আনন্দ, বন্ধুপ্রীতির স্নিগ্ধ রসে সঞ্জীবিত। এই ব্যক্তিত্বযুক্ত কাজের কথার সাহিত্যিক পত্র মাইকেল মধুসূদনের। ইংরেজিতে লেখা তাঁর চিঠি কবির কিশোরসুলভ মনের সহজ আবেগে পূর্ণ। মোহিতলালের পত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বের

প্রবল অভিব্যক্তি। এই প্রবলতায় তিনি মধুসূদনের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য দুজনের ব্যক্তিত্ব দুরকম। মোহিতলাল অধীর অসহিষ্ণু বিচারশীল স্পষ্টবাদী, সর্বোপরি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন। মধুসূদন অধীর উচ্ছ্বসিত চিন্তাহীন সরল।

মোহিতলালের পত্রের বিষয়বস্তুগত অবধানযোগ্যতা সাহিত্যের সমালোচক-দের আগ্রহের সৃষ্টি করবে। মোহিতলালের মতো সাহিত্যসমালোচকের মতামতের মূল্য আছেই। তাঁর মতামতের ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক মূল্যবিচার আলাদা ভাবে করা হয়েছে। কিন্তু সে দিক ছাড়াও মোহিতলালের পত্ররচনার স্টাইলেই ফুটে উঠেছে একটি মননশীল যুক্তিবাদী মন। কিন্তু এ যুক্তি নিরুত্তাপ নির্বিকার যুক্তি নয়। এর সঙ্গে যুক্ত প্রবল অনুভূতি (feeling)। যে যুক্তি মোহিতলাল দেন সে প্রবল আবেগে রাগরক্তিম হয়ে ওঠে। দেশজাতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রবল দেশাত্মবোধের আবেগে প্রখর অধীর অসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কবিতাকে বলেছেন পৌরুষের সৃষ্টি, পত্ররচনাতেও মোহিতলালের পৌরুষ আমাদের মতো দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়বিচলিত দুর্বলচেতা আদর্শদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাঙালী পাঠককে বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করে। তাঁর লেখায় কোন দ্বিধা নেই অনিশ্চয় ধারণা নেই। যা বিশ্বাস করেছেন সে বিশ্বাসের পর্বতকে কোনো ইন্দ্রদেবতার বজ্রপাতই টলাতে পারবে না, হোন তিনি গান্ধী হোন তিনি রবীন্দ্রনাথ। কখনও কখনও তাঁকে গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, তাঁর মন যেন একটা জায়গায় গিয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, জগতের প্রবাহ নিয়তির বিধানে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে চলে এসেছে, তিনি কিছুতেই তাকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না। হয়তো এখানেও আছে তাঁর মতবাদের স্ববিরোধিতা। জীবনের রূঢ় বাস্তবকে বরণ করে নিতে তিনি পারছেন না, কারণ তাঁর মধ্যে আদর্শবোধই প্রবল। বাঙালীর জাতিস্বভাবে যে বীজ লুকিয়েছিল আজ সেই বীজই ডাল-পালা মেলে দিয়েছে, তার ধ্বংসের সেই বিষ-বীজই আজ ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর একক দায়িত্ব কতখানি?

আসলে মোহিতলালের মধ্যে জাতিপ্রেম প্রবল। তীব্র জাতিপ্রেমই তাঁকে করেছে ভাবুক। তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাবুকতা আদর্শে স্থির, প্রেমে বলীয়ান। মোহিতলালের ভাষা অনুকরণ করে বলা যায়, প্রকৃতিই চঞ্চলা পুরুষ অচঞ্চল। তাঁর অচঞ্চল বিশ্বাস পরিবর্ত্যমান জীবনের সঙ্গে সন্ধি করে নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সব সময়েই দেখি অতৃপ্ত অসন্তুষ্ট যুধ্যমান। তিক্ততা এসেছে তাঁর ভাষায় অথচ আত্মপ্রত্যয় ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে, তাঁকে সমালোচনা করলে তিনিও রুষ্ট

সীমাযুক্ত করতেই হয়। কিন্তু পত্রের উদ্দিষ্ট থাকেন একজন, লেখকের সঙ্গে তাঁর মন-দেয়া-নেয়া। তাই পত্রসাহিত্যের রস অন্য শ্রেণীর সাহিত্যের মতো নয়। এর স্বাদ হয় আলাদা। এ যেন দুজনের নিভৃত অন্তরলোকে বাইরের লোকের হঠাৎ দৃষ্টি-মেলা। লেখকের আবেগ অনুভূতি ও বাসনা যখন পত্রের ভাষায় বেজে ওঠে গানের মতো, তখনই সে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও অন্যকেও আবিষ্ট করে। কীটসের পত্রগুলি ব্যক্তিগত হয়েও এই জন্যেই আশ্চর্য সুন্দর।

কিন্তু পত্র শুধু এক রকমেরই হয় না। কখনও কখনও পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি অন্তরালে চলে গিয়ে লেখকের মনের কল্পনার আলোছায়াই পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। কুমার মনের ছায়াপটে আঁকা হয়ে যায় স্নিগ্ধ কোমল ভাবনার ছবি, লেখক হয়ে ওঠেন আত্মভাবমুখর। বিষয় হয়ে যায় গৌণ, উপলক্ষ্যের বস্তুত্ব অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে লেখকের কল্পনায় যায় হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বহন করছে রূপময় ভাবনার সাহিত্য।

মোহিতলালের পত্র এর কোনোটাতেই পড়ে না। তাঁর পত্র একান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত-চারণ নয়, আবার বস্তুগৌরবহীন অলস কল্পনার শিল্পরচনাও নয়। মোহিতলাল আর্ট সৃষ্টি করবেন বলে পত্র লেখেন নি; ভাষা বা প্রকাশভঙ্গিমার সচেতন কারুকলা কিংবা নিজের মন নিয়ে 'ভারহীন সহজের রস'-রচনা—কোনটাই তাঁর পত্রের বিশিষ্টতা নয়। মোহিতলালের পত্রে বক্তব্যই বড়ো এবং সে বক্তব্য এমন যে তার অভিধা শুধু লেখক এবং উদ্দিষ্টের মধ্যে বদ্ধ থাকে না। এইজন্যই মোহিতলালের পত্রের নৈর্ব্যক্তিকতার গুণ আছে, সাহিত্য মাত্রেরই যা উৎকর্ষের কারণ। মোহিতলালের পত্রের বিষয় মোটামুটি দুটি, সাহিত্য এবং দেশকাল। এই দুটি বিষয়েই সমালোচক ও চিন্তাশীল মোহিতলালের বক্তব্য সকলের শোনবার যোগ্য।

তা ছাড়াও রচনার সাহিত্যগুণযুক্ত হওয়ার আর-একটি কারণ থাকে—ব্যক্তিত্বের সঞ্চার। খুব সাদাসিধে ব্যবহারিক প্রয়োজনের রচনা সাহিত্য হয় না, যদি না তাতে লেখকসত্তার ব্যক্তিত্বের আভা যুক্ত হয়, একটা দৃষ্টিভঙ্গি আসে অর্থাৎ একটা অনুভূতিশীল মনের ছাপ পড়ে লেখায়। রবীন্দ্রনাথেরও এরকম পত্র আছে, জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা। কবির অন্তরের বেদনা ব্যাকুলতা উদ্বেগ আনন্দ, বন্ধুপ্রীতির স্নিগ্ধ রসে সঞ্জীবিত। এই ব্যক্তিত্বযুক্ত কাজের কথার সাহিত্যিক পত্র মাইকেল মধুসূদনের। ইংরেজিতে লেখা তাঁর চিঠি কবির কিশোরসুলভ মনের সহজ আবেগে পূর্ণ। মোহিতলালের পত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বের

প্রবল অভিব্যক্তি। এই প্রবলতায় তিনি মধুসূদনের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য দুজনের ব্যক্তিত্ব দুরকম। মোহিতলাল অধীর অসহিষ্ণু বিচারশীল স্পষ্টবাদী, সর্বোপরি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন। মধুসূদন অধীর উচ্ছ্বসিত চিন্তাহীন সরল।

মোহিতলালের পত্রের বিষয়বস্তুগত অবধানযোগ্যতা সাহিত্যের সমালোচকদের আগ্রহের সৃষ্টি করবে। মোহিতলালের মতো সাহিত্যসমালোচকের মতামতের মূল্য আছেই। তাঁর মতামতের ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক মূল্যবিচার আলাদা ভাবে করা হয়েছে। কিন্তু সে দিক ছাড়াও মোহিতলালের পত্ররচনার স্টাইলেই ফুটে উঠেছে একটি মননশীল যুক্তিবাদী মন। কিন্তু এ যুক্তি নিরুত্তাপ নির্বিকার যুক্তি নয়। এর সঙ্গে যুক্ত প্রবল অনুভূতি (feeling)। যে যুক্তি মোহিতলাল দেন সে প্রবল আবেগে রাগরক্তিম হয়ে ওঠে। দেশজাতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রবল দেশাত্মবোধের আবেগে প্রখর অধীর অসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কবিতাকে বলেছেন পৌরুষের সৃষ্টি, পত্ররচনাতেও মোহিতলালের পৌরুষ আমাদের মতো দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়বিচলিত দুর্বলচেতা আদর্শদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাঙালী পাঠককে বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করে। তাঁর লেখায় কোন দ্বিধা নেই অনিশ্চয় ধারণা নেই। যা বিশ্বাস করেছেন সে বিশ্বাসের পর্বতকে কোনো ইন্দ্রদেবতার বজ্রপাতই টলাতে পারবে না, হোন তিনি গান্ধী হোন তিনি রবীন্দ্রনাথ। কখনও কখনও তাঁকে গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, তাঁর মন যেন একটা জায়গায় গিয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, জগতের প্রবাহ নিয়তির বিধানে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে চলে এসেছে, তিনি কিছুতেই তাকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না। হয়তো এখানেও আছে তাঁর মতবাদের স্ববিরোধিতা। জীবনের রূঢ় বাস্তবকে বরণ করে নিতে তিনি পারছেন না, কারণ তাঁর মধ্যে আদর্শবোধই প্রবল। বাঙালীর জাতিস্বভাবে যে বীজ লুকিয়েছিল আজ সেই বীজই ডাল-পালা মেলে দিয়েছে, তার ধ্বংসের সেই বিষ-বীজই আজ ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর একক দায়িত্ব কতখানি ?

আসলে মোহিতলালের মধ্যে জাতিপ্রেম প্রবল। তীব্র জাতিপ্রেমই তাঁকে করেছে ভাবুক। তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাবুকতা আদর্শে স্থির, প্রেমে বলীয়ান। মোহিতলালের ভাষা অনুকরণ করে বলা যায়, প্রকৃতিই চঞ্চলা পুরুষ অচঞ্চল। তাঁর অচঞ্চল বিশ্বাস পরিবর্ত্যমান জীবনের সঙ্গে সন্ধি করে নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সব সময়েই দেখি অতৃপ্ত অসন্তুষ্ট যুধ্যমান। তিক্ততা এসেছে তাঁর ভাষায় অথচ আত্মপ্রত্যয় ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে, তাঁকে সমালোচনা করলে তিনিও রুষ্ট

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ

Letters, such as written by wise men, are, of all the words of men, in my judgement, the best.

Francis Bacon

১. মোসলেম ভারত সম্পাদককে লিখিত

[*আগষ্ট ১৯২০]

ভাদ্র ১৩২৭

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই নিবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করিবেন।

মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনার সিদ্ধির পরিচয় আছে। নিশ্চয়ই নির্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব হইতেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন নতুবা সহসা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।

আমার অনেকদিন হইতে একটি ক্ষোভ ছিল এই, যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়নিহিত মনুষ্যত্বের স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ, যে বাণী মানবাত্মার হৃদয়-রহস্যের একমাত্র প্রকাশ পন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জনগুহাশায়ী অন্তর-দেবতা জীবনলীলার মূর্তিধারণ করেন —সেই বাক, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রসারের আদি চেষ্টা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকেই হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান-সমাজ যেন যুগধর্মবশে অবশেষে অজ্ঞাতে সেই সাধনমন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছেন, তাই আজ বোধ হইতেছে, তাঁহারা আপনাকে এবং জাতিকে এতদিনে চিনিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে সেই সত্য সুন্দর বিচিত্র

মধুর স্ব-রূপ দেখাইতে সমর্থ হইবেন। নইলে এই সাহিত্য-সাধনার মধ্যে তাঁহারা যে খাঁটি বাঙ্গালী, এই প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন কবিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল?

এইবার এক নূতন রসধারা নবজীবনের আবেগ প্রবাহে আমার এই অতি আদরের, আজন্ম-সাধনার, শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গ-সাহিত্যের অকাল প্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-হিল্লোল সঞ্চারিত করিবে। পারস্যের গোলাব-বাগিচার বুলবুল তাহার বৈতালিক হইবে, আরবের মরুপ্রান্তরে দূর মরূদ্যানের খর্জুরকুঞ্জের আড়াল দিয়া যে বৃহৎ চন্দ্রোদয় হয়, তাহার আলোকে বঙ্গভারতীর জরীন শাড়ী ঝকমক করিয়া উঠিবে। অনন্ত বালুরাশির দৈনন্দিন দহনজ্বালা, নিরুদ্দেশ মরুসমীরণের প্রদোষকালীন হাহাশ্বাস, নিশীথ আকাশের দিগন্তবিসর্পী মহামৌনী নক্ষত্রসভা জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধ মন্ত্রে বঙ্গভারতীর অর্চনারতি হইবে। একটা অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব সম্পদ, নূতন সুর-সংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছে।

পত্রিকায় প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মত সুন্দর কিছু এপর্যন্ত চোখে পড়ে নাই। যেন, সাহিত্যের যে নব সাধনায় আপনারা ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ভাবগত আদর্শকে তুলিকার সাহায্যে চক্ষুগোচর করা হইয়াছে,—কি সুসংযত সুষমা! বাণীর কি পবিত্র সুন্দর পুষ্পপীঠিকা! আমার নিবেদন, যদি সম্ভব হয়, তবে জগদ্বিখ্যাত পারস্য কারুশিল্পের (decorative art) এই জাতীয় চিত্রলিপি মুদ্রিত করিবেন; পারস্যের art-idea-র এই চাক্ষুষ বিগ্রহের সহিত বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিবার অন্য উপায় দেখি না।

মুসলমান লেখকের সমস্ত রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিলেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এককথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙ্গালার কবি-মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয়সমীরণের অভাবে ব্যজনীবীজন

চলিয়াছে। এ হেন সময়ে নূতন দিক হইতে নূতন হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গালা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-শিঞ্জন, তাহার নটিনীলাঞ্ছন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়ম-শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্য-রসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবিযশঃপ্রার্থীর ঝিল্লিস্বরে বাঙ্গালা কাব্যে অকালসন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জীবতা সূচিত হইতেছে। আপনার পত্রিকাতেও হিন্দুকবির সেই ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম তাহার দ্বারা মোসলেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গালা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যে চিত্তবিনিময় হইয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। "খেয়া পারের তরণী" শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগতভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতি-প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব—

আবুবকর উস্‌মান উমর্ আলী-হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারিগান—'লা শরীক আল্লাহ্!'

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ্'—যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে!

"বাদল প্রাতের শরাব" শীর্ষক কবিতায় ইরাণের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতেও কবির 'মস্ত্' হইবার ও 'মস্ত্' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

পরিশেষে একটি বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আচার-প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, যেগুলি না থাকিলে মুসলমান-জীবনের বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না, এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটি ভঙ্গিরূপে পরিগণিত হইবে—সেইগুলিকে আমাদের মত নিরক্ষর হিন্দু পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছুদিন) কি উপায় করিতে পারেন? নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি[১]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২. অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত
[*জুন ১৯২৩]

২৭ নং বাদুড়বাগান লেন
কলিকাতা। ৭ই আষাঢ় '৩০

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র আজ পাইলাম। আমি ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য পল্লীবাস করিতেছিলাম, কাজেই আপনার পত্রখানি এইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিবেদনে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ

করিয়াছি— সেটা একটা পাপ— তার প্রশ্রয় দিবেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে তথাকথিত সমাজে আমি একটু জোর করিয়া স্বগর্বে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসী বটে— কিন্তু যেখানে বিরলে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে চিত্তবিনিময় করি সেখানে সেই কৃত্রিম অভিমান দূর করিয়া দিই, কারণ সে ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন নাই! অতএব আপনার এই সবিনয় শ্রদ্ধা আমাকে 'খুসী' করিলেও, অন্তরে ভীতির উদ্রেক করে; কারণ আমাকে বড় করিয়া দেখিলে, শেষে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত করিয়া তোলে।

সেদিন রাত্রে আপনার সহিত যে আলাপ হইয়াছিল তাহা নিতান্তই এক-তরফা। আপনার কথা কিছুই শুনি নাই, নিজের কথাতেই মশগুল হইয়া পড়িয়াছিলাম— তাহাও যদি আপনার ন্যায় সুধী ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিয়া থাকে তবে তাহা আপনারই রসবোধ ও সহানুভূতিশক্তির প্রমাণ। আমার মনটা নানা কারণে স্বাস্থ্য হারাইয়াছে—আমি যাহা নই অনেক সময়ে, কেবলমাত্র বিরক্তি ও সত্যসুন্দরের জন্য যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিবশে তাহাকেই স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকি। বর্তমান সাহিত্যসমাজের সহিত আমি কখনো সন্ধিস্থাপন করিতে পারি নাই, বরং ক্রমশ যত দিন যাইতেছে আমি তাহার ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে অপসরণ করিতেছি— ক্রমে দেখিবেন কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার সদ্ভাব থাকিবে না, কোনো coterie আর আমাকে আসন দিবে না। সাহিত্য-সমাজে বন্ধুত্ব একটু অপূর্ব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে— Mutual Admiration Society-র মেম্বার হইতে না পারিলে আর গত্যন্তর নাই— বন্ধু কথাটির একটিমাত্র অর্থ আছে—"They are the agreeable hypocrites of life, who sustain for us the illusions in which we wish to live." এই hypocrisy আমি কখনও সহ্য করিতে পারি না—ইদানীং আরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমাকে একক বলিয়া জানিবেন—সামাজিক লোক বলিয়া মনে করিবেন না।

আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি সত্যই সুখী হইয়াছি— আপনার রসবোধ আছে, এবং ধীরচিত্তে বিচার করিবার প্রবৃত্তিও আছে। এই দুই গুণ একপাত্রে কচিৎ মিলিত হয়। আপনার প্রকৃতিতে রসপিপাসা রহিয়াছে, emotional susceptibility প্রচুর আছে অথচ আপনি সংযমী ও জিজ্ঞাসু। এইজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগিয়াছে। আপনার 'ছন্দ'-বিষয়ক প্রবন্ধটিতে আপনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। খুব দূরে থাকিবেন, অগ্নিহোত্রীর মত অতি সাবধানে আপনার প্রাণের অগ্নিভাণ্ডটিকে স্বহস্তে আহৃত সমিধ্‌ভারে

জ্বালাইয়া রাখিবেন, বাহিরের ঝড়ের মুখে ধরিবেন না— স্বকীয় দৃষ্টি ও প্রতিভা যেন বাহিরের মতবাদে মলিন না হয়। বহুর মধ্যে আপনাকে হারাইবেন না, জনশ্রুতি বা লোকপ্রসিদ্ধি যেন আপনাকে কেন্দ্রচ্যুত না করে— সত্যসুন্দরের সেবার অধিকারী হইয়া আপনি জন্মিয়াছেন বোধ হইতেছে— সে অধিকার Vanity Fair-এর আবর্তে পড়িয়া, যেন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না হয়। সদাজাগ্রত, শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। সকল সংবাদ রাখিবার চেষ্টা করিবেন— কোনো সমাজে মিশিতে উৎসুক হইবেন না। কলিকাতা হইতে দূরে আছেন— ইহাই আপনার সৌভাগ্য।

আমার সহিত পত্রব্যবহার করিলে আমি সুখী হইব— যাঁহার মধ্যে সত্যকার সাহিত্যচেতনা জাগ্রত হইয়াছে— যিনি সত্যকার সাহিত্যকে ভালবাসেন, যিনি সত্যসুন্দরকে সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ে উদারতা লাভ করিয়াছে, অথচ যাহা-কিছু ক্ষুদ্র, মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণ তাহার উপর যিনি খড়্গহস্ত তিনিই আমার বন্ধু। আমাকে ভালবাসিবার প্রয়োজন নাই, আমার ঠাকুরকে যিনি ভালবাসেন, তিনিই আমার আত্মীয়। সে রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে অতিরিক্ত স্বাধীন ব্যবহার করিয়াছি— এমন কি আমার সকল কথায় একটি আত্মম্ভরিতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্য আমি লজ্জিত— পূর্বেই বলিয়াছি, নানা কারণে আমি মনের স্বাস্থ্য হারাইয়াছি। অতিশয় অভদ্র হইয়াছি। বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি out of time, এবং বোধ হয় out of placeও বটে। "I am fallen on evil days and on evil tongue"। আমাকে কেহ বুঝিবে না, আমি বড়ই স্বতন্ত্র, বড়ই একাকী। যাহারা আমাকে ভালবাসিয়াছে এবং বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তাহারাও শেষে বুঝিতে না পারিয়া মর্মাহত হইয়াছে।

পত্র লিখিবেন— খুব লিখিবেন। কিন্তু উত্তর সকলবার যথাসময়ে পাইবেন না। কারণ আমার প্রাণের ভিতরে লিখিবার তাগিদ না হইলে আমি কিছুই লিখি না, লিখিতে পারি না। লিখিবার ইচ্ছা খুবই থাকে, কিন্তু লিখিতে বসা হইয়া ওঠে না। আবার কখনো কখনো লিখিয়া শেষ করা আর হয় না, অমনি পড়িয়া থাকে। সেইটুকু মাফ করিতে পারিলে আর কোনো গোল থাকিবে না। এবার কিছু বেশী করিয়া লিখিবেন— যাহাতে আপনার পরিচয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া পাই।

আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আশা করি ভালই আছেন।

বীরেন ভায়ার খবর অবশ্যই পাইয়াছেন? কি ছেলেমানুষ!

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩. অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত

[* আগষ্ট ১৯২৩]

২৭ বাদুড়বাগান লেন

কলিকাতা। ১৫ই শ্রাবণ '৩০

ভাই প্রবোধ বাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি— এবং পড়িয়া খুব আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনার পত্রে আপনার তরুণ হৃদয়ের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে— এই তারুণ্য যেন চিরকাল রক্ষা করিতে পারেন, এই আমার কামনা।

আমি আজকাল এত ব্যস্ত যে সাহিত্যচর্চা পরের কথা একখানা পত্র লিখিবারও সময় পাই না। এজন্য যথাসময়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখিতে পারিলাম না, আশা করি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আপনার পত্রালাপের ভূমিকা সুদীর্ঘ হইলেও অকারণ দীর্ঘ হয় নাই। প্রাণ থাকিলেই উচ্ছ্বাস অবশ্যম্ভাবী— আপনার প্রাণ সকলের কাছে মুক্ত করিতে পারেন না বলিয়াই, যেখানে আপনার বশে মুক্ত হয় সেখানে একটু অসংযম স্বাভাবিক। এই অসংযম আমার খুব বেশী। আমি কিছুই রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিতে পারি না, সৌজন্য ও লোকব্যবহারের নিয়ম আমি কখনও পালন করিতে পারি না, সেজন্য সকলের সহিত মিশিতে গিয়া অবশেষে প্রতিহত হইয়া আপনার মধ্যে আপনি রুদ্ধ হইয়া থাকি। আপনার স্বভাব আরও ভাল। আপনি সর্বত্র আপনার হৃদয় খুলিয়া বসেন না—কিন্তু যেখানে তাহা করেন, সেখানে সেইজন্যই তাহার মুল্যও অধিক হয়। আপনার এই প্রাণখোলা পত্রালাপ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে— আমার ইহাতে প্রয়োজন আছে। কারণ, আমি আমার তারুণ্য আর বেশী দিন রাখিতে পারিব বলিয়া ভরসা নাই, সমাজ ও সংসারের পেষণে আমার বালকসুলভ উচ্ছ্বাস ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছে— আপনাদের মত প্রাণবন্ত যুবকের হৃদয়ের স্পর্শ আমাকে অনেকটা সঞ্জীবিত করিবে বলিয়া আশা হয়।

আপনার জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা বহিয়াছে— সেজন্য দুঃখ করিবেন না— কারণ দুঃখবিপদ্ না ঘটিলে অনুভবশক্তি প্রখর হয় না— দেহটাকে আছড়াইয়া না লইলে আত্মার জাগরণ ঘটে না। দেহের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়, দেহ অলস বা সুখখিন্ন হইলে অন্তরাত্মার জড়তা ঘটে ; যদি ভিতরে কিছু থাকে তবে তাহাকে এইরূপে বেশ করিয়া নাড়া না দিলে সাড়া জাগে না। অধ্যয়ন মনের পুষ্টিসাধন

করে— তাহারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে সৌভাগ্যবান্ জীবনে যত অল্পবয়সে জাগ্রত দুঃখদেবতার দর্শন পাইয়াছে, সেই তত সত্যকে আত্মীয় করিতে পারিয়াছে। Blessed are they that mourn। আপনার যে সংযম ও অনুভূতির গভীরতা আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এই আঘাত সহিয়াছেন বলিয়াই লাভ করিয়াছেন, বুঝিতেছি। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সুখের কোলেও বৃদ্ধিলাভ করে বটে, কিন্তু সে কল্পনার উৎকর্ষ, intellectual refinement— প্রাণ বা হৃদয় তাহাতে পুষ্টিলাভ করে না। এই প্রাণ বা হৃদয় দেহসাহায্যে বাস্তবের সহিতে সংঘর্ষে জাগিয়া উঠে, এবং সত্যকে জানিবার ও লাভ করিবার অন্য পন্থা নাই। এই Anti-Intellectualismই আমার বর্তমান ধর্মমত। আমি এই কথাটার আলোচনায় এখন আমার সকল চিন্তা নিয়োজিত করিয়াছি। 'অলকা' মাসিকপত্রের একটি প্রবন্ধে (সত্যসুন্দরদাস নামীয়) এবং উপস্থিত 'নব্যভারতে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমি এই কথাটাই বলিতে চেষ্টা করিতেছি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেহটাকে সকল উপায়ে সকল দিকে নানা stimulusএর সাহায্যে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহারই পরিপোষকরূপে অধ্যয়নাদি করিতে হইবে। বর্তমান যুগ বিশেষ করিয়া দেহবাস্তবের যুগ, মানসবিলাসের যুগ নয়— নচিকেতা যেমন যমকে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া দেহের অন্তরালে যে সত্যপুরুষ আছেন, জীবনের রহস্যসাগরে ডুব দিয়া, তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া, প্রশ্ন করিতে হইবে। মানসিকতা একটা ব্যাধি মাত্র— ওটা প্রবল হইলে, বিদ্যা নয়, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইতে হয়; ওপথে জ্ঞানী হওয়া যায়, গুণী হওয়া যায় না; 'অহং' প্রকট হইয়া ওঠে— ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া সার্বভৌমিক চেতনা বা পরাজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। প্রাণটা বড় হওয়া চাই— যত বড় হইবে, ততই ভূমার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে। মন যত মার্জিত হইবে ততই 'অহং' বৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইবে— বাস্তব হইতে দূরে গিয়া আপনার জগতে একচ্ছত্র অধিপতি হইবে— আপনাকেই সর্বস্ব করিয়া তুলিবে —এক অর্থে সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়া উদার হইবে বটে, কিন্তু আসলে সেটা 'অহং'এর দাসত্ব বই আর কিছুই নয়— সে দাসত্ব এমন দাসত্ব যে বুঝিতেও পারিবে না কোথায় সে বদ্ধ ও অধীন হইয়া আছে। মুক্তি হয় প্রাণের প্রসারে, মনের পরিমার্জনায় নয়। দেহটাকে বেশ করিয়া খোঁচাইয়া না লইলে প্রাণশক্তি বাড়িবে না, ওই প্রাণশক্তিই সত্যদর্শনের একমাত্র উপায়। তাই বলিতেছি— পড়াশুনার ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া শোক করিবেন না। পড়াশুনা খুব করুন, কিন্তু তার চেয়ে যা বড় তার মূল্য ভুল করিবেন না।

আমাকে 'দাদা' বলিবেন তার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতেছি। এ formality আপনাকে কে শিখাইল? আমি বয়সে বড় এ হিসাবে আমার অনুজ ত হইয়া আছেন। এ অধিকার ত জন্মগত, এর জন্য ত অনুমতি চাহিতে হয় না। তবে আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করার যে কথা তাহাতে আমার দাবী নাই— যদি পরে খড়-মাটি বাহির হইয়া পড়ে সেজন্য আমাকে দায়ী করিবেন না। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তার যে সূত্র রহিয়াছে সে সূত্র দৃঢ় হইতে বেশীদিন লাগিবে না— কিন্তু যেরূপ ঘটা করিয়া আপনি সম্বন্ধ পাতাইতেছেন তাহাতে আমার ভয় হয়। আমার যেটুকু খাঁটি (যদি থাকে) সেটুকু আপনাকে দান করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিতেছে; আমার জীবন-প্রাঙ্গণে গোধূলির ছায়া যেন রেখান্বিত হইয়া উঠিতেছে, কানে যেন নিস্ফলতার বিদায়সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছি! আর কিছু দিন আগে আসিলে বোধ হয় হাতখানিতে গোপনে কিছু দিবার মত পাইতাম, আজ বসন্তশেষে কেবল শুষ্ককথার ঝরাফুল পড়িয়া আছে, তাহাতে কি তরুণের গলায় দোলাইবার মনের মতন মালা হয়? ইতি

আপনার দাদা
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪. অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত
[এপ্রিল ১৯২৪]

২৭ নং বাদুড়বাগান লেন
কলিকাতা। ১১ই এপ্রিল '২৪

প্রীতিভাজনেষু

ভাই, অনেকদিন পরে তোমার একখানা চিঠি পেয়ে বড় আহ্লাদ হল। তোমার হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম— ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি—একটু যে ক্ষুণ্ণ হইনি এমন বলতে পারিনে। কারণ, তোমার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি সংযম ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছিলাম, যাতে তুমি যে খেয়ালখুশীর খুব অধীন এমন কথা মনে হয় না— যা কর বা না কর তা যে বিশেষ বিবেচনা করেই কর, আমাদের মত উচ্ছৃঙ্খল বা উদাসীন নও এইটাই আমার বিশ্বাস। কাজেই— আমি একটু নিরাশ হয়েছিলাম। আমি নিজে

একেবারেই এ সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারিনে— অতিমাত্রায় অলস ও খেয়ালি— আমার মত bad correspondent কেউ আছে কিনা সন্দেহ, অথচ আমি এসব বিষয়ে অপরের ত্রুটি খুব লক্ষ্য করি এবং নানা রকমের যুক্তি আশ্রয় করে তবে সান্ত্বনা পাই। মুখ যেমন আয়নাতেই দেখা যায়, তেমনি বোধ হয় নিজের চরিত্রের ছায়া অপরের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হলেই চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু তোমার চরিত্র ত আমার অনুরূপ নয়, তোমার স্বভাব ধীর গভীর ও সংযত। তাই আমার একটু গোল ঠেকেছিল।

যাক্ তুমি যে কারণ উল্লেখ করেছ তা সম্পূর্ণ সম্ভব—তবে, এটাও ঠিক যে তুমি কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের সগোত্র— খুব হিসাবী নও। তাতে একটু আশ্বস্ত হলাম। কর্তব্যের বণ্টনটা প্রাণধর্মের বশে অনেক সময় শিথিল হওয়া ভালই, চিঠি লেখবার আবেগ না হলে, আকর্ষণপ্রবল না হলে অবকাশের মধ্যেও সে কাজটা হয়ে ওঠে না— আবার, অবকাশ একটুও যখন নেই, সহস্র কাজের মধ্যেও যখন ওই আগ্রহ প্রবল হয়, তখন নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না— এটা আমি খুব মানি, তোমার মধ্যেও সেই প্রাণের নিয়মটি কাজ করে থাকে এই পরিচয়ে আমি সুখী হয়েছি। পরস্পরের মধ্যে এই আত্মীয়তার পরিচয় খুব দরকার— এইটি না হলে অনেক ভুলের সৃষ্টি হয়। এখন থেকে আমার আর ভুল হবে না।

তোমার ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটি তোমার সম্বন্ধে সংবাদের মত আমাকে নিশ্চিন্ত রেখেছিল। ঐ প্রবন্ধ তোমার একটা খুব বড় কীর্তি হয়ে রইল— তুমি যশস্বী হয়েছ। আমি বড় আনন্দিত হয়েছি। প্রবন্ধ বোধ হয় শেষ হল? খুব পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় ওতে আছে। এর পর, ছন্দ ও কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কতখানি ও কিরূপ এই রকম একটা আলোচনা করলে মন্দ হয় না, 'ছন্দশাস্ত্রে'র আলোচনা বোধ হয় খুব সম্পূর্ণ রকমেরই করেছ। এখন, এই ছন্দ কবিতার কতখানি, কাব্যের আত্মার সঙ্গে এর যোগ কোথায়— ভাব ও কল্পনার সঙ্গে ছন্দের মিল— ধ্বনিরূপের সঙ্গে ভাবরূপের সামঞ্জস্য, সুকবিতার বা সত্যকার কাব্যপ্রেরণার পক্ষে উহার উপযোগিতা— ভাবের সুরের সঙ্গে, কল্পনার রূপের সঙ্গে তার organic সম্বন্ধ— কাব্যের উপাদান হিসাবে উহার মূল্য— এই রকমের একটা আলোচনা করতে পারলে খুব ভাল হয়। ছন্দ কবিতার প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু ছন্দ রচনা যদি কবিদের মুখ্য চেষ্টা হয়, তবে কাব্যকে তা কতখানি কৃত্রিম করে তোলে বা নষ্ট করে, আজকালকার কাব্য রচনায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছন্দে কবিতার বা কবির styleও অনেকটা প্রকাশ পায়, কোনো ছন্দ যদি ভাবকল্পনার অনুপযোগী

হয় তবে কবিতা যে inspired নয়, তা সহজেই ধরা পড়ে, লেখকের personality যে একটা ছল বা pose মাত্র তা বোঝা যায়। প্রত্যেক সুকবির যেমন নিজস্ব ভাষা ও expressionএর ভঙ্গি আছে, তেমনি তাঁর ছন্দবৈশিষ্ট্যও আছে। Style যেমন লেখকের স্বরূপের পরিচয় দেয়, ছন্দেও তেমনি তাঁহার ভাবকল্পনার গঠন, তাঁর প্রাণের আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়— ছন্দ একটা বাহিরের ব্যাপার নয়, ভাষার phonetic-এর সঙ্গে তার যেমন সম্বন্ধ, কবির কল্পনা ও ভাবপ্রকৃতির সঙ্গেও তার একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। আরবী ফারসী সংস্কৃত বা ইংরেজী ছন্দের অনুকরণে একটা বাইরের কসরৎ বা বাহাদুরী প্রকাশ পায়, একটি বিচিত্র ধ্বনিসৌন্দর্যও যে না ফুটে ওঠে তা নয়— কিন্তু তবু কৃত্রিমতার রেশ কানে লাগে— ভাষার নিজস্ব মাধুর্য ব্যথিত হয় বলে মনে হয়। তেমনি, যে কোন ভাব বা কল্পনা যে কোন ছন্দে সুপ্রকাশ হয় না, ভাবে ও ছন্দে বিরোধ বাধে। আবার কবির নিজস্ব ভাষা বা diction ছন্দের উপযোগী হওয়া চাই— রবীন্দ্রনাথের 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের অনেকেই অনুকরণ করে থাকেন— কিন্তু তাঁর phrasal music কেউ ধরতে পারলেন না— সেটা কবির নিজস্ব আত্মার expression—সে ত অনুকরণ করা চলে না। এই কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় কবিতার ছন্দ তার প্রসাধন মাত্র— কবির 'বাণী'ই তাঁর ভাবমূর্তির প্রকৃত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দোবন্ধের মধ্যে সেই 'বাণী' সর্বত্র সুপরিস্ফুট এবং তার সৌন্দর্য ছন্দকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই 'বাণী'র একটি বিশিষ্ট ধ্বনি আছে— phraseরচনায় একটি অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি হয়— সকল ছন্দের অতীত সেই melody প্রাণকে অজ্ঞানে আবিষ্ট করে। 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে বাইরের নৃত্যতাল ও বর্ণস্পন্দই বেশী বাজে— একটা স্থূল রকমের ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে— কিন্তু পয়ারে একটু যেন গভীরতর, যেন spiritual ঝঙ্কার শোনা যায়—প্রত্যেক শব্দ, এমন কি বর্ণবিন্যাসের মধ্যে যেন সেটা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে—একেই আমি phrasal music বলি। পয়ারের ছন্দে যেন কণ্ঠস্বরের মত একটা স্বাধীন ধ্বনিলীলা অব্যাহত থাকে— স্বরের সঙ্গে ভাবের অসীম দ্যোতনা স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে— আবিষ্ট বিহ্বল কবির অবশ স্বাধীন প্রাণের সুর— যেখানে যেমন—অবাধে প্রবাহিত হয়। এইজন্য আমার মনে হয় বাংলায় পয়ারের সুরটাই সব চেয়ে বড়— সঙ্গীতের নিগূঢ় রসমাধুর্যের medium. মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাফল্য লক্ষ্য করেছি এই কয়েকটি কৌশলে—

১. যুক্তাক্ষর ও পদান্ত হসন্ত বর্ণের সুনিপুণ সমাবেশ।

২. অনুপ্রাস, মধ্যমিল বা যমক।

৩. যতিবৈচিত্র্য।

কবি করুণানিধানের কবিতা রচনায় শুধু ছন্দ নয়, ধ্বনিমাধুর্যের দিকে বিশেষ যত্ন লক্ষ্য করেছি— এক একটি শ্লোকের মধ্যে বর্ণগুলির ধ্বনিসামঞ্জস্যের দিকেও তাঁর বিশেষ লক্ষ্য·— নহিলে তাঁর কান তৃপ্ত হয় না। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের উৎকৃষ্ট সনেটগুলির পদবিন্যাসে এই phrasal musicএর পরিচয় আছে— এই ধ্বনি কবির হৃদয়ের সঙ্গীত এবং একে ধরা যায় প্রাণকর্ণে— ছন্দের নিয়মপাশ অক্ষুণ্ণ রেখেও এর তরঙ্গলীলা উদ্বেল হয়ে উঠে। এর তুলনায় ছন্দ যেন কতকটা বহির্গত, এ যেন কাব্যের আরও অন্তর্গত। এইজন্য আমি বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের অভিনব নটিনীলীলায় মুগ্ধ হয়েও তাকে যেন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করতে পারিনি। সমুদ্রের তরঙ্গছন্দ বা বায়ুহিল্লোলের মত মুক্ত স্বাধীন সুরলহরী বাংলা পয়ারেই সম্ভব। মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ rule ও compass-এর সাহায্যে অকবিরও আয়ত্ত হতে পারে— অবশ্য তাতেও সত্যিকার প্রাণের আবেগ না থাকলে খাঁটি গানের সুর বাজবে না বটে কিন্তু পয়ারে অকবির কবিত্বচেষ্টা যত সহজে ধরা পড়ে—অপর দুই ছন্দরীতিতে বহু পরিশ্রমী কবিযশঃপ্রার্থীর কাব্যকসরৎ আভ্যাসিক সলীলতায় অনেকটা আপাতপ্রচ্ছন্ন থাকে। আধুনিক কবিকুল এই খাঁটি পয়ারকে বেশ একটু respectful distanceএ রেখে চলেন—অমিত্রাক্ষরকে বিশেষ ভয় পান। প্রতি চরণে মিল রেখে অর্থাৎ একটা life-belt আশ্রয় করে তবে তাঁরা অবাধযতি enjambementএর সঙ্কটকে বরণ করেন। আমি নিজে এই ছন্দের (syllabic) কসরৎ কিছুকিছু করেছি— সফল হয়েছি কিনা জানিনে, কিন্তু পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত (যুক্তাক্ষরমান্য) ছন্দের উপর আমার দাবী বেশী— আমার বোধ হয় এদের মধ্যে সুরের একটা দরাজ প্রসার আছে— epic, dramatic ও lyric ত্রিবিধ ভাবের প্রশ্রয় এদের মধ্যে একাধারে পাওয়া যায়। আমার "বেদুইন" ও "শেষ শয্যায় নূরজাহান" দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবমূলক কবিতা আমি একই ছন্দে রচনা করেছিলাম— কিন্তু ঐ একই ছন্দে দুইএর ভাবগত সুরের বৈশিষ্ট্য আমি বজায় রাখতে পেরেছি বলে বোধ হয়। যুক্তাক্ষর জন্য মাত্রাগৌরব, হসন্তের দ্রুতগতি, স্বরান্তের বিলম্বিত ভঙ্গি এবং যতিনৈকট্যের জন্য পদের আরম্ভে accent— এ সকলের সুযোগে ভাব অর্থের অনুযায়ী সুর বা ধ্বনিসঙ্গতি অব্যাহত আছে বলে মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের "কবর-ই-নূরজাহান" পড়ে দেখো— একঘেয়ে, mechanical হয়ে গেছে কিনা ? আমার যেন মনে হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অক্ষরবৃত্তের খুব নিকটাত্মীয় হলেও স্বরবৃত্তের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করা যায়। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত লিখো।

আমি প্রবন্ধ লিখছি না, চিঠি লিখছি—যেমন মনে এল যা তা লিখলাম—তোমার মত ছন্দবিদের কাছে হয়ত হাস্যাস্পদ হব। সত্যি তোমার ছন্দশাস্ত্র রচনা খুব বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে—এটা তোমার একটা কীর্তি হয়ে রইল। এর পর কি সম্বন্ধে লিখবে স্থির করেছ? [২১ শে এপ্রিল]

তারপর, আমার নূতন কবিতা খুব ভাল লেগেছে আর সেই ভাল লাগার আবেগে আমাকে পত্র না লিখে থাকতে পার নি? এতে আমি সত্যই খুব গর্ব ও কৌতুক অনুভব করেছি। মানুষ হিসাবে আমাকে ভুলে থাকা যায়. কিন্তু কবিতার প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না—সত্যকার সাহিত্যপ্রাণ হলে ওটুকু বশ্যতা স্বীকার করতে হবেই। কবিতা ভালই হোক আর মন্দই হোক, কেউ পড়ে না। ও জিনিষটার সমঝদার আজকাল আমাদের দেশে খুব কম আছে বলেই মনে হয়, অন্ততঃ কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আমি বিশেষ সাড়া পাইনে। লিখি খুব কম —ছাপাতে বিশেষ উৎসাহ নেই। যে শ্রেণীর পাঠক ও যে শ্রেণীর সাহিত্য আজকাল সুলভ ও সুপরিচিত—তাদের মধ্যে আমার স্থান নেই—এটা আমি খুব স্পষ্ট বুঝি, এজন্যে আমি কোনও গোলমাল করতেও চাই নে। তবে আমার পক্ষে এই ক্ষতি হয়েছে যে, সাহিত্যকে আমি একান্ত করে বরণ করতে পারি নি, কতকটা দূরে রেখেছি। ওটা আমার খেয়াল হয়েই রইল, ব্রত হতে পারল না। একটা খেলার বস্তু! উপাসনার বা যজ্ঞানুষ্ঠানের মত নয়! কারণ আমি অধুনাতন সাহিত্যবুদ্ধির সঙ্গে আপন রুচি ও আদর্শের মিল খুঁজে পাইনি। উপেক্ষা অনাদর বিদ্বেষ বিরোধের মধ্যে চিত্তের স্ফূর্তি হয় না। তন্দ্রাবস্থায় মাঝে মাঝে একটা উত্থানের উদ্যম করি তার পর আবার তন্দ্রা ও অবসাদ। আমি popular হতে পারলাম না, পারবও না। আজকালকার দিনে popularityই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রমাণ। তবু তোমাদের মত গুটিকয়েক সহৃদয় রসিক বন্ধু ও পাঠকের আনন্দ নিবেদনে আমার একটু উৎসাহ হয় বটে—একটু নিজের উপর আস্থা হয়—নইলে এতদিনে বোধ হয় লেখার চেষ্টা একেবারেই ছেড়ে দিতাম। মনের ভিতর অনেক কল্পনা ছিল—কিন্তু দেশকালের প্রভাবে ফুটল না—আমি একালের লোক নই, আর একটু আগে বা আর একটু পরে হলে বোধ হয় দাঁড়াতে পারতাম।

"নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর" কবিতাটি আমার পূর্বলিখিত "শেষশয্যায় নূরজাহান" কবিতার companion piece। দুটা কবিতা এক সঙ্গে পড়লে এই কবিতার বিশেষত্ব আরো বেশী করে ফুটে উঠবে বোধ হয়—সেটা ছিল Reflective Lyrical—এটা হয়েছে Dramatic passionate—এটাতে আমি খুব popular

হবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এর appeal ব্যর্থ হবে না—তাই হয়েছে কি? কোনো Philosophyর লেশ মাত্র নেই। বেশী thought এর বালাই নেই। Situation, characterisation ও passion খুব যথাযথ হয়েছে ত? ভাষায় কি অতিমাত্র Persianism দোষ ঘটেছে; আমি জ্বর থেকে উঠে খুব দুর্বল দেহে, হঠাৎ আবেগের বশে (বহুদিনের কল্পিত) ওটাকে প্রায় এক ঝোঁকে শেষ করি। তবু শেষ দিকটা বার বার revise করতে হয়েছিল—বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি শীতের সময় লিখি—শীত ফুরিয়ে গেলে আর লেখা হয় না। আবার আগামী শীতে যদি কিছু হয়। অনেক বিষয় মাথার মধ্যে আছে। এখন বোধ হয় সত্যসুন্দর দাস নামক ব্যক্তিটি কিছু লিখবার চেষ্টা করবেন।

আমি বড় ব্যস্ত এবং ততোধিক অলস আছি। চিঠি আরম্ভ করি দেরীতে, শেষ হতে প্রায় দশ বারো দিন লাগল। আশা করি এর জন্যে তুমি দোষ দেবে না। আমি এখন কলকাতাতেই আছি—ছুটি হবে ২।৩ রা মে, তার পরেও থাকব, মাঝে মাঝে বাড়ী যাব।

পরীক্ষা কেমন হল? বিষয় কি কি ছিল? কবে কলকাতায় আসছ? আশা করি তোমার ও বাড়ীর সকলের কুশল। বীরেনের সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। ভালো আছে। আমার ভালোবাসা লও—ওই সঙ্গে শ্রদ্ধাও জানাই। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯২৯]

৩৮ নীলক্ষেত রোড
রমনা। ঢাকা
৮. ১০. ২৯.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা পাইয়া সুখী হইলাম। অতিশয় ব্যস্ত থাকায় পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল; এখন একটু অবসর হইয়াছে তাই যত চিঠির উত্তর বাকী ছিল, একে একে দিতে বসিয়াছি; ৬।৭ খানির জবাব দিয়াছি এখনও ৩।৪ খানি বাকী। অতএব, আপনার একারই ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।

আপনার হস্তাক্ষরে এবং কথাগুলিতে একটা পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিলাম—পত্র লেখার মধ্যে একটা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় আছে। আর একটি মজার কথা এই যে আপনার হস্তাক্ষর ও পত্র লিখিবার ভঙ্গী অবিকল হেম বাগচির মত বোধ হইল; আমার মনে হয়, আপনাদের মধ্যে কোথাও একটা spiritual affinity আছে। আপনার সঙ্গে সেদিন আলাপ করিয়া বড় প্রীতিলাভ করিয়াছি। মনে রাখিবেন, লেখার তুলনায় পড়া যেন অন্ততঃ দশগুণ হয়। পড়ার মধ্যেও মনের স্বাধীন বিচরণ চাই—মনের পুষ্টির জন্যই পড়া, মনকে শাসন করিবার জন্য নয়। অর্থাৎ নিজের সহজ সংস্কার বা বিশিষ্ট প্রেরণা যেন বাধা না পায়।

আপনার কবিতা আবার পড়িলাম—ভাষা ও ছন্দ খুব পরিচ্ছন্ন—তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয়, আপনি এযুগের চলিত কাব্যরীতিটি ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, receptivity বা রসবোধ আপনার আছে। আপনি আধুনিক লেখক সমাজে বসিবার উপযুক্ত হইয়াছেন; আপনার যে বয়স তাহাতে ইহাই যথেষ্ট মনে করি। এখন আপনাকে চলিতরীতি ত্যাগ করিতে বলি না। কেবল ইহাই স্মরণ রাখিতে বলি যে, কবি হইতে হইলে কোনও চলিত রীতি, যত ভালই হোক্, যতক্ষণ ছাড়াইয়া উঠিয়া আপনার নিজস্ব রীতি ভাষায় ছন্দ সুর না ফুটিয়া উঠিতেছে, ততদিন আপনার কবি ব্যক্তিটি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। * * * উপস্থিত এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে রসবোধ ও receptivity আপনার আছে, অর্থাৎ বাণীকে চিনিবার ও তাহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইবার gift আপনার আছে। Expression যত পরিচ্ছন্ন ও নির্দোষ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, মৌলিকতার জন্য বিশেষ তাড়া নাই—সেটা যথাসময়ে আপনিই আসিবে।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি, কুশলে আছেন। আবার পত্র পাইলে এবং আপনার প্রয়োজন বুঝিলে এসম্বন্ধে আলোচনা করিব।···খুব নূতন লেখা থাকিলে পাঠাইবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯২৯]

৩৮ নীলক্ষেত রোড
রমনা। ঢাকা
১ কার্তিক ১৩৩৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা 'মহাকাল' পাইলাম। কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য ফুটিয়াছ। Stanza-র শেষ ছত্রটি ভালো হইয়াছে। 'মৌনতা' ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ 'উৎকর্ষতার' মত। আশা হয়, আপনি কাব্য-সাধনায় ব্রতী হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। আপনার কল্পনার ambition আছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আপনার হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ ও সচেতন হইবে, ততই আপনার কবিতার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। Diction ও technique সম্বন্ধে আপনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

'সাহিত্য ও জীবন' সম্বন্ধে আপনি যে কথা বলিতে চান তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তবে কথাটা খুব গভীর—এ সমস্যা সম্যক্‌রূপে সমাধান করিতে হইলে নিখিল কাব্যকলা এবং যুগে যুগে তাহার বিচিত্র বিকাশের সন্ধান করিতে হইবে—Nature ও Art, Life ও Poetry, Particular ও Universal, Abstract ও Concrete—এইরূপে যত দ্বন্দ্ব মানুষের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উভয়ের সমন্বয়মূলক একটি তত্ত্ব বুঝিয়া বুঝাইতে হইবে। Subjective ও Objective—Real ও Ideal এর দ্বন্দ্ব কেমন করিয়া রসসৃষ্টিতে মিলাইয়া যায়—Fact ও Truth—Perception ও Imagination—এ দুইয়ের কোন্‌টা বড় এবং কেন? সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ কি? কাব্যসৃষ্টিতে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, রস চেতনায় সে সত্যের মুল্য কি? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব জীবন ও জগৎকে যেভাবে উপস্থিত করে, কাব্য হইতে তাহা স্বতন্ত্র, ইহা কাব্যের গৌরব না অগৌরব? জীবন ও জগৎ-রহস্যের চরম উপলব্ধি কাব্যেই সম্ভব। অতএব উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ কি? কাব্য জীবনেরই নিগূঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, জীবনের সঙ্গে কাব্যের এই সম্বন্ধ কোন্‌খানে? কাহাকে জীবনধর্ম বলে—কবিকল্পনা এই জীবনধর্মের অনুসরণ করে কোন্ অর্থে ও কিভাবে? সৌন্দর্য ও সত্য—এই দুই তত্ত্বের সমন্বয় হয় কাব্যে।

Imagintion নামক কবির যে দৈবীশক্তি তাহার authenticity কোথায়?—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মীমাংসাদ্বারা সাহিত্য ও জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থির করা দরকার। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বহু চিন্তা ও মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে—বড় বড় কবি ও সমালোচক এই দুরূহ সমস্যার নানারূপ মীমাংসা করিয়াছেন, আধুনিক য়ুরোপে এবিষয়ে অতি অপূর্ব আলোচনা চলিয়াছে। আপনি 'শনিবারের চিঠি'তে (গতবৎসরের সকল সংখ্যা—ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) এ বিষয়ে বহু আলোচনা দেখিতে পাইবেন; বিশেষ করিয়া কাব্য ও জীবন নামক দুই সংখ্যায় সমাপ্ত যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইটি আপনাকে পড়িয়া দেখিতে বলি। এ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকায় 'আলোচনা' বিভাগে তর্কবিতর্কও আছে।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন লইবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[মার্চ ১৯৩০]

৩৮ নীলক্ষেত রোড
রমনা। ঢাকা
১. ৩. ১৯৩০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মাঝে মাঝে এরূপ পত্র পাইলে আনন্দিত হইব জানিবেন। আশা করি, আপনি সপরিবারে ও সবান্ধবে কুশলে আছেন।

আপনি রবিবাবুর 'পরশ পাথর' কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি ইহার পক্ষপাতী নয়। এইরূপ ব্যাখ্যাপদ্ধতিই আমার মতে সমীচীন নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বিশেষতঃ 'ভগবানের' অবতারণা করা উচিত নয়। আবার সর্বত্রই 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'র বিরুদ্ধে protest অন্বেষণ করার চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত নয়। এইরূপ ব্যাখ্যাপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যমন্ত্র

তাঁহার যৌবনের কাব্যসাধনাতেও আবিষ্কার করার এই প্রবৃত্তি আজকাল একটু প্রবল হইয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকেই খর্ব করা হয়।

'পরশ পাথর' কবিতাটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ হইবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না—তবে যাঁহারা 'পসারিণী' কবিতারও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। 'ক্ষ্যাপা' চরিত্রটিই এই কবিতার মূল প্রেরণা, 'পরশপাথর' বস্তুটি কি তাহার নির্ণয় নির্ভর করিবে এই 'ক্ষ্যাপা' চরিত্রটির সম্যক ধারণায়। ক্ষ্যাপার প্রতি কবির যে বিপুল শ্রদ্ধার ভাব ঐ কবিতাটিতে আবেগ সঞ্চার করিয়াছে তাহাই পাঠককে এ বিষয়ে নিঃসংশয় করিয়া দেয়। 'ক্ষ্যাপা' নামটির মধ্যেই এমন একটি নিন্দাচ্ছলে স্তুতির ব্যঞ্জনা আছে যে ওই একটি শব্দের দ্বারাই তাহার প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষ্যাপা সেই মানুষ যে মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়—যে মানুষ তাহার দীনতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সম্পদ তুচ্ছ করিয়া—দুর্লভের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে—এইরূপ Idealist Dreamer যাহারা তাহারাই জগৎ সৃষ্টির রহস্যভেদ করিতে গিয়া ব্যর্থ জীবনের মহিমায় নর-চরিত্র মহীয়ান করিয়া তোলে। সাধারণ জীবন-যাত্রার সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিসম্মত সুসাধ্য সাধনা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না—সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই এক বস্তুর সন্ধানে এক জীবনে বিফল হইয়াও তাহারা আর এক জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পরশপাথর লাভ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নয়—এ সন্ধান ভক্তিবিশ্বাসের সাধনা নয়—ইহা মানুষের জ্ঞানপিপাসার চরমতম সন্ধান। মানুষ ভগবানের দাস নয় দোসর হইতে চায়—সৃষ্টিরহস্যের মূলে যে একটিমাত্র তত্ত্ব আছে যাহাকে আবিষ্কার করিতে পারিলে সদসৎ অভিমান আর থাকে না, জ্ঞানের যে অবস্থায় সৃষ্টির এই বহু বৈচিত্র্য ও বিরোধ নিমেষে লয় পায়, সর্ব বস্তু সৎ-রূপে উদ্ভাসিত হয় মৃত্যু ও অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়—লোহাও সোনা হইয়া যায়—সেই মহাজ্ঞানের পরশমণির সন্ধান মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া নানা পন্থায় নানা সাধনায় করিয়া আসিতেছে আজ তাহাই বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান-পন্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বস্তুকে 'ভগবান' বলিলে মানুষের জ্ঞান নয়—বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যভেদের পুরুষকার প্রকৃতি নয়—বাস্তবজগতের প্রতি উদাসীন একটা অন্ধ আধ্যাত্মিক সাধনার প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া অথবা ভক্তি-প্রেমের সরল বিশ্বাসে সাংসারিক জীবনযাত্রাকেই নিশ্চিন্ত সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া অলস আত্মপ্রসাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় এই

জীবনযাপনের আদর্শকে মহিমান্বিত করার বহু প্রমাণ থাকিলেও এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই শক্তিসাধনা—এই একক আত্ম-প্রত্যয়ের পুরুষকারকে, তাহার সর্বত্যাগী একনিষ্ঠ সংকল্পকে নিদারুণ ব্যর্থতার গৌরবেই গৌরবান্বিত করিয়া নমস্কার করিয়াছেন। বিশ্বাস অটল, সংকল্পও অটল—তথাপি মানুষের শক্তির সীমা আছে, তাই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আসনে বসিয়াও সাধক তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তন্দ্রা ভঙ্গে দেখিতে পায় 'ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা'। এত বড় tragedy-র মধ্যেও সে আশা ত্যাগ করে না বরং যেন মনে হয়, যাহার সম্বন্ধে সে বিশ্বাস হারাইতেছিল হয়ত সে বস্তু নাই, তাহাকে পাইবার কল্পনাও বৃথা বলিয়া মনে হইতেছিল, সেই বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে যেন আশ্বস্ত হইল—এ জীবনে হয়ত আর সময় নাই, সে বোধ হয় নিজে আর তাহাকে পাইবে না, কিন্তু তাহার প্রমাণ রাখিয়া যাইতে পারিল। সোনার শিকল তাহার সাক্ষী। 'গ্রামবাসী ছেলে' (average, অল্পবুদ্ধি কল্পনাহীন মানুষ) আর তাহাকে উপহাস করিতে পারিবে না—লোহা সোনা হইয়াছে দেখিয়া তাহারা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়াছে। এ সাধনা বৈরাগ্য সাধনা নয়, মানুষের পরম কল্যাণের পরম সম্মানের সন্ধান। এ সন্ধানের এখনও শেষ হয় নাই, হইবে কিনা কে জানে? কিন্তু এই সন্ধানে যুগে যুগে যে সকল যোগী সাধক বিজ্ঞানপন্থী আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত অভিজ্ঞান মানব জাতিকে পুরুষানুক্রমে দান করিয়া যাইতেছেন, তাহার মূল্য অল্প নহে—প্রকৃতির সেই মুখাবগুণ্ঠন যতটুকু সে অপসারিত করিতে পারিয়াছে, এবং জ্ঞানে-শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জীবনযুদ্ধে দেহে ও মনে জয়ী হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষ এই সকল ক্ষ্যাপারই নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় এইরূপ মহাপুরুষের জীবনের tragedyর দিকটা বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই grand attempt ও grand failure-এর মহিমাতেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই জন্যই আমার মতে এই কবিতার সর্বপ্রধান বিষয় বা কাব্য সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা পরশপাথরও নয়, অন্য কোনও incidentও নয় ওই পরশপাথর ও incident গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি এক ধরণের মহান চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কবিতাটির রচনা ভঙ্গীতে 'ক্ষ্যাপার' প্রতি যে কটাক্ষের ভাণ করিয়াছেন তাহাতে রস আরও উচ্ছল হইয়াছে, ইহাই উৎকৃষ্ট আর্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'ক্ষ্যাপা' চরিত্রের মহিমা স্থানে স্থানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র মন্থনের কাহিনী ক্ষ্যাপার সাধনাকে একটা বিরাটত্ব দান করিয়াছে এবং পরিশেষে যে সকরুণ উপসংহার অংশটি রহিয়াছে তাহাতে, এই ব্যাপারে কবির

প্রাণের attitude অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয় পরশপাথরের ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ নাই—এ কবিতায় কোনও অস্পষ্টতা নাই, ইহার রূপক কল্পনায় কবি কোনও গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবনার বশবর্তী হ'ন নাই; এই জন্যই এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা।

আজ এই পর্যন্ত। আপনার যখন যাহা প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করিলে যতদূর সাধ্য সমাধানে সাহায্য করিব। আমার প্রীতি নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[* জুন ১৯৩৩]

নীল ক্ষেত

ঢাকা। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

প্রীতিভাজনেষু,

কার্ড পাইলাম। বিশেষ ব্যস্ত আছি তবু কাপির পরিবর্তে দীর্ঘ পত্র ত লিখিতেছি। আমি কাল একবার মৈমনসিংহে যাইতেছি, সেখানে বাৎসরিক রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে আমাকে পৌরোহিত্য করিতে হইবে। এজন্য ব্যস্ত আছি। কবিতাটি আজই পাঠাইতে পারিলাম না। কারণ কাপি করিতে সময় লাগিবে। একটু বিশেষ বড় হইয়াছে।

আরও কারণ, আপনাকে তৎপূর্বে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় উচিত, যে এবারে এরূপ দীর্ঘ কবিতার স্থান সঙ্কুলান হইবে কিনা। কবিতাটির পরিমাণ ২০ stanza, প্রত্যেক stanza ৮ লাইন করিয়া। এমাসে যাইবে কি? আপনি তাহা জানাইবেন। আমি মৈমনসিংহ হইতে ফিরিয়াই উহা কাপি করিয়া পাঠাইব।

আপনার পত্রে এবং পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে যে একটি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বড়ই কৌতুকবোধ করিয়াছি। আপনাকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, সে সম্পর্কে শনিবারের চিঠির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল; কারণ 'শনিবারের চিঠি'—'অভ্যুদয়' অথবা 'বঙ্গশ্রী', পর্যায়ের কাগজ নহে—তাহার মধ্যে যে আদর্শ, সঙ্কল্প ও পদ্ধতি ছিল, তাহা সকলের সমর্থন না পাইতে পারে—এবং তাহারই নিজের আদর্শ অনুসারে ত্রুটিবিচ্যুতিও থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার তুলনা সে-ই—দোষে-গুণে, ক্ষমতায় অক্ষমতায়, এমন কি অভদ্রতায় তাহার যে একটা

character আছে, তাহা সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু সে যাহা, তাহা না হইয়া অন্য কিছু হইল না কেন, এবং সাহিত্যের উচ্চতর (বা আমাদের ভদ্র সমাজ সম্মত) আদর্শ সে কেন পালন করে নাই—এমন তর্ক বা অনুযোগ বিফল। আমি 'চিঠি'র সর্ববিধ প্রকৃতির সমর্থন করিতেছি না—কিন্তু সাধারণ সাহিত্য পত্রিকার আদর্শে 'চিঠি'র সমালোচনা চলিতে পারে না—ইহাই আমার বক্তব্য। ইহাও বলিয়া রাখি, একই প্রসঙ্গে 'চিঠি'তে যাহা যে ভঙ্গীতে লিখিব, অন্যত্র সেরূপ লিখিব না।

'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ? না চিত্রাঙ্গদার আলোচনাটুকুই পড়িয়াছেন! সমগ্র প্রবন্ধটি একটু মনোযোগ সহকারে পড়িয়া লেখকের মূল প্রতিপাদ্যটি বুঝিয়া না লইলে অংশবিশেষের প্রতিবাদ মূল্যহীন হইবে। লেখক যে সাহিত্য নীতিকে উক্ত প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন সেই নীতিকে অস্বীকার করার কারণ দেখাইতে হইবে, তাহা না করিলে অন্য কোনও দিক দিয়া প্রতিবাদ করিলে, সে প্রতিবাদ উহাকে স্পর্শ করিবে না—অন্যদিক দিয়া একটা স্বতন্ত্র আলোচনা মাত্র হইবে, তাহার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য—কিছুই থাকিবে না। একথাও জানাইয়া রাখি উক্ত প্রবন্ধে আমি চিত্রাঙ্গদার যে আলোচনা করিয়াছি তাহা অতিশয় প্রাসঙ্গিক ভাবে, সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার অবকাশ তাহাতে ছিল না। যদি আবশ্যক হয় পরে চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিব। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত আমিও কম নহি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়েও যিনি বড়—নিখিল কাব্য-দেবতা—তাঁহার পূজা আগে না করিয়া রবীন্দ্রনাথের পূজা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তের অভাব নাই—সাহিত্যক্ষেত্র তাহারাই ভরিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র আমি এই অন্ধভক্তির প্লাবন রোধ করিয়া সাহিত্যের বৃহত্তর গতি অবাধ অব্যাহত রাখিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক তাহার বিচার করিবে। সাহিত্যকে লইয়া আর যাহাই করিয়া থাকি প্রতিপত্তির উপায় স্বরূপ তাহাকে ব্যবহার করি নাই—নাম, পয়সা বা সাহিত্যিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া এ যাবৎ দাঁড়াইয়া আছি, তাহার জন্য বহু নিগ্রহ, বহু অপবাদ ও বন্ধু বিচ্ছেদ অকাতরে সহ্য করিয়াছি—বড়র তোষামোদ করি নাই, বরং অযাচিত আদর উপেক্ষা করিয়া অসন্তোষভাজন হইয়াছি। তাহাতে নিজেদের সামাজিক সুখসুবিধা বিসর্জন দিতে হইয়াছে—সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি। সাহিত্যিক জীবনে আমি যে সত্যের সাধনা করিয়াছি তাহার শক্তিই আমাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, নিন্দা-প্রশংসা আমাকে বিচলিত করিবে না।

উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা যত হয় ততই ভালো—যত প্রতিবাদ হয় ততই খুসী হইবার কারণ আছে। তাছাড়া আমার সত্য আমারই—সকলে সেই সত্য গ্রহণ করিবে এমন আশা করিবার মত নির্বোধ আমি নহি। এবং ইহাও জানি ঐ প্রবন্ধ অনেকের পক্ষে গুরুপাক হইবে। তাই গত সংখ্যার 'অভ্যুদয়' মাসিক সমালোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের উপর যে মন্তব্য দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত হইলাম —বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় ইহার বেশী যে আশা করা বাতুলতা, তাহা আমার মত আর কে জানে? কম দুঃখে 'শনিবারের চিঠি' কে আশ্রয় করিয়াছি! পরকে আক্রমণ করিতে এতটুকু আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান নাই, লজ্জা বলিয়া কিছুই নাই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির শোচনীয় অভাব প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তার কারণ কি এই নয় যে, লেখক মনে করেন— বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধির যা দৌড় তাহাতে কাহারও নিকটে কাহারও লজ্জা করিবার আবশ্যকতা নাই। যদি কোনও প্রবন্ধ বিশেষ চিন্তাপূর্ণ হয় তবে, সেই কারণেই তাহা অপাঠ্য হইয়াছে, কেহ তাহাকে পড়িবার বুঝিবার পরিশ্রমও করিবে না। সে ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে চিন্তাহীন মন্তব্য সম্পূর্ণ নিরাপদ, বরং এই চিন্তাহীনতার গড্ডলিকা প্রবাহের অনুকূল বলিয়া এরূপ সমালোচনা বড়ই উপাদেয়। আশা করি উক্ত সমালোচনা আপনার নহে। এ সকল কথা লিখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না তথাপি লিখিলাম এই জন্য যে—দেখিতেছি মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে কাহারও conscience বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু উহার অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশেষের বিরুদ্ধে সমালোচনা conscienceকে অতিমাত্রায় আঘাত করিয়াছে, রীতিমত প্রতিবাদ লেখার প্রয়োজন হইয়াছে— পরম নিশ্চিন্তভাবে যা'তা মন্তব্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মূল প্রবন্ধের আলোচনা সাহিত্যের একটি গূঢ় গভীর সমস্যা লইয়া—তাহাতে লেখকের সহিত একমত হইতে না পারিলেও, সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা শ্রদ্ধার সহিত অ লোচনার যোগ্য। কিন্তু যেহেতু 'সাহিত্য' শ্রদ্ধার বস্তু নয়, কারণ সে ত 'ব্যক্তি' নয়—'রবীন্দ্রনাথ' নয়—কাজেই—তাহাকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে আর স্থির থাকা সম্ভব নয়! কথাটি ঠিক কিনা? হায় সাহিত্য, হায় সাহিত্য-সেবা!

কথাগুলো একটু রূঢ় হইল, সেজন্য আপনি আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখি নাই—আপনি উপলক্ষ্য মাত্র। বাদ-প্রতিবাদে আর আস্থা নাই—সাহিত্যের আদর্শ লইয়া আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্মবিশ্বাস মত অনেক লিখিয়াছি; এক্ষণে মনে করিতেছি ও দুষ্কর্ম আর করিব না। আপনি-

নিশ্চিন্ত থাকুন—সাহিত্য চর্চা হইতে অবসর লইবার সংকল্প করিয়াছি, বোধ হয় সে সংকল্প রক্ষা করিতে পারিব। না পারিলেও, আর বেশীদিন এ ভোগ ভুগিতে হইবে না—তাহা বুঝিতেছি।

আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যাযকে লিখিত

[জুন ১৯৩৩]

ঢাকা

১১.৬.৩৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। অকপট মনোভাব ব্যক্ত করায় অতিশয় আনন্দ পাইলাম। ইহাইত চাই! আমার কবিতাটি [১০] সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় সহজ সত্য—আমি ভাবিয়াছিলাম—উহার নাম দিব—পদ্য-নিবন্ধ! কিন্তু আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য নয়—মতবাদমূলক হইলেও এবং যুক্তির ভঙ্গী থাকিলেও মোটের উপর উহাতে আবেগ আছে—এবং কাব্যের আদর্শ বা মতবাদ লইয়া কবিরা যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা রচনা হিসাবে নিষ্ফল হয় নাই। আমার কবিতা সেইরূপ রচনার মধ্যে গণ্য হইতে পাবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না—আশা করিতে পারি এই পর্যন্ত। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা গদ্যে বলিলে সমান effective হইয়াছে কিনা ইহাই বিচার্য। তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে উহা নিষ্ফল হইয়াছে।

আমার প্রীতিপূণ নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।

স্নেহধন্য

শ্রীমোহিতলাল

১০. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[জুন ১৯৩৩]

ঢাকা

১৭.৬.৩৩

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই সাবিত্রীবাবু, জ্যৈষ্ঠের 'অভ্যুদয়' যথাসময়ে পাইয়াছি। আমার কবিতা [১১] যে স্থানে যে ভাবে ছাপাইয়াছেন তাহাতে প্রীত হইয়াছি—তবে পাঠকগণ কতটা প্রীত হইবে তাহা জানি না, সে দায়িত্ব আপনার। কারণ কবিতাটি—দ্রাক্ষারস বা পুষ্পমধু নয়—বরং অতি কঠিন ইক্ষুদণ্ড বটে; রস যদি কিঞ্চিৎ থাকে তাহাও লবণাক্ত। ছাপার দোষে স্থানে স্থানে কীট-বিকৃতও বটে। তথাপি আপনার যত্ন ও শ্রদ্ধার পরিচয় যথেষ্ট পাইলাম।

'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য পাঠ করিলাম। লেখক কে [১২] তাহা আমি জানি—আমি জানি—আপনি নহেন ইহা নিশ্চিত। উপাসনাতেও আপনার বেনামীতে এই রকম সমালোচনা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। লেখার যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'Open mind' তাহা লইয়া লেখক আলোচনা করেন নাই—অহি-নকুল সম্ভাবের মত একটা ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে ওকালতির ঝাঁঝটুকু বাদ দিলে বাকি অংশে যুক্তি ও ভাবুকতার প্রমাণ আছে। আমার মতের বিরুদ্ধ মত যে আছে এবং সে মতকে প্রবলতর ও নিপুণতর যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা আমি ভালরূপে জানি; এমনকি তর্কশক্তির পরিচয়-স্বরূপ আমিই আমার এই মতবাদের বিরুদ্ধে লিখিতে পারি—কিন্তু তর্কের বাহাদুরী ও প্রতীতি, এই দুই ত এক নহে; নিজ মোকদ্দমা মিথ্যা জানিয়াও সু-তার্কিক উকীল যুক্তি প্রমাণের ভেল্‌কীর দ্বারা জয়লাভ করিয়া থাকে। তথাপি সুপণ্ডিত রসিক সমাজে এইরূপ বাদ প্রতিবাদের মূল্য আছে। দুই বিরুদ্ধ মতের সঙ্ঘর্ষে যে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাই সত্য কিন্তু সেই স্ফুলিঙ্গ দর্শন করিবার শক্তি সকলের নাই—বিশেষতঃ আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য সমাজে ইহাই নিরাশার কারণ।

উক্ত সমালোচনার প্রারম্ভে আমার প্রতি আমারই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে বিদ্রূপ-চেষ্টা আছে, তজ্জন্য লেখকের প্রতি রোষ না হইয়া অনুকম্পা

হওয়াই উচিত। অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক উক্তির মধ্যেও কথার ছল ধরিয়া যাহারা যষ্ঠি উত্তোলন করে, তাহারা আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। যদি ইহা 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে গাত্রদাহের প্রকাশ হয়—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে 'অভ্যুদয়' 'শনিবারের চিঠি'র সগোত্র। এবং এরূপ গাত্রদাহের counter irritant প্রয়োগ করিতে হইলে আবার 'শনিবারের চিঠি'র শরণাপন্ন হইতে হয়। আমার এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সেরূপ প্রবৃত্তি নাই—সে প্রয়োজনও নাই বলিয়া মনে করি। ছিদ্রান্বেষী লেখক ঐ প্রবন্ধের সম্পর্কে যে 'আলোচনা' সাগ্রহে পাঠ করিয়া সাদরে শিরোধার্য করিয়াছেন, এবং সে আলোচনা আমার প্রবন্ধের গাত্রে মশক দংশনও নয়, বুদ্ধিমান পাঠকমাত্র বুঝিবেন; এবং সে প্রতিবাদ কত যে অমূলক তাহাও আর একটু অপেক্ষা করিলে লেখক মহাশয় দেখিতে পাইতেন। সংস্কৃত ভাষা বা সাহিত্যে 'পণ্ডিত' আমরা কেহই নই—বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও নহেন। সেরূপ 'পণ্ডিত' হইলে 'সাহিত্য' সম্বন্ধে যে রসবোধ জন্মিত, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের দেশের 'পণ্ডিত'গণের মধ্যে পাওয়া যাইবে। সেরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন করিবার সুযোগ যে ঘটে নাই তাহাতে ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ; কিন্তু আশা করি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তাহা উক্ত প্রবন্ধের অভিপ্রায় পক্ষে যথেষ্ট। যাহাকে 'পণ্ডিত' বলে—ঐ প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সেই পাণ্ডিত্য আমি দাবী করি নাই—সে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনও মানি না। তাই তথাকথিত পাণ্ডিত্যের নিকটে—বিনয় স্বীকার করিয়া গরজের উল্লেখ করিয়াছি—যাঁহারা প্রবন্ধটি পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট সে গরজ অজ্ঞাত নয়; তথাপি নমস্কার জানাইবার জন্য তাহা যদি 'অজ্ঞাত' হয়, তাহাতে আমার আপত্তি করা অন্যায়।

'কুমার সম্ভবের' [১৪] অনুবাদ পড়িলাম—বড় সুন্দর হইতেছে; কবিকে আমার আনন্দ অভিবাদন জানাইবেন। ঐ সঙ্গে ইহাও বলিবেন 'রসানুস্মৃতি' কথাটা ঠিক হয় নাই—তিনি যেন ভাবিয়া দেখেন; কারণ 'রসের' স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিও একজন authority.

আমার স্নেহালিঙ্গন জানিবেন। ইতি—

আপনার
মোহিতলাল

১১. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৩৪]

ঢাকা
১. ১০. ৩৪.

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন হ'ল আপনার 'কুটীরের গান' উপহার পেয়েছি, প্রাপ্তি-সংবাদ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, এজন্য লজ্জিত আছি। প্রাপ্তি-সংবাদ দিলে আর কোনও সংবাদ দেবার তাগিদ থাকত না; তাই বইখানা ভাল ক'রে প'ড়ে আপনাকে লেখবার ইচ্ছে ছিল, তা এ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। আমি নানা কারণে বড় ব্যস্ত ও বিব্রত আছি। আজ একটু সময় ক'রে নিয়ে আপনাকে এ চিঠি লিখ্‌ছি।

বইখানা বেশ যত্ন করে ছাপিয়েছেন, আপনার এই প্রথম সন্তানের প্রতি মমতা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উপহার[১৫] যাঁকে দিয়েছেন, তিনি খুবই মহৎ ব্যক্তি সন্দেহ নেই; তবু আপনার কবি-প্রাণের নিভৃত বাসর-কক্ষের এই নিভৃত আলাপন আরও অন্তরঙ্গ কোনও ব্যক্তির উদ্দেশে অর্পিত হ'লে আরও শোভন হ'ত।...

কবিতাগুলি সব পড়েছি। দুইটি দোষ আছে বোধ হ'ল। প্রথম, সুর প্রায় সর্বত্রই এক, বিষয়ও প্রায় এক, বৈচিত্র্যের অভাব। দ্বিতীয়, ভাষার দুর্বলতা, শব্দের অপপ্রয়োগ। এই কয়টি কবিতা আমার ভালো লেগেছে: মহাকাল, বেহুলা, আজ শরতে, গাঁয়ের স্বপনে ভুলি। আমার বিশ্বাস, এই কয়টি কবিতাতেই আপনার কবিত্বের পরিচয় আছে। বাকিগুলিতে খুব খাঁটি inspiration-এর লক্ষণ নেই, ভাব-কল্পনার কোনও মৌলিকতা নেই। ভাষা সম্বন্ধে আপনার আরও সাবধান হওয়া উচিত। "উষসী যেমন শান্ত শোভন মেঘের শিরে" এরূপ চিত্র অর্থহীন। কবিতায় বিরহিনীর "বাসন-কোষণ ভারী লাগে যেন" ইত্যাদি রীতিমত রসাভাসের সৃষ্টি করেছে। "দীর্ঘ দীর্ঘ কাঠগুলি ফেলা"—অতিশয় দুর্বল ভাষা। "লেগে গেছে ব্যস্ততা", "ভুজঙ্গে পূরিত পথ", "সমাস্তৃত দীর্ঘ জটাজাল", "বন-বুকে", "নাচন্ জল", "কুটীর অঙন", "শরতের চম্পক-ভূষণ", "ভাসন্-মেঘ" প্রভৃতি অনেক অসাবধানতার পরিচয় বইখানিতে রয়েছে। "গেঁয়ো তরুণী"—এখানে 'গেঁয়ো' শব্দটি আপনি আধুনিক ভুল অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'গেঁয়ো' মানে পল্লীবাসিনা বা গ্রামের নয়, গেঁয়ো' শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক, ইংরেজী rustic বা uncultured অর্থে

ব্যবহার হয়। ওর মানে অসভ্য 'আজ শরতে'। কবিতাটি সবচেয়ে ভাল লাগল। 'পথের পাশে ফুল ফুটেছে ঘরে ফেরার গান বুলিয়ে' এমন লাইন আপনার বই-খানিতে বেশী নেই।

যাই হোক, আমি আপনাকে যা লিখলাম, তাতে আপনি আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভুল বুঝবেন না। আপনারা এখনও নবীন, আপনাদের সম্ভাবনা এখন অনেক। আপনার সম্বন্ধে আশা রাখি বলেই আপনাকে খোলাখুলি দু' চারটে কথা বললাম। আশা করি, সেগুলি ভালভাবে নেবেন এবং তাতে আপনার কিছু সাহায্য হবে।

আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১২. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)কে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৩৭]

৩৮ নীলক্ষেত রোড
পোঃ রমনা। ঢাকা
৭.৪ ১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র ও পরে স্বহস্তের উপহার পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার কবিতা (স্মরগরল) আপনার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।

আপনার লেখা—বিশেষতঃ গত কয় বৎসরের গদ্য ও পদ্যরচনা, আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি, এবং সত্যকার প্রতিভার পরিচয়ে শুধুই যে মুগ্ধ তাহা নয়, বাংলা সাহিত্যের এই অতিশয় দুর্গতির দিনে আপনার লেখায় যে সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই, তাহাতে আশ্বস্ত বোধ করি, অর্থাৎ বুঝি যে বাংলাদেশে এখনও সাহিত্যের প্রেরণা মরে নাই। আপনার সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে আপনার রস-দৃষ্টি শুধুই খাঁটি নয়—গভীর; আপনার ভাষা এবং ছন্দ ও মিলের ক্ষমতা যেমন বাণী-সাধনার সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট প্রমাণ (সাহিত্যিক প্রতিভার উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।) তেমনই আপনার কল্পনা ও ভাবুকতা, জীবন রস-রসিকতা ও কবিত্ব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয়। আরও মনে

হয় আপনার কবিমানস ও কবিশক্তি বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইতেছে, অর্থাৎ অনেকের মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া নির্বাণোন্মুখ নহে। আপনার শিখা আরও স্থির, এজন্য আশা করা যায় পূর্ণদীপ্তির এখনও বিলম্ব আছে। এই সকল কারণে, এবং রচনার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে এবং উৎকর্ষের পরিচয়ে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, দীর্ঘায়ু হইয়া এবং উত্তরোত্তর শক্তিমান হইয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করুন।

আপনার নূতন পুস্তক 'বৈতরণীর তীরে' প্রায় অর্ধেক পড়িয়াছি। গল্পের কৌশলটি খুব মৌলিক না হইলেও চমকপ্রদ। কল্পনার ভঙ্গীতে ও রস-সৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—আরও প্রকাশ পাইয়াছে বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। ছোট খাঁচায় বড় পাখীর পাখা ঝাপ্‌টানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্যজীবনের সেই চিরন্তন ট্রাজেডি, প্রকৃতিশাসিত পুরুষের দুর্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অমৃতের আকাঙ্ক্ষা এই উভয়ের দ্বন্দ্ব—

Swinburne-এর ভাষায়—

> Remembrance fallen from Heaven,
> And madness risen from Hell—
>
> ... ...
>
> In his heart is a blind desire,
> In his eyes for knowledge of death.

সেই মহাকাব্যের ভাববস্তুকে আপনি কৌশলময় ভঙ্গীতে এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আপনার ভাববস্তু যত বড় এবং কল্পনাকে যত ঊর্ধ্বে তুলিতে চাহিয়াছেন কথাবস্তু তাহার সমান নহে। এই রচনাটিতে আপনার রসদৃষ্টি ঊর্ধ্বগ হইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা রসাস্বাদ অপেক্ষা তীব্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই আবদ্ধ হইয়া আছে। রচনাটি যদি গদ্যে না হইয়া পদ্যে (dramatic poetry) হইত, তবে বোধ হয় আরও গাঢ় হইতে পারিত, এত sentimental হইত না। পদ্যের একটা সুবিধা এই যে rhythm ও rhyme এর কঠোর শাসনে প্রবলতর ভাববস্তু যেন পুষ্টিপাকে গাঢ় ও গভীর হইয়া উঠে। আমার মনে হয়: আপনার রসদৃষ্টি ও কবিপ্রেরণায় কোনও দোষ নাই—form বা প্রকাশভঙ্গীই যথাযথ হয় নাই, অর্থাৎ দেহ ও আত্মার মিলন ঘটে নাই। রচনাটিতে যেমন কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে, তেমনই প্রকাশকৌশলে ত্রুটি আছে; অথবা রচনাটিতে কুশলতা অপেক্ষা কৌশল অধিক হইয়াছে। আপনি নিজে একজন উৎকৃষ্ট সাহিত্য

রসিক, এবং আর্টিষ্ট, অতএব আমার সমালোচনার যদি কোনও সত্য থাকে তাহা আপনিই বুঝিবেন। নিজে Neurasthenia-র রোগী, বর্তমানে দেহ মন আরও দুর্বল, এজন্য নিজের উপর বিশ্বাস নাই।

আমি এখনও খুব দুর্বল—Chronic Bronchitis, তার উপর Neurasthenia, এবং তারও উপরে Pneumonia এবং বয়সও অনুকূল নহে। এ সকলের উপরে আমার শিশুপুত্র গত ২/২॥ মাস যাবৎ Nephrites-এ ভুগিতেছে, তাহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত ও উদ্বিগ্ন আছি ; এজন্য সাহিত্যচর্চা ত একেবারে বন্ধ আছে, বহুদিন কাহাকেও পত্র লিখি নাই, উত্তরও দিই নাই। সজনীবাবুর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বলে 'স্মরগরল' প্রকাশিত হইয়াছে—সে কীর্তির যশ বা অযশ তাঁহারই প্রাপ্য। কবিতাগুলি কাহারও কেমন লাগিল, সাহিত্য সমাজে তাহার কোনও আলোচনা হইল কিনা, পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইল কিনা—প্রভৃতি কোনও চিন্তাই আমার আর নাই। অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না—যাহা লিখিয়াছি তাহাই গ্রন্থাকারে রাখিয়া যাইতে পারিব না, ইহাই দুঃখ, কারণ আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহসম্ভাষণ জানিবেন। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন। আপনার সকল পুস্তকই আমাকে পাঠাইবেন। 'তৃণখণ্ড' পাই নাই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৩. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) কে লিখিত
[মে ১৯৩৭]

ঢাকা
৩.৫.৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আপনারই উপযুক্ত। আমাকে আপনারা যেটুকু শ্রদ্ধা করেন—তাহাতে আপনাদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাই, তাহাই আনন্দের বিষয়।

আপনার নূতন বইখানি[১৬] ইতিমধ্যে শেষ করিয়াছি। বইখানির কল্পনা ও

রচনাভঙ্গিতে যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ আছে। কাঁচা emotion বা বাস্তব হৃদয় সংবেদনা বইখানার একমাত্র content বা উপাদান বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে যে criticism বা অন্তর্দৃষ্টি আছে—অনুভূতির সেই সজ্ঞানতা রসাবেগের সহিত যুক্ত হওয়ায় এক প্রকার কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে। রচনায় subjectivity-র মাত্রা খুব থাকায় একটা lyric আবেগই প্রবল হইয়াছে। এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছিলাম[১৭]—এ বস্তু কাব্যচ্ছন্দেই আরও রসঘন হইয়া উঠে। বইখানির মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে pessimism ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রাকৃত জনসুলভ, অর্থাৎ 'realistic' attitude-ই প্রকাশ পাইয়াছে—কবিপ্রাণ বাস্তবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে—দেহে ছুরির আঘাতের মত—মনের উপরে জীবজীবনের গ্লানি ও দুঃখ গভীর কশাঘাত করিয়াছে। সেই আঘাত, সেই বেদনা দেহ-মনের ক্ষেত্রে সত্য—এবং ইহাকে এমন করিয়া কাব্যের আকারে অর্থাৎ বাঙ্ময় করিয়া প্রকটিত করা একপ্রকার কবি-শক্তি বটে। কিন্তু যে সূক্ষ্মতর চেতনার ক্ষেত্রে আমরা 'রস' আস্বাদন করিয়া থাকি, সে ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। যে Beauty সমস্ত অসুন্দর ও অপ্রীতিকরকে অতিক্রম করিয়া, অথচ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপলব্ধি করা বা আস্বাদন করা সকল উৎকৃষ্ট কাব্যের মূল প্রেরণা ও অভিপ্রায়। Palace of Art রচনা করিয়া বাস্তব জীবন ও জগতকে দূরে রাখিয়া এই রস আস্বাদন করিতে হয়—এমন কথা নয়। যদি জগৎই কবির গভীরতর চেতনায় রূপান্তরিত হয়—রসাস্বাদন-কালে পাঠকের আর এক জগতে জাগরণ ঘটে, মৃত্যুবিষমূর্ছিত এই প্রাণই অমৃত-সাগরে সন্তরণ করে; এই জন্যই কাব্য এত বড়, কবি এত বড়। প্রাকৃত জনমনের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ ও মনঃকল্পিত যে জগৎ তাহাই মিথ্যা, কারণ, দুঃখ ও সুখের দ্বন্দ্ব তাহাকে ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত ও বিরূপ করিয়া রাখে। কিন্তু কবির experience—perfect experience একটি অপূর্ব সঙ্গীত-সঙ্গতে তাহাকে সম্পূর্ণ বা perfect করিয়া তোলে। চরম দুঃখ ও পরম সুখ ইহার কোনটাই যে সত্য নয়, এমন কি এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও মূল যে এক—ব্যক্তি চেতনার অতি সংকীর্ণ আত্মপ্রীতি, এ কথা আমরা বুঝি—কিন্তু বাস্তব-অভিভূত চেতনা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। আপনি ত তাহা পারেন, কিন্তু হৃদয়-রক্তের তাড়নায় আপনার কবি-শক্তি এই গ্রন্থে তাহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে। সাধারণ মানুষ—যাহারা 'রসিক' নয়, তাহারা তাহাদের দেহ-মনের নিম্নভূমিতে এই রূপ প্রবল 'ভাব' অনুভূতিকেই সত্যকার কাব্যগুণ মনে করিয়া আশ্বস্ত হইবে—আপনাকে 'দরদী' কবি বলিয়া অভিবাদন করিবে—দুঃখ ভাষা পাইয়াছে বলিয়া সুখী হইবে।

একালের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসনা করে—ধর্মবিশ্বাসের মতই খাঁটি কাব্য-কল্পনায় আস্থা আর নাই। আগেকার শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত 'tragedy'; এই tragedy-তে যে রস ঘনীভূত হইয়া উঠিত, তাহা সম্ভব হইত না, যদি কবির কবি-চৈতন্যের মধ্যে একটা বৃহত্তর আশ্বাসের আনন্দ না থাকিত। এই আনন্দ আত্মার সম্পদ—দুঃখকে দেহ-মনের দ্বারা এমন তীব্রভাবে অনুভব করার কারণ তখন ঘটে নাই; মনের নিরাশ্বাস এমন করিয়া আত্মার আনন্দকে স্তম্ভিত করে নাই। তাই দুঃখ তখন রসেরই উপাদান হইয়া উঠিত। আজিকার কাব্যে তাহা হয় না। Hardy-র উপন্যাসই এযুগের চরম tragedy—Pessimist Schopenhauer-এর Philosophy তাহার ভাব সত্যকে দুপ্রধর্ষ করিয়াছে। এমন Philosophy তাহার মূলে আছে বলিয়া Hardy-র উপন্যাস এক অপূর্ব রসসৃষ্টি হিসাবে—মানুষের অতি জাগ্রত বিচারশীল মনকে আশ্রয়হীন করিয়া শূন্যবাদের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, হাহাকারকে স্তম্ভিত করিয়া, সুখদুঃখহীন অথচ আনন্দহীন এক অদ্ভুত অনুভূতির উদ্রেক করে। Art-এ pessimism ইহার উর্ধ্বে এখনও উঠিতে পারে নাই। তথাপি Hardy-র উপন্যাসগুলিতে Perfect experience-এর রস-পরিণাম নাই—প্রকাণ্ড denial আছে, fulfilment নাই; এবং তাহা না থাকিলে অমৃতপিপাসু মানুষের আত্মা কখনও পরিতৃপ্ত হইবে না।

আপনার কাব্যে রসসৃষ্টির সকল চেষ্টা আছে—দুঃস্বপ্নগুলিকে সাজাইবার কৌশল এবং ভাবের সুরসাম্য ও সুরবৈচিত্র্য বিধানের প্রয়াস। উভয়ই একটি বিশিষ্ট শিল্পী মনের পরিচয় দিতেছে। লেখাগুলিতে আপনার ভাবদৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি, সহৃদয়তা ও রচনাশক্তি একাধারে মিলিত হওয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালী জীবন বা চরিত্রের যে সকল আলেখ্য আপনি এইসকল লেখায় ধরিয়া দিয়াছেন তাহাতে ভাবনা-কল্পনা ও আন্তরিকতা বা সহানুভূতির প্রমাণ রহিয়াছে—রসবোধের ও বিরস-বেদনার যে যুগপৎ অভিব্যক্তি আছে, তাহা লেখক হিসাবে আপনার ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করিয়াছে। এই Style আপনার নিজস্ব, এই জন্যই আধুনিক সাহিত্যে আপনার দানের মূল্য আছে।

আপনার আরও দুইখানি বই ইতিমধ্যে পৌঁছিয়াছে—সেজন্য ধন্যবাদ। বই দুখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তৎসঙ্গে একটি অতিশয় ভাবপ্রবণ sensitive মন—আপনার লেখাগুলির মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে—গদ্য ও পদ্য দুইএর দ্বন্দ্ব লেখকের মানস প্রকৃতিকে প্রাঞ্জল করিয়া

তুলিয়াছে। লেখাগুলির মধ্যে সর্বত্র আপনার মনঃপ্রাণ উন্মুক্ত হইয়া আছে, আর্টের সূক্ষ্ম আবরণ না থাকিলে এগুলিকে একেবারে আপনার Journal বা diary বলা যাইত। ভাবপ্রবণতার সঙ্গে যে কল্পনাশক্তি ও রসচেতনা উন্মুখ হইয়া আছে তাহাতেই স্থানে স্থানে অতি উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি মনে হয়, আপনাকে আরও উপরে উঠিতে হইবে—জীবনকে আরও "Steadily and as a whole" দেখিবার সাধনা করিতে হইবে—টুকরাগুলিকে না গাঁথিয়া কেবলমাত্র চয়ন ও গ্রহণে যে দৃষ্টিশক্তি ও কলাকৌশল আছে তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া জীবনকে কেবল স্থান কাল পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না দেখিয়া, তাহার মূল রহস্যে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থান কাল পাত্রকেই আশ্রয় করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রম করিয়া একটা বৃহত্তর সত্যতর ও সুসঙ্গত রসজগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে—একটা খুব বড় plan বা plot এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া একটা panoramic view প্রকাশিত করিতে হইবে—এক কথায় আপনাকে উপন্যাস লিখিতে হইবে। যে দৃষ্টি বা রসচেতনার প্রমাণ আপনার লেখায় আছে কিন্তু সাধনার সে সময় আপনার নাই, তাই আপনার মনের শিল্পসাধনায় একটা বড় কিছু গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না—সদ্যতপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহফলকে হাতুড়ির দুই চারিটা দৃঢ়-মুষ্টি আঘাতে যাহা গড়িয়া উঠে তাহাই আপনি দান কারয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমার আশা আছে আপনার সৃষ্টিশক্তি বৃহত্তর কীর্তির অপেক্ষা করিতেছে।

'তৃণখণ্ড' পড়িলাম—এক নিশ্বাসে। পড়িবার সময় শীঘ্র শেষ না হয় এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের 'আত্মচরিত' বা আত্ম-পরিচয় যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই বইখানি এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রত্যেক বাস্তব বহির্জীবনের সঙ্গে লেখকের একজন অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বশালী Cultured soul-এর যে সংঘর্ষ, তাহাই এই বইখানির আসল কথাবস্তু। 'বৈতরণী তীরে' ও 'তৃণখণ্ড' একই বস্তু, একটিতে দিন ও অপরটিতে রাত্রির ভাবনা আছে। 'বনফুলের গল্প'গুলিতে লেখক নিজে একটু আড়ালে থাকায় রস আরও জমিয়াছে। গল্পগুলির কয়েকটিতে গূঢ়তর রস সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ কেবল সুখ-দুঃখের পরিমাণ বা ভাল-মন্দ বিচারের যে ভাবুকতা Cynical, Satirical বা Humourous কল্পনা নয়—এগুলিতে লেখকের অনাসক্তি বা কঠিন আত্মসংযম আছে; মানুষকে দায়ী করা নয়,—জীবন বিধাতার নির্মম রসিকতাকেই ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যুগল স্বপ্ন' 'বল হরি হরিবোল',

'ভৈরবী ও পূরবী' 'খেঁদি' প্রভৃতি এইরূপ রচনা। Thomas Hardy-র 'Life's Little Ironies' মনে পড়ে— তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ আপনার এই গল্পগুলি।

চিঠি বড় হইয়া গেল— একদিনে লিখি নাই। বড় দুর্বল, লিখিবার সামর্থ্য আর নাই। তবু আপনার লেখা ভাল লাগে, আপনার মধ্যে শক্তির পরিচয় পাই বলিয়াই; এবং আপনি শুধু শক্তিমান ও সত্যবান সাহিত্যিক বলিয়াই অনেক কিছু লিখিলাম, যদি আপনার কাজে লাগে। সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ আপনার কিছু কিছু পড়া উচিত। দুইখানি গ্রন্থ আপনাকে পড়িতে বলি— 'Fyodor Dostoevsky' by Middleton Murry এবং ঐ একই লেখকের 'Discoveries'। শেষোক্তখানি আমি সম্প্রতি শেষ করিয়াছি; এরকম বই আপনাদেরও পড়া দরকার।

আমার শরীর পূর্ববৎ। ছুটি আরম্ভ হইয়াছে—একটু বিশ্রামের আশা করিতেছি। কিন্তু রোগ ত' শরীরের নয়— জন্মগত মানস-ব্যাধিও আছে, লেখাপড়া একেবারে ত্যাগ করিতে পারি না; তাছাড়া, নানাদিক থেকে অনুরোধ ও আবদার আছে। অথচ মস্তিষ্ক বড় দুর্বল। ছেলেটিকে লইয়া আরও উৎকণ্ঠিত ও বিব্রত আছি। Chronic দাঁড়াইয়াছে কোনো কিছুতেই কমিতেছে না। কি করি বলুন ত?

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আন্তরিক শুভকামনা জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৪. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) কে লিখিত
[মে ১৯৩৭]

৩৮ নীলক্ষেত রোড,
রমনা। ঢাকা
১৯.৫.৩৭

পরমপ্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ছেলেটার অসুখ এখন chronic হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ডাক্তারী চিকিৎসায় কিছু হ'ল না, তাই কবিরাজী করাইতেছি।

আপনার 'ভূয়োদর্শন' আমি বরাবর পড়িয়া থাকি ; লেখাগুলি খুব উপভোগ্য হইতেছে। সাহিত্য স্থষ্টির মূল উপাদানই experience—এই experience নানা ভঙ্গীতে মনকে ধাক্কা দেয়—যেখানে তাহা চিন্তালেশশূন্য ভাবাবস্থারূপে প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, সেইখানেই খাঁটি কাব্য-সাহিত্যের স্থষ্টি হয়— এই ভাবাবস্থাই 'রস'; Vivid and actual experience হইতেই রসোদ্রেক হয়। যেখানে তাহা না হইয়া, ভাব ও চিন্তা উভয়ের মিশ্রণ ঘটে, সেইখানে এই জাতীয় রচনার উদ্ভব হয়। এগুলিও রসস্থষ্টির পর্যায়ভুক্ত—Essay বটে, কিন্তু critical নয়, creative। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে। ইহাও একটি বিশিষ্ট literary form—এবং আমার মনে হয় আপনার সাহিত্যিক প্রকৃতির অতিশয় স্বাভাবিক প্রয়োজন-বশে এইরূপ form ধরা দিয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন যে একখানি নূতন নাটকও ইতিমধ্যে শেষ করিয়াছেন। এ সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে এ সময়ে আপনার literary activity প্রবলতম হইয়া উঠিয়াছে— আপনার মধ্যে সত্যকার প্রকাশ-ব্যাকুলতা নানা ভঙ্গীতে পথ খুঁজিতেছে। খুবই আনন্দের কথা। 'ভারতবর্ষে' আপনার 'দ্বৈরথ' এবার শেষ হইল, আমি সব সংখ্যাগুলি পড়ি নাই। প্রথম দুই instalment পড়িয়া খুব ভাল লাগিয়াছিল। আশা করি ভালই হইয়াছে। সম্পূর্ণ পড়িলে আপনাকে জানাইব।

আমার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' আপনাকে একখানি পাঠাইব। উপস্থিত খোঁজ করিয়া জানিলাম বাঁধান কপি (প্রায় দেড়শত) ফুরাইয়াছে। আর কতগুলি বাঁধা হইলেই আপনাকে একখানি পাঠাইব। আমার আর একখানি ঠিক ঐ আকারের গ্রন্থ ছাপা হইতেছে— Indian Press ছাপাইতেছে, নাম—'সাহিত্য-কথা'। এই বইও ছাপা হইলে আপনাকে উপহার পাঠাইব।

আপনাকে একটি কথা না লিখিয়া পারিলাম না। আমার ফুলের নেশা আছে— এ নেশা সাহিত্যের নেশাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন হইতেই শুনিতেছি, ভাগলপুরে এক ভদ্রলোকের (অনাদিবাবু—?) খুব ভাল Chrysan-themums সংগ্রহ আছে। তিনি কি বিক্রয় করেন? আমার কয়েকটি খুব বাছা variety-র চারা অন্ততঃ ২ ডজন হইলে ভাল হয়। খুব বড় ফুল globulas (chinese) Gold, Pink, Red, ও Flesh এবং White—এই কয়রঙের খুব শক্ত ও সুস্থ চারা আপনি আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন? খরচ যাহা লাগে দিব।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৫. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কে লিখিত
[জুন ১৯৩৭]

ঢাকা
২০শে জুন ১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

বহুদিন হইল আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি—এখনও পর্যন্ত উত্তর দিতে না পারায় লজ্জিত আছি। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক উদ্বেগের জন্য কিছুতেই আর উৎসাহবোধ করি না। সময়ে সময়ে এমন অবসাদগ্রস্ত হই যে সামান্য লেখাপড়ার কাজও দুঃসাধ্য বোধ হয়।

আপনি আমার কথামত Chrysanthemum-এর খোঁজ করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি ইতিমধ্যে দেওঘর হইতে কিছু চারা পাইয়াছি—এজন্য, এবং ও সম্বন্ধে পূর্বেকার উৎসাহ ক্ষীণ হওয়ায়, আমি উপস্থিত আর অধিক চাই না। আপনাকেও আর কষ্ট করিতে হইবে না।

এ মাসের 'ভারতবর্ষে' আপনার 'রূপান্তর' নাটকের প্রথম কিস্তি দেখিলাম—অতি সামান্যই বাহির হইয়াছে। উহা হইতে গল্পটিকে রূপান্তরিত করিবার, নূতন করিয়া সাজাইবার, চরিত্রগুলিকে পুনঃসৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় বেশ বোঝা যাইতেছে; কিন্তু নাটকায় actionটি কেমন দাঁড়াইবে, তাহার আভাস ভালো পাওয়া যায় না। এজন্য এখন কিছু বলা মুস্কিল। তবে আশা হয়, আপনার হাতে একটা নূতন ধরণের রস-রূপ ওই পুরানো গল্পটিতে ফুটিয়া উঠিবে। অর্থাৎ, গল্পের সূত্রটি-মাত্র ছাড়া নাটকখানি আপনার একখানি মৌলিক রচনা হইয়া দাঁড়াইবে। চরিত্রগুলির মধ্যে নায়ক হোসেনের চরিত্র সম্ভবতঃ একটা বিশেষ কিছু হইয়া উঠিবে— উহার মধ্যে একটু অভিনবত্ব ও গভীরতা ইতিমধ্যেই আভাসিত হইয়াছে। আমার মতে কোনও নাটকই গল্পের মত ক্রমশঃ প্রকাশ হওয়া উচিত নয়—উহাতে নাটকখানি বারবার উচ্ছিষ্ট হয় মাত্র, শেষপর্যন্ত ভুক্ত হওয়া ঘটে না। পড়িয়া যে

ধরণের উপভোগ তাহা বাধা পায়—, পাঠকের চিত্তে উহার সম্পূর্ণ রসরূপ ধরা পড়ে না—অতএব নাটকখানি পাঠ্যরূপে 'বিফল-প্রেরণা' হইয়া দাঁড়ায়। তারপর যখন উহার অভিনয় হয়, তখন উহার প্রকৃত পরিচয় লাভ ঘটে। একথা অবশ্যই সত্য যে, কোন নাটকই অভিনয় না হওয়া পর্যন্ত নাটকই নয়, তথাপি পাঠ্য-নাটক বা closet drama হিসাবেও তার যে আর এক ধরণের রস-সংবেদনা আছে তাহাও একবারে না পড়িলে ব্যর্থ হয়; এজন্য আমি আধুনিক মাসিকপত্রের এইরূপ piecemeal বা কিস্তিবন্দী নাটকের বিরোধী। নাটক উপন্যাস নয়, উহা মুখ্যত একটা action বা ঘটনা-ঘটিত আখ্যানরস; স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে কাল বা কার্য-কারণের দ্রুত অনুবন্ধই উহার প্রাণ; এই কালগত অখণ্ডতাই বিশেষ করিয়া নাটকীয় রসাস্বাদনের সহায়; এই জন্যই এক কালের নাট্যাচার্যগণ unity of time-এর উপরে এত জোর দিয়াছিলেন— অবশ্য ততটা unity বজায় রাখিতে হইলে নাটকের action বড় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, এজন্য উত্তরকালে এই unity-র নিয়মরক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। তথাপি action-গত কালের অখণ্ডতা রক্ষা না করিলেও নাটকের আভিনয়িক 'কাল' বারবার খণ্ডিত হইলে, অথবা পাঠ্যরূপে তাহাকে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার রস নষ্ট হইতে বাধ্য। তবে যদি (যেমন আমাদের সাহিত্যরসিকগণের ধারণা) উহাকে গল্প-উপন্যাসেরই সামিল মনে করা হয়— অর্থাৎ উহার action-এর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া— উহাকে দৃশ্য ও dialogue-এর উপাদানে গঠিত একপ্রকার গল্প বলিয়া মনে করিলে—উহার নাট্যরস সম্বন্ধে কোনও ভাবনার কারণ ঘটে না। পাঠকের মন শুধু গল্পটির জন্যই উৎসুক ও কৌতূহলী হইয়া থাকে—মাসের পর মাস সে কৌতূহল বাড়িয়াই চলে। আমার মনে হয়, আজিকার এই সাময়িক-সাহিত্য বা ক্ষণিক-রসের যুগে নাটক-প্রকাশের যদি অন্য উপায় না থাকে, তবে অন্ততঃ দুই বা বড় জোর তিন সংখ্যায় উহা শেষ করা উচিত।

আপনি গদ্য কবিতার সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। আপনি অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'তে গত বৎসরের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমার দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় একই— দুই নামে দুই ভাগে ছাপা হইয়াছিল—'অতি আধুনিক ছন্দ' ও 'রবীন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কবিতা'। ঐ প্রবন্ধে আমি এই জাতীয় রচনার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিয়াছি। কবিতার শুধু ছন্দ নয়—মিলও চাই এবং পদযোজনার সুষমাও চাই। এটা ব্যক্তিগত রুচির কথা। কারণ বাক্য ছন্দোবদ্ধ হইলেই প্রাথমিক প্রকাশরীতি বজায় থাকে—

তাহাতেই কবির প্রতিভা যুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট কাব্যরস সৃষ্টি হইতে পারে ; একথা আমাকে কাব্যসমালোচক হিসাবে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ছন্দোহীন কবিতা আর যাই হউক, খাঁটি কবিতা নয় : ভাবের যে সুর, এবং কল্পনার যে আবেশ ভাষায় প্রকাশ করাকে কাব্যনির্মাণ বলে— সেই সুর ও সেই আবেশ ছন্দে ভিন্ন ভাষায় সংক্রামিত হয় না—চিত্তকে সত্যকার কাব্যলোকে উত্তীর্ণ করিতে হইলে —'হেথা নয়-'এর জগতে প্রস্থান করিতে হইলে, আর কোনও রথ নাই। যাহারা গদ্য-কবিতার পক্ষপাতী তাহারা লেখক হিসাবে কবি নয়, এবং পাঠক হিসাবে বাংলা দেশের গ্র্যাজুয়েট, অধ্যাপক, এবং পূর্বদেশীয় অতিশিক্ষিত, অতিনব্য, হঠাৎ নব্যরসিকের দল। যাহারা কেরানী বা চাষা তাহারা বেরসিক হইতে পারে —কিন্তু এখনও এইরূপ অতি রসিকতার ছোঁয়াচ হইতে তাহারা মুক্ত আছে ; এবং বোধ হয় শেষপর্যন্ত, এই কেরানী ও চাষাদের মধ্যেই যাহা কিছু রসজ্ঞতার সহজ রসিকতার আশা করা যাইতে পারিবে। নতুবা, বোলপুর, বালীগঞ্জ ও বেহালা এই তিন ব-কারের জ্বালায় বাংলার কাব্য-সরস্বতীর এখনও কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে বাংলা ভাষা, বাংলা বানান ও বাংলা ছন্দ—এই তিনের বাপান্ত-শ্রাদ্ধ করিয়া তবে নিজেও সরিবেন এবং বাঙালীকেও সারিবেন।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আমার সংবাদ পূর্ববৎ—নিজে acute neurasthenia-য় ভুগিতেছি, ছেলেটির অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নয়। ডাক্তারী এবং হোমিওপ্যাথির শেষে কবিরাজী চলিতেছিল—তাহার ফলে এখন কয়দিন যাবৎ খুব diarrhœa দাঁড়াইয়াছে— ফলে দেহের ভার যথেষ্ট লঘু হইয়াছে বটে, কিন্তু অক্ষুধা ও অরুচির জন্য কিছুই খাইতেছে না—glucose, barley-water বা horlicks কিছুতেই রুচি নাই— খাইতে চায় না বা পারে না। এজন্য বড় দুশ্চিন্তায় আছি। মোটের উপর আমি আর বাঁচিয়া নাই এবং এ যাত্রা উদ্ধার পাইব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ হইতেছে।

মাঝে মাঝে পত্র দিলে সুখী হইব। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৬. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কে লিখিত
[জুলাই ১৯৩৭]

ঢাকা
২৮. ৭. ৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আপনার জন্য একখানি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' অনেক আগেই আনাইয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু প্যাক করিতে না জানায়, এবং কিভাবে পাঠাইলে ভাল হয় তাহা ঠিক করিতে না পারায় এতদিন পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে একদিন দপ্তরী আসিয়াছিল (আমার বইগুলি সে বাঁধাইয়া দেয়) তাহার হাতে প্যাক করিতে দিলাম। সোমবার কলেজে গিয়া তার নিকটে বইখানি লইয়া ডাকে দিতে পাঠাইলাম। দেখিলাম প্যাক ঠিকমত করে নাই—Ordinary Book-Post-এর মত করিয়াছে— সর্বাঙ্গ ভাল করিয়া মুড়িয়া উপরে address-এর জন্য পৃথক label লাগাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে পাকা লোক, তাই নিজের পরিশ্রম বাঁচাইয়া মাশুলের সুবিধার কৈফিয়ৎ দিয়াছে। বইখানি ঠিকমত পৌঁছাইল কিনা জানাইবেন।

বইখানি আপনার স্ত্রীর বি.এ. পরীক্ষার standard অপেক্ষা একটু কঠিন হইবে; আপনি তাহাকে নিজে পড়াইয়া দিবেন— আশা করি তাহা পারিবেন। সে সৌভাগ্য আমাদের মত সেকেলে দম্পতীর ঘটিল না। প্রথম প্রবন্ধ ও শেষ প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এ কয়টি পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। বাকি নির্দেশিকার সাহায্যে আবশ্যক মত দেখিয়া পড়িলেই চলিবে। বইখানি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পাঠ্য হইয়াছে কিনা জানি না—এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি। তাহাতে আসে যায় না; বাংলা সাহিত্যের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রদের জ্ঞাতব্য কতকগুলি তথ্য ও তত্ত্ব ঐ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এবং তাহা জানা থাকিলে মোটের উপর কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমি পরীক্ষা-সাগরে সেতুবন্ধন উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত করি নাই—পাঠ্য পুস্তক রচনায় আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, বরং উহাতে জাতিনাশ হয় বলিয়াই মনে করি। আপনি নিজে ঐ পুস্তক আদ্যোপান্ত পড়িয়া, আপনার কেমন লাগিল, একটু বিস্তারিত জানাইলে সুখী হইব। 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' সম্বন্ধে monographটি সর্বাগ্রে পড়িবেন।

আপনার 'রূপান্তর' পড়িতেছি—আলিবাবা খুব আধুনিক হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—Old wine in a new bottle নয়, New wine in an old bottle। 'শনিবারের চিঠি'র নাটিকাখানি বড়ই মজাদার হইয়াছে—অতিশয় নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার সনেটটি আপনার ভাল লাগিয়াছে, তার কারণ আপনি যথার্থই গভীর রসের রসিক। সনেট সাধারণ গীতি-কবিতা নয়—উহা ভাবরসের ঘনীভূত নির্যাস, তাই উহার রস খুব প্রৌঢ় রসিক ভিন্ন আর কেহ আস্বাদন করিতে জানেন না। আমার 'স্মর-গরল'-এর সনেটগুলি আমি খুব বাছিয়া দিয়াছি। উহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টি সনেট একেবারে গাছ-পাকা ফল হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সনেট বারবার পড়িতে হয়। আমি সনেট সম্বন্ধে একটি আলোচনা ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে চৈত্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম— ঐ লেখাটি যদি সম্ভব হয়—আপনি এবং আপনার সহধর্মিণী উভয়ে পড়িয়া লইবেন। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'A sonnet is a moment's monument,
Memorial from the soul's eternity
To one dead deathless hour'. (D. G. Rossetti)

'সনেটের Content একটা অতি গভীর হৃদয়াবেগ— এই passion কেবল উৎসারিত হইলেই চলিবে না— তাহাতে যে কোনও উৎকৃষ্ট lyric-এর জন্ম হইতে পারে— সেক্ষেত্রে কোনও বন্ধনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে এই passion পুটপাকের মত একটি সুস্পষ্ট ভাবনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া উঠে, সেখানেই তাহা সনেটরূপ গ্রহণ করিতে পারে। একদিকে যেমন আবেগ, অপরদিকে তেমনই অন্তর্নিরুদ্ধ গভীরতা— এই উভয়ের প্রয়োজনে তরলোচ্ছল ভাব-বাষ্প যে নিয়মে গাঢ় হইয়া উঠে— সনেটের মিল-বিন্যাস ও সুর-গঠন সেই স্বাভাবিক নিয়মেরই ফল। কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস কেমন করিয়া এই অতি কঠিন নিয়মবন্ধনেই সার্থক হইয়া উঠে, এই নাগপাশের কৃত্রিমতা এবং সনেট-কবির অকৃত্রিম আন্তরিকতা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে— উৎকৃষ্ট সনেট পড়িবার সময়ে ইহাই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্য সনেট লেখকের বিশিষ্ট প্রতিভা ও কৃতিত্বের প্রয়োজন। যে কোনও ভাব বা ভাবনাকে সনেটের ভঙ্গী ও ছাঁচে ঢালা অসম্ভব। ভাব ও রূপের মধ্যে যেখানে একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে সেখানেই কাব্য-প্রেরণা আপনা হইতেই সনেটের সন্ধান করে।'

আশা করি সপরিবারে ভাল আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৭. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কে লিখিত
[নবেম্বর ১৯৩০]

38 Nilkhet Road
Dacca. 25. 11. 1938

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের উত্তর আর দিই নাই— প্রয়োজনবোধ করি নাই। তবে আপনার সংবাদ আপনার লেখাগুলিতে পাই এবং সময়ে সময়ে সেই সংবাদের সাড়া মনে জাগে, এবং পত্র লিখিবার প্রয়োজন ঘটে।

আপনার গল্পের বইখানি ভালো করিয়া পড়িয়াছি। উহার সম্বন্ধে ইহাই বলিবার আছে যে, একটি নূতন form আপনি আয়ত্ত করিয়াছেন—রীতিমত গল্পও নয়, নক্সা-Snapshot ও নয়— এ একরকম অতি ছোট গল্প। এবং এই সংগ্রহের অধিকাংশই এত সুসম্পূর্ণ রস-কলেবর পাইয়াছে যে আমার মনে হয় ইহা আপনার একটি খুব নূতন কীর্তি বলিয়াই ঘোষিত হইবে। আপনার রচনাশক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিভায় এখনও পূর্ণ যৌবন চলিতেছে— ঠিক কোন্ ঘাটে আপনার তরী ভিড়িবে— কোন্ লক্ষ্য আপনি ভেদ করিতে পারিবেন তাহা এখনও বলা কঠিন, সম্ভাবনার অনেক দিক এখনও রহিয়াছে। খুব লিখিয়া যান, পরে আপনার নিজস্ব ইষ্ট-মূর্তির দেখা পাইবেন।

মধুসূদনের শেষটিতে বড় কায়দা করিয়াছেন—finishing stroke যাকে বলে। মধুসূদনের চরিত্র-চিত্র হিসাবে, তাঁহার জীবন-চরিতের নাট্যরূপ হিসাবে, ইহার চেয়ে আর কি করিতে পরিতেন। তথ্য নির্বাচন ও সন্নিবেশেও আপনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

'ভূয়োদর্শন' বেশ লাগিতেছে। নানা ভঙ্গীতে আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় 'রসগুণবলিজারিত' বটিকাগুলি ইতস্তত: বিতরণ করিতেছেন। আমার মনে হয় ইহাতে যেন একটি প্রাচুর্যজনিত অপব্যয় আছে। যে সকল মাল-মসলা বৃহত্তর

সৌধের ভিত্তিনির্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাই অজস্রতার চাপে কল্পনা-বৃত্তির অধীরতায় খণ্ড খণ্ড ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। আপনি সেগুলিকে আপনার মনোভাণ্ডারে বেশী দিন ধরিয়া জমিয়া উঠিতে দিতেছেন না— অস্বস্তি বোধ করেন। বড় কিছু করিবার ইচ্ছা আপনার আছে— যে কথা আমাকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বড় কিছু করিতে হইলে বড় Plan চাই, একটা central ভাববস্তুকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, কল্পনাকে তাহার চতুর্দিকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে— তাহা হইলে যত কিছু খণ্ড ভাব, খণ্ড চিন্তা, খণ্ড অভিজ্ঞতা সেই মণ্ডলের মধ্যে আপনি আকৃষ্ট হইয়া একটা সুডৌল Organic আকার ধারণ করিবে। ইহার জন্য ধৈর্য চাই, এবং ধ্যান চাই। এই খণ্ড রচনাগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য বটে, কিন্তু মনে হয় এগুলিকে বৃহত্তর স্বষ্টির অঙ্গীভূত করিয়া আরও বড় সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে।

এবারকার শঃচি'র অনেকগুলি রচনা ভাল লাগিল। আপনি এত রকমের এত লেখা লেখেন কি করিয়া? খুব ভাল লক্ষণ সন্দেহ নাই।

আপনার শেষ বইখানি পাই নাই। আমার নূতন বই আপনাকে শীঘ্র পাঠাইব। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৩৮]

38 Nilkhet Road
Ramna

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি, এবং আপনার ঐ পত্রে আপনার সাহিত্যিক উৎসাহ ও উৎকণ্ঠার পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়, সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পরিলেই কিছু ফল হইতে পারিত।

আপনার প্রাণে যদি কোনও সত্যকার প্রেরণা জাগিয়া থাকে, তবে তাহার ফলে আপনি কিছু করিবেনই— সে বিষয়ে আমার উৎসাহবাক্য আপনি প্রচুর পাইবেন। খণ্ডকাব্য বা লিরিক অপেক্ষা আপনার ভাবকল্পনা যদি বড় কাব্যের

পরিসর দাবী করে তবে নিশ্চয়ই আপনি সে দাবী গ্রাহ্য করিবেন, এবং আপনার প্রেরণা যদি সত্য হয় তবে আপনি যাহা রচনা করিবেন তাহা নিশ্চয়ই সার্থক হইবে। আমি যদি গোড়া হইতে সে বিষয়ে কোনরূপ সমালোচনা-মূলক পরামর্শ আপনাকে দিই তবে তাহাতে আপনার উপকার না হইয়া ক্ষতিও হইতে পারে। এজন্য আমি ঠিক সোজাসুজি কোনও পরামর্শ দিব না। তথাপি কতকগুলি বিষয়ে আপনার নিজেরই ধারণা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

বর্তমান যুগে সাহিত্যে বড় আকারের কিছু গড়িয়া উঠিতেছে না, তার কারণ, মানুষের মন এখন বিশ্লেষণ-ধর্মী হইয়াছে—বহুর যে বৃহৎ ঐক্য তাহাকে না মানিয়া, খণ্ডকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ঐক্যের অভাবটাকে ঘোষণা করিতে চায়। মন তাহাতেই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। আদি ও অন্তের ভাবনা করিতে হয় না, চলমান জগৎ-যাত্রার ক্ষণিক ও বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি হইতেই একটু রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহাই অতি-আধুনিক বিংশ-শতাব্দীর মানবীয় প্রবৃত্তি। খণ্ডকে সমগ্রের অংশরূপে দেখিতে হইলে যে সত্যের কামনা ও কল্পনা করিতে, যে আস্তিক্য নীতিতে আস্থাবান হইতে হয়, তাহাই আজিকার দুর্বল ধর্মভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে একটা বিভীষিকা। সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্যই শাশ্বত সত্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তথাপি সাহিত্যের একটা দেশকালানুবর্তিতা আছে— কারণ সাহিত্য একার নয়— সমাজমনের, দেশ ও কালের শাসন তাহাকে মানিতে হয়। আমরা যতই স্বতন্ত্র হই না কেন যতই চিরযুগের দিকে তাকাইয়া থাকি না কেন— যুগকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আপনি লিখিয়াছেন, লিরিকের যুগ শেষ হইয়াছে, তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়াই বড় কাব্যের যুগ যে অতঃপর আসিতেছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বরং ইহাও মনে হইতে পারে যে কাব্যেরই যুগ গত হইয়াছে, সাহিত্য-রস আর মানুষের পিপাসার বস্তু হইবে না।

তথাপি যদি কাহারও চিত্তে এ যুগেও, বৃহত্তর কাব্যরচনার প্রেরণা জাগে, তবে বুঝিতে হইবে যে, হয় তাহা একটি মোহ-বিকার মাত্র, নয় তাহার মূলে যুগ-ধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া আছে, এবং তাহা স্বাভাবিক, অতএব সত্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ— ঐরূপ কাব্যরচনা যখন সফল হইবে— তখনই পাওয়া যাইবে, তার পূর্বে নয়। অতএব, আপনাকে এবিষয়ে আমি উৎসাহ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই।

কিন্তু বৃহৎ কাব্য গদ্যে ও পদ্যে—দুই রীতিতেই লেখা যায়; বস্তুতঃ আধুনিক উপন্যাসই প্রাচীন মহাকাব্যের নব দেহ। আপনি নিজে দুই রীতিরই সাধক এবং এক রীতিতে বড় কাব্য (উপন্যাস) রচনায় ইতিমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও

আপনি পদ্যছন্দে বড় কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইহাতে বুঝিতেছি, আপনি একটা অতিশয় Romantic বা উচ্চ ভাববস্তুর উপযুক্ত medium খুঁজিতেছেন, এবং তাহার model কি হইবে, আমার সাহিত্যিক বোধ-বুদ্ধির দ্বারা তাহাই ঠিক করিয়া লইতে চান। প্রথমেই বলিয়া রাখি ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যের (যেমন, Paradise Lost) আদর্শ এখন চলিবে না ; তাহার অন্তর্গত সেই ধর্ম বা নীতির সেই নিছক আদর্শমূলক কল্পনা, সেই প্রেম ও বিশ্বাসের paradise মানুষ এখন হারাইয়াছে। বড় কাব্য লিখিতে হইলে কোনও একটি Romantic tale, পুরাণ ইতিহাস ও কিম্বদন্তী হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং তাহার রসের মূল উৎস হইবে আদিম মানব প্রকৃতির অতি সরল, অথচ সবল ও গভীর হৃদয়বৃত্তি। আজিকার এই অতি সভ্য কৃত্রিম জীবনাদর্শের পাশে অতি সুস্থ প্রাণবন্ত মানুষকে দাঁড় করাইতে পারিলে— কাব্যরসকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাইবে— অতি উচ্চ ধর্ম বা নীতির আদর্শ নয় ; মাটি এবং মানুষ, এই দুইকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে।

একটু বড় আকারের কবিতা লিখিবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল— অন্ততঃ কোনও একটি Romantic রূপকথার মত কাহিনীসূত্র অবলম্বন করিয়া Keats-এর মত, নিছক সৌন্দর্য-রসের একটি রঙীন ও সুরভি শ্লোক-শতদল রচনা করিবার বড় সাধ ছিল ; সাহিত্যের মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার পর রসরাসেশ্বরী আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। একটি বৃহত্তর কাব্য লিখিবার কল্পনাও করিয়াছিলাম— লিখিতে পারিলে আমার কল্পনা ও আমার কাব্যভঙ্গির চরম উৎকর্ষ তাহাতে প্রকাশ পাইত। সে কাব্যের কাহিনী-অংশ বহুদিন যাবৎ পরিকল্পিত হইয়াই পড়িয়া আছে ; বৌদ্ধযুগের ধর্ম, সমাজ, শাস্ত্রবিধি ও আচার-প্রথা ভাল করিয়া পড়িয়া লইবার প্রয়োজন ছিল, তাহা ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই তখন আর সে কাব্যে হাত দিতে পারি তাই। তারপর আমার সাহিত্য-জীবন ক্রমেই রসহীন হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যের ভাববস্তু ছিল যেমন কবিত্বপূর্ণ তেমনই গভীর। মৃত্যুভয়ভীত মানুষ অমরত্ব লাভের বাসনায় প্রেমকে তুচ্ছ করিল—প্রেম ও মৃত্যুর নিত্যসম্বন্ধ সে স্বীকার করিল না ; আয়ুষ্মান না হইতে পারিলে প্রেম বৃথা ; অতএব সে আগে অমর হইলে তবে প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবে। শেষে অমরত্বের বর লাভ করিয়া সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল—সে বর তাহার পক্ষে অভিশাপ হইয়া উঠিল। জীবনের সকলই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই আর আকর্ষণ বা আসক্তি নাই। পুনরায় মৃত্যুলাভের সাধনা করিল। দৈববাণী হইল কোনও কিছুতে আসক্তি না হইলে শাপমোচন হইবে না—সে আর হয় না। অবশেষে এক

আশ্চর্য সহজ ভাবে সেই আসক্তি ঘটিল। সে একটি এমনই ব্যাপার যাহাতে জন্ম ও মৃত্যু একসঙ্গে গাঁথা হইয়া আছে—তাহারই ফলে সে আবার অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে নামিয়া পড়িল। বৌদ্ধ দর্শনের 'তন্‌হা' বা তৃষ্ণার এবং অন্তহীন জন্মমৃত্যুর ট্র্যাজেডি আমি এই কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, এবং তাহারই মধ্যে প্রেমহীন অমরতার উপরে মৃত্যুবিড়ম্বিত প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সে আর হইল না। এ কাব্য কিন্তু অতিশয় কল্পনাপ্রধান, Romantic হইত। ইহাতে Greek element-ই বেশী থাকিত। আপনি Passion ও action এর কাহিনী রচনা করুন। অন্ততঃ Mathew Arnold-এর Sohrab and Rustam-এর মত একখানি কাব্য লিখুন। Tennyson's Idylls of the King পড়িয়াছেন ?

পূর্বে বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আলোচনা সাক্ষাতে ভিন্ন হইবার উপায় নাই। আমি আপনাকে কয়েকটি অতিশয় স্থূল কথা লিখিলাম—আপনার নিশ্চয়ই ইহার উপর অনেক প্রশ্নই মনে জাগিবে— জানাইলে সাধ্যমত উত্তর দিব।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিবেন।

ইতি—
আপনারই
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৯. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত
[মার্চ ১৯৪২]

ঢাকা
২০. ৩. ৪২

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ১২।৩।৪২ তারিখের পত্র ও কবিতাগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি। আমার প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধা এবং আমাকে গুরুবরণ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তুমি পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছ, তাহাতে আমিও পুনরায় বলি—নিজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিও ; সত্য ও সুন্দরের প্রতি হৃদয়ের নিষ্ঠা কখনও হারাইও না ; মন ও প্রাণের পিপাসাকে অগ্নিহোত্রীর মত সর্বদা সমিদ্ধ রাখিও। তোমার পিপাসা আছে—পথেও বাহির হইয়া কিছু অগ্রসর হইতে পারিয়াছ ; এজন্য মনে হয়, তুমি তীর্থে পৌঁছিবে। আমি

যে মন্ত্রের সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, এজন্য মন্ত্রকে এখনও পাই নাই, তাই কাহাকেও কোন সত্যমন্ত্র দান করিবার দুঃসাহস বা অভিমান আমার নাই। আমি আমার দেবতাকে কি স্পষ্টরূপ দিতে পারিয়াছি? —দিয়া থাকিলেও, সে রূপের রূপান্তর যে আর সম্ভব নয় তাহা কে জানে? আমি তোমাদের সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলি; কেবল একটি উপদেশ এই যে আধুনিক কালের সর্ববিদ্যা ও সর্বচিন্তার সহিত সম্যক পরিচয় রক্ষা করিয়াও আত্মরক্ষা করিবে—যে 'আত্ম' বা 'আত্মা'র কথা এই ভারতবর্ষই বলিয়াছে, আর কেহ বলে নাই। আত্মপরিচয় ভিন্ন সেই আত্মরক্ষা সম্ভব নয়, তাই ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশাখা ও সকলরূপ, অন্ততঃ পরোক্ষ করিবার জন্য, আজীবন ব্রহ্মযজ্ঞে নিযুক্ত থাকিও। চিত্তকে মুক্ত রাখিও— জ্ঞানকে কখনও গণ্ডিবদ্ধ করিও না—সরস্বতীর সাধনায় বিশ্বরূপের রস সন্ধান করিও। যদি সেই সাধনায় আমার সাধনার ফলাফল তোমাকে কোন প্রেরণা দিয়া থাকে তবে ইহাই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইব যে—আমার এই একক আত্মনিষ্ঠ সাধনার সেই বস্তুর অন্ততঃ একটা পিপাসাও ছিল—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তরে বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই। ঐ সকল কবিতা বহুদিন পূর্বে লিখিয়াছিলাম। 'বেদূঈন' 'নূরজাহান' ও 'নাদির শাহ্' প্রভৃতি কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম—কাব্য ও ইতিহাস উভয়বিধ আকর হইতে। 'বেদূঈন'-এর জীবন ও মরুভূমির চিত্র আমি নানাস্থান হইতে প্রায় বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়াছি। তবে উহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল—Monier William Jones কৃত কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ। ঐ কবিতাগুলি খাঁটি বেদূঈন-কবির রচিত—মক্কায় 'কাবা'র মন্দির গাত্রে সেগুলি এখনো নাকি ঝুলানো আছে। সেগুলি কবিতার আম-মাংস বিশেষ; আমি তাহাকে সিদ্ধ করিয়া কিছু মসলা যোগ করিয়াছি এবং মাংসের কাথটুকু আবশ্যক পরিমাণে আমার কবিতায় মিশাইয়াছি। 'মরুভূমি'কে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের 'The Terrible Sahara'র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি— দুই একটি ইংরাজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু এই সকলের উপরে আমার 'বেদূঈন-জীবন' বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। আমি একসময় পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। 'আবির্ভাব' কবিতাটিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে; 'কবির প্রতি' কবি করুণানিধানের প্রশস্তি। 'উচ্চৈঃশ্রবা' ভিকটর হিউগোর (Victor Hugo)

একটি কবিতার ভাবানুবাদ—ভূমিকায় তাহার উল্লেখ আছে। আমার কোন কবিতার তাৎপর্য-ঘটিত অনুপপত্তি দূর করিতে আমি সর্বদাই সম্মত আছি জানিবে।

তোমার এবং তোমার বন্ধুর কবিতা পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবিতাগুলিতে তোমাদের উভয়েরই সারস্বত সাধনার শুচিতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার বন্ধুকে আমার সনেটের ইংরাজী অনুবাদের জন্য আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আমি একবার দেবেন্দ্রনাথ সেনের কয়েকটি সনেট অনুবাদ করিয়াছিলাম—তাহার একটি Calcutta Review-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি rhythmical prose-এ অনুবাদ করিয়াছিলাম। আরও দুই তিনটি এখানকার University Journal-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার অধিকাংশ সনেট 'স্মর-গরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে পাইবে।

রোহিণী সংক্রান্ত যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার একরূপ উত্তর আমি ইতিপূর্বে দিয়াছি— তুমি বোধ হয় পড় নাই। 'শরৎ-পরিচয়' নামক যে দীর্ঘ-আলোচনা শনিবারের চিঠিতে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতেই ঐ প্রশ্নের একটা উত্তর দিয়াছি। আমার যে নূতন দুইখানা প্রবন্ধ পুস্তক—'বিচিত্র কথা' ও 'বিবিধ-কথা' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তোমার পড়িবার সুযোগ হয় নাই ; 'বিবিধ কথা'য় ঐ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। আমার কাছে আমার কোন বই (গদ্য বা পদ্য) নাই— থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। প্রকাশকরাই মালিক বলিয়া ইচ্ছামত উপহার দিতে পারি না। তুমি আমার কাব্য হাতে লিখিয়া লইয়াছ শুনিয়া একদিকে যেমন তোমার নিষ্ঠার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি, তেমনই অপরদিকে দুঃখবোধও করিয়াছি। আমার 'স্মর-গরল' কোনও লাইব্রেরীতে নাই কেন—বুঝিতে পারিলাম না। কলেজে কি বাংলা সাহিত্যের সংবাদ কেহ রাখে না? যদি সম্ভব হয়, তোমাকে আমার একখানি 'বিচিত্র কথা' উপহার স্বরূপ পাঠাইব— কোনক্রমে কেবল উহাই এক কপি যোগাড় হইতে পারে। তোমাদের কলিকাতা 'য়ুনিভার্সিটি'র প্রকাশিত অতএব অবশ্য পাঠ্য-পুস্তকগুলি ছাত্রদের পক্ষে যে কি ভয়াবহ তাহার বহুপ্রমাণ পাইতেছি। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' এইরূপ একখানি পুস্তক। তারপর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমালোচনা দেখিয়া রীতিমত ভয় পাইয়াছি। ছাত্রগণের কথাই নাই, বঙ্কিমচন্দ্রেরও দুরদৃষ্ট এখনও ঘুচিল না! ঐ পুস্তকের একটা Review 'প্রবাসী'তে করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছে। সংক্ষেপে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে। আমার স্বাস্থ্য এবার এতই ভাঙিয়াছে যে সাহিত্যকর্ম

সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। তার উপর দেশের যে অবস্থা হইয়া আসিল, তাহাতে বোধ হয় এ যাত্রায় আর কিছু হইবে না। আমার স্নেহাশিস্ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—আমাকে পত্র দিবার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

২০. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[জুন ১৯৪২]

ঢাকা

১০.৬.৪২

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ১০।৫।৪২ তারিখের পত্র ও কবিতা এবং পরে একখানি কার্ডে আমার একটি কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ যথাসময়ে পাইয়াছি। এবার আমি এমন অবস্থায় পড়িয়াছি যে কাহাকেও একটু মন দিয়া পত্র লিখিবার অবকাশ পাই না। পরিশ্রম করিবার শক্তি পূর্বাপেক্ষা যে কত কমিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। রাত্রে এত দুর্বল ও অবসন্ন বোধ করি যে সামান্য কিছু লিখিতেও পারি না—পড়িতেও পারি না। দিনটা নানাবিধ পরিশ্রমে এমন ভাবে কাটে, যে আর কিছু করিবার সময় পাই না। প্রায় দেড় মাস যাবৎ, দুটি কাজ করিতেছি—(১) মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত আলোচনা; মস্তিষ্ক অতিশয় দুর্বল বলিয়া একবার লিখিয়া পাঁচবার সংশোধন করিতে হয়; লেখাটি এত দিনে শেষ করিয়াছি; কিন্তু আশানুরূপ হয় নাই—অনেক কথাই বাদ দিতে হইয়াছে। 'শনিবারের চিঠি'তে তিন সংখ্যায় শেষ হইবে। দ্বিতীয় কাজটি আরও শ্রান্তিকর; ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের (ঢাকা বোর্ডের) জন্য একখানি কবিতা-পুস্তক সংকলন। নাম দিয়াছি 'কাব্যমঞ্জুষা'। কবিতাগুলি ছাপা হইয়া গিয়াছে। এ কাজেও বড় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—অনেক কবিতা রীতিমত কাটছাঁট করিতে হইয়াছে; নিজে সমস্ত মূলগ্রন্থ পড়িতে হইয়াছে। এখন 'মঞ্জুষা'র একটি 'উন্মোচনী', লিখিতেছি। তাহাতে 'কবিতার কথা', 'পদ্য ও গদ্য', 'কবিতা কয় প্রকার' 'কবিতা কেমন করিয়া পড়িতে হয়', 'বাংলা কবিতার ছন্দ' প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ থাকিবে। তারপর 'কবিতা-পাঠ' অংশে প্রত্যেক কবিতার খুব প্রয়োজনীয় টীকা,

ভাষ্য থাকিবে,—সবশুদ্ধ ১০০টি কবিতা আছে; বুঝিতে পারিতেছ যে কি বৃহৎ ব্যাপার! তার উপর, একটি glossary এবং 'কবি-পরিচয়' পরিশিষ্টে থাকিবে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতে 'কবিতাপাঠের' অর্ধেক পর্যন্ত লেখা হইয়াছে। একটা ভূমিকাও লিখিতে হইবে। এই মাসের মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইবে। কাজেই বুঝিতে পারিতেছ আমি কি বিপদে পড়িয়াছি।

তোমার পরীক্ষার ফল কি হইল? এর পর কি পড়িবে? সংস্কৃতে এম.এ? তোমার ম্যাট্রিক ও আই.এ.র ফল কেমন হইয়াছিল? ইংরাজী কেমন পড়া আছে? এসব আমাকে জানাইবে।

তোমার 'চিতাভস্ম' পড়িয়া খুসী হইলাম—'রচনা' হিসাবে ভাল। ছন্দ বেশ আয়ত্ত হইয়াছে—ভাষা আরও একটু সরল হওয়া চাই। দুইটি জায়গা খুব ভাল হইয়াছে!—'সুন্দর সে ত মরণের মেঘে প্রখর ক্ষণপ্রভা!' আর—'গীতিময়ী অমরতা? —সে ত জনতার বিষয়াধিকার দায়ভাগ নিয়ে কথা!' নূতন সুন্দর শব্দ যোজনার সফল প্রয়াসও আছে। সব চেয়ে বড় কথা—তোমার সারস্বত সাধনার আদর্শ ছোট নয়। সংস্কৃত কবিতাটি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিবার অধিকারী নই, তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইও। সাহিত্য-চর্চা হিসাবে প্রশংসনীয়।

'দুঃখের কবি' কবিতাটির লক্ষ্য তুমি ঠিক ধরিয়াছ। উহার অর্থও ঠিক বুঝিয়াছ। 'অ-মানুষ' কবিতাটিতে আমার কবিজীবনের চিরন্তন হাহাকার—যাহা শেষ পর্যন্ত রহিয়া গেল—তাহাই আছে। 'স্মর-গরলের' 'শেষ আশা' কবিতাটি ঐ সঙ্গে পড়িও। 'ক্ষ্যাপা' কবিতার তুমি যে অর্থ করিয়াছ—উহাই বোধ হয় ঠিক। 'হেমন্ত-গোধূলি'র কোন্ কোন্ কবিতা তোমার ভাল লাগিয়াছে? Sonnet Sequence গুলি কেমন বুঝিলে? আমার মনে হয় ঐ গুলিই তোমার ভাল লাগিয়াছে। অনুবাদ কবিতাগুলির ভাষা কেমন হইয়াছে?

রবীন্দ্রনাথ আমাকে কখনও 'অধ্যবসায়ী কবি' বলেন নাই—বলিতে পারেন না—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! আমি ইচ্ছা করিলে অজস্র কবিতা (ছাপিবার মত) লিখিতে পারিতাম—'অধ্যবসায়' না থাকায় তাহা করি নাই। তোমাকে আমি নূতন 'স্বপন পসারী' বাহির হইলেই পাঠাইব। একখানি 'বিচিত্র কথা'ও দিব। 'বিচিত্র কথা' যদি দেখিয়া থাক তবে, তাহার শেষের লেখাটি পড়িও। তুমি একখানি পুরানো 'স্বপন-পসারী' যে উপায়ে পাইয়াছ তাহা শুনিয়া খুব কৌতুক বোধ করিয়াছি। অনেকের মতে ঐ খানিই নাকি আমার শ্রেষ্ঠকাব্য—তোমার কি মত?

তোমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম; আশা করি তিনি কেবল 'ছন্দসূত্র' রচনাই করিবেন না—ছন্দের প্রাণবস্তুর সংবাদও দিবেন। আশা করি কুশলে আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২১. অধ্যাপক তাবাচরণ বসুকে লিখিত

[জুন ১৯৪২]

ঢাকা

২৩.৬.৪২.

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি যে এত অল্প বয়সে এমন সাহিত্যিক বুদ্ধি ও রসবোধের অধিকারী হইয়াছ, ইহা বড় আনন্দের কথা। কুশিক্ষা ও ধর্মভ্রষ্টতা দোষে বর্তমানবংশীয় বাঙালী সন্তান একটা বড় সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; এবং সেইজন্য দেশে আজ কোথাও সাত্ত্বিক নিষ্ঠা ও নির্মলবুদ্ধির উৎকৃষ্ট ফল কোন বিষয়ে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বাঙালী জাতি তাহার পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। আমার সাহিত্য সাধনা আমার জীবনের গভীরতম উৎকণ্ঠার সহিত যুক্ত হইয়া আছে—উহা আমার অধ্যাত্মসাধনা, এবং একমাত্র সাধনা। সকল সাধনাই এইরূপ একাগ্র বা একমুখী হয় যখন তাহা স্বধর্ম-প্রণোদিত বা স্বভাব-প্রেরিত হয়। এক এক জনের সাধনা এক এক রূপ হয় কেন? তাহার উত্তরে প্রাক্তনের কথা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। ওটা একরকম Fate। যদি তাহা আত্মার পক্ষে উপাদেয় বোধ হয়, তবে ঐ fate-ই 'যমেবৈষ বৃণুতে' মনে করিয়া সৌভাগ্য হইয়া দাঁড়ায়। তুমি আমার 'স্বপনপসারী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে বুঝিলাম তোমার সাহিত্যচর্চা আলস্যবিনোদন নয়—উহার মূলে তোমার আত্মার ক্ষুধা আছে; এবং তুমি পরমসৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। আমার মনে হয় সাহিত্যের সাধনা এবং রসপিপাসা এই দুয়ের যোগ আজকাল শিক্ষিত সমাজে অতিশয় বিরল; তাই আমি শেষে কবিতালেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। "একাকী গায়কের নহে ত গান—গাহিতে হবে দুইজনে"। এ সমাজে কাব্যের বসন্ত ঋতু গত হইয়াছে।

'স্বপনপসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা শেষ হইয়াছে—প্রায় ৩।৪ মাস পূর্বে। প্রকাশক অতিশয় মূর্খ, এবং ঘোরতর ব্যবসায়ী, এজন্য এই ছাপা যেমন শেষ হইতে দেরী হইয়াছে, তেমনই বাঁধাই হইতে প্রায় ১ মাস-এর উপর লাগিয়াছে। আমি মাত্র এক কপি পাইয়াছি—ছাপা ও বাঁধাই কোনটাই আমার পছন্দ হয় নাই। ইহা লইয়া এবং অন্য কারণে প্রকাশকের সঙ্গে আমার বিবাদের উপক্রম হইয়াছে। আমি মানুষটা অতিশয় অচতুর ও বিষয়-বুদ্ধিহীন, এবং উত্তেজনা-প্রবণ; এজন্য বৈষয়িক ব্যাপারে আমি সর্বদাই ঠকিয়া থাকি। বোধ হয়, এক্ষেত্রেও আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। কিন্তু Hebrew Prophet-দের মত আমার মন একটুও অনাচার বা অন্যায় সহ্য করিতে পারে না, একেবারে আগুনের মত উদ্দীপ্ত হয় এবং অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে চতুর ব্যক্তিদের বড়ই সুবিধা হয়,—কারণ সে যে একটা দুর্বলতা, তাহারা বুঝিতে পারে। যাই হোক্, আশাকরি কয়েক খানা বই অন্ততঃ তাহারা আমাকে পাঠাইবে; পাঠাইলে তোমাকে একখানা উপহার পাঠাইব।

তোমার প্রস্তাব ও অনুযোগ অতিশয় যথার্থ; দেখিয়া সুখী হইবে যে বহু পূর্বেই কয়েকটি বিষয়ে অবহিত ছিলাম। পুস্তকের সাইজ ও ছাপার ধরণ অন্যান্য কাব্যের মতই হইয়াছে। একটি উপহার-কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কবিতাটি আশা করি খুব ভাল লাগিবে! সাতটি নূতন ছোট কবিতা যোগ করিয়াছি। ছন্দের ঐ ভুলটি সংশোধন করিয়া দিয়াছি—উহা অনেকদিন যাবৎ আমাকে অসুস্থ রাখিয়াছিল। কিন্তু 'হ্ব'-'ভ'-এর গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে; ও সম্বন্ধে আমার একটা পুরাতন অভ্যাসই বোধ হয় দায়ী। পড়িবার সময়ে ওই দুই উচ্চারণের একটা মাঝামাঝি রকম কিছু করিতে হইবে। 'বিস্মরণী'তেও ('কালাপাহাড়') ঐ রকম আছে। 'গহ্বর' 'গভর' লেখাও চলে কবিতায়। বিদেশী শব্দের glossary দেওয়া খুব উচিত ছিল, তাহাও নানা কারণে হইয়া উঠে নাই—প্রধান কারণ, বোমা-আতঙ্ক; তাড়াতাড়ি ছাপা শেষ করিবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশকের দোষে বিলম্ব কম হইল না, অথচ কাজটিও অসম্পূর্ণ রহিল।

তুমি আমার 'হেমন্ত-গোধূলি'র অনুবাদগুলির প্রত্যেকটি ভাল করিয়া পড় নাই বোধ হয়; যে কয়টি তোমার ভাল লাগিয়াছে, তাহার মধ্যে 'নাগার্জুন' এবং 'প্রেতপুরী' নাই। 'নাগার্জুন' আমার একটি প্রসিদ্ধ কবিতা, অনেকে উহাকে মৌলিক মনে করিয়াছিলেন—অনেকদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাল করিয়া

পড়িয়া উহার ভাবের নূতনত্ব ও সনাতনত্ব দুই-ই বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তথাপি, তোমার রসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়া আমি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি—তুমি যে কয়টি কবিতার নাম করিয়াছ তাহাদের প্রায় সবগুলিই উল্লেখযোগ্য। বইখানিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে, বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। তোমার কাছে যখন বই নাই তখন ভুলগুলি নির্দেশ করিয়া কোন ফল নাই। এ বই তোমাকে একখানি দিবার ক্ষমতাও উপস্থিত আমার নাই, কারণ প্রকাশক অতিশয় অসজ্জন; সে ব্যক্তি আমাকে আর বই দিবে না। আমার যাহা প্রাপ্য ছিল (তাহার হিসাবে) তাহা নাকি সে দিয়াছে। তোমাকে আমার 'বিবিধ কথা' ও 'বিচিত্র কথা' দিবার চেষ্টা করিব। 'স্বপনপসারী' তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে, তাহার তুলনায় আমার 'বিস্মরণী' বা 'স্মরগরল'—পেয় নয় চর্ব্য; অনেকে একথা বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমার মতের বোধ হয় কোন মূল্য নাই। কিন্তু 'বিস্মরণী'র কবি বলিয়াই আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি এককালে ছিল, এখন তাহাও নাই। আমার মনে হয় 'স্বপন পসারী'তে মাদকতা আছে—যৌবনের আবেগ ও দিবা-স্বপ্ন-রচনা আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে শুধুই উপভোগ নয়—রূপপিপাসার সহিত রূপজিজ্ঞাসাও আছে। আমার মনের এই ধর্মই ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—'বিস্মরণী'তে আমার কবিমানস ভাবকল্পনাকে আরও বশীভূত করিয়াছে—যাহা মূলে rcmantic তাহাকে কঠিন classical বন্ধনে বাঁধিয়াই, জীবনের রহস্যবোধকে আরও গভীর করিয়াছে—'মৃত্যু ও নচিকেতা' আমার 'নূরজাহানে'র (স্বপনপসারী) অপর পিঠ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন জানি না—তিনি 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান' পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—নিজের 'কবর-ই-নূরজাহান' ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, 'স্বপনপসারী'তে রসকল্পনার প্রসার বেশি—কিন্তু সংযমের শ্রী কম। 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলিতে—আমার ভাব-কল্পনার কবিত্ব যেমনই হোক—আমি form ও style-এর শেষে পৌঁছিয়াছি—বাংলা গীতিকাব্যে classical style-কে ভাষায় ও ছন্দে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছি। Form ও content-এর এই সাযুজ্যকেই শ্রেষ্ঠ আর্ট বলে, আমার আর্ট ওইখানে আসিয়াই শেষ হইয়াছে; 'পান্থ' ও 'নারী-স্তোত্র' তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। একটা কথা খুব সত্য, আমি Popular কবি নই—আমার গীতিকবিতাতেও Epic গাম্ভীর্য আছে; আমি 'রূপবিলাসী' নই—'রূপতান্ত্রিক'; আমার 'স্মর-গরল' কবিতাটিতে সে পরিচয় দিয়াছি। 'স্বপনপসারী' হইতে 'স্মরগরল' পর্যন্ত কবিমানসের একটা অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বগতির ধারাই পাইবে। ঐ তিনখানি কাব্য একই কবিজীবনের তিনটি অধ্যায়, এবং তাহাতে বিকাশের

ক্রমভঙ্গ নাই। 'মৃত্যুশোক' কবিতা পড়িয়াছ? 'পুরূরবা'র কল্পনারই পরিণতি নয়? 'দেবদাসী' কবিতাটিতে যে ধরণের lyric cry আছে তাহা 'স্বপনপসারী'র ঐ শ্রেণীর কোন কবিতায় আছে? তথাপি 'স্বপন-পসারী'র কবিতাগুলিতে রসের উচ্ছলতা আছে—সেই উচ্ছলতা পরবর্তী কাব্যে নাই, ইহা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু ইহাও জানি, আমি কখনও কবিতা লইয়া খেলা করি নাই; 'স্বপনপসারী' আমার প্রথম কাব্য হইলেও কাঁচা বা অপরিণত নয়। তথাপি, 'স্বপনপসারী'তে আমার পরিচয় ঐরূপ পৃথক করিয়া করিলে, আমাকে জানা হইবে না। পূর্ণ পরিণতি খুঁজিতে হইবে আরও পরে। আমি যে-চক্ষু মেলিয়া নীলাকাশের আলোকসুরা পান করিয়াছি—তারা-ঝলমল অন্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া সেই চক্ষুই শেষে স্বপ্নরসে ঢুলিয়া পড়িয়াছে; সেই স্বপ্নই নিবিড়তর হইয়া অবশেষে আমার চেতনা হরণ করিয়াছে। আমার কাব্যগুলির সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা এই—এ ধারণা যদি তোমাদেরও হয়, তবে বুঝিব—আমার কবি-জীবন-কাহিনী মিথ্যা নয়। কিন্তু 'স্বপনপসারী' সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ, এবং আর সকল কবিতার রস-উপভোগের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আমি তোমার সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হইয়াছি—তুমি যে সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে তাহাতে নিঃসংশয় হইয়াছি।

তোমার ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের যে পরিচয় পাইলাম—অর্থাৎ তুমি পরীক্ষায় বিশেষ উচ্চস্থান লাভ করিতে পার নাই, তাহাতে বিস্মিত হই নাই; তোমার মধ্যে যে ক্ষুধা এবং হজমশক্তি আছে—আমাদের স্কুল কলেজের পাকশালায় তাহার উপযুক্ত অন্ন প্রস্তুত হয় না—আহারের রীতিও তাহার অনুকূল নয়। অতএব তোমার সে বিষয়ে আশানুরূপ ফললাভ না হওয়া, একপক্ষে তোমার প্রাণমনের স্বাস্থ্যই প্রমাণ করে।

তোমার সেই দীর্ঘ কবিতাটি আমাকে পাঠাইলে, আমি ভাল করিয়া পড়িয়া তোমাকে জানাইব। তুমি বাংলা ভাষার চর্চা আরও বেশি করিবে—কলিকাতা University র Honours গোরুর গাড়ীর বোঝা মাত্র, উহাতে ভাষা বা সাহিত্য কোনটারই চর্চা হয় না। প্রথম বৎসরের Drama Paper আমাকে প্রশ্ন করিতে দিয়াছিল, আমি সেই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে যে দীর্ঘ মন্তব্য পাঠাইয়াছিলাম—তার ফলে, আমাকে scriptগুলিও পাঠায় নাই; এবং আমাকে আবার পূর্বের ন্যায় সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। তুমি 'পরিচয়' পত্রিকা এবং তাহার লেখক (যথা শচীন সেন) সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ কর? আমার হাতে উহারা অনেক চাবুক খাইয়াছে। ওসব পড়িও না, পড়িলেও উহাদের মতামত কিছুমাত্র মূল্যবান মনে করিও না। 'ভাগীরথীতীর'-এর

উচ্চারণ এবং idiom দুই-ই নষ্ট হইতে বসিয়াছে,—খুব সাবধানে পূর্ববঙ্গীয় বর্বরতা বর্জন করিবে। 'কিছুটা' লিখিবে না। আমরা বলি—'কতকটা'। রচনাতে, সংস্কৃত idiom সম্বন্ধেও সাবধান হইবে—সংস্কৃতকে বাংলা করিবে, বাংলাকে সংস্কৃত করিবে না। তুমি কতকগুলি বাংলা 'classics' সর্বদা পাঠ করিবে। ভাষাই সব—একথা কখনও ভুলিবে না। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২২. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত
[আগষ্ট ১৯৪২]

ঢাকা
১৫.৮.৪২

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে, পত্র লিখিবার সময় পাই নাই। 'স্বপনপসারী' পাইয়াছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, কেননা এখনও আর কোথা হইতে প্রাপ্তি সংবাদ না আসাতে (পাঁচখানি একদিনে পাঠাই) একটু চিন্তিত ছিলাম।

'স্বপনপসারী'র ছাপা ও বাঁধাই আমার আদৌ পছন্দ হয় নাই—বড়ই কষ্ট বোধ করিয়াছি কারণ, আমার জীবদ্দশায় উহার ঐ মূর্তির বদল আর হইবে না। বড় ইচ্ছা ছিল—উহার ভিতরের মত উপরটাও একটু রসোদ্দীপক হয়। আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ।

তুমি যে ছন্দোবিচ্যুতি ধরিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি ; এমন করিয়া মনোযোগ সহকারে না পড়িলে লেখার সার্থকতা কি ? কিন্তু ঐ ভুলের জন্য আমিই দায়ী। বইখানি শেষের দিকে বড় গোলমাল করিয়া ছাপা শেষ করিয়াছিল—সে একটা কারণ বটে ; আমাকে যে প্রুফ পাঠাইয়াছিল তাহার কপি কাটাকুটিতে ভরা ছিল, কাজেই একটা প্রুফে সব ভুল সংশোধন হইতে পারে নাই ; দ্বিতীয় প্রুফ পাঠাইবার কথা, কিন্তু তাহা করে নাই। বিশেষতঃ ঐ কবিতাটি আগাগোড়া কাটাকুটি করিয়াছিলাম—প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছি, এবং প্রেসের তাড়ায় ভাল করিয়া দেখিয়া দিবার সময় পাই নাই—প্রুফে সংশোধন করিবার

সঙ্কল্প ছিল। কবিতাটি ১৯১১-১২ সালে লেখা এবং 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, খুব সম্ভবতঃ ১৩২৭ বা ২৮ সালে ; তুমি কোনও লাইব্রেরীতে সন্ধান করিতে পারো ; তাহা হইলে আমি উহার কিরূপ সংস্কার করিয়াছি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে—কাঁচা লেখাকেও কতখানি পাকা করিয়া তোলা যায়। এমনও হইতে পারে, তোমার হয়ত' সেই প্রথম পাঠটিই ভাল লাগিবে। কাঁচা ছিল বলিয়া আমি উহাকে 'স্বপনপসারী'র প্রথম সংস্করণে স্থান দিই নাই। এখন দেখিতেছি সংশোধনের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় কবিতাটি আমার উপরে প্রতিশোধ লইয়াছে—কারণ, আর যাহা হউক, সেই প্রথম রচনায় এইরূপ গুরুতর ভুল ছিল না। সেখানে ঐ দুই লাইন এইরূপ ছিল—

পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-বালুকায়,
শিহরিবে দুটি-তনু শীতল সমীরে—

অতএব দোষ আমারই, প্রুফ রীডারের নয়, যদিও প্রেস আমার সঙ্গে বঞ্চনা করিয়াছে। আমি আর শেষে কবিতাগুলি ভাল করিয়া পড়ি নাই ; বইখানার প্রতি আমার কেমন একটা ঔদাসীন্য ঘটিয়াছে। কেবল দুই একটা ছাপার ভুল যাহা চোখে পড়িয়াছিল. দাগ দিয়াছি।

তোমরা (কাহারা ?) Paradise Lost অনুবাদ করিতেছ শুনিয়া বুঝিলাম তোমরা একটু গুরু রকমের সাহিত্যিক ব্যায়াম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। Paradise Lost 'অনুবাদ' করা হয়ত অসম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহার 'বাদ' যে ভাবভূমিকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহাকে হিন্দুর ভাবে ও ভাষায় অবিকৃত রাখা সম্ভব নয় ; এবং তাহার ছন্দ—যাহার নিকটে মধুসূদনও পৌঁছিতে পারেন নাই—তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য নয়,—অসম্ভব। প্রত্যেক কাব্য বা কবিতা অনুবাদ করিবার সময়ে তাহার ভাবমণ্ডলটি লক্ষ্য করিবে—যদি তাহা কোন বিশেষ জাতির সাধনা ও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একান্ত অনুগত হয়, তবে তাহার অনুবাদ পণ্ডশ্রম। মিল্টন শুধুই বড় কবি নহেন—বড় খ্রীষ্টান ; একটা অতি কঠিন ধর্মবিশ্বাসের গভীর আবেগ তাঁহার কল্পনামূলে বিদ্যমান। অতএব, তোমরা Paradise Lost-এর সেই সেই অংশের অনুবাদ করিতে পারো—যাহাতে মানব-সাধারণের প্রাণস্পন্দন, সার্বজনীন ভাবুকতা ও সৌন্দর্যবোধ প্রকটিত হইয়াছে।

Mathew Arnold-এর 'Sohrab and Rustum' এককালে আমি অনুবাদ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—অনুবাদযোগ্য বটে। ঐ কাব্যের শেষ পংক্তিগুলি ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তুমি Paradise

Lost-এর ভাষা কথঞ্চিৎ বাংলায় ধরিতে পারিলেও, এই কাব্যখানির style এখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে তোমার 'রবীন্দ্রবিয়োগ-গাথা'র সম্বন্ধে বলি। ঐ রচনা ভাব-অর্থের দিক দিয়া এবং বিদ্যাবত্তার প্রমাণ হিসাবে তোমার মত তরুণ লেখকের একটি প্রশংসনীয় কীর্তি। তোমার পত্রগুলিতে যে মনস্বিতা, সাহিত্যিক আদর্শনিষ্ঠা, রসবোধ এবং রসপিপাসা—এককথায় যে বাণীব্রহ্মের উপাসনার পরিচয় পাই—এই কবিতাটিতে তাহাই পরিপূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছে; কিন্তু যে রস-প্রেরণায় কাব্যসৃষ্টি সম্ভব, তাহার পরিচয় নাই—বরং বিপরীতই আছে। ইহার কারণ, তুমি বাংলা ভাষা—বিশেষ করিয়া তাহার বাক্যরীতির স্ব-ভাবকে লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করা দূরে থাক—তাহাতেই উৎসাহ বোধ করিয়াছ। সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য বাংলা রচনায় দোষাবহ নয়, যদি তাহা ভাবার্থপ্রকাশের বাংলা রীতিকে পীড়িত না করে; অর্থাৎ যদি সংস্কৃত শব্দকে বাংলা করিয়া লইতে পার। সর্বদা ইহাই মনে রাখিবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা; তুমি সংস্কৃতবিদ্যার অনুরাগী হইতে পারো, কিন্তু তাই বলিয়া সে অনুরাগের আতিশয্যে বাংলাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারো না; কারণ তাহার ঘরে আর কাহাকেও প্রভুত্ব করিতে দেওয়াই তাহাকে অসম্মান করা। তোমার সাহিত্যিক দীক্ষা কতকটা বাংলা-বিমুখী বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে—আমি নিজে সংস্কৃত বিদ্যা এবং sanskrit eloquence-এর অনুরাগী, তাহা তুমিও বুঝিয়াছ; কিন্তু, বাংলার উপরে দাঁড়াইয়াই সংস্কৃতকে অভিবাদন করি—উল্টারকমে নয়। মধুসূদনের ভাষা যে খাঁটি বাংলা—তাহার ঐ সংস্কৃত শব্দবাহুল্য সত্ত্বেও তাহার প্রকাশরীতি যে উৎকৃষ্ট কাব্য-রীতিই বটে, তাহার উদাহরণস্বরূপ মধুসূদনের ভাষা এবং তোমার রচনার অংশবিশেষ একত্র উদ্ধৃত করিলে পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবে। অতএব আমি তোমাকে এ বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিতে বলি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য ভাষা যে সংস্কৃতের দ্বারাই সঞ্জীবিত হইয়াছে তাহা যেমন সত্য, তেমনই—দুইভাষার দুই বিভিন্ন ধাতুর মিলন-সাধনে যে শক্তি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাই বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম হইতে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তোমার কবিতাটি কোন 'বাঙালী' (সংস্কৃত-বিদ্যা যাহার নাই) পড়িয়া বুঝিতে পারিবে না। এইজন্যই ঐ রচনা কোন পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তুমি ঐ কবিতা বাংলায় না লিখিয়া সংস্কৃতে লিখিলে বোধ হয় সার্থক হইত। এবিষয়ে তুমি নিজে খুব ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া, ভবিষ্যতে সাবধান হইবে। নতুবা তোমার অতি উৎকৃষ্ট ভাব-কল্পনা প্রকাশের প্রয়াসও ব্যর্থ হইবে।

উপরে তোমার রচনার স্টাইল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে 'Sohrab and Rustum' এর ভাষার অনুবাদ তোমার পক্ষে এখনই সুসাধ্য হইবে না। Mathew Arnold ঐ কাব্যে, কাব্যের একটি আদর্শ বা নীতির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা এই যে, উৎকৃষ্ট কাব্যের বিষয়বস্তু যেমন সার্বজনীন মানবহৃদয়ের সরল অনুভূতি—elemental emotions and passions, তেমনই কাব্যে তাহার প্রকাশও যতদূর সম্ভব সরল ও সহজভঙ্গিতে হওয়া চাই; এবং সকল ভঙ্গির মূল ভঙ্গি—ভাষা। এইজন্যই তিনি আদিম মানবীয় কাব্য Epic-কেই কাব্যের আদর্শ করিয়াছেন এবং সর্ববিষয়ে তাহার যে সারল্য, সেই সারল্যকে তাঁহার কাব্যে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য Sohrab এর ভাষা ও ছন্দ দুই-ই অতিশয় সহজ হৃদয়বেদ্য। উপমাগুলি চিত্রাত্মক, এবং ভাষা অর্থ অপেক্ষা ভাবের দ্যোতক, ছন্দও সহজ অথচ গম্ভীর। ভাষায় ও ছন্দে lyric এর সরলতার সহিত আদি এপিকের গাম্ভীর্য যুক্ত হইয়াছে। কাব্য হিসাবে এমন অপূর্ব বস্তু আর নাই—আমি উহার অতিশয় ভক্ত। এখন বাংলায় ঐ ভাষা এবং ছন্দ-সুর রক্ষা করা কি সামান্য শক্তির কাজ! ভাষা যেমন সরল—তেমনই গাঢ়বন্ধ, সুসংযত ও গম্ভীর হওয়া চাই। তোমার স্টাইল ত ইহার ঠিক বিপরীত। আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করিতে চাই না—কেবল, কাজটির দুরূহতা সম্বন্ধে সজাগ রাখিতে চাই।

আমি একটি কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম বলিয়াছি; কাজটি শেষ হইয়াছে, উপস্থিত অন্য একটি কাজের জন্য কিছু লেখাপড়া করিতেছি। যে কাজ শেষ করিয়াছি তাহা আমার পক্ষে নূতন, একখানি বাংলা কবিতা সংকলন-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি তাহা ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই কাজে লাগিবে। পরে যথা সময়ে তোমাকে একখণ্ড পাঠাইব। এক্ষণে বাংলার আদি কবি 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইতেছি কারণ পদকর্তা চণ্ডীদাসকে 'বিশেষজ্ঞ' পণ্ডিতগণ প্রায় উড়াইয়া দিতেছেন, এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজটি আমার পক্ষে অনধিকার চর্চার মত, কিন্তু উপায় নাই; বাংলা সাহিত্যের একটা বড় জিনিষকে লইয়া সাহিত্যিক পণ্ডিত-মূর্খেরা—প্রত্নপ্রেতগ্রস্তগণ—বড়ই অনাচার আরম্ভ করিয়াছেন; আমি খাঁটি সাহিত্যের পক্ষ হইতে তাহার একটা প্রতিবাদ করিতে চাই।

তোমাকে একটা কথা বলা বোধ হয় উচিত। আমার পত্রের উত্তর দিতে তোমার অধিক বিলম্ব হওয়া উচিত নয়; তোমার পত্রের উত্তর দিতে আমার বিলম্ব

হওয়া তেমন অসঙ্গত নয়। আমার সময় খুব কম—বহুস্থানে পত্র লিখিতে হয় তৎসত্ত্বেও তোমাদের মত তরুণ জিজ্ঞাসুদিগকে আমি সর্বদাই বিশেষ যত্ন সহকারে, বিস্তারিত পত্র লিখিবার চেষ্টা করি ; এইজন্য যে, তাহাতে তোমাদের কিছু উপকার হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ পত্র লেখার ফলে যদি দেখি যে বহুকাল কোন সাড়াশব্দ নাই, তবে আমার ইহাই ধারণা হইবে যে, তোমাদের মনে তেমন ঔৎসুক্য নাই ; আমারও আবশ্যকতাবোধ থাকিবে না।

আশা করি কুশলে আছ। তোমার পরীক্ষার ফল কি হইল, জানিতে চাই। আমার স্নেহাশিস জানিবে। ইতি—

২৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৪২]

ঢাকা
২৭.১০.৪২.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি আমার ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন ; আপনার মিতাকে আমার ৺বিজয়ার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানাইবেন। তাঁহাকে উপস্থিত পৃথক পত্র লিখিতে পারিলাম না,—বড় ব্যস্ত আছি, তার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি চিঠি জমিয়া উঠিয়াছে, শরীরটা আমার বড় অসুস্থ হওয়ায় সব একেবারে চুকাইয়া দিতে পারিতেছি না। আপনার মিতার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি এবং আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আপনাকে পূর্বপত্রে লিখি নাই—আমি 'কবি-পরিচয়' প্রসঙ্গে অতিশয় সংক্ষিপ্ত দুই চারিটি তথ্য যোগ করিতেছি। আর কিছু নয়—কবিগণের জাতিকুল-বংশপরিচয়, জন্মস্থান ও কর্মজীবনের কিঞ্চিৎ সংবাদ—এই মাত্র। কবিগণের স্বহস্ত লিখিত সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি। কারণ, পরে এ বিষয়ে যেন কোন বিতর্কের কারণ না থাকে ; অনেকে ইংরাজী বৎসর ও তারিখ দিয়া থাকেন—দুইই দিলে ভাল হয়, ইংরাজী হিসাবে সবসময়ে বাংলা বা বাংলার হিসাবে ইংরাজী ঠিক হয় না, তাহা আপনি জানেন। জন্মমাসটা জানা থাকিলে ভাল হয়। আপনার সম্বন্ধে খুব

সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞাতব্য কিছু লিখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। কবিদের পরিচয় তাঁহাদের কবিতায়, সেই কবিত্ব বা প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই চারিটি সারবান মন্তব্য ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন আমার পুস্তকের নাই। কিন্তু এমন দুই চারিটি সংবাদ হয়ত দিতে পারিলে ভাল হয়, যাহাতে কবির কাব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

আপনি আমার পত্রের উত্তরে নিজের সম্বন্ধে যে বিনয়পূর্ণ confession করিয়াছেন, তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি আমার কবিতা বুঝিতে অনিচ্ছুক নন, তাহা আমি জানি। আপনার লেখার মধ্যে আপনার সাহিত্যিক চরিত্র এত স্পষ্ট হইয়া আছে যে আপনাকে কেহ ভুল বুঝিতে পারে না। আপনি শুধুই ভাববিলাসী আর্টিষ্ট কবি নহেন, আপনার ভাবুকতায় প্রবল সত্যনিষ্ঠা আছে; আপনার 'ভাব' এত মর্মান্তিক এবং আপনার ভাষা এমন খাঁটি। ঠিক যে কারণে আপনার কবিতা মূল্যবান,—সেই কারণেই আপনার কল্পনা অতিশয় আত্মনিষ্ঠ——আত্মকেন্দ্রিক; আপনার রসানুভূতির পরিধি সঙ্কীর্ণ। আপনার অনুভূতি যেমন গভীর, আপনার উক্তিও তেমনই অকপট; আপনার কবিচিত্তে 'বহু'র প্রতিনিধিত্ব নাই বলিয়া আপনার কবিতায় যেমন একটি বিশেষ স্ফুরণ দেখা যায়, তেমনই ক্রিটিক হিসাবে আপনি একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। আপনার প্রকৃতিতে একটা loyalty বা faithfulness আছে; আপনি একাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, 'a man of strong conviction'—আপনার কবিধর্ম ও হৃদয়ধর্মে বিরোধ নাই। আমার কবিতা আপনি বুঝিতে কষ্ট পান। ইহাতে আমি আদৌ আশ্চর্য হই নাই, এবং তজ্জন্য আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়াছে। আপনার কোন ভাণ নাই—কোন pretensions নাই। অথচ আপনি চিন্তাশীল ও পণ্ডিত—আপনার মনের অস্ত্রও তীক্ষ্ণ ও শাণিত। রচনার মধ্যে ভাব-অর্থের সহজ সঙ্গতি, শব্দ প্রয়োগের অব্যর্থতা, কল্পনার একটা সুপরিচ্ছন্ন রূপ এবং অনুভূতির ঘনিষ্ঠতা—আপনার কবিতায় এই লক্ষণগুলি আমাকে মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে আর একটি দুর্লভ গুণ আছে—ভাবের দীপ্তিমুখে ভাষায় যেন আপনা হইতে অলঙ্কারের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। ইহার কোনটাই আমার নাই—আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা কি, আমি তাহা বলিব না—হয়ত বলাও নির্ভুল হইবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানি আমার ধর্ম আপনার ধর্ম নয়। তবে আমি যে আপনার কবিতা বুঝি, কিন্তু আপনি আমার কবিতা বুঝিতে বেগ পান, তার কারণ, আপনার সাহিত্যিক কালচার অন্যরূপ; আমি অতি অল্প বয়সে য়ুরোপীয় কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য—ইংরাজী Elizabethan ও Romantic কাব্য—আমি মদের

মত আকণ্ঠ পান করিয়াছিলাম; এজন্য সংস্কৃত কাব্য, এমন কি রবীন্দ্রনাথও আমাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে নাই। যাক্ কতকগুলা হয়ত অবান্তর কথা বলিলাম—হাসিবেন না।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—আপনার ঠিকানা ভুলিয়াছি। এজন্য আপনার মিতার ঠিকানায় দিলাম।

২৪. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[মার্চ, ১৯৪৩]

ঢাকা

৭.৩.১৯৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করি। সংক্ষিপ্ত হইলেও উহারই মধ্যে আপনার হৃদয় ও মনের স্পর্শ পাই। আপনি সাহিত্যরস পিপাসু এবং জিজ্ঞাসু, এজন্য আপনার সহিত আমার প্রকৃত আত্মীয়তা বোধ করি। এখানে আমার তেমন আত্মীয়-বান্ধব নাই তাই 'উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং' ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ঢাকায় প্রায় ১৫ বৎসর বাস করিলাম—আমার যিনি জীবনদেবতা তিনিই আমার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কলিকাতার সাহিত্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে আমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই নির্বাসন বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ইহার ফলে পিপাসা বা আস্বাদনের নেশা জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে, নিজেরই ভাব ও ভাবনার মধ্যে সে ক্রমাগত আশ্রয় খুঁজিয়াছে। কাব্যরস একা ভোগ করিবার নয়; মন বাহিরের দিকে মুক্ত এবং অপর সহৃদয় রসিক মনের সহিত যুক্ত না হইলে রসজীবন পুষ্ট হয় না। নিঃসঙ্গ জীবন যোগ-সাধনার অনুকূল, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, রসের রসায়নে প্রাণের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় না। ঢাকায় থাকিয়া সাহিত্যের যে সাধনা করিয়াছি, তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের কতটুকু উপকার হইবে জানি না। আমার নিজের দেহ-মনের স্বাস্থ্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনার পত্র পড়িয়া ঈর্ষা হয়, আপনি পুণ্যবান, আপনার রসজীবনের স্বাস্থ্য অটুট আছে।

নূতন কাব্য বহুকাল পড়ি নাই, নূতন গল্প বা উপন্যাসও ইদানীং আর বিশেষ পড়ি নাই। Michael Sholokoff এবং Somerset Maugham-এর লেখায়ই আমার আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে শেষ সার্থক পরিচয়। আমার বিশ্বাস, খুব শক্তিমান লেখক—যাঁহাদিগকে শুধুই জীবনশিল্পী নয়, জীবনদ্রষ্টা বলা যায়—তাঁহাদের সংখ্যা কোন যুগেই বেশি নয়; কাব্য, গল্প ও উপন্যাস আর্ট হিসাবে যতই বিচিত্র হউক, সেই বৈচিত্র্যই রস-পিপাসা উদ্রেকের কারণ হইলেও আত্মাকে গভীরভাবে প্রবুদ্ধ করে রচনাবলীর বৈচিত্র্য নয়, লেখকের দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্য—জীবনকে দেখিবার সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গী—যাহা দ্বারা জীবনের একটা অপ্রকাশিতপূর্ব দিক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ দ্রষ্টা বেশি নাই। কারণ, সে কেবল শিল্পীর সৌন্দর্য-সৃষ্টি নয়, খণ্ড ক্ষুদ্র তুচ্ছকে রসবৎ করিয়া তোলা নয়,—অসীম অকূলকে উদ্ভাসিত করা যাহাকে Great Art নাম দেওয়া হইয়াছে। আমি চিরদিনই সেই তীর্থের পথিক। তাছাড়া আমি সাহিত্যকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ বা সাধনমার্গ বলিয়া মনে করি। মানুষের প্রাণ মন দেহ ও আত্মার যতকিছু উৎকণ্ঠা সকলই এই সারস্বত সাধনায় নিবৃত্তিলাভ করা চাই।

সম্প্রতি কিছুকাল সাহিত্য সাধনার অবকাশ ও সামর্থ্য দুই-ই কমিয়াছে, স্বাস্থ্য এক কারণ; দ্বিতীয় কারণ সাংসারিক ও বৈষয়িক দুশ্চিন্তা; তৃতীয় কারণ এখানকার য়ুনিভার্সিটির নানা সংকট। তার উপর কতকগুলি বই প্রকাশিত করিয়া কর্মফল ভোগ করিতেছি। অধিকাংশ প্রকাশকই অতিশয় দুর্জন ও অমানুষ, মূর্খ ও অসাধু। চিঠি লিখিলেও উত্তর দেয় না; টাকা ত' দেয়ই না, ভদ্রতা বা সৌজন্যও নাই। "কাব্যমঞ্জুষা" আর একবার মুদ্রিত করা প্রয়োজন, কাগজ নাই, তার জন্যও বহু চেষ্টা করিতেছি। এখান হইতে সহসা চলিয়া যাইতেও হইতে পারে, সে অবস্থায় কি যে করি, সে চিন্তাও আছে।

এই অবস্থাতেও 'শনিবারের চিঠি'র জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হয়, সে একরকম বাধ্যতামূলক। তবু সে একরকম ভালই, কারণ তবু অভ্যাসটা বজায় থাকে। এবার কিছুদিন ধরিয়া একটি অপ্রিয় কাজ করিতেছি, আপনি বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। কর্তব্যবোধেই করিতেছি, আপনার কি মত?

কি পড়িতেছি, আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—সাহিত্য সমালোচনার বই কিছু কিছু পড়িতেছি—একদিকে Outline of Literature বা বিশ্বসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আর একদিকে আমার একটি অতিপ্রিয় পুরাতন বই আবার পড়িতেছি ও মহাকাব্য পাঠ করার মত মুগ্ধ হইতেছি। বইখানির নাম The Martyrdom of

Man by Winwood Reade. একটু নমুনা দিই। বিশাল মানব-ইতিহাসের অতিদূর অতীতের দিকে চাহিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"Since those great monuments (পিরামিড) were raised the very heavens have been changed. When the architects of Egypt began the work there was another polar star in the northern sky, and Southern Cross shone upon the Baltic shores. How glorious are the memories of those ancient men whose names are forgotten for they lived and laboured in the distant and unwritten past. Too great to be known, they sit on the height of centuries and look down on fame."

আর এক জায়গায় বৈজ্ঞানিকের সূর্যবন্দনা পড়ুন—

"Glorious Apollo is the parent of us all. Animal heat is solar heat, a blush is a stray sunbeam. Life is bottled sunshine and Death the silent-footed butler who draws out the cork."

কিছুদিন যাবৎ গীতাও পড়িতেছি, প্রত্যহই পড়ি, এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

'সাহিত্য-বিতানের' একটা review আপনি লিখিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। 'প্রবাসী' ছাপিবে ?······

আশাকরি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার প্রীতি সম্ভাষণ লইবেন।

ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৫. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[মে ১৯৪৩]

ঢাকা

৩০.৫.১৯৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি, পরে দুই তিন দিন হইল আপনার উপহার 'কুমারসম্ভব' পাইয়াছি, তজ্জন্য ধন্যবাদ। পত্রের জবাব দিতে দেরী হইল, তার কারণ, আপনার পত্রে যে সকল সংবাদ চাহিয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিতে সময় লাগিয়াছে।

প্রথমেই কাজের কথা বলি। আপনার পুত্রের সরকারী চাকরী সংগ্রহের সংবাদ সুসংবাদ বটে—কারণ চাকুরী হিসাবে 'মূল্যবান' না হইলেও কর্ম হিসাবে শুচি ও সাত্ত্বিক। আমি তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। কিন্তু প্রথমেই ঢাকার মত স্থানে আসিতে হইতেছে—ইহাই একটু ভাবনার কথা। স্থানটি অতিশয় খারাপ। একে ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রায় নিত্য ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে, তার উপর মিলিটারীর চাপ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কলেজের বাড়িটি মিলিটারী দখল করায় এখন কলেজ এমন স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে—যাহাকে ভদ্র বা নিরাপদ স্থান বলা যায় না। এতদিন আমাদের এই রমনাতেই য়ুনিভার্সিটির খুব নিকটে ছিল, তাই খবরাখবরও পাওয়া যাইত, এখন তাহার কোন খবরই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়, কলেজটি সরকারী কলেজ হইলেও এখন তাহা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের খাসমহল হইয়া উঠিয়াছে—হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। আমরা রমনাতেই বাস করি—ঢাকা শহরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়; তার উপর যদি কোন বিশেষ এবং নিম্ন শ্রেণীর বস্তী হয়, তবে ত সেদিকে যাতায়াতই থাকে না। এই কারণে সংবাদ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল। আপনার প্রথম জ্ঞাতব্য সংবাদ এই যে, ঢাকায় তেমন ভাল মেস পাওয়া দুর্ঘট—যাহা আছে তাহাতে সহসা স্থান পাওয়া শক্ত। দুই একটি Officers' Mess আছে চেষ্টা করিলে স্থান মিলিতে পারে; কিন্তু শ্রীমানের আসিতে ত এখনও বিলম্ব আছে, আমি পরে সবিশেষ জানিয়া একটি seat পূর্বাহ্ণেই ঠিক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব—বোধ হয় অগ্রিম ভাড়াটা দিয়া রাখিলেই চলিবে। যদি যথাসময়ে না মেলে তাহা হইলে এখানে যে একটিমাত্র

Hotel আছে, সেখানেই অল্পদিনের জন্য উঠিলেই চলিবে, পরে দেখিয়া শুনিয়া একটি ব্যবস্থা করিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। আমি নিজে এখন একটি ছোট বাংলো বাড়ীতে থাকি; এবং উপস্থিত যেভাবে ঝি-চাকরহীন অবস্থায় অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া দিন কাটাইতেছি, তাহাতে আপনার পুত্রের মত আত্মীয়স্বজনকেও একদিনের জন্যও থাকিতে বলা উভয় পক্ষেই বিড়ম্বনা। তিনি আসিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যাই হোক, এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব আমি করিবার চেষ্টা করিব - সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

আপনার দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য সংবাদ আপনি বোধ হয় কোন উপায়ে কলিকাতা হইতেই সংগ্রহ করিলেই ভাল হয়। এখানে যতটুকু জানিয়াছি তাহা এই যে, যাহার স্থানে আপনার পুত্র নিযুক্ত হইতেছেন, তিনি অনেক পূর্বেই পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং তাহার স্থানে অস্থায়ী ভাবে আর একজন মোহম্মদীয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে স্থায়ী করা হয় নাই দেখা যাইতেছে, তাহারই স্থানে আপনার পুত্র নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় ঐ Vacancy এইবার স্থায়ী ভাবে filled up হইল—আদৌ যিনি ছিলেন তিনি আর ফিরিবেন না। শুনিলাম যিনি মধ্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি বর্তমান প্রিন্সিপ্যালের জামাতা। সেই জামাতার স্থানেই আপনার পুত্রের নিয়োগ হইয়াছে—ইহাও তেমন শুভযোগ বলিয়া মনে হইতেছে না। কাজের কথা এই পর্যন্ত।

আপনার পত্রে আপনাদের সহিত আমাদের কুটুম্ব সম্বন্ধ—আপনি যাহার যাহার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। কাশীতে ওকালতী করে যে সেই বীরেন আমার পিতার নিকটতম জ্ঞাতিসম্পর্কের ভাগিনেয়—এলাহাবাদের সেনেদের (দেবেন সেন, সুরেন সেন) আপনার ভগিনীর পুত্র। তাহারা (দুই ভাই) আমাকে খুব ভালরূপ জানে। আমার পিতামহ ও পিতা উভয়েই পর পর একমাত্র পুত্র (আমিও এক্ষণে তাহাই) হওয়ায়, আমার পিতৃবংশে আমার নিকটতর জ্ঞাতি কেহ নাই—এজন্য কিছু দূর হইলেও উহারাই আমার নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু আপনার এক পিসিমার বিবাহ হইয়াছিল আমাদের বংশে—এই সংবাদটি সবিশেষ জানিতে অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ; আমার মা এখনও বাঁচিয়া আছেন, আপনি আরও সঠিক জানাইলে আমি তাঁহার নিকটে বোধ হয় আরও জানিতে পারিব। আমাদের বংশের দেশস্থ মূল এখন আমাতেই বিদ্যমান ; পশ্চিমাঞ্চলে দুই তিনটি শাখা আছে, তাহার মধ্যে এলাহাবাদের উঁহারাই বৃহত্তম ও কীর্তিমান। মূল প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে—বাস্তুও এতদিনে লোপ পাইল।

আপনার 'কুমারসম্ভব' দেখিলাম ও পড়িলাম। কাব্যখানির সম্বন্ধে যেমন প্রশংসার যথেষ্ট আছে, তেমনই আপত্তির কারণও অনেক আছে। আপনার রচনাটি যদি সম্পূর্ণ আপনার হইত তবে প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গত হইত না। কালিদাসের মহাকাব্যখানিকে আপনি যে কৌশলে একখানি গীতিকাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে আপনার কবিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আপনি মহা-কাব্যের প্রাকৃতিক অরণ্যশোভাকে বিলাসীর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহাতে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস চাপা পড়িয়াছেন, অথচ উঁকি দিতেছেনও বটে। যাহারা কালিদাস পড়ে নাই ও পড়িবে না তাহাদের ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না বরং লাভই হইবে। কিন্তু কালিদাসের কাব্যজগৎই স্বতন্ত্র, যদি তাহারা মনে করে যে আপনার এই কাব্যের মারফতে তাহারা কালিদাসের কবিপ্রতিভার একটা পরিচয় অতি সহজেই লাভ করিল, তবে বড়ই ভুল করাই হইবে; অথচ এইরূপ ধারণাও অনিবার্য। কিন্তু আপনার কাব্যখানি, যে অংশে কালিদাস তাহাতে কালিদাসের যথার্থ পরিচয় নাই বরং পরিচয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কালিদাসের কাব্যের গল্প বা কাহিনীটিই সর্বস্ব নয়—এমন কি, তাহা এক হিসাবে অপ্রধান বলাও চলে—যদিও এই কাহিনীর মধ্যে একটা বড় Philosophy of life আছে, এবং সেই Philosophy Hindu Culture-এর একটা গূঢ়তত্ত্বের পুষ্পিত রূপ—'কুমারসম্ভবের' সেই রূপক রূপটি আজিও উদ্‌ঘাটিত করা হয় নাই। হিন্দু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি—হিন্দুর অধ্যাত্মবাদকে যে অপূর্ব কবি-দৃষ্টির বলে মানুষের জীবনধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটা চির-বিরোধের সমন্বয় করিয়াছেন—সৃষ্টির মূল প্রবৃত্তি কামকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া আবার তাহাকে যে ভাবে যে অর্থে পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে সংসার ও অপরদিকে সন্ন্যাস এই দুই এর মধ্যে সেতু যোজনা হইয়াছে। বৈদিক ধর্মের পরে উপনিষদ (তাহারও পূর্বে সাংখ্য) এবং বুদ্ধের সন্ন্যাসধর্ম এবং গীতা, এই সকলের ভিতর দিয়াও হিন্দুর যে মূল সংস্কার কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করে নাই—সেই সংস্কারের একটি কাব্যময় ঘোষণা—'কুমারসম্ভবে'র কাহিনীতে চিত্রিত করিয়াছেন। অতএব কাহিনীর মূল্য ও কম নয়। কিন্তু কালিদাসের কবিপ্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য এই কাব্যের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার অপূর্ব উপমা, তাঁহার Humour তাঁহার চিত্রাঙ্কন চাতুর্য, তাঁহার Keats সুলভ sensuousness, তাঁহার phrase-রচনায় আশ্চর্য বাণী-প্রতিভা এবং সর্বোপরি তাঁহার সেই সকল উক্তি—যাহাদের একাধারে বৈদগ্ধ্য ও অর্থগৌরবের Classical কবিতার প্রধান ঐশ্বর্য রহিয়াছে—সেগুলির

দিকে কিছু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত এবং সংক্ষেপেও রাখা যাইত। আপনার কাব্য-খানিকে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি হিসাবে দেখিলে কোন আপত্তির কারণ ঘটে না, কিন্তু আপনি যে কবিকে অনুসরণও করিয়াছেন এবং অনেকস্থলেই অনুবাদও করিয়াছেন। আবার এই অনুবাদের পংক্তিগুলিতেই স্থানে স্থানে গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে—এই দোষ অনায়াসে বর্জন করা চলিত—আপনার মিতা ও শ্রীযুক্ত কালিদাস এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই কেন? আমি দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। "ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ"—আপনি অনুবাদ করিয়াছেন 'শিখির চূড়া বায়ুতে চিরিয়া যাইতেছে'। তাহা ত নয়! কিরাতের কোমরে যে শিখিগুচ্ছের বেষ্টনী বাঁধা থাকে তাহাই প্রতিকূল বায়ুর প্রভাবে চিরিয়া যাইতেছে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট "picturesque detail," কালিদাসের কবি কল্পনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

২। "মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ"—"অঙ্গুলীকৃত" নয়, "মুকুলীকৃত"—কালিদাসের Keatsian রূপাচিত্রাঙ্কনী প্রতিভার আর একটি অপূর্ব নিদর্শন। অঙ্গুলী হইতে করমূল পর্যন্ত হাতখানিকে যদি একটি প্রস্ফুটিত ফুলের (যথা 'পদ্মের') সহিত তুলনা করা যায়, তবে 'মুকুলীকৃত' অর্থে, সেই হাতখানি আবার মুদিত হইয়া যাওয়া—কালিদাস ঐ একটি মাত্র শব্দের দ্বারা আমাদের চোখের সম্মুখে যে চিত্র ধরিয়াছেন তাহা এই:—পার্বতীর অক্ষমালা এতক্ষণ হয়ত করমূলে বা তাহার কিছু উর্দ্ধে নামিয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে সেটিকে তিনি হাতের একেবারে অগ্রভাগে খুলিয়া লইলেন (জপ করিবার সময় যেমন করা হয়), তাহাতে আঙুলের ডগাগুলি একত্র হইল, এবং সে করপদ্ম উন্মীলিত হইল তাহা যেন 'মুকুলীকৃত' হইল। Keats এর একটি অপূর্ব পংক্তি স্মরণ হয় 'As though a rose should shut and be a bud again'। "অঙ্গুলীকৃত" শব্দটির এখানে কোন অর্থই হয় না—একটি স্বাভাবিক চিত্রও নহে।

৩। "কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধক্যশোভি বল্কলম্ বদ প্রদোষে স্ফুট-চন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥" (আমার নিকট এক্ষণে বই নাই স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিলাম)—এমন উপমা কালিদাসেও বেশী নাই। এই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কালিদাসকে ইংরাজী শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবিদের পাশে একটি উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আপনি এই শ্লোকটিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন—আপনার সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু কালিদাসেরও কি হুঁস হয় নাই? এই শ্লোকটির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়—সে অবকাশ নাই। কিন্তু "স্ফুট-চন্দ্রতারকা বিভাবরী" আর "জ্যোৎস্নাবরণী যামিনী"

কি এক? 'জ্যোৎস্না' ত একখানি শুক্লচেলাম্বর মাত্র—"আভরণ" কোথায়? চন্দ্রতারকার ঝলমল করা রাত্রির রূপই কবিকে এখানে এমন Romantic কল্পনায় আবিষ্ট করিয়াছে। তাই যে উপমা একমাত্র Byron ছাড়া আর কোন ইংরাজ কবিও দিতে পারেন নাই—রূপসী রমণীর সঙ্গে রাত্রির তুলনা—তাহা একমাত্র এই কবির পক্ষে সম্ভব হইয়াছে—Byron কেবল একটি মাত্র কথায় যাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন "She walks in beauty like the night" কালিদাস তাঁহার Keatsian রূপ-তৃষ্ণার বশে তাহাকে আরও ভাস্বর ও চক্ষুগোচর করিয়াছেন। তারপর, "অরুণায় কল্পতে"—সমগ্র উপমাটির প্রাণ তথা কবির কবিত্বের চরম প্রকাশ রহিয়াছে এই phrase-টিতে। ইংরাজী ভাষায় ইহার অর্থ "pales into grey dawn" তার অনুবাদ কি "রৌদ্রবাস"? যাহা উজ্জ্বল তাহা মলিন না হইয়া আরও প্রখর হইয়া উঠিল এ উপমার এখানে সার্থকতা কি? 'অরুণ' অর্থ—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ধূসর বর্ণহীন আলো পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের "অরুণ-ধূসর পথে" স্মরণ করুন।

আমি দুই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম—আপনাকে ইহার অধিক বুঝাইতে হইবে না। আপনি কালিদাসের কাব্যখানি আর একটু ভাল করিয়া পড়িয়া লইলে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার পক্ষেও ক্ষতি হইত না। আপনি অনেকস্থলে যাহা বর্জন করিয়াছেন, তাহা না করিলেই ভাল হইত—কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্যের যতখানি সম্ভব আপনার এই স্বকীয় কাব্য-রচনাতেও ধরা দিতে পারিলে, আপনার কাব্যখানির নিজস্ব কবিত্ব অধিকতর সমৃদ্ধ হইত। ইন্দ্র-মদন সংবাদ খুব দীর্ঘ নয়—উহার সবটুকু দিলে মদনের চরিত্রটি নাটকীয় চিত্র হইয়া উঠিত—কালিদাসের কবিশক্তির আর একটি দিক প্রকাশ পাইত। আপনি মূল কাব্যের যে দ্রুত paraphrase করিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্যই এত দ্রুত যে মনে হয় গ্রহণ ও বর্জন বিষয়ে আপনি বিশেষ মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই—নিজের গীতিকল্পনার একাগ্র আবেগে যেমন অনেকস্থলে আপনি মূলের সূত্রটি মাত্র ধরিয়া নূতন কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলিই সৌন্দর্যকল্পনার লঘুলীলায় যেমন রসোজ্জ্বল তেমনই চমকপ্রদ তেমনই অপর অনেকস্থলে মূলকে ধরিয়া রাখিতে গিয়াই তাহার সম্যক রসগৌরব ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। আপনার কৈফিয়ৎ পড়িলাম—উহাতেও আপনার বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও রচনানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে—apology-টিও আলঙ্কারিক চাতুর্যে উপভোগী হইয়াছে—কিন্তু যুক্তি খুব দৃঢ় বা নিশ্ছিদ্র হয় নাই। Shakespeare-এরও modernised version হইতেছে—আধুনিক বেশবাসে ও

আধুনিক রুচিসঙ্গত করিয়া, Shakespeare-এরও নাটকগুলির জন্মান্তর ঘটানো হইয়াছে। আপনি কালিদাসের কাব্যের কতকটা সেইরূপ—শুধু ভাষান্তর নয়—ভাবান্তর ঘটাইয়া রবীন্দ্রযুগের রসবন্যাশেষে এই অর্ধমগ্ন তরল পিচ্ছল পঙ্কভূমিতে একটি জলকুমুদীরূপে তাহাকে রোপণ করিয়াছেন—তাহাতে এই পঙ্কভূমির কিঞ্চিৎ শোভাবৃদ্ধি হইবে—বর্ণে গন্ধে অনেকেই মুগ্ধ হইবে—উহার ওমর্‌খৈয়ামী অঙ্গ-প্রসাধন উহাকে একটি বিশিষ্ট পাত্র-গৌরব দান করিবে—কিন্তু আশঙ্কা হয়, উহার দ্বারা না কালিদাস না আপনার কাহারও কবিশক্তির সম্যক্ মর্যাদা আদায় করা যাইবে। এই কাব্যে আপনার যে কৃতিত্ব নাই তাহা নয়—কালিদাসকে একেবারে বাদ দিয়া বিচার করিতে পারিলে তাহা স্বীকার করিতেই হয়—কবিত্ব যেটুকু আপনার নিজস্ব সেইটুকুই উহার গৌরব। ঠিক এই ধরণের কাব্য রচনা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই, সে হিসাবেও আপনার কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু আমাদের মত কালিদাসভক্ত পাঠকের পক্ষে বহুদিনের সংস্কার ত্যাগ করা কঠিন বলিয়াই বোধ হয় আমি আপনার কাব্যখানি পাঠ করিয়া, তাহার মধ্যে আপনার নিজস্ব স্টাইলটি উপভোগ করিলেও, কালিদাসের কাব্যের ঠিক এই ধরণের রূপান্তর অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমার বহুদিনের ধারণা কালিদাসের কবি প্রতিভার আধুনিক মতে বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে—কালিদাসের classicism-এর মূলে যে Romantic কবিচিত্তের প্রেরণা রহিয়াছে—যাহাকে দেশীয় পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত কোন মূল্য দেন নাই, এবং যাহা আছে বলিয়াই কালিদাস প্রাচীন হইলেও চির-আধুনিক—সেই রোমান্টিক দিকটিকে বিশেষ করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিবার দিন আসিয়াছে অথবা আসিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহা দেখাইতে হইলে গোটা কালিদাসকেই চাই—বেদান্তসূত্রের নানা ভাষ্যের মত, কালিদাসের কাব্যেরও অভিনব ভাষ্য রচিত হওয়া উচিত এবং তাহা শুধুই সমালোচনায় নয়—অনুবাদেও। আপনার কাব্যখানি আমি যে উপভোগ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য—তথাপি এই অপ্রিয় সমালোচনা কেন করিলাম—আশা করি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আপনার মিতা ও আপনি উভয়ে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৬. অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৩]

ঢাকা

১৫.৭.৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠি যথাসময় হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু আজও পর্যন্ত তার উত্তর দিবার সুযোগ ঘটেনি—অথচ সর্বদাই মনে ছিল। আজ এতদিন পরে সেই উত্তর লিখছি।

দেশে আপামর সাধারণের যে ভীষণ অবস্থা ক্রমেই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আত্মা অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে, কিছুতেই আশা বা আনন্দ নাই। নিজের দুঃখযন্ত্রণা যতই অধিক হউক, বাহিরে মানুষের অবস্থা যদি ভালো দেখি, সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে যদি নিরাশ না হই, তবে ব্যক্তিগত দুঃখকেও দমন করা সম্ভব হয়, চিত্তের অন্তস্তলে গভীরতর আনন্দ অনুভব করা যায়, উহাতেই শক্তিসঞ্চার হয়। কিন্তু মহাকালের যে মূর্তি ক্রমে প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভিতরের সেই জীবনীশক্তিও লোপ পাইতেছে। তার উপর আমার স্বাস্থ্য বড় ভাঙিয়া পড়িতেছে—কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না। Nervous breakdown স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর gastric trouble, blood-pressure প্রভৃতি। তাই একমাত্র দৈব বা ভগবান ছাড়া আর কোন ভরসা নাই। যদি বাহিরের এই দারুণ দুর্যোগ ও ভিতরের এই অবস্থা সত্ত্বেও এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠি তবে তাহা নিতান্তই ভগবানের কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এখন আর সব আশা ত্যাগ করিয়াছি। যদি না বাঁচি তবে সবচেয়ে দুঃখ এই যে আমার সাহিত্য-সেবা ও সাধনা বড়ই অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। এত কাজ করিবার ছিল! যাহা করিয়াছি তাহা এক-তৃতীয়াংশও নয়। আরও দুঃখ এই যে আমার কাজ আর কাহারও দ্বারা সম্পূর্ণও হইবে না—তাহা যদি হইত, যদি সে আশা করিতে পারিতাম তবে এত দুঃখবোধ করিতাম না। আমি এতকাল যে সাধনা করিয়াছিলাম, যে আদর্শ ধরিতে পারিয়াছিলাম এবং যে বিচারবুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিলাম তাহা এযুগে আর কাহারও পক্ষে সুলভ হইবে না; এমন কি আমার নিজের পক্ষেও (যদি জন্মান্তর থাকে) জন্মান্তরে তাহা সুলভ হইবে না। কিন্তু তাহা বোধ হয়

ব্যর্থ হইতে চলিল। যাক আজ যে প্রলয় আসন্ন তাহাতে আমার এইরূপ আক্ষেপ তুচ্ছ ও হাস্যকর।

'বঙ্কিমচন্দ্র' আর অগ্রসর হয় নাই। অনেক আলোচনা অনেক দিন হইতে করিয়াছিলাম, লিখিবার অবসর পাইলেই তাহা বোধ হয় এক বৎসরেই শেষ হইতে পারিত। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রলয় আসন্ন মনে করিয়া এবং নিজের স্বাস্থ্য, সংসার এবং স্থানীয় অবস্থার অনিশ্চয়তা প্রভৃতির জন্য সেই কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। ভাবিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করিব এবং তাহা শেষ করিতে পারিলেই নিজের ব্রত কতকটা উদ্‌যাপন হইল মনে করিয়া একটু তৃপ্তি লাভ করিব। কিন্তু তাহার তো কোন আশাই আর দেখিনা। একটা খুব বড় কাজ প্রায় আরম্ভ করিয়াছিলাম—একটি আদর্শ সাহিত্য-প্রকাশ-ভবনের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—উৎকৃষ্ট সাহিত্য সুসম্পাদিত করিয়া প্রকাশিত করার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলাম এবং তাহার জন্য যেরূপ সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ capitalist পাইয়াছিলাম তাহাতে মনে হইয়াছিল—জীবনের শেষ পর্বে একটা সত্যকার কাজ করিয়া যাইতে পারিব—কিন্তু সে আশাও অঙ্কুরে বিনাশ হইয়াছে—কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

আমার দুইখানি বই (নতুন) ছাপা হইতে পারিল না—'শ্রীমধুসূদন' ও 'আধুনিক বাংলা ছন্দ'। তাছাড়া 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণও ছাপিবার কথা ছিল। এই সকলের অবসরে 'আধুনিক বাংলা গদ্য' ও 'আধুনিক বাংলা কাব্য' (আধুনিক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর) নামে দুইখানি ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক ছাত্রপাঠ্য পুস্তক এবং রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র একখানি উপযুক্ত টীকাভাষ্য সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ও ছিল। আরও যা সঙ্কল্প ছিল, তাহা শুনিলে আপনি খুবই আনন্দিত হইতেন এবং আমারই মত নিরাশ হইতেন। বাংলা কবিতার একখানি Golden Treasury এবং গদ্যের একখানি Typical Selections সম্পাদন করিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইংরেজী G. T. S. সংস্করণের মত একটা Series (বাংলা কবি ও কাব্যের) আরম্ভ করিতাম। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রত্নমালাও Uniform Volume-এ রীতিমত সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। বর্তমান সাহিত্যেরও উৎকৃষ্ট সংকলন কি আদর্শে ও কি প্রণালীতে করিব তাহাও স্থির করিয়াছিলাম। এখন সকল সঙ্কল্পই 'উত্থিত হৃদি লীয়ন্তে' বা 'গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা' মিলাইয়া গেছে। শারীরিক অবস্থার সঙ্গে এই মানসিক অবস্থা যোগ করিলেই আমার বর্তমান দশার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

আমি এখন কিছুকাল যাবৎ দার্শনিকগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিতেছি। সাহিত্যজিজ্ঞাসা ও জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা যোগ করিতে চাই, তাহাতে বোধ হয় আমার দৃষ্টির কিছু প্রসার ঘটিবে এবং যদি বাঁচিয়া থাকি তবে কিছু উপকার হইবে। এইরূপ গুরুতর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে খুব লঘু সাহিত্য (বিশেষ করিয়া ইংরেজী ছোট গল্প)—নূতন এবং পুরাতন—পড়িয়া থাকি। সম্প্রতি Henry James এবং Galsworthy-র দুই চারিটি গল্প পড়িলাম। Galsworthy-র লেখাই অতি. উচ্চস্তরের বলিয়া মনে হইল। মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি যদি পান তবে 'Five Tales' নামক ছোট গল্প-সংগ্রহটি পড়িবেন এবং কেমন লাগে জানাইবেন। আপনার পত্রে অনেক নূতন লেখকের নূতন প্রশংসা থাকে। আমার রুচি বা মনোভাব একটু aristocratic এবং conservativeও বটে। নূতন সবকালেই প্রথমে অজ্ঞাৎকুলশীল থাকে বটে কিন্তু নূতনত্বের মধ্যেও একটি 'চিরন্তনের' গূঢ় প্রবৃত্তি না থাকিলে কোন কবিকে বড় কবি বলা যায় না। এই যে অতিশয় নূতনের মূর্তিতে চিরন্তন মানুষের সেই গূঢ় গভীর পরিচয়, ইহাই খাঁটি রস-সংবেদনার কারণ। কেবল আমাদের অতিজাগ্রত মনের তৃপ্তিসাধন হইলেই চলিবে না — গভীর চেতনায় পরম রহস্যবোধ চাই। এমন লেখক কোন যুগেই সংখ্যায় বেশী হইতে পারে না—ইহাই আমার বিশ্বাস। লেখক কেবল শক্তিমান হইলেই হইবে না—কেবল 'ভাল' লেখা নয়—চটকদার বা চমকপ্রদ হইলেই হইবে না—অতি স্থির ও গভীর দৃষ্টির প্রমাণ চাই। আপনি কি বলেন?

আজ এই পর্যন্ত। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ স্নেহসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৭. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Bagnan Po.
Howrah
4.12.45.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আবার পীড়িত হইয়া পড়ায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হইয়াছে—কোনরকমে টিকিয়া আছি।—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রায় ২ সপ্তাহ ক্রমাগত একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়া আছে—উপস্থিত আমাশয় রোগে ভুগিতেছি। অতএব বুঝিতে পারিতেছেন, আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া কিরূপ অসম্ভব। আপনার সাদর নিমন্ত্রণ আমি শিরোধার্য করিয়াছি, কিন্তু তাহা মনে মনেই—কাজে পারিলাম না। আমি কলিকাতায় যাইতেও সকল সময়ে সাহস করি না, কোথাও রাত্রিবাস করিবার সামর্থ্য নাই। কেবল গুরুর কৃপায় এখনও বাঁচিয়া আছি এবং কিছু সাহিত্যকর্ম এখনও করিতে পারি ; নহিলে আমার শরীরের যে অবস্থা তাহাতে আমি প্রায় Invalid হইয়া আছি।

বাংলা সাহিত্যের অরাজক অবস্থা আমাকে এতই পীড়িত করে যে আমি আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর নিজের কাব্যচর্চা ছাড়িয়া বাংলা সাহিত্যের কোষ্ঠী ও দশাবিচার করিতে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। কিছু ফল হইয়াছে, হাওয়া একটু ফিরিয়াছে। সাহিত্যের ধর্ম ও তাহার সত্যকে আমি যথার্থ শিক্ষিত বাঙালীর মনে একটু জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে—কেননা, আমার লেখার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি অনেকের পড়িয়াছে। সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য যে কি বস্তু তাহা বাঙালী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—সহজ রসবোধও হারাইয়াছে। এজন্য, আমি সাহিত্যের কয়েকটি মূলতত্ত্ব পণ্ডিতসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে যেমন চেষ্টা করিয়াছি, তেমনই কবি মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার রস-বিচার করিয়া যতদূর সম্ভব সাধারণের রুচি ও রসবোধ জাগ্রত ও মার্জিত করিবার চেষ্টাও করিতেছি। কাব্যের আদর্শ আধুনিক অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে—এজন্য আমি একালের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, দুই-

একজনের যেমন করুণানিধান ও সত্যেন্দ্রনাথের—ইতিমধ্যে করিয়াছি। আপনার কবিতার যে রস তাহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে—আপনার কবি-প্রাণ ও কবি-প্রতিভার মধ্যে বাঙালীর একটি নিজস্ব রস-পিপাসার ভঙ্গি আছে; এজন্য আমি অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়াছি যে, আপনার কবিতার একটা পরিচয় অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইহাও জানি যে, কবির বা কবিতার পরিচয় দিতে হইলে কতকগুলি কথাই যথেষ্ট নয়। আসল পরিচয়, কবির রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সম্মুখে তুলিয়া ধরা। আমাদের দেশে সে পদ্ধতি এখনও প্রচলিত হয় নাই—কবিরা নিজেরা যে 'চয়ন' বা 'সংকলন' গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া থাকেন তাহাতে কাজ হইবে না; একজন উপযুক্ত সমালোচকের হাতে বাছিয়া ঝাড়িয়া খুদ-কাঁকর বাদ দিয়া এমন কয়েকটি কবিতা তুলিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে রসিকমাত্রেরই চমক লাগে—ইহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন; তারপর পাঠকগণ কবির সকল রচনা আগ্রহ করিয়া পড়িবে এবং নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে। আপনার মত কবির পক্ষে এইরূপ 'কবিতা-নির্বাচন' দ্বারা পরিচয় সাধন বড়ই আবশ্যক—একখানি দেড় শত পৃষ্ঠার ছোট বই যদি ভাল করিয়া সংকলন ও সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আপনি অবিলম্বে বাংলার রসিকসমাজে আপনার যোগ্যস্থান লাভ করিবেন। আপনি অনেকটা স্বভাবকবির মত নিরন্তর কবিতায় আপনার কবিহৃদয়কে মুক্ত করিয়া দিতেছেন—ওই অজস্র কাব্য-জল-বিন্দুর সবগুলিই মুক্তা হইয়া উঠিতে পারে না; যেগুলি হইয়া উঠে, সেগুলি অপর বিন্দুগুলির মধ্যে হারাইয়া যায়, সকলের চোখে পড়ে না। আপনি যাহা লেখেন তাহার সবই আপনার কবি-হৃদয়ের দিক দিয়া সত্য ও অর্থপূর্ণ, কিন্তু কবিতার দিক দিয়া সকলই সার্থক নয়; ইহার কারণ, আপনি কবিতা 'রচনা' করেন না, আপনার কবিতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"They write themselves." আপনার কবিপ্রকৃতিতে implicit criticism নাই। এইজন্য আপনার কবিতায় যেমন একটি অপূর্বগুণ প্রকাশ পায়, তেমনই তাহার 'রস-রূপ' (art) অনেক সময়ে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আপনার কবিতা হইতে কাব্যের সেই রসরূপ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইবে—কেবল ভাষাই যথেষ্ট নয়, 'রূপ'ই আসল বস্তু। এজন্য আমার মনে হইয়াছে, আপনার কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট 'চয়ন' শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমি যে প্রবন্ধ লিখিতে মনস্থ করিয়াছি সেই প্রবন্ধও ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা' হইতে পারে—চয়ন আমি করিয়া দিব। এজন্য আপনার পরিণত বয়সের রচনা আরও অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা দরকার। গত দশ বারো বৎসরে বোধ হয় আপনার

কোন কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই—ইহাই একটি বড় অসুবিধা হইয়াছে। আপনি মাসিক পত্রগুলি হইতে কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলে ভাল হয়।

আপনার নিজের জীবনের একটু ইতিহাস পাইলেও ভাল হয়। যে সকল কথা আপনার কবি-জীবনের প্রাসঙ্গিক—বাল্য কৈশোর ও যৌবনে যে পরিবেষ্টনী ও যে ধরণের সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল আপনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, আপনি কি ধরণের কাব্য-সাহিত্য হইতে আপনার কবি-হৃদয়ের পুষ্টিলাভ করিয়াছেন —কেবল এই সকল বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলে বোধ হয় আমার কাজে লাগিবে।

আমি এ পর্যন্ত এই বইগুলি পাইয়াছি— শতদল, নূপুর, বনমল্লিকা, একতারা, রজনীগন্ধা, উজানি, অজয়, বীথি, চূণকালি, (তূনীর আমার কাছেই ছিল)। আর কিছু আছে? থাকিলে পাঠাইবেন। কিন্তু আপনার আধুনিক অজস্র (মাসিকপত্রে প্রকাশিত) কবিতার কি হইবে? আমার মনে হয় সেই কবিতা-গুলিতেই আপনার পরিণত রচনা-শিল্পের পরিচয় আছে।

পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল। আমি অতিশয় অসুস্থ তার উপর, অনেক সাহিত্যিক ঝঞ্ঝাট নিত্য সহ্য করিতে হয়—অনেক চিঠি লিখিতে হয়। কাজও একটা নয়, যেমন সাহিত্যের দায় আছে, তেমনই সংসারের দায়ও কম গুরুতর নয়; এই অসুস্থ-অবস্থায় জীবিকার ভাবনাও আছে; নিজের বইগুলিকেই জীবিকার উপায় করিয়া তুলিতে হইতেছে—নানা ফন্দি-ফিকিরও করিতে হইতেছে। এই সব কারণে, আমার সাহিত্যিক জীবন যেমন খণ্ডিত হইয়াছে তেমনই সামাজিক কর্তব্য ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারি না। আমার পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে দুঃখিত হইবেন না। 'কাব্য-মঞ্জুষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ লইয়া ব্যস্ত আছি—অনেক নূতন কবিতা থাকায় notes লিখিতে বড় বেগ পাইতেছি। দুইখানি গ্রন্থও শীঘ্র ছাপা শেষ হইবে—প্রুফ দেখা, ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া বিব্রত আছি। আমার একখানি নূতন কবিতার বই (ছেলেদের জন্য) বাহির হইতেছে—বাহির হইলেই আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। বইখানি আমার দুই মৃতা কন্যার নামে উৎসর্গ করিয়াছে। উৎসর্গের কবিতাটি আপনাকে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইলাম—আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। বইখানির নাম দিয়াছি—'রূপকথা'।

চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের বুকের তলার অন্ধকারে,
কোথায় আছিস্, আছিস্ কি নেই—সে কথা কেউ বল্‌তে নারে।

মন যে বলে অট্ট হেসে, 'মিথ্যা সে সব ছায়ার মায়া',
প্রাণ কেঁদে কয়, 'দেখছি তবু সেই ছায়ারি অচল কায়া!'
আছিস তোরা—আছিস বেঁচে আমার নিশাস চোখের জলে,
থাকবি নে আর, ডুবব যখন আমিও সেই আঁধার-তলে।

আজকে শুধুই নাম দু'টি এই পুঁথির 'পরে দিলাম লিখে
কি বলে' যে আশিস্ করি—জানিনে সেই বচনটিকে!
'বেঁচে থাকো' এমন কথা বাপের মুখেও নেই যে আজ
মানুষ যদি এতই পাপী—বিধির তা'তে হয় না লাজ?
ধর্ মা তোরা তোদের বাপের বুক-ভাঙা এই ব্যথার দান,
তোদের কথাই 'রূপকথা' যে - এম্নি আমি ভাগ্যবান!

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৮. রমেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯৪৬]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বাগনান পোঃ

(বি. এন. আর.)

২৫.১.১৯৪৬

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'শতাব্দী' পড়া শেষ হইয়াছে। আমি অন্যত্র উহার পরিচয়মূলক আলোচনা করিব। আপনার পত্রের উত্তরে এই কয়টি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি।

বইখানি পড়িয়া আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই উপন্যাস একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। ইহা বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনও মনে

হইতেছে, আপনিই নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন—একেবারে বাংলার বাঙালীর নবজীবন। এই উপন্যাস এমন সময়ে বাহির হইয়াছে যখন আমাদের মহারথীরা তাঁহাদের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন—এখন নিজ নিজ সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে জর্জর করিয়া চীৎকার ও আর্তনাদ করাইতেছেন। আপনার লেখাটিতে কি ভাবে, কি ভাষায় কোথাও চিৎকার নাই, দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ, তেমনই স্থির ;·কল্পনা অতিশয় সংযত—কোনখানে অতিরিক্ত রং মসলা নাই, ভাষাও তদুপযুক্ত। এই ভাষাই আপনার রচনাটির জীবন—উহাই আপনার প্রধান কৃতিত্ব, আপনার দৃষ্টি বা মনোভাব, কল্পনার সমগ্র রূপ, রচনার যাহা কিছু কৌশল তাহা ঐ ভাষাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে ; ঐ ভাষাই তাহা ধরিয়া আছে। সকল শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ ইহাই—ভাষাই সব ; প্রেরণা যদি সত্য এবং সম্পূর্ণ হয় তবে লেখক তাহার উপযুক্ত ভাষাও লাভ করেন—ঐ ভাষাই তাঁহার স্ফূর্তি, উহাই শক্তি, উহাই আনন্দ। এই উপন্যাসে আপনি কোথাও এতটুকু আত্মভ্রষ্ট হন নাই, অর্থাৎ ফাঁকিদেন নাই—আপনার সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহার সকল উপকরণ যোগাইয়াছে—একটা জীবনের যাহা কিছু সঞ্চয় এবং প্রাণপূর্ণ উপলব্ধি, আপনি ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাই ইহা এত সত্য ও সফল হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনি আর কোন উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিবেন না, করিলেও তাহা পুনরাবৃত্তি হইবে মাত্র ; আবশ্যকও নাই, কারণ অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতেই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে, আপনি বাঙালী জীবনের, তথা সমাজের, একেবারে মূলে বা তলদেশে দৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জীবনের অতিশয় সরল ও সহজ ধারাটিকে আধুনিক কালের বিশাল জীবন-সমুদ্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। অথচ, কোন মতবাদের উগ্রতা নাই, চরিত্রসৃষ্টিতে কোন জটিলতা নাই—নাটকীয় ঘটনার চমক বা কাব্য-কল্পনায় রংও নাই। নায়ক রাজেশ্বরের জীবন ও তাহার চরিত্রকে ঘেরিয়া যে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারা যেমন স্বতন্ত্র ও সজীব, তেমনই কাহিনীরও সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইয়াছে। নায়ক চরিত্রের যে বিকাশ এই উপন্যাসে দেখানো হইয়াছে যাহাকে ইংরাজীতে growth বা development বলে, এমন আমি বাংলা উপন্যাসে অল্পই দেখিয়াছি। তা'র কারণ, এই চরিত্রটিই যেমন উপন্যাসের মেরুদণ্ড, তেমনই ইহার স্বরূপটি আপনার কল্পনায় অতিশয় সত্য ও গভীরভাবে ধরা দিয়াছিল—ঐ একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনের স্পর্শে আর সকল চরিত্র জীবন্ত হইয়া

উঠিয়াছে। কল্পনার এই কেন্দ্রটি ঠিক ছিল বলিয়াই আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

দোষ-ত্রুটিও কিছু কিছু আছে—বা থাকিতেও পারিত। শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়ি করিয়াছেন। রাজেশ্বরের জীবিতকালের একটা তারিখ আপনি গোড়া হইতে ঠিক রাখিয়াছেন। সমস্ত কাহিনীটির একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে—এই উপন্যাসে তাহার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু শেষের দিকে ঘটনা অতিশয় বর্তমান বলিয়াই মনে হয়—রাজেশ্বরের বয়সের সহিত তাহা মেলে কি? গান্ধী-অ'ন্দোলন পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পৌঁছে কি? আপনি এখানে একটু গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজেশ্বর, শেষ পর্যন্ত হিন্দুই রহিল? তবে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কোন্ মতে সম্পন্ন হইল? এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থি শিথিল হইয়া আছে—তাহাতে বাস্তবতার হানি হয়।

তৎসত্ত্বেও আপনার এই উপন্যাস একটি অভিনব রচনা; অভিনব এবং অতিশয় সহজ ও ধীর, গভীর বলিয়াই সহসা সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতেও পারে, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার লক্ষ্য ভেদ হইয়াছে। একটা বিষয়ে আপনি সত্যই অপরাধ করিয়াছেন—এত ছোট অক্ষরে ছাপা উচিত হয় নাই—উপন্যাস-পাঠক সর্ববিষয়েই একটু আরাম চায়, এজন্য অনেকেই বিমুখ হইতে পারে। বইখানি আরো সুশ্রী হওয়া উচিত ছিল।

পুনরায় আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৯. দিলীপকুমার রায়কে লিখিত
[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭]

Bagnan P. O
Howrah
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

শ্রীদিলীপকুমার রায়,
প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন পরে পত্র লিখিতেছি। শুনিলাম আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন।

কয়েকদিন হইল আপনার "ভূস্বর্গ-চঞ্চল" বইখানা হাতে পড়িয়াছিল, বইখানি পড়িয়া বড়ই তৃপ্তিবোধ করিয়াছি। আমার মনে হয় এই বইখানিতে আপনার ষ্টাইল পরিণতিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ ভাবসাধনা ও রসসৃষ্টি (Expression) সাযুজ্যলাভ করিয়াছে। এমন অনেক কথা ঐ বইখানিতে আছে যাহা চিরন্তন সত্য হইয়াও একটি ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধিরসে অতিশয় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বইখানি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

ঐ বইখানিতেই আপনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বড় ভাল লাগিয়াছে। আমি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষের একটি সাহিত্যিক আলেখ্য রচনা করিয়াছি—আপনি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু, আপনাকে তাহার একখণ্ড পাঠাইতেছি। পড়িয়া দেখিবেন—আমার ভাবনা-কল্পনায় কোন ভুল আছে কিনা।

আমার প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩০. দিলীপকুমার রায়কে লিখিত
[মার্চ ১৯৪৭]

Bagnan P. o.
B. N.Rly. (Howrah)
২২ ফাল্গুন, ১৩৫৩

শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়
প্রীতিভাজনেষু,

আপনার প্রেরিত উপহার ও পত্র পাইয়াছি। বহু ধন্যবাদ। ফটোখানি বড়ো সুন্দর হইয়াছে এবং বয়সের হিসাবে 'বনং ব্রজেৎ' কথাটার জয় ঘোষণা করিতেছে। কারণ, উহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যাহারা যৌবনেই বনকে আশ্রয় করে, তাহাদের আর সেই বয়স আসে না যে বয়সে বনে যাওয়াই প্রশস্ত। অতএব আপনি অতিশয় বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন—আপনার তুলনায় আমরা যথার্থই নির্বোধ।

আপনার পত্রে আপনি 'নেতাজী' বইখানির সম্পর্কে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন আপনার অভিমত হিসাবে আমি তাহা মূল্যবান মনে করি।

শুধুই সাহিত্য-পন্থা নয়, বোধ হয় অধ্যাত্মমার্গেও আপনি আমা হইতে ভিন্ন-পন্থী, কাজেই যে-দৃষ্টিতে আমি সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেছি আপনি ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না—সুভাষের মধ্য দিয়া আমি যে-দেবতাকে পূজা করিয়াছি সেই দেবতা আপনার 'ইষ্ট' নহে, তাহা আমি জানি। আপনার জগতে বাস না করিলেও আমার সাহিত্যিক রসদৃষ্টি বা কল্পনাশক্তির দ্বারা আমি আপনার সাধনা ও সেই সাধনালব্ধ আনন্দ ও বিশ্বাস অন্ততঃ উত্তমরূপে পরোক্ষ করিতে পারি—আপনার নানা রচনায় আপনি নিজেকে যেরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারি। তাই ইহাও জানিবেন যে, মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতভেদ অনিবার্য হইলেও তাহা ব্যক্তিগত—কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে সত্যের উপাসনা বা আরাধনা থাকে তবে গভীরতর আত্মিকচেতনায় একটা সমপ্রাণতা থাকিবেই- আশা করি তাহা আছে। আপনার পত্রে আপনি সেই সত্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমি সুখী হইয়াছি।

সুভাষচন্দ্র আপনার বাল্যবন্ধু, আপনার সহিত তাঁহার একটি সাক্ষাৎ-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে-সম্বন্ধ আত্মীয়তার সম্বন্ধও বটে। আমার সহিত তাঁহার সে-সম্বন্ধ ছিল না অথচ আমি অনুভব করি, আমার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি আমাকেই তাঁহার আত্মার স্বধর্মী বলিয়া বুঝিতেন; স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব বা শ্রদ্ধা নয়—একেবারে spiritual kinship। হয়ত সুভাষচন্দ্রের সেই 'আত্মা' আপনার বরণীয় হইতে পারে না, যদি হইত তবে আপনার সাধনা ও সাধনমন্ত্র মিথ্যা হইত। গীতা বলিয়াছেন, "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—ঠিক এই অর্থে আপনি কি সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধাবান্? আপনার ভালবাসা গভীর ও অকপট—আপনার শ্রদ্ধাও সেই বন্ধুপ্রীতি, বা সুভাষচন্দ্রের একটা দিক—তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্যের প্রতি আপনারই স্বভাবের অনুরূপ অংশের আকর্ষণ। কিন্তু তাঁহার সমগ্র Personality বলিতে যাহা বুঝায় আমি একটি স্বতন্ত্র "বুদ্ধিযোগের" দ্বারা তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছি—সে-পক্ষে আপনার বাধা আছে, থাকাই উচিত ও স্বাভাবিক, তাই আপনি কোনো কোনো বিষয়ে আমার নির্ভীক সত্যবাদিতার প্রশংসা করিলেও—এবং আমার সুভাষ-প্রীতিতে সম্পূর্ণ যুক্ত হইলেও—যে তত্ত্বের আলোকে আমি তাঁহাকে পাঠ করিয়াছি, তাহার অনুমোদন করিতে না পারায় বইখানির উপভোগে কিছু বাধা ঘটিয়াছে। আপনি খাঁটি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত, এবং শাক্ত হইলেও উচ্চাধিকারী নই; আপনার বাধা কোথায় তাহা আমি বুঝি। তাই আপনার সত্যভাষণে আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি। আপনি যে আপনার সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন,

তাহারও প্রমাণ পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি—আপনার জীবন ফুলের মতই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হউক—এই কামনা করি। আপনার বই দু'খানি যত্নের সহিত পাড়িব। 'ভাগবতী কথা' ভাল লাগিতেছে। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি—

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ আপনার "ভূস্বর্গ-চঞ্চল" একখানি পাঠাইলে আনন্দিত হইব।

৩১. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত
[জুন ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮ ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট,
কলিকাতা—১
Kailas Chandra Ghose Road
Barisa P. O.
(24 Pargs.)
12. 6. 1947

প্রীতিভাজনেষু

আপনার নাটক 'তরঙ্গ' ডাকযোগে পূর্বেই পাইয়াছিলাম—পরে আপনার কার্ড পাইয়াছি।

আপনার কোন রচনা ইতিপূর্বে পড়িবার সুযোগ হয় নাই—এজন্য এই নাটকখানিতে প্রথম পরিচয় হইল। বাংলা নাটক বা নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে আমি খুব উৎসাহী নই। কাব্যপ্রধান নাটক রচনা বাংলায় এ পর্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবজীবন বা সমাজ-সংসার কতকগুলি নাটকে নাট্যোচিত রসরূপ লাভ করিয়াছে। এইজন্য মনে হয় বাঙালীর নাটক-রচনা অতিশয় বর্তমান বা প্রত্যক্ষ-বাস্তবকে ধরিয়াই সাফল্যলাভ করিবে। ঐখানে তাহার কল্পনাদৃষ্টি সংহত ও সংযত হয়—কাব্যের ভাববাষ্প কিছু কঠিন বা জমাট হইয়া উঠে; শুধুই ভাবের রসাবেগ নয়—জীবনের শক্তির দিকটাও সে অপরোক্ষ করে; সেই শক্তির নানা রূপই নাটকের উপজীব্য। আপনার নাটকখানিতে আপনি সেই শক্তিরই একটা রূপ—যেমনই হোক, যতটুকুই হোক—দেখাইতে পারিয়াছেন, এজন্য নাটকখানি

সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ঘটনাবস্তু আপনাকে কল্পনা করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতেও আপনার বাস্তবদৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে। কিন্তু এই রচনায় আপনার যে প্রকৃত শক্তির প্রমাণ পাইতেছি, তাহা ঐ চরিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রণে; প্রত্যেকটি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তিধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নাটকের action-টি হয়ত যথাস্থানে সমাপ্ত হয় নাই (এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে) কিন্তু উহাতে গতি আছে, তাপ আছে, স্ফুলিঙ্গ আছে। মোটের উপর নাটকখানি পড়িয়া আমি খুসী হইয়াছি।

আপনি যে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন উহাও অতিশয় সরস হইয়াছে—ঐ ভাষা এ নাটকের রসসৃষ্টির পক্ষে বড় কাজে লাগিয়াছে। তবে, বাস্তব তথ্যের দিক দিয়া, ইহার ঐ ঘটনাবস্তু পূর্ববঙ্গের নয়, উহার ঘটনাস্থল যে মেদিনীপুর তাহাতে পাঠক মাত্রেরই (যাহারা খবর রাখে) বিশ্বাস হইবে। কিন্তু তাহাতে নাটকের কোন ত্রুটি নাই।

'তরঙ্গ' নামটি সুষ্ঠু হয় নাই—ছবিখানির সঙ্গেও মেলে না। ছবি না দেওয়াই ভাল; ঐরূপ ফ্যাসনের দাস না হওয়াই ভাল। আজকাল অতিশয় অপাঠ্য গল্প-কবিতা ও উপন্যাস ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হয়—এজন্য ঐ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে সকলকেই এক শ্রেণীর বলিয়া মনে হইতে পারে। লেখা ও লেখকের আভিজাত্য নষ্ট হয়।

আপনার ভাষা শুদ্ধ ও সংযত, তথাপি দুই একটি প্রয়োগ অশুদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহা দাগ দিয়া রাখিয়াছি। যথা—

"ছোটবেলা" নয়—'ছেলেবেলা'।

"ধ্বনি দিচ্ছে"—ভাষায় রীতিদোষ আছে।

"অন্তরীক্ষে"—'নেপথ্যে' হইবে। 'অন্তরীক্ষ' অর্থে আকাশ। নাটকে দেবদেবী নাই; কাজেই 'অন্তরীক্ষ' শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয় নাই।

'র' ও 'ড়' উল্টাপাল্টা বড় বেশী হইয়াছে, যথা—

পগাড়ে (পৃঃ ২৯)—'পগারে' হইবে।

ন্যাকরা (পৃঃ ৪৭) (পৃঃ ৫৫) }—'ন্যাকড়া' হইবে।

'চেরী' (পৃঃ ৬৬)—'চেড়ী' হইবে।

'চড়কীবাজী (পৃঃ ৭২)—'চরকিবাজী' হইবে।

'সড়া' (পৃঃ ৭৩)—'সরা' বা 'শরা' হইবে।

'নদীর পার' (পৃঃ ৮৯)—'নদীর পাড়' হইবে।
(নদী পার হওয়া অন্যে অর্থে)।

কয়েকটি Idiom ভুলও আছে। যেমন—

'পান বানিয়ে' (পৃঃ ৬২)—'পান সেজে' হইবে।

'নাম হাসাবে' (পৃঃ ৬৪)—'নাম ডুবাবে' (ডুবোবে)

'ধকমচিয়ে' (পৃঃ ৮০)—'ধড়মড়িয়ে' (?)

'ককানি' (পৃঃ ৯৬)—'কাতরানি'।

'কোকিয়ে উঠা' এই ক্রিয়াপদটির আজকাল বড় ভুল ব্যবহার হইতেছে।

আপনার মত সাহিত্যিকের ভাষায় কিছুমাত্র ত্রুটি না থাকাই বাঞ্ছনীয়—তাই, এগুলি আমি দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। বানান (ঐ 'র' ও 'ড়') সম্বন্ধে আপনি সহজেই সতর্ক হইতে পারেন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানই যথেষ্ট।

আপনার এই নাটকখানি পড়িয়া আমার মনে হইতেছে, আপনার এই ধরণের নাটক আমার পত্রিকার উপযোগী হইতে পারে। আমি একখানি পত্রিকা সম্পাদনের আশা করিতেছি—যদি ইতিমধ্যে কোন গুরুতর বাধা না ঘটে তবে বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। আমি দুই সংখ্যায় শেষ হওয়ার মত একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা পাইলে সুখী হইব। বাঙালীর বর্তমান বিপন্ন জীবনের চিত্রই তাহাতে থাকিবে—কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ ও মনের বাঙালী-প্রতিভাই যেন ফুটিয়া উঠে—পরমুখাপেক্ষী না হইয়া "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" এই বিশ্বাসে যেন সে আবার বাঁচিবার উপায় খুঁজিতে থাকে। অর্থাৎ অন্ধ গান্ধীভক্তি যেন তাহাকে *hypnotise* না করে। এই ভাবটিকে আপনি যদি একটা বাস্তব পরিবেশের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তবে আমার মনে হয় ঐ নাটক-রচনা সার্থক হইবে ; কারণ তাহাতে ভবিষ্যতের পূর্বসূচনা থাকিবে—তাহা prophetic হইবে। আমি নাটকের বিশেষ পক্ষপাতী নই, কিন্তু জীবনের আলেখ্য হিসাবে এবং জাতির চিত্ত ও চরিত্র গঠনের পক্ষে, নাটক যে একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার যে শক্তি আছে তাহাতে মনে হয়, আপনি আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩২. অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৭]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailash Chandra Ghose Road.
Barisa P. O.
(24 Pargs.) 15.7.47

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান ভবতোষ, তোমার প্রেরিত 'বার্ষিকী' একখণ্ড পাইয়াছি। উহাতে তোমার প্রবন্ধ পড়িলাম।

তুমি যে আমার রচনাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ—ইহাই তোমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। আমার ছাত্রদের মধ্যে কেহই এমন করিয়া আমার style—ভাষা ও চিন্তা আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। অবশ্য, এই আত্মসাৎ করার শক্তিই সব নয়—শেষ পর্যন্ত তোমার নিজস্ব চিন্তা ও ভাষার আকৃতি গড়িয়া লইতে হইবে; তবু প্রথম দিকে এই রকম একটা শিষ্যত্ব করিতে হয়। আমার আশা হয়, তুমি আমার কাজ কিছু হয় ত টানিয়া চলিতে পারিবে।

কিন্তু তোমার এই প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি মারাত্মক ভুল রহিয়াছে। ভাষা ও ভঙ্গিটি ভাল, কিন্তু চিন্তার গভীরতা নাই—কাব্যসমালোচনার পদ্ধতিটিও শাস্ত্রসম্মত হয় নাই। অবশ্য তাহাতে তুমি হতাশ্বাস হইবে না; এখনও অনেক পড়িতে ও চিন্তা করিতে হইবে। আমার কাব্যের সমালোচনা আমি ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সমাজে আর কেহ করিবার নাই। তুমি একটা খুব বড় কাজ করিতে পারো—আমার নিকটে আমার কাব্যের ও কবি-জীবনের সকল টীকা-ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারো—পরে তাহা তোমার কাজে লাগিবে। কারণ, এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন আমার কবিতা বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে কিন্তু কেহই তাহা পারিবে না।

তোমার প্রধান ভুল হইয়াছে, তুমি আমার কাব্যগুলির সম্বন্ধে নিজে স্বাধীন মত বা চিন্তার উপর দাঁড়াইতে সাহস কর নাই—বা আলস্য বশতঃ সে পরিশ্রম কর নাই। সাধারণ তথাকথিত সাহিত্যিক সমাজে আমার সম্বন্ধে যে সকল অর্ধসত্য মতামত প্রচলিত আছে; তাহারই অনুসরণ করিয়াছ। যথা—'বিস্মরণী' ও

'স্মর-গরল' আমার শ্রেষ্ঠ কাব্য—এ কথা কে বলিল? ইহা ত সত্য নয়। আমার প্রত্যেক কাব্যই সমান মূল্যবান্। এক একখানিতে আমার কাব্যপ্রেরণা এক একটা স্তরে উঠিয়াছে এবং প্রথমখানি হইতে শেষ পর্যন্ত (হেমন্ত-গোধূলি) একটা অবিচ্ছিন্ন growth or development আছে। আমার কবিতায় দুইটি প্রবৃত্তিই Romantic ও Classical সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহাই আমার কবিতার মৌলিকতা। আমার কবিতায় যে জ্ঞানের বা চিন্তার প্রাধান্য দেখিতে পাও তাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয় তাহা প্রাণ-পুরুষের ঐকান্তিক আকূতিপ্রসূত—পরে তাহার সহিত কোন একটা দার্শনিক তত্ত্বের আশ্চর্য মিল ঘটিয়াছে। জীবনকে যে অতিশয় গভীর ও গুরুতর উৎকণ্ঠার সহিত জানিতে চাহিবে, সে আপনার প্রাণের ভিতর হইতেই একটা তত্ত্বকে আশ্রয় না করিয়া পারে না। কিন্তু ঐ তত্ত্বের মূলে আছে সারা চৈতন্যের, প্রাণশক্তির আকুল জিজ্ঞাসা। জীবনের রহস্য যেমন বিরাট তেমনই দুর্ভেদ্য—তাই প্রাণের সেই আকুল জিজ্ঞাসা কোনকালে নিবৃত্ত হয় না। আমি জীবনের যে রূপ দেখিয়াছি, তাহাকেই বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার বিষ ও অমৃত দুই-ই আমি সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছি এবং বিষকে হজম করিবার জন্য একটা তত্ত্ব নিজেই—মস্তিষ্ক নয়—প্রাণের অনুভূতি দ্বারা স্থির করিয়াছি। আমার 'বিচিত্র কথা'র প্রথম প্রবন্ধ পড়িবে—তাহাতে আমি আমার কবিজীবনের একটা ইতিহাস লিখিয়াছি—উহাই আমার Testament, আমি অনেক জায়গায় কাব্যসাধনাকে 'জ্ঞানযোগ' বলিয়াছি—অর্থাৎ পরম সত্যে পৌঁছিতে হইলে চিন্তার সাহায্যে তাহা হইবে না, 'অনুভূতি'র দ্বারাই তাহা সম্ভব। অতএব আমার কাব্যে যে জ্ঞান ও চিন্তার প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে, তাহার কারণ আমি কাব্যকে অতিশয় উচ্চ সাধনার সোপানে তুলিয়াছি। আমার নিকটে কাব্য একটা ভাববিলাস মাত্র নয়; ক্ষণিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের সাময়িক record মাত্র নয়। ইহাকে যদি কাব্যবিরোধী মানস-ক্রিয়া বলিতে হয়, তবে কাব্যে মানুষের গভীরতর চৈতন্যকে বাদ দেওয়া হইবে। ইহাও সত্য যে, অধিকারভেদে কাব্যের নানা স্তর আছে—সকলেই সকল কাব্য উপভোগ করিবার অধিকারী নয়। তাই বলিয়া কাব্যকে একটা অতিশয় সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা কি উচিত?

আমি এখন কাব্যরচনা ত্যাগ করিয়াছি। আমার কাব্যসাধনার যাহা কিছু ফল তাহা ঐ চারিখানি কাব্যে আমি সঞ্চয় করিয়া বাংলা সাহিত্যের একপাশে রাখিয়া দিয়াছি। আমি নিজেই অনুভব করি, আমার ঐ কাব্য কত মৌলিক—এমন কি য়ুরোপীয় কাব্যেও ঠিক ঐ সুর নাই। একদিন হয় ত তাহারাও উহা লক্ষ্য

করিবে। যতদিন আমি কাব্যচর্চা করিয়াছিলাম ততদিন আমি কোন philosophy বা বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিলাম না—আমার কাব্যে যদি একটা ভাব বা চিন্তাপদ্ধতি থাকে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেখা দিয়াছে। পরে আমি বাংলার সাধনা ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও গ্রন্থপাঠ করিয়াছি। তাহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি এই দেখিয়া যে, আমি আমার কাব্যে অতিশয় অজ্ঞাতসারে বাংলার তান্ত্রিক সাধনার কয়েকটি মূল তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া ছ। এতদিন বৈষ্ণব ভাবধারাই বাংলা কাব্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব, কেবল আমিই নূতন যুগের নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় বাংলার সেই তান্ত্রিক সাধনার একটা মূল তত্ত্বকে নূতন ভাষায় ও নূতন ছন্দে রূপ দিয়াছি। ইহা বুঝিতে হইলে—অর্থাৎ আমার কবিতার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে বাংলার সেই সাধনার ইতিহাস ও তত্ত্বকথা জানিতে হইবে—বিশেষ করিয়া বাংলার 'সহজিয়া' সাধনার নানা রূপ! সেই সঙ্গে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বও একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমি ঐ সব তত্ত্ব সজ্ঞানে আমার কাব্যে প্রচার করি নাই। আমার 'পান্থ' ও 'নারীস্তোত্র' 'মোহমুদ্গর' 'অঘোর-পন্থী' 'পাপ' 'মৃত্যু' প্রভৃতি কবিতাও যেমন, তেমনই 'মৃত্যুশোক' 'স্মর-গরল' 'বুদ্ধ' 'প্রেম ও জীবন' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণের আকূতি ও দ্বন্দ্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে এই দ্বন্দ্বের শেষ অবস্থা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে আমার কবিজীবনের সেই দুরূহ সাধনার যে শেষ-নিঃশ্বাস সমীরিত হইয়াছে কাব্য হিসাবে তাহার মূল্যও যেমন আমার জীবনের পরিচয় হিসাবেও তেমনি তাহা কম অর্থপূর্ণ নহে। উহার 'স্বপ্নসঙ্গিনী' 'ফুল ও পাখী' 'দুঃখের কবি' 'বালুকা-বাসর' 'যাত্রাশেষে' 'বাণীহারা' 'নির্বেদ' ও 'সার্থক' প্রভৃতি কবিতা কবিতা হিসাবেও যেমন অনবদ্য, তেমনি উহার অনেকগুলিতে লিরিক সুরের অর্থাৎ কবির নিজস্ব প্রাণের অন্তরঙ্গ আত্মকথার অকপট প্রকাশ আছে। মানুষও যেমন, কবিও তেমনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারে না—এই পরাজয়ই মানুষের মানবতার নিদান। আমার সমগ্র কবিজীবনে মানুষেরই সেই কাহিনী আদ্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে 'অজ্ঞান' নামে যে কবিতাটি আছে, তাহাও পড়িয়া দেখিও—বোধ হয় পড় নাই।

তোমার একটা ভুল হইয়াছে এই যে "আমার চারিখানি কাব্যের সবগুলি সমান মূল্যবান নয়।" অন্যের পক্ষে এইরূপ হইতে পারে কিন্তু আমি যে কবি হিসাবে বড় স্বতন্ত্র তাহা এখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই। 'স্বপন-পসারী'র আগে,

অনেক কবিতা আছে, প্রকাশিতও হইয়াছিল কিন্তু সেগুলিকে কাব্যে স্থান দিই নাই। 'স্বপন-পসারী'ই আমার কবিজীবনের পূর্ণ-যৌবন-কাব্যের Romantic প্রবৃত্তির উচ্ছল উৎসার হইয়া আছে—অনেকের মতে উহাই আমার শ্রেষ্ঠ কাব্য। তুমি ইহার প্রতি দৃষ্টি দাও নাই—সাধারণ ধারণার বশবর্তী হইয়া এইখানেই তোমার প্রথম গুরুতর ভুল হইয়াছে। যে 'স্বপন-পসারী' পড়িয়া মুগ্ধ হয় নাই সে কাব্য-সমালোচনার অনুপযুক্ত। ঐ রোমান্টিক ভাবধারা অতিশয় সংযত ও ঘনীভূত হইয়া 'বিস্মরণী'তে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। 'স্মর-গরল' কাব্যে আমার ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ-নিষ্ঠা ভাষায়, রচনাভঙ্গীতে ও সর্বোপরি ছন্দের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনিমাধুর্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। একথা আমি বন্ধুগণকে বলিয়াছিলাম যে কবিত্বগুণে 'স্মর-গরল' যেমনই হোক, আমি এই কাব্যে বাংলার কাব্যসরস্বতীকে একটি নূতন মহিমময় মূর্তিতে স্থাপন করিলাম—এ পর্যন্ত কেহ তাহা পারে নাই। মধুসূদনের এপিক ছন্দ ও ভাষা এইবার লিরিকের ক্ষুদ্রতর পরিসরে 'শাণোল্লিখিত মণিগণে'র মত দীপ্তি পাইয়াছে। এই ভাষার সঙ্গীতও অন্য সুরের, ইহা নৃত্যচটুল নূপুরধ্বনি নয়—বাঙালীর কান তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়াছে। বাঙালী কাব্যচ্ছন্দের ঐ টপ্পা ঠুংরীকেই বোঝে—তাই মধুসূদন আজও একপাশে পড়িয়া আছেন। তুমি আমার কাব্যচ্ছন্দকে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করিয়া তাহার সঙ্গীতগুণের অভাব লক্ষ্য করিয়াছ। ইংরেজ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টা Spencer, Milton এবং পরে Shelly ও Keats। অথচ আমরা Tennyson, Swinburne, Rossetti প্রভৃতিকেই পূজা করি।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। 'স্বপন-পসারী' হইতে 'স্মর-গরল' পর্যন্ত ঐ Romantic ও Classical দুই ধারার যুগ্মস্রোত লক্ষ্য করা যাইবে। 'স্বপন-পসারী'তে Romantic-এর প্রাধান্য, 'স্মর-গরলে' Classical-এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা; 'বিস্মরণী'তে দুই-এরই একটা সাম্যভাব। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবির ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়—উহা অতিশয় lyrical ; যদিও উহার ভাষা ও রচনাভঙ্গীতে সেই Classical সংযম অতিমাত্রায় লক্ষিত হইবে। তুমি এই বিকাশধারা লক্ষ্য কর নাই। একটা কথা তুমি মনে রাখিবে, আমি একটি কবিতাকেও কোন গ্রন্থে স্থান দিই নাই যাহা কবিতা-হিসাবেও সার্থক নয়। আমার ঐ চারিখানি কাব্যই সমান মূল্যবান্—যদি সন্দেহ হয় তবে একটা উপায় বলিয়া দিই—মনে মনে ভাবিয়া দেখ ঐ চারিখানি কাব্য চারিজন কবির রচনা অর্থাৎ কবিকে ছাড়িয়া কাব্যকে দেখ। তাহা হইলে তোমার কি মনে হইবে না যে ঐ প্রত্যেক কবিই শক্তিমান্ এবং বিশিষ্ট কাব্যরসের

স্রষ্টা? 'হেমন্ত-গোধূলি' যদি আর কোন কবির রচনা হইত, তবে তুমি উহাকে কি একখানি বিশিষ্ট কাব্য বলিয়া মনে করিবে না? অবশ্য, আমার অর্থাৎ একজন কবির কাব্যসাধনার বিকাশধারায় উহাদের স্থান ও মূল্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে হইবে।

আর একটি বড় ভুল করিয়াছ। তুমি আমাকে Swinburne-এর সগোত্র স্থির করিয়াছ। এই যে ভুল ইহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে তুমি এখনও কাব্য-সমালোচনার মূলসূত্র ধরিতে পার নাই। Swinburne এর কাব্যপ্রেরণার মূলে আছে একটা 'দেহবাদ'—"দেহাত্মবাদ" নয়—তাহাতে কেবল একরূপ সঙ্গীতাত্মক Sensuousness আছে। আশ্চর্য শব্দসঙ্গীতের স্রষ্টা তিনি। আমার বাণীরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন কবিকে চিনিয়া লইতে হইলে সর্বপ্রথম তাহার বাণীর রূপটিকে বুঝিয়া লইবে—ভাব নয়—ভাষাটাই কবির আত্মার প্রতিমূর্তি। আমার ভাষা বা ছন্দ কোনটাই Swinburne এর মত নয়। তা ছাড়া আমি বাংলার তান্ত্রিক সাধনা হইতে আমার কাব্যের প্রেরণা পাইয়াছি—উহা আমার রক্তের মধ্যে অজ্ঞানে নিহিত ছিল। Swinburne তাহা পাইবে কোথায়? সবশেষে তোমাকে একটা সংবাদ দিই,—আমি Swinburne পড়িয়াছি অনেক বেশি বয়সে—'বিস্মরণীর'ও পরে। আমার প্রিয় কবি ছিলেন তিনজন Tennyson, Keats ও Landor. Swinburne না পড়ার প্রধান কারণ আমাদের সময়ে Swinburne-এর কবিতা প্রচলিত হয় নাই। Swinburne-এর কাব্যও অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল। কিন্তু তুমি এই যে ভুল করিয়াছ, ইহার কারণ, আমার কবিতা তুমি খুব ভাল করিয়া পড় নাই। যদি পড়িতে চাও, আমাকে লিখিও আমি তোমাকে অনেক সঙ্কেত বলিয়া দিব—এমন কি প্রায় সকল কবিতার ব্যক্তিগত ইতিহাসও যথাসম্ভব তোমাকে দিব—টীকা-টিপ্পনীও পাইবে। আমি জানি আমার কাব্যের সমালোচনা বা ব্যাখ্যা করিতে এযুগের কোন পণ্ডিত অগ্রসর হইবে না।

আমি বড় ব্যস্ত আছি। তাড়াতাড়ি প্রায় অসংলগ্নভাবে তোমাকে কয়েকটা কথা লিখিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে সময় হইবে কিনা জানি না—শরীরের যে অবস্থা, তাহাতেও ভয় হয়, হঠাৎ সব শেষ হইয়া যাইতে পারে। তোমার ঐ প্রবন্ধটিতে ভুল যাই থাকুক—একটা যে সুসম্বদ্ধ আলোচনা খাড়া করিতে পারিয়াছ তাহা প্রশংসনীয়। তোমার রচনার স্টাইলটিও শ্রদ্ধার যোগ্য। তুমি যদি আমার কবিজীবন ও কাব্য সম্বন্ধে serious আলোচনা করিতে চাও, তবে এখনই তৎপর হও। আমার কাব্যগুলি আবার ভাল করিয়া পড় এবং যেখানে দুর্বোধ্য হইবে

চিহ্নিত করিয়া পরে আমাকে জানাইবে। আগে কবিতাগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া পরে, তুমি আলোচনা আরম্ভ করিও।

আশা করি শারীরিক কুশলে আছ। তোমার পরীক্ষা কবে? আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুঃ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন ৮ ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কলিকাতা-১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলাম। সুনীলের বিবাহ সংবাদে আনন্দিত হয়েছি—নবদম্পতীকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।

আমি আপনার কবিতা সম্বন্ধে যা আপনাকে লিখেছি সাক্ষাতেও বলেছি—তার থেকে আপনার মনে এখনও সন্দেহ যায় নি যে, আমি সত্যিই আপনার কবিতার ভক্ত কিনা! তার কারণ বোধ হয় এই যে, আপনি আমাকে ভালো করে জানবার সুযোগ পাননি। আমার দেবতা আমাকে এই একটা বর দিয়েছেন যে, সাহিত্য ও কাব্য-রস আস্বাদনের শক্তি আমার আছে—খাঁটি কাব্য-রস আমাকে ফাঁকি দিতে পারে না। আপনার কবিতা যদি আমার ভালো না লাগত তাহলে আমিই ঠকে যেতাম। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে যে দুই তিনজন মাত্র সত্যকার শক্তিশালী কবির অভ্যুদয় হয়েছে তার মধ্যে আপনি একজন। একথা আমি চিরদিন জোর করে বলেছি। আমি কারও খোসামোদ করিনে—বরং আমার উল্টো দুর্নামই আছে। অতএব আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি এখনও আমার নিত্যনূতন ছাত্র ও শিষ্যদের নিয়ে কবিতাপাঠ করি তাতে আপনার কবিতা প্রায় প্রত্যেকবারই পড়তে হয়—না পড়ে উপায় নেই। আপনার কোন্ কবিতা আমার ভালো লাগে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কি নিজেই বুঝতে পারেন না? অবশ্য সকলেরই ব্যক্তিগত রুচি আছে; কিন্তু আমার ত শুধুই ব্যক্তিগত রুচি থাকলে চলবে না—আমাকে রুচির উপরে উঠতে হবে—কেবল

'রস'ই যে আমার একমাত্র ইষ্ট। আপনি খুব বেশি লেখেন না, কাজেই আপনার ব্যর্থ কবিতার সংখ্যা খুব কম; তবু, একথা আপনি নিশ্চয় জানেন এবং মানেন যে, Inspiration-কেও ভাষায় ছন্দে প্রতিবারই পুরোপুরি ধরে ফেলা যায় না—উৎকৃষ্ট কবিতা মাত্রেই 'ক্ষণজন্মা'। প্রত্যেক কবিরই ভিতরকার কবিপুরুষ কয়েকটি বিশিষ্ট বা পরমক্ষণে ভাষায় ছন্দে ধরা দেয়—সেই কবিতাগুলিতে তাঁর আসল স্বাক্ষর থাকে, তাইতেই তিনি যুগকেও অতিক্রম করে কাব্যাকাশে একটি পৃথক জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করেন। আপনারও তেমন কবিতা আছে, আবার সুন্দর সুপাঠ্য কবিতাও আছে। 'বারনারী', 'বেদিনী'ও আছে আবার 'বাইসিকেলের বারমাস্যা'ও আছে। 'কচিডাব'ও আছে 'কৃষ্ণা'ও আছে; এছাড়া ভাষায় ভাবের বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অসংখ্য আছে। আপনি যদি আমাকে আপনার কবিতা নির্বাচনের ভার দিতেন, তাহলে আমি একটি উপযুক্ত ভূমিকাসহ একখানি অমূল্য কাব্য-সঞ্চয়ন সম্পাদন করে কৃতার্থ হতাম। কিন্তু বোধ হয় তা আপনার মনঃপূত হবে না—শুনতে পাই সে বিষয়ে আপনার একটি স্বতন্ত্র মনোভাব আছে।

আপনার কাব্যগুলি প্রায় সবই আমার ছিল—কিন্তু অনেকগুলি বহুদিন pack-করা থাকায় উই-এ নষ্ট করে ফেলেছে—সেইজন্যে আপনাকে একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতার নাম দিতে পারলাম না। আমি যদি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করি, তবে তাতে একটা section থাকবে—প্রতিমাসে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা উদ্ধৃত হবে, সবই আগেকার কবিতা, বই থেকে বেছে নেওয়া; উদ্দেশ্য—বাঙ্গালীকে ভাল কবিতার রসাস্বাদন করানো—জোর করে পড়ানো; যাতে তাদের কাব্য-রসবোধ একটু জাগে। আধুনিক বাজে কবিতার বদলে, প্রতিমাসে ঐ রকম সঞ্চয়ন থাকবে। আবশ্যক হলে কিছু note-ও থাকবে যাতে বুঝতে পারে; অর্থাৎ কাব্যের একটা পাঠশালা খুলব। আপনার কবিতা উদ্ধৃত ও চয়ন করার অনুমতি চাই। এছাড়া, প্রতিমাসে একখানি full size ফোটো (বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের) দেবার ইচ্ছে করেছি। সেইজন্যেই আপনার একখানি ভালো ফটো এখন থেকেই চেয়ে রাখছি—না থাকলে নূতন তুলিয়ে দিতে হবে। এটা আপনার প্রয়োজনে নয় আমার 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রয়োজনে—যদি খরচ দিতে হয়, তাও 'বঙ্গদর্শন' দেবে। কিন্তু ছবিখানা আগে কোথাও প্রকাশিত হতে পারবে না।

আপনি কবিতা কম লেখেন জানি, কিন্তু এখনও যে আপনার মধ্যে 'কবি' বেঁচে আছে, তার প্রমাণ নিত্যই পাচ্ছি। 'পূর্বাচলে' আপনার যে কবিতাটি

বেরিয়েছে তা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনাকে আমার কেবল এই অনুরোধ যে কবিতাদেবী আবার যখন ভর করবেন, তখন আপনি যা লিখবেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি আমাকে পাঠাবেন—কারণ আপনার কোন কবিতাই কোন পত্রিকার পক্ষে অগৌরবের হবে না, তবু যেটি সর্বোৎকৃষ্ট সেটি আমি 'বঙ্গদর্শন'-এর নামে দাবী করব।

আমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে। তার উপর সাংসারিক দুশ্চিন্তাও কম নয়। 'বঙ্গদর্শন' চালাতে পারব কিনা জানি না, হয় সেই আমাকে বাঁচাবে, নয় সেই আমাকে মারবে। আপনার শরীরও খুব খারাপ তা জানি, তবু আশা করি আমার মত অবস্থা নয়। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। ইতি—

আপনার প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৪. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৪৭]

Kailas Chandra Ghosh Road
Barisa P. O. (24 Pargs.)
'47

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ আপনার কবিতা পাইলাম। কবিতাটি আপনার উপযুক্ত হইয়াছে —অতএব 'বঙ্গদর্শন'-এরও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সত্যকথা বলিতে কি, এই কবিতাটি পাইয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যে বলিয়াছিলাম, আপনিই আমাদের মধ্যে এখনও কবি হিসাবে জীবিত আছেন তাহা সত্য। 'বঙ্গদর্শন'-ও আপনার উপরে বিশেষ ভরসা রাখিবে।

এই কবিতাটি আমার 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রথম বাঞ্ছিত অর্ঘ্য; এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই পাই নাই; কি করিয়া প্রথম সংখ্যা সাজাইতেছি তাহা বাহির হইলেই বুঝিতে পারিবেন। বাহির হইতে দুই চারিটি যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশযোগ্য বটে, তবে বড় কিছু নয়। আমি কবিতা ছাপিব না—একরূপ স্থির করিয়াছি, কারণ আপনাদের মত কবির উৎকৃষ্ট কবিতা আমি কতই বা আশা করিতে পারি?

এজন্য আমি অতিশয় সাবধানে কৃপণের ধনের মত সঞ্চয় করিতেছি। আপনার কবিতাটি দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য রাখিলাম—এ সংখ্যায় উহাকে ছাপিতে সাহস হইল না। কারণ, দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য এখনও একটিও ভালো জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আরও কারণ, আমি এই কবিতাটিকে ঐ সংখ্যায় একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিব।…আরও একটা লক্ষ্য করিতেছি—আপনার এই শেষের কবিতাগুলিতে বাণী-সৌন্দর্য আর একরূপ ধারণ করিয়াছে—পূর্বের বলিষ্ঠতাই যেন আরও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে—ভাষার উপর আপনার অসাধারণ অধিকার !

আপনার তিনখানা কাব্যই জেনারেলের ওখান হইতে আনাইয়া লইয়াছি। এবারকার সংখ্যার 'মণিমঞ্জুষা'-বিভাগে আপনার 'সায়ম্' হইতে 'বরনারী' কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি। প্রতি সংখ্যায় এইরূপ কাব্য-চয়ন থাকিবে—ভালো কবিতা কাহাকে যে বলে তাহা এমনই করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

আপনি 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য একটি ছোট খাট প্রবন্ধ লিখিয়া দিন না? আপনার গদ্যও যেমন শাণিত, তেমনই অর্থযুক্ত। অতি আধুনিক সাহিত্যের কোন একটা দিক লইয়া কিছু লিখিতে পারেন না—যেমন অতি আধুনিক কবি ও কবিতার সম্বন্ধে—বা, আপনার যে বিষয়ে যাহা বলিতে খুবই ইচ্ছা হয়, তাহাই ?

আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুনশ্চ : কবিতাটির দ্বিতীয় পংক্তিতে বোধ হয় একটি দুই অক্ষরের শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, যথা— "তোমারি মাঝে কবে যে আমি
হারানু তোমারে"

ছন্দটি পাঁচ মাত্রার—সর্বত্রই তাহাই আছে। কেবল ঐ 'হারানু তোমারে'—একটু কম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি সংশোধন করা আবশ্যক মনে করেন তবে করিয়া দিবেন। যদি ইচ্ছা করিয়া এইরূপ রাখিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় আপনার কোন উদ্দেশ্য আছে ; তাহা হইলে আমি কোন পরিবর্তন করিতে বলি না। হয়ত …subtle effect, একটা চমক সৃষ্টি হয়।

মোহিতলাল

আপনার 'অনুপূর্বা' এখনও পাই নাই।

৩৫. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৭]

Kailas Chandra Ghosh Rood
Barisa P. O.
(24 Pargs.)
24. 12. 47

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটির জন্য বহু ধন্যবাদ—সুন্দর হইয়াছে।

আমার 'অনুপূর্বার' সমালোচনা পড়িয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের নিঃস্বার্থ সেবায় বা পূজায়, আমি যে পরিশ্রম জীবনভোর করিয়া চলিতেছি, তাহার কোন পুরস্কার অবশ্যই আশা করি না, করিলে ঐ পূজাই ব্যর্থ হইত। আমি কবিতা লিখিয়াছি এবং কবি হিসাবে আমি এযুগের খুব বড়দের মধ্যেই (রবীন্দ্রনাথ বাদে) একজন, তাহাও নিঃসন্দেহে জানি; ইহা আত্মশ্লাঘা নয়, নির্মম ও নিস্পৃহ সমালোচকের জবানীতেই বলিতেছি। কিন্তু আমি কাব্যসাধনাও ত্যাগ করিয়া, বাংলা সাহিত্যের শুধু সেবাই নয় উদ্ধার ব্রতে নিজের সকল সামর্থ্য—বোধ হয় জীবনটাই উৎসর্গ করিয়াছি। তার কারণ, আমি অনেক পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম ইহাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। তাই যেখানে যে সত্যকার সরস্বতী-পুত্র আছেন, মৃত ও জীবিত—সকলেরই যথাসাধ্য জাতি ও মানরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। একা সব পারিতেছি না। কিন্তু সাহায্য করিবার দোসর কেহ নাই। আপনার কবিতা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ—ইহা আমি প্রথম হইতেই জানি। আমি আপনার একজন ভক্ত (বন্ধু বা মিতা নহি)—কিরূপ ভক্ত তাহা আপনি জানিবেন না—বিশ্বাসও বোধ হয় করিবেন না। তার কারণ, আপনার ধারণা (খুব স্বাভাবিক) যে বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ না হইলে কেহ কাহারও প্রতিভার আদর করে না। ইহার কারণ, আপনি নিজ শক্তিতে আস্থাবান হইলেও পরের সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা ছিল না; বন্ধুত্ব বা স্নেহ স্বাকার করিতেন, কিন্তু সত্যকার রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল না; অথচ আজ প্রায় বিশ বৎসর আমি বাংলা সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খ্যাতি, অর্থ, বন্ধুত্ব সকলই তুচ্ছ করিয়া 'আধুনিক সাহিত্যের আধুনিক সমালোচনা' প্রবর্তিত করিতে প্রাণপণ করিতেছি। আপনার কাব্য-সমালোচনাও তাহারই প্রয়োজনে; এবং তার জন্য আপনার কাব্যই যথেষ্ট। আপনার সহিত বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না : যাহাদের সহিত সেরূপ পরিচয় আছে তাহাদের সমালোচনায় বরং বাধা ঘটে। অবশ্য আমার চক্ষু-লজ্জা আদৌ নাই। তাহার পরিচয় পাইয়াছেন, পরে হয়ত আরও পাইবেন। আমার কোন আত্মীয় নাই—সাহিত্যিক আত্মীয়তা ছাড়া, সেখানেও ছোটদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করি না।

আপনার কবিতার মূল প্রেরণা যদি আমি ধরিতে পারিয়া থাকি, তাহার কারণ দুইটি—প্রথম, আপনার আত্মপ্রকাশে কোন ভাণ বা ফাঁকি নাই; দ্বিতীয়, আমিও কবি—কত বড় কবি তাহার প্রমাণ—আপনার কবি-প্রকৃতি আমার সম্পূর্ণ বিপরীত; তথাপি আমি আপনার কবি-প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি; আপনি আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে কখনও পারিবেন না; এই না-পারাটাও আপনার গৌরব; এ রহস্য আমি বুঝি, আপনি বুঝিবেন না। আমি প্রাচীন বা আধুনিক—দেশী ও বিদেশী এমন উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই, যাহার আস্বাদন করি নাই, সেই রসের বৈচিত্র্যই আমাকে মুগ্ধ করে। ইহার উপর, আমি কাব্য-সৃষ্টি ও কবিপ্রতিভা এবং কাব্যকলার যত কিছু তত্ত্ব তাহাও যতটা সাধ্য বুঝিয়া লইবার জন্য রীতিমত অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছি। এ সকল সত্ত্বেও আপনাকে আমি চিনিতে পারিব না? আমি কি বাংলা সাহিত্যের আড্ডাধারী বৈঠকবিলাসী বা বন্ধুগোষ্ঠীর সমালোচক? একটা দৃষ্টান্ত দিই—'পূর্বাচল'-এর এই সংখ্যায় দেখিলাম, সম্পাদক মহাশয়েরই একটি কবিতার সমালোচনা লিখিয়াছেন ঐ গোষ্ঠীরই এক সমালোচক। এই সমালোচক নিজে যেমন মহাকবি, মহারসিক এবং মহাপণ্ডিত—সমালোচনাটিও তেমনই পাঠকগণের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা হইয়াছে। কিন্তু কথাটা শুধু তাই নয়, ঐ কবিতার (সম্পাদক-লিখিত) ঐরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার যে কদর্যতা—প্রশংসালোলুপ কাঙালদের সে বিষয়ে চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নাই! এই ত বাংলার সাহিত্য-সমাজ এবং সমালোচনার রীতি ও নীতি। আমাকে লোকে দাম্ভিক, অসামাজিক, অভদ্র বলিয়া থাকে—ভাগ্যে আমি তাই, নহিলে জাতটাও রক্ষা করিতে পারিতাম না। আমি সাহিত্যিক জীবনের কাহিনী যদি কখনও লিখিয়া যাইতে পারি, তবে এই যুগের যে চিত্র তাহাতে থাকিবে—সে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পক্ষে যেমন কৌতুককর তেমনি শিক্ষাপ্রদ হইবে। আমার জীবনটাকেই রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্য-দর্পণ বলিতে পারেন।

যাক, একটা কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে; আপনার ইদানীন্তন কবিতাগুলিতে একটা নূতনতর সুর ফুটিতেছে : রূপে, রসে, রঙে—এমনকি কারু-কলায়। যেন একটা বিধুরতার সুর; ঠিক এই রকম রসমূর্ছনা পূর্বে ছিল না। মনে হয়, বিদ্রোহের ভাবধারা প্রশমিত হইয়াছে, হৃদয় পরিশ্রান্ত হইয়াছে; এখন 'তিক্ত হোক, মিষ্ট হোক—একমাত্র রস' যাহা তাহাই পান করিবার জন্য প্রাণ পিপাসিত হইয়াছে। আপনার এই কবিতাটি (নূতন যেটি পাঠাইয়াছেন) বড় ভালো লাগিয়াছে। কেবল উহার শেষ লাইনগুলিতে একটু রসভঙ্গ হইয়াছে; তাহা আপনিও বুঝিতে পারিবেন। তা হউক, কিন্তু উহার কতকগুলি পংক্তি ভাবকে ভাষার যাদুতে আশ্চর্যরূপ দিয়াছে। এই রকম কবিতা যদি আমি 'বঙ্গদর্শন'-এ দিতে পারি তবে কৃতার্থ বোধ করিব। আপনি মনে রাখিবেন, আপনার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হইতে পারিবে না। আপনার সঙ্গে এই স্বার্থের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নই।

'অনুপূর্বার' সমালোচনা কাহার কেমন লাগিয়াছে সে চিন্তা আমার আদৌ নাই; আপনিও সে চিন্তা করিবেন না। আমার সমালোচনার একটি পৃথক গৌরব আছে, উহা মাসিক পত্রের সমালোচনা নয়—রীতিমত সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং উহা আমার গ্রন্থে স্থান পাইবে অর্থাৎ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে। আমি ত আপনার খোসামোদ করি নাই—বন্ধুতার ঋণ শোধও করি নাই (তাহাও আমি কখনও করি না—এমনই অমানুষ আমি); যাহা লিখিয়াছি তাহার উপরে কথা কহিতে পারে বাংলা সাহিত্যের এই সমাজে এমন কোন বুদ্ধিমান দুঃসাহসী ত দেখি না—আপন আপন কোটরে বসিয়া যে যেমন কণ্ঠকণ্ডুয়নই করুক। ঐ প্রবন্ধ অনেকেরই খুব ভালো লাগিয়াছে শুনিতেছি, তবে তাহারা 'বড় কবি' নয়; যাহারা 'বড় কবি' তাহারা যে ঈর্ষায় দগ্ধ হইবে, আপনিও তাহা জানেন।

আপনার স্বাস্থ্যের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দুঃখিত ও চিন্তিত না হইয়া পারি না। আমার তাহাতে বলিবারও কিছু নাই কারণ "তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে"—আমাদের পরস্পরের সেই অবস্থা। কেবল ইহাই প্রার্থনা করি যে, স্বাস্থ্যের উন্নতি যদি নাও হয়—আরও অবনতি না হয়। আমি যে কি অবস্থায় আছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন না। আমার কথা ভাবিয়া আপনি একটু ভরসা পাইতে চেষ্টা করুন।

আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৬. অধ্যাপক বিনায়ক সান্যালকে লিখিত
[নভেম্বর ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮ ওল্ড্ পোস্ট অফিস্ স্ট্রীট্
কলিকাতা-১
১৬ই কার্তিক, ১৩৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও সঙ্গের কবিতাটি যথাসময়েই পাইয়াছি—সময়ের অভাবে উত্তর দিতে দেরী হইল,—ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আমি এত রকমের কাজে ব্যস্ত থাকি যে পত্রে সাহিত্যিক আলোচনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমার নিকট যাহা প্রত্যাশা করেন তাহা সঙ্গত ও স্বাভাবিক, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার তাহাতে ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও অতিশয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া ছাড়া—তাহাও সব সময়ে সম্ভব নয়—উপায় নাই।

আপনার কবিতাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছি। রচনার ভাষা, এবং ছন্দ প্রভৃতি অতিশয় শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। আপনি যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন, এবং আপনার যে রুচি ও রসবোধ আছে তাহার পরিচয় উহাতে পাইয়াছি। কবিতাটি একধরণের কবিতাই হইয়াছে, উহাতে ভাবনা আছে, চিন্তা আছে, এবং তাহাতেও একটি মৌলিকতা আছে, কিন্তু উহা খাঁটি "কাব্য" হইয়া উঠে নাই। রচনা ব্যর্থ হয় নাই বটে, কারণ ব্যক্তিগত একটা প্রাণের আকুতি উহাতে আছে, তথাপি রসাবেশ অপেক্ষা চিন্তার সজ্ঞানতাই অধিক। আপনি কবি নহেন—ভাবুক; ভাবকে ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কৃত করিবার সাধনা কতকটা সফল হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন পংক্তি উহাতে নাই যাহাতে রসাবেশজনিত ভাষার magic আছে। হয়ত সাধনা থাকিলে, পরে আপনার সেই শক্তি লাভ হইবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, পরে আরও কবিতা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু আমি

আপনাকে প্রতিবার পত্র দিতে পারিব না। যদি তেমন "উৎকৃষ্ট" বুঝি, তাহা হইলে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত করিতেও পারি। কিন্তু সে আশা করিবেন না।

আমার ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৭. শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত
[মার্চ ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৪ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা-১৩
Kailas Chandra Ghose Road
Barisa. P. O. (24 Pargs.)
21. 3. 48.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা পাইয়াছি। আপনার পূর্ব কবিতাটিকে 'ছড়া' নাম দেওয়ায় আপনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ছড়ার ইতিহাস এবং কবিতা, ছড়া ও ছড়া-কবিতা, এই তিন শ্রেণীর কবিতার বিচারমূলক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধও পত্রাকারে লিখিয়াছেন। আমার সংশোধন আপনার মনঃপূত হয় নাই। এ সকলের উত্তর পত্রে দেওয়া যায় না। কাব্য-রস বিচার বড় জটিল ব্যাপার—উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই মত। আপনি আমাকে বাংলা কবিতা এবং ছড়ার ইতিহাস এবং কাব্য ও কাব্য-ভাষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। বয়সে আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, তাই এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু লেখা অতিশয় অশোভন হইবে! তাছাড়া আপনার সংস্কার এবং রুচি স্বতন্ত্র, আমি সাহিত্যের শুধুই সমালোচক নই—উচ্চতম ক্লাসের ছাত্রদের অধ্যাপক; এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের P. R. S. ও Ph. D. প্রভৃতির পরীক্ষার পরীক্ষক, ইহাই আপনাকে মনে রাখিতে বলি। কাব্যের ভাষার শিষ্টতা বা শুচিতা সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি স্মরণ করিলেই চলিবে; সাহিত্যিক রচনায় কোন ভাষাই সাধু বা অসাধু নয়—ভাব প্রকাশের অব্যর্থ শব্দ যাহা তাহাই সাধু—কবিতার ভাব যদি অন্তরের অগ্নিযুক্ত হয়, তবে তাহার উত্তাপে সকল শব্দই 'সাধু' হইয়া উঠে। বাংলা ভাষায় "গরু ও জরু" অপাংক্তেয় নয়—যে

ভাষায় অপাংক্তেয় তাহা বাংলা ভাষা নয়। যাক, এ বিষয়ে তর্ক করিবার স্থান পত্রে নাই। আপনার ক্ষোভ ও অভিযোগের কারণ বুঝিতেছি। আমি যে ঐ রচনাটির 'ছড়া' নাম দিয়াছিলাম, তাহাতে উহার মুল্যবৃদ্ধি হইয়াছে; যদি কবিতা নাম দিতাম তাহা হইলে মূল্য কমিয়া যাইত। আমি যে আকারে উহা ছাপিয়াছি, তাহাতেই উহা সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আপনার মানহানি হইয়া থাকিলেও কবিতাটির মানহানি হয় নাই। "ছড়া-কবিতা" বলিয়া কোন শ্রেণী-বিভাগ কোন শাস্ত্রে নাই—তাহার আবশ্যকও নাই।

আপনার ঐ কবিতাগুলির মধ্যে ভাব, ভাষা ও ছন্দের যে সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে তাহাই পাঠকের তৃপ্তিকর; উহাতে খাঁটি কাব্যাংশ আছে কিনা সে প্রশ্নটি অবান্তর। অতএব আমি, আপনার কবিতা ছাপিতে পারিলে সুখী হইব; কিন্তু একসঙ্গে দুইচারিটি পাঠাইলে ভাল হয়, আমি নিজের পছন্দমত বাছিয়া বাকিগুলি ফেরৎ পাঠাইব। যদি আবশ্যক হয় কিছু সংশোধন করিব, তাহাতে আপনার আপত্তি থাকিলে, আমি আপনাকে পূর্বেই জানাইব। সংশোধিত অংশ আপনাকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিব। তাহাতে প্রকাশ করার একটু বিলম্ব হইবে।

'পূর্বাচল' পত্রিকায় আপনার একটি কবিতা দেখিলাম—এবার 'বঙ্গদর্শন'-এ যেটি পাঠাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সে কবিতাটি ভালো। 'বঙ্গদর্শন'-এ একই লেখকের নিকৃষ্ট লেখা ছাপিতে সংকোচবোধ করি। সেজন্য আপনাকে একাধিক কবিতা পাঠাইতে বলিয়াছি। আপনি ইহাও জানিবেন যে, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির কবিতা আমি পছন্দ না হইলে ফেরৎ দিয়া থাকি।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

শ্রীমোহিতলাল

৩৮. অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৪৮]

বরিষা পোঃ

২৪পরগণা

২৯. ৪. ৪৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছিল। আমার বর্তমান অবস্থা ক্রমিক মন্দ হওয়ার জন্য আমি প্রায় জীবন্মৃত হইয়া আছি, তাই চিঠিপত্র লেখাও ত্যাগ করিয়াছি। তুমি তোমার পত্রে আমাকে কতকগুলি বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছ—নিরুৎসাহকে উৎসাহ দান করাই কর্তব্য। কিন্তু বোধ হয় আমার সাহিত্যিক জীবন ও সাহিত্যব্রতের একটা বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য কর নাই। বাংলা সাহিত্যের যে সেবা আমি করিয়াছি তাহা দেশ, জাতি ও সমাজকে দূরে রাখিয়া নহে—কেবল সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক চালনা ও সাহিত্যরস চর্চার জন্য নহে; আমার এই ব্রত ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রেরই মত। বাঙালী জাতির জাতিগত সাধনা ও জাতীয় প্রতিভাকে আমি তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তার কারণ আমি শুধুই সাহিত্যিক নই—আমি বাঙালীর জীবন, তাহার আত্মার বলাধান করিতে চাই। আমার কাব্যগুরু রবীন্দ্রনাথ বটে কিন্তু আমার ধর্মগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্য আমার কাছে গৌণ—বাঙালীর উদ্ধারসাধনই মুখ্য। এতদিন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তাহার সাধনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য—বাঙালীর আত্মা বা তাহার জাতীয় জীবনধর্মের পক্ষে সাক্ষাৎ পুষ্টিকর নয়। আবার সাহিত্য হিসাবে ও শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। আমি যে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলাম না, আমরা জীবনে এই দুঃখই বড় হইয়া থাকিবে। বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনার পর রবীন্দ্র-সাহিত্য, তার পূর্বে নয়। কিন্তু দেশ ত ধ্বংস হইতে চলিয়াছে—হিন্দু বাঙালী একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। কোন্ আশা, কোন্ ভরসা লইয়া আমি বাংলা সাহিত্যের রূপ গুণ বিচার করিব? আমার দেহ ব্যাধি ও জরায় জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আমি এতদিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার যে ভিত্তি স্থাপন এবং কয়েকটি নির্মাণ-কর্মও করিয়াছি, তাহার মূল্য অল্প নহে। তোমার পত্র

পড়িয়া মনে হয়, সে কর্ম কিছুই নহে, অর্থাৎ আমি আরম্ভ করিয়াছি মাত্র—অর্ধেকও সমাধা করি নাই, তাহা সত্য নহে। যাহা এতদিন ধরিয়া করিয়াছি তাহাই বাংলা সাহিত্যে একটি বড় contribution, ততখানি আর কেহ করে নাই। তোমার মামার এবং তোমার কুশল সংবাদ দিবে। 'বঙ্গদর্শন' যথারীতি ও আদ্যন্ত পড়িতেছ কিনা জানাইবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুঃ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৯. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৮]

বড়িষা পোঃ (২৪পরগণা)

২৬.১১.৪৮

প্রীতিভাজনেষু

আপনার প্রেরিত উপহার 'ওআর য়্যাণ্ড পীস্' তিন খণ্ড পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার পত্রে জানিলাম, আপনি আমার নিকট হইতে একটা অনুকূল অভিমত চান, বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্য। ইহাতে আমি একটু বিব্রত বোধ করিতেছি।

আপনি যে এইরূপ অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুবাদ-কার্য—বিশেষতঃ উপন্যাস প্রভৃতির অনুবাদ সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ জীবধর্মী নহে, কাব্য-জাতীয় সাহিত্য জীবধর্মী ; যাহা চিন্তা মাত্র তাহাকে ভাষার কৌটায় ভরিয়া রাখা যায়, কিন্তু যাহার প্রাণ আছে তাহার জন্য ভাষারও জীবন্ত দেহ চাই। আবার প্রাণের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—এই জলমাটির গাছ, অন্য জলমাটিতে রোপণ করিলে বাঁচে না, বা বৃদ্ধি পায় না। য়ুরোপীয় বহু উৎকৃষ্ট উপন্যাস এইজন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা চলে না ; কারণ ঐরূপ সাহিত্যের প্রাণধর্ম আছে, তাহা জীবন্ত, উহা চিন্তাসাহিত্য নয়—বাংলায় ভাষান্তরিত হইয়া উহাকেও জীবন্ত হইতে হইবে। তবেই উহা বাংলা সাহিত্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বাংলার জলমাটিতে সকল বিদেশী ফুল বা ফলের গাছ বাঁচিতে পারে না। ইহাকেই —আমি উপন্যাসের অনুবাদকর্মে সূক্ষ্ম বিচার বলিতেছি।

আপনার নিষ্ঠা ও শ্রমশক্তি আছে, এবং আপনার ভাষাও প্রাঞ্জল ও শুদ্ধ; আপনি যদি এইরূপ অনুবাদকর্মে আরও সতর্ক ও বিচারশীল হ'ন তবে, সত্যই বাংলা সাহিত্যের এই দিকটার কিছু সেবা করিতে পারিবেন।

আমার সময় বড় কম এজন্য উপস্থিত আপনার এই বৃহৎ অনুবাদকর্মটির সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে পারিলাম না। যদি পরে পড়িয়া উঠিতে পারি তবে জানাইব।

একটা কথা— আপনিই কি 'অভ্যুদয়' নামক কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক?

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও কুশল কামনা জানিবেন।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪০. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৫০]

বড়িষা পোঃ
(২৪ পরগণা)
ইং ৯. ৭. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি—শরীর অসুস্থ এবং নানা কারণে মনও অসুস্থ বলিয়া উত্তর দিতে দেরী হইল।

অনুবাদের এবং সাধারণ সাহিত্যিক ভাষা সম্বন্ধে আপনার যে মনের সমস্যা সে সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। একটি সাধারণ normal Idiom-এর উপরে সাহিত্যিক (art-এর) সপ্ততন্ত্রী বাঁধিয়া লইতে হইবে, যেটা হইবে ground—সেই ground-এর উপরে ঐ ভাষার সপ্ততন্ত্রী বা সপ্তবর্ণের স্বর ও রং খেলিবে। ইহা সাহিত্যিক ভাষায়—সাধারণ ভাষায় আছে। তার উপর লেখকের নিজস্ব স্টাইল,—তাহা নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। ঐ সাহিত্যিক ভাষার অর্থাৎ, রূপসৃষ্টির—ভাব-রস সৃষ্টির ভাষায়, কথ্য ও সাধু, বঙ্কিমী ও বিদ্যাসাগরী, রাবীন্দ্রিক সকলই আবশ্যক মত লুকোচুরি খেলিতে পারে—কিন্তু লেখকের সেই মিশ্রণশক্তি চাই—রংয়ের harmony-এর মত। Dialogue-এ সাধুভাষা চলে না বটে, কিন্তু art-এর প্রয়োজনে চলে। এ বিষয়ে সাক্ষাতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শুনিলাম গোপাল খুব পীড়িত, সে এবার বাড়ী আসে নাই। আপনি তাহার সংবাদ পাইলে জানাইবেন।

আবার কবে আসিতেছেন ?

আশা করি কুশল। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।

ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—আপনি গল্পগুলির সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। কোন্ কোন্ গল্প আপনার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে তাহা লেখেন নাই। আমি সেই সংবাদই চাহিয়াছিলাম। গল্পগুলির নির্বাচনে রসের বৈচিত্র্য আমার লক্ষ্য ছিল।

শ্রীমোঃ

৪১. অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

বড়িষা পোঃ

২৪ পরগণা

ইং ৭. ২. ৫১

স্নেহাস্পদেষু

তোমার প্রেরিত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়ে খুশী হয়েছি। তুমি আমার 'শ্রীমধুসূদন' পড়ে তোমার নিজের চিন্তা ও জিজ্ঞাসা দুইয়েরই যে খোরাক পেয়েছ এবং তাই দিয়ে এই যে প্রবন্ধটি রচনা করেছ তাতে তোমার নিজস্ব বিচার-শক্তি এবং রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখাটি খুব সুপাঠ্য হয়েছে।

তবে, সমালোচনার সূক্ষ্মতা আরও কিছু থাকা চাই। তুমি এই যে সাহিত্যে 'ব্যক্তিত্ব' এবং তার অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছ—এ ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রসৃষ্টির কথা এক নয়, তা নিশ্চয় জানো। কবি কোন একটা নীতি বা আদর্শকে স্বাধীন ভাবে ঘোষণা করলে—তার নাম 'ব্যক্তিত্ব' বা Individualism বটে, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির যে কল্পনাশক্তি—তার মূলে আছে Objectivity, আমাদের সাহিত্যে এখনও—রবীন্দ্রসাহিত্যেও তা নেই। মধুসূদনের কাব্য Classical কিন্তু প্রেরণা Romantic;

অর্থাৎ Revolt আছে, সেইটুকুই তাঁহার ব্যক্তিত্বঘোষণা; কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে যেখানে যেটুকু objectivity আছে তাতে তিনি Romantic আদর্শ নয় Classical আদর্শই অনুসরণ করেছেন। আসল কথা আমাদের সাহিত্যে (পূর্বকালের) যে সব চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাতে কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের জীবন ও সমাজই ছিল ঐ রকম। কবিদের দোষ এই যে, সেই সমাজ এবং সেই সব চরিত্র নিয়েও তাঁরা উচ্চাঙ্গের কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নাই—মূলে কবিশক্তিরই অভাব। একথা বলতে পারো যে তাদের প্রাণের মুক্তি ছিল না। সেই মুক্তির যে কবিকল্পনা আর কবিমানসের 'ব্যক্তিত্বচেতনা' বা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' এক নয়। অতএব, তুমি এই সূক্ষ্মবিচারও করিবে।

এবার যখন কলিকাতায় আসিবে, আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করিবে।

আশাকরি কুশলে আছো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি

শুং

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪২. অধ্যাপক বিনায়ক সান্যালকে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পোঃ বরিষা
কলিকাতা-৮
ইং ১২. ৯. ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পূর্বপ্রেরিত উপহার ও পরে পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় প্রাপ্তি-স্বীকার ও ধন্যবাদ জানাইতে দেরী হইল।

আপনার বইখানি একবার চোখ বুলাইয়াছি, তাহাতে আপনার পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। আর কিছু না হোক, একালের শিক্ষকসমাজে যদি আপনার মত গভীর ও বিস্তৃত পড়াশুনা থাকিত, তবে বড়ই আশ্বাসের কারণ হইত। আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্যার তপস্যা করিয়াছেন, ইহাই বড় কথা। তারপর রুচি ও রসবোধ—এসব ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে—একরূপ জন্মান্তরীণ সংস্কার। বইখানিতে আপনার নিজস্ব একটা বিচারপদ্ধতি এবং সাহিত্যিক আদর্শ আছে। ইংরেজী সাহিত্যে এমন সুপণ্ডিত হইয়াও রসবিচারে আপনি প্রাচীনপন্থী—অর্থাৎ

Modern Literature-এর Modern Study আপনার রুচির অনুকূল নয় তাহাও দেখিলাম, কারণ আপনি দেশীয় "অলঙ্কার শাস্ত্রের" প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্। এই একটি লক্ষণ বড়ই Significant : আমি ঐ একটি লক্ষণেই একটা বড় জাতিভেদ করিয়া লইয়াছি।

যাই হোক, আমি আপনার একটি প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইব। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে আমি এই শেষ বয়সে একটি গুরুতর গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছি—"কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য"। উহাতে "সঞ্চয়িতার" কবিতাগুলির একটি running commentary ও critical appreciation থাকিবে; কাজেই যেখানে ইংরেজী কাব্যের ছায়ার এক স্পষ্ট অনুসরণ আছে, সেখানে তাহার উল্লেখ ও প্রমাণ দিতে হইবে। নিজের জানা যতখানি, তাহাই করিতেছি। আপনার ঐ একটি প্রবন্ধে আরও অনেক নির্দেশ পাইলাম, সেগুলি বড় কাজে লাগিবে। এই প্রসঙ্গে একটা অনুরোধ করি—যদি নিতান্ত দুঃসাধ্য না হয়, একদিন আমার এখানে আসিয়া ঐ গ্রন্থের (এ পর্যন্ত যতটুকু লিখিয়াছি) একটু পরিচয় লইলে খুব আনন্দিত হইব—আশাকরি আপনিও হইবেন। একটা দিন স্থির করিয়া বৈকালে একটু বেলা থাকিতে আসিবেন। আপনাকে শুনাইয়া আমার আনন্দ হইবে; ঐদিন আপনাকে স্বহস্তে আরও একখানি সদ্য প্রকাশিত বই উপহার দিয়া পরম প্রীতিলাভ করিব।

আপনি ঐ পুস্তকে আমার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন—সে-সম্বন্ধে কবি হিসাবে আমার কিছু বলিবার নাই—কেবল ধন্যবাদ দিলাম। সমালোচক হিসাবে হয়ত কিছু বলিবার আছে, যদি জিজ্ঞাসা থাকে সাক্ষাতে বলিব।

আমার "প্রবন্ধ" পুস্তকখানির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কেবল দুইটি বিষয়ের মতভেদ আছে—উহার ভাষা কঠিন হইয়াছে এবং standard 'সাধারণ' ছাত্রের পক্ষে উচ্চ। ইহার উত্তরে সংক্ষেপে ইহাই বলিতে চাই যে, বি. এ পরীক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষেও ঐ ভাষা ও ঐ ধরণের তত্ত্ব আলোচনা যদি দুরূহ হয়, তবে বলিতে হইবে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা দুই-ই একটি mockery হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাদের মত পণ্ডিত অধ্যাপকদেরও "Occupation is gone"। বড় লজ্জার কথা! আমি ভাবি, বিলাতে London Matric-এ ইংরেজী অর্থাৎ মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্য যে পদ্ধতি ও যে আদর্শে পঠিত ও পাঠিত হয়, এখানে ডিগ্রী পরীক্ষাতেও তাহা অচল! অর্থাৎ স্কুল হইতে কলেজের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত বাঙালী

সন্তান সত্যকার বিদ্যালাভ করিতে না পারে—তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

৪৩. অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে লিখিত

[মার্চ ১৯৫২]

পোঃ—বরিষা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কলিকাতা-৮

ইং ১।৩।৫২

স্নেহাস্পদেষু

শ্রীমান ভবতোষ, তোমার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

তোমার ঐ পত্রে তুমি যে সংবাদ দিয়াছ তাহা আমার পক্ষে এক হিসাবে মূল্যবান্; কারণ, ঐ রকম এক বিদেশী পণ্ডিতের সমালোচনার সহিত আমার যে এমন মিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার নিজের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়াছে; সাহানির সকল উক্তি সমান গভীর নয়—তার কারণ, লোকটা তেমন বাংলা নিশ্চয় জানে না যাহাতে লিরিক কবিতার রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায়। লিরিক কবিতা যেমন অনুবাদে প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, তেমনই মূল ভাষার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে তাহার সুর সম্পূর্ণ ধরিতে পারা যায় না। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তি ও কাব্যরস সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাঁহার ঐ কথাগুলি (তোমার উদ্ধৃত) আমার সহিত আশ্চর্য মিলিয়াছে। ১। যে 'সর্ববাদী'—তাহার নিজের বক্তব্য কিছু নাই। ২। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন পুষ্পোদ্যান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়াছেন মাত্র। ৩। তাঁহার শেষের দিকের কবিতায় কাব্যকে হত্যা করা হইয়াছে। ৪। তিনি একজন অসাধারণ আর্টিস্ট। এই কথাগুলি অতিশয় সত্য। ঐ শেষের কথাটিই আমি আমার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছি। **'Easygoing Universalist'** কথাটিও খুব সত্য; কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ যে নিজের সেই স্বৈরতান্ত্রিক ভাববাদের একটা তত্ত্ব গড়িয়া লন নাই, তাহা সত্য নয়। আমি তাহার নাম দিয়াছি 'জগৎব্রহ্মবাদ', একরূপ প্রকৃতিতান্ত্রিক জড়বাদ। আমি রবীন্দ্রনাথের ঐ ধর্মমন্ত্রটি উত্তমরূপে প্রমাণ করিব—আদি হইতে শেষ পর্যন্ত, রবীন্দ্রকাব্যে কবির এ ধর্মমন্ত্রটি নানারূপে নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটা সুপ্রতিষ্ঠিত 'জগৎবিজ্ঞান' ছিল না, তাহা বলা যায় না। 'ছোটগল্প' সম্বন্ধে আমিও বহুপূর্বে ঐ কথা বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনারাশির মধ্যে 'ছোটগল্প', 'কথা ও কাহিনী'র কয়েকটি এবং কতকগুলি গান বাঁচিয়া থাকিবে—আমার বিশ্বাস ইহাই।

ঐ বিদেশী অর্থাৎ অ-বাঙালী সমালোচকের সাহিত্যিক বোধশক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। বহুদিন আগে পাদ্রী টম্‌সন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলি নাই। তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির দুর্বলতা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উক্তিও যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই অর্থপূর্ণ। আমি তাহা একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এই সব বিদেশী সমালোচকের বিচার সম্বন্ধে Sainte Beauve-এর একটি বাক্য স্মরণ করি—"বিদেশী সমালোচকের সেই দৃষ্টি আছে যাহার সত্যতা পরবর্তী যুগে স্বীকৃত হয়।" মূল বাক্যটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না কারণ কোথায় আছে এখন স্মরণ হইতেছে না।

এদিকে ঢাকার সংবাদ খুবই খারাপ। আমি গণেশবাবু ও হরনাথের জন্য চিন্তিত আছি। য়ুনিভারসিটি এখন বন্ধ থাকিবে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহারা চলিয়া আসিবেন। আমি এখনও কোন খবর পাই নাই।

শ্রীমান নির্মলের একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। আমার 'স্বর্ণলতা'—Radio-Talk তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাহাই জানাইয়াছেন।

আবার কবে কলিকাতায় আসিবে? আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আশা করি কুশলে আছো। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দেশ ও সমাজ

১. জ্যোতির্ময়ী দেবীকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৩৬]

পোঃ তালপুকুর
বারাকপুর

স্বসৃকল্পাসু,

আপনার পত্র বিলম্বে পাইয়াছি। আমি এক্ষণে ঢাকা হইতে কিছুদিনের জন্য বাহিরে আসিয়াছি। উদ্দেশ্য, একটু স্থান বা বায়ু পরিবর্তন।

আপনার পত্র যত্নসহকারে পড়িয়ছি। আপনি আপনার লেখার দ্বারা আমার পূর্বপরিচিতা। আপনার লেখায় যে একটি আন্তরিকতা ও গভীরতার পরিচয় পাই তাহাতে আপনাকে একজন বিশিষ্ট লেখিকারূপে জানি।

আপনার পত্রে বুঝিলাম, আপনি সাহিত্যসেবা ছাড়াও সামাজিক সমস্যার চিন্তা করিয়া থাকেন। তাহা সাহিত্য-সেবার অনুকূল নয়; কিন্তু এযুগে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত সাহিত্য-চর্চাও সম্ভব নয়। এই জন্যই সাহিত্য এখন আর পদস্থ নাই—অবান্তর ভাবনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত। আমি সাহিত্যকে ব্যক্তিগত সাধনার একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করি। বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে আমিও সচেতন, কারণ ব্যক্তি-মন সমাজ-মন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিক জ্ঞান-যোগের দ্বারা এই সকল সমস্যার যে সত্যরূপ উপলব্ধি করা যায়—তাহা প্রতিকারমূলক না হইলেও, তাহার মূল্য খুব বেশি। এইজন্য যাঁহারা সাহিত্যব্রতী বা সাহিত্যিক প্রতিভাশালী তাহাদিগকে জন-কোলাহল হইতে একটু দূরে কতকটা নির্লিপ্ত থাকিতে বলি। কারণ সাহিত্যিকের অনুভূতি অখণ্ড অনুভূতি হইয়া থাকে—তাঁহারা কিছুকেই খণ্ডভাবে দেখেন না, তাই সাক্ষাৎভাবে কর্ম না করিলেও সত্য আদর্শ ও সত্য পন্থা তাঁহারাই নির্দেশ করিতে পারেন। কর্মীর দৃষ্টি কতিপয় নিকট ও আপাত প্রয়োজনের উপরেই নিবদ্ধ—একটা স্থূল ভাবাবেগ এবং যাহা হয় একটা কিছু করিয়া ফেলিবার অধীরতা—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের

মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার ফলে খানিকটা উত্তেজনার বাষ্প বা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

'নারী-সমস্যা'র কথা লিখিয়াছেন। সমস্যা অতিশয় জটিল ও গভীর এবং দুরূহ ও মর্মান্তিক। কিন্তু right thinking ও right attitude দরকার—ভাবাবেগের বিষয় নয়। আমাদের দেশে এই সমস্যা যে অতিশয় গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ভাবে ইহার সমাধানচেষ্টার পরিচয় নানাদিকে পরিস্ফুট হইতেছে তাহাতে মনে হয়—এ বিষয়ের গুরুত্ব কেহ উপলব্ধি করিতেছেন না। মূল সমস্যা নারী-সমস্যা নয় আরও বড় ও মূলগত। নারীর সমস্যা আমাদের দেশে যেমন, তাহা কেবল নারীজাতির পৃথক সমস্যা নয়—সমগ্র জাতির জীবন-মরণ সমস্যা। আমরা জাতি হিসাবেই চরম অধঃপাতে পৌঁছিয়াছি—মনুষ্যত্ব আমাদের নাই; আমরা যদি মানুষ হইতাম, পুরুষ হইতাম, তবে হয়ত য়ুরোপের মত আমাদের নারীদের পৃথক সমস্যা থাকিত না। কারণ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে আমাদের একটা স্বতন্ত্র কালচার ছিল, এখনও রক্তের মধ্যে তাহা আছে। আমাদের মেয়েদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; জগতের কোথাও এমন নয়। হৃদয়বলে ও আত্মিকবলে আমাদের মেয়েরা এত বড় বলিয়াই আজও জাতটা মরিয়াও মরে নাই। ইহা কবিত্ব নয়। পুরুষের আত্মপ্রসাদমূলক মিথ্যা নারী-স্তুতি নয়। আমাদের সকল সমস্যার মূল—আমাদের পুরুষেরা পশুর ধাপে নামিয়াছে। শিক্ষিত নারীদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তাহা য়ুরোপের মত পুরুষ-শক্তির সহিত নারী-শক্তির প্রতিযোগিতা নয়—পুরুষের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও তাহারই ফলে যে অধর্মাচার বা নিষ্ঠুরতা—তাহা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা। মনে রাখিবেন—"ক্ষীণো নরা নিষ্করুণা"—দুর্বলের নিষ্ঠুরতা ও সবলের নিষ্ঠুরতা এক নহে। সমস্যাটা বড় করিয়া দেখুন—যদি শক্তি থাকে দুর্বলকে উদ্ধার করুন, সমগ্র জাতির কল্যাণ চিন্তা করুন। নতুবা একটা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিরোধ সৃষ্টি করিলে ধ্বংসের পথ আরও প্রশস্ত হইবে। জগতে আজ সভ্যমানুষের মহাসঙ্কট উপস্থিত—যে সভ্যতার মূলে স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম উৎকর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল সেই সভ্যতা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া আজ মানুষ-জাতিকে বিনাশের মুখে আনিয়াছে। যে পরম অধ্যাত্ম-শক্তির নাম প্রেম, তাহা এই সভ্যতা হইতে নির্বাসিত হইয়াছে; তাই জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতির স্বার্থ-বিরোধ আজ মানুষের মনুষ্যত্বকে—মানুষের সবল আত্মাকেও নষ্ট করিতেছে। আমরা দুর্বল—আমাদের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরাও কি এই স্বাতন্ত্র্য-অভিমানকে সকল সমস্যা *সমাধানের জন্য শক্তিরূপে বরণ করিব?*

একথা আমিও মানি যে পুরুষের অবস্থা যখন এমনই, তখন মেয়েদের কল্যাণ-চিন্তা মেয়েদেরই করিতে হইবে। লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উপায় কি? কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে [যেন] কোনও বিরোধের ভাব না থাকে—থাকিলে কখনই [শুভ] হইবে না। সর্বকর্মসাধনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন—সেই শক্তি যদি প্রেম-পরিশুদ্ধ না হয় তবে কল্যাণ হইতে পারে না। কল্যাণই লক্ষ্য এবং কল্যাণ সকল সত্যের মতই অখণ্ড। পশ্চিম জীবনকে সংগ্রাম বলিয়া মনে করে—সমস্যার অবসান চায় না, সমাধান-চেষ্টায় যে উত্তেজনা তাহাই তাহার পরমার্থ। কর্মের উত্তেজনাটাই বড়—ফললাভটা বড় নহে। আমাদের কিছু নাই—আমরা অতি দীন, অতিশয় নিঃস্ব—বাটপাড়ের ভয় আমাদের নাই। কিন্তু যদি কিছুর সাধনা আমরা করিতে পারি, তাহা যেন সত্য-সাধনা হয়, জীবনের পরিপূর্ণ সফলতার সাধনা হয়।

আপনি পুরুষদের মতও চাহিয়াছেন। আমার মনে হয়, নারীদের যদি কোনও পৃথক সমস্যা থাকে তবে তাহা নারীদেরই এবং সে সমস্যার বিষয়ে তাহাদের চিন্তাই ঠিক হইবে। কিন্তু তজ্জন্য নারীদিগকে শিক্ষিত হইতে হইবে। পুরুষের যদি কোনও কর্তব্য থাকে তবে তাহা নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সুযোগ করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে বাকী যাহা তাহা নারীরা আপনিই করিবে। ইহা ছিল বিবেকানন্দের মত, আমি তাহার সমর্থন করি।

কিন্তু শিক্ষাও একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। আমাদের দেশে আজিও যথার্থ শিক্ষার নীতি বা রীতি প্রবর্তিত হয় নাই পুরুষরাও শিক্ষিত হয় নাই—নারীরা যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা সেই শিক্ষারই একটা কদর্য অনুকরণ। আমার মতে ইহাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। কুশিক্ষিত পুরুষের মত কুশিক্ষিতা নারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহাই ভয়াবহ। ইতি— ১৫.১১.৩৬

ভবদীয়
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৪০]

38 Nilkhet Road, Ramna
Dacca
৯-১০-৪০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু এতদিন আপনার পত্রের প্রত্যাশায় ছিলাম, কারণ তৎপূর্বে পত্র দিয়াছিলাম, উভয়ের পত্র cross করিয়াছিল। এখন মনে হইতেছে, আপনিও আমার চিঠির প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাই লিখিতে বসিলাম।

এখন নিঃসঙ্গ আছি—ছুটিতে ছাত্রদের সঙ্গও নাই—যেন কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, ভাল লাগে না; এক, চিঠি লেখা ছাড়া। শরদিন্দুবাবুকে অনেক চিঠি লিখিয়াছি—ভদ্রলোক বোধহয় আমার এই চৈঠিক বাচালতায় আশ্চর্য হইয়াছেন। উপায় নাই, কথা কহিবার একটি সঙ্গী নাই; এক আধজন যাহারা আসে, তাহারা খাঁটি পূর্ববঙ্গীয়, সাহিত্য-রস তাহাদের পক্ষে taboo। পূর্ববঙ্গ—বাংলার Scotland, ইহার প্রকৃতি আমাদের হইতে মূলে পৃথক, পরস্পরকে ঠাট্টাই করি, আর গালাগালিই দিই, সত্যকার প্রকৃতিভেদ আছে; অতএব পুনর্মিলনের আশা না করিয়া we should agree to differ। এতদিন এখানে রহিলাম, কি বয়স্কদের মধ্যে, কি ছাত্রদের মধ্যে,—একটিও সত্যকার সাহিত্যরসিক দেখিলাম না। ছাত্ররাও সাহিত্যচর্চার যে কসরৎ করে অথবা রসিক হওয়ার যে ‘আপ্রাণ’ চেষ্টা করে, তাহা সকল সময়ে ভয়াবহ না হইলেও, শোকাবহ। ইহারা অলঙ্কৃত বা শ্লেষযুক্ত ভাষা আদৌ বরদাস্ত করিতে পারে না। সকল বিষয়েই too literal। ইহারা nerve অপেক্ষা muscle-এর গুণগ্রাহী ও quality অপেক্ষা quantity-র আদর করে—পাঁপরভাজা খায় না, বড় হালকা, un-substantial বলিয়া। তাছাড়া এমন stark materialist আমি আর কোথাও দেখি নাই; যে কোন প্রকার শক্তি-প্রতিপত্তি, ও পয়সার জন্য—প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য—ইহারা এমন কাজ নাই যাহা করিতে পারে না। ইংরাজিতে যাহাকে grit বলে তাহা ইহাদের খুব বেশি মাত্রায় আছে—জিদ আছে, গোঁ আছে, impulsiveness-ও আছে কিন্তু সত্যকার idealism নাই, কারণ সে culture নাই। ইহাদের হৃদয়ের সৌরভ নাই—রং আছে, কিন্তু সেও বড় কাঁচা। আমার মনে হয় অতীতের সঙ্গে ইহাদের

যোগ বড় অল্প, কোন পাকা বনিয়াদ কোথাও নাই, ধর্মের বাঁধন একটা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘুচিয়া যাওয়ায়—কোন সংস্কারই এখন আর নাই, তাই সর্ববিষয়ে ইহারা প্রগতিবাদের দোহাই দিয়া অভিমান চরিতার্থ করিতেছে। মনের aristrocracy নাই বলিয়া ইহাদের কোন বিষয়ে 'লজ্জা' নাই; এইখানে আমাদিগকে উহারা হটাইয়া দিয়াছে। এই সমাজেই আমি এতকাল বাস করিতেছি, মনের মত মানুষ একটি পাইলাম না, যদিও অনেকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। আবার যাহারা ৫০০৲ উপরে মাহিনা পায় বা কোন বড় চাকুরী করে, তাহাদের বিলাতিয়ানা ও snobbery বাঙ্গালী-জাতির মুখে কালি মাখাইতেছে। ঐ যে বলিয়াছি— ইহাদের মনের aristrocracy কোন কালেই ছিল না।

উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহা পুরুষদেরই সম্বন্ধে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি খুব ওয়াকিবহাল নই; তবু মনে হয়, তাঁহাদের কমনীয়তা কিছু কম হইলেও, আমাদের মেয়েদের তুলনায় তাঁহারা শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী। পরিবার এখনও অনেকাংশ একান্নবর্তী থাকায়, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রসার এখনও আছে। তাঁহারা দুর্বলা নয়, সবলা। সেবায় যত্নে পরিশ্রমে তাঁহারা অধিকতর পটু; কিন্তু— জানি না, মনে হয় দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্যগুণে তাঁহারা আমাদের সীমন্তিনীদের সমকক্ষ নহেন।

কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। আপনার মত রসিক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নারীচরিত্র ও নারীদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই; তাই, বলিয়াই জিব কাটিয়াছি, আপনি তাহা দেখিতে পান নাই। তবু এখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে পারি—য়ুনিভার্সিটিতে প্রায় ৬০।৭০—এবার ৮০।৯০ জন মেয়ে ছাত্রী আছে। এতদিন এখানে আছি তবু একখানিও এমন মুখ দেখি নাই যাহা দেখিলে মনে চমক লাগে—কল্পনা জাগিয়া উঠে। এই জন্যই বোধ হয় এদেশে কবি নাই, যাহারা জোর করিয়া কবি হয় তাহারা sex ছাড়া আর কিছুরই প্রেরণা পায় না—যে প্রেম সৌন্দর্যের সহিত অভিন্নতার সেই অসীম রহস্য, সেই সচন্দ্রতারকাবিভাবরী রূপ ইহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, ইহারা কুৎসিত বাস্তবের জয় ঘোষণা করে।

কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, আমার এই নিঃসঙ্গতার কথা। আজ শারদীয়া নবমী—কোথাও ঢাক ঢোলের শব্দও নাই—আমি থাকি শহর হইতে দূরে মাঠের ধারে। এ কয়দিন একটি মানুষও আসে নাই। ভাগ্যে বাগান ছিল তাই একটু অন্যমনস্ক হইতে পারি—শীতের ফুলের আয়োজন এখন হইতেই করিতে হয়। ঘরে আসিয়া বসিলে কিন্তু আর ভাল লাগে না। 'পূজাসংখ্যা'-গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া

সময় কাটাইবার চেষ্টা করি। তাতেও বিপদ কম নয়। মাথার অসুখ হইয়াছে—মাথা একটুকুতেই উত্তেজিত হয়—মনের সুখ না থাক, শান্তি ত চাই! একদিকে রবীন্দ্রনাথের গুরুতর পীড়ার সংবাদে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত, তাঁহার মহাপ্রস্থানের মুহূর্ত সকলে মহা উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, আমিও একটু ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে পূজার 'আনন্দবাজারে' রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরী' চোখে পড়িল—পড়িয়া এমন একটা শক্ পাইলাম তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাংলা সাহিত্যে রবান্দ্রপ্রতিভার শেষ দান অথবা পরিণাম যেন একটা গগনভেদী অট্টহাস্য হইয়া উঠিল! কবি রবীন্দ্রনাথের খেলার ঘর, পড়িবার ঘর, সাধন-কক্ষ, বসন্ত-বাটিকা, পূজার ঘর, অধ্যাপনা-গৃহ, নৃত্যশালা, ব্যাধিমন্দির—বাংলা সাহিত্যে এই সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু 'ল্যাভেটরী'-ও যে দেখিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই। এই রচনাটিকে আগাগোড়া অন্য অর্থে লইয়া বিদ্রূপ বা শ্লেষের রচনা বলিয়া সাফাই গাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে হইবে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা!

আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠি-তে আপনার 'ভৌতিক' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি—'আধুনিক বাংলা কবিতার' এমন সমালোচনামূলক satire এ পর্যন্ত কেহ লিখিতে পারে নাই। কার্তিকের সংখ্যায় 'প্রোলেটারিয়েট' কবিতাটিও উক্ত রসের একটি masterpiece। ভারতবর্ষে আপনার একটি নাটিকা দেখিলাম, শুনাইয়াছিলেন। আরগুলির কি হইল? আপনি কি সেগুলি কৃপণের মত সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন? সেই 'বানপ্রস্থ' এ পর্যন্ত কোথাও বাহির হইতে দেখিলাম না? দেখিলাম 'রাত্রি' শনিবারের চিঠিতে বাহির হইবে—'প্রভাতী'র কি হইল? সেখানে কি শেষ হইয়াছে? এবারে শনিবারের চিঠিতে একটিও ভাল গল্প নাই—পূজার বাজারে সব জিনিষই মহার্ঘ, শনিবারের চিঠির পক্ষে সওদা করা কঠিন হইয়াছে।

'আনন্দবাজারে' আপনি ফাঁকি দিয়াছেন—'দ্বৈরথ' গল্পটিকে ভাঙ্গিয়া কেবল একটু হাল্কা করিয়া বাঁধিয়াছেন, আপনাকে এখনই···বাবুর রোগে ধরিল! লক্ষণ ভাল নয়, ও কাজ করিবেন না। একটি ঠিক অপরটি মত না হইলেও স্পষ্ট repetation আছে, উহাতে কোনটারই মর্যাদা থাকে না। আপনার বই পাইয়াছি, বহু ধন্যবাদ। 'মন্ত্রমুগ্ধ' কিন্তু আমাকে একবারও দেন নাই।

এবারে তারাশঙ্করের দুইটি গল্প বড় ভাল লাগিল—খাঁটি তারাশঙ্করী গল্প, প্রবাসীতে 'কবি' ও আনন্দবাজারে 'বন্দিনী কমলা'। দুইটি দুই ধরণের, একটিতে (বন্দিনী কমলা) atmosphere, অপরটিতে চরিত্র সৃষ্টি বড় উপাদেয় হইয়াছে।

'কবি' গল্পটির কল্পনা একেবারে প্রথম শ্রেণীর : জিনিষটি বাহিরে অতিশয় simple—কিন্তু প্রত্যেক touchটি অর্থপূর্ণ : গল্পের শেষটিতে কবিচরিত্র ও কবিভাগ্যের যে নিগূঢ় তত্ত্ব—এই গ্রাম্য 'কবিয়ালে'র জীবনে লেখক যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। দেখা যাইতেছে তারাশঙ্করের সৃষ্টিশক্তি এখনও অব্যাহত আছে। আপনার কেমন লাগিয়াছে ?

আজ যা খুশি লিখিয়া চলিয়াছি—কেবল আলাপ করিবার জন্য। আবার বড় অবসাদ বোধ করিতেছি। মনে হইতেছে জীবনটা বৃথায় গেল— কত ভুল করিয়াছি ! নিজেকে অতিশয় দীন দরিদ্র মনে হইতেছে ; জীবন যে কত বড়, আর আমি যে কত ছোট, ইহাই ভাবিয়া এবং নিঃস্বতার পরিমাণ চিন্তা করিয়া বড়ই হতাশ হইতেছি—কোন দিকে এতটুকুও হাতে পাইলাম না !

আমার ৺বিজয়া দশমীর আলিঙ্গন-নমস্কার জানিবেন—একটু আগে হইলেও ডাকে যথাসময়ে পৌঁছিবে। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪২]

ঢাকা

১—১১—৪২

পরমস্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি—মনে হইতেছে মধ্যে একখানি কার্ডে আমার বিজয়া দশমীর স্নেহালিঙ্গন জানাইয়াছি কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে, আমি কিরূপ মানসিক অবস্থায় আছি। শরীর আবার কিছুদিন— পূজার পূর্ব হইতেই খারাপ হইয়াছে, তার উপর অসম্ভব রকমের পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তিনখানি বই প্রেসের জঠর হইতে বাহির হইবার সময় হইয়াছে, কাজেই এ সময় যত উদ্ভট কাজ—যেমন মুখবন্ধ লেখা, Index প্রস্তুত করা, এবং প্রুফ দেখা (রাশি রাশি) করিতে হইতেছে। তার উপর নিত্যসেবাও আছে ; এবং তদুপরি বিজয়া দশমী, সাহিত্যিক আবেদন-নিবেদন, তরুণ কবিদের কাব্য-উপহার ও তৎসম্বন্ধে মতামত প্রার্থনা, এবং জন্মদিন উপলক্ষেও অভিনন্দন—

ইত্যাকার পত্রস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছি। কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে আরও পূর্বে লিখিতে পারি নাই।

তোমার মনের যে অবস্থার কথা লিখিয়াছ তাহা বোধ হয় আজকাল দেশের সকল অনুভবশীল যুবকের অবস্থা এবং তাহা সুস্থ অবস্থা নয়। তথাপি, তোমার পক্ষে একটা সৌভাগ্য এই যে, তুমি সাহিত্যজগতে অর্থাৎ সত্যসুন্দরের ভাবজগতে বাস করিবার পরোয়ানা তোমার বিধাতার নিকট পাইয়াছ; যদি তাহাকে নিত্য অনুশীলনের দ্বারা পাকা করিয়া লইতে পার, তবে বাহিরের মহাদুর্যোগ—এমন কি নিজের সাংসারিক নানা দুর্ভাবনাও তোমাকে কতক পরিমাণে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিবে। আসল কথা, এযুগে কাহারও আত্মিক শক্তি তেমন নাই, আত্মজ্ঞানের অভাবই তার কারণ। সকলেই সকল কাজের উপযুক্ত নয়—সকলেরই 'স্বধর্ম' আছে; এবং তাহা স্বনুষ্ঠিত পরধর্মের প্রলোভনে যেন বিচলিত না হয়। তোমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত পরধর্ম, যাহা তোমার অধিকার নয়—পারিপার্শ্বিকের তাড়নায় যেন তাহাতে নিজেকে নিমজ্জিত করিও না! চাই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—নিজেকে বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে স্থির রাখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিবে। যতদূর মনে হয়, 'সামাজিক' কর্মজীবন তোমার জন্য নয়; তোমার গতি বহির্মুখী নয়—অন্তর্মুখী; অতএব ধর্ম বিপর্যয় না ঘটে। তুমি যতদূর সম্ভব নিজেকে বাহির হইতে পৃথক রাখিয়া আরও গভীরভাবে ও একাগ্রচিত্তে সারস্বত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে। জীবনে অনেক লগ্ন আসে যখন চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়, আসন রক্ষা করা যায় না—উহার নাম **spiritual crisis**—ঐ সময়ে গুরুবাক্য ছাড়া আর কিছুতে মন না দিয়া, প্রায় অন্ধভাবে স্বকীয় মন্ত্র জপ করিবে; তাহা হইলেই ক্রমে সেই অন্ধকারেই আলো ফুটিয়া উঠিবে—মনোহররূপধারী মিথ্যা-দৈত্যেরা অপসৃত হইয়া যাইবে। চাই ধৈর্য, এবং আত্মনিষ্ঠা। দেশে আজ যে সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিতেছে—তাহার জন্য বহু মানুষের কর্তব্য আছে, কিন্তু সকলকেই সেই কর্তব্যপালনের জন্য ডাক পড়ে না; তোমার মত মানুষের কাজ স্বতন্ত্র, দলে মিশিয়া যুদ্ধ করিবার ক্ষাত্রধর্ম তোমার ধর্ম নয়। কেবল অস্থির বা অধৈর্য হইয়া কোন পথ সহসা অবলম্বন করিবে না। যাহাদের মনের কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ বা প্রাক্তন সঞ্চয় আছে তাহারা পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দের তীর্থপথেই চলিবে, তাহাতেই তাহাদের ধর্মপালন করা হইবে। আমার 'হেমন্তগোধূলি'র অনুবাদ-কবিতায় 'আবেদন' আবার পড়িবে—উহার শেষ **stanza**টি সকল সাহিত্যিক সাধকদের পক্ষে সত্য।

আরও একটা কথা এই যে, আমাদের দেশে বর্তমানে একটা অতিশয়

লক্ষ্যহীন, ধর্মহীন, নেতৃহীন উপদ্রবের আবহাওয়া মাত্র আছে—সত্যকার যজ্ঞ বা যজ্ঞেশ্বরের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। কেবল উপদ্রব ও উৎপাত, কেবল হাত-পা-ছোড়া এবং শক্তিহীন লক্ষ্যহীন অকর্মের উত্তেজনাই এ পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাতে 'সোভিয়েট-সুহৃদ' বা ঐরূপ দল বাঁধিয়া, তাহাতেই ঝাঁপ দিয়া পড়া নিতান্তই আত্মহত্যা। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটি পড়িবে। সর্বোপরি, একটা কাজ আরম্ভ করিয়া দাও—বেশ একটা plan করিয়া একটা রীতিমত 'অধ্যয়ন' আরম্ভ কর—বাংলা সাহিত্য অথবা সংস্কৃত সাহিত্য—এবং ইংরাজী সাহিত্য (বিশেষ করিয়া তাহার ইতিহাস) পড়া আরম্ভ কর। একটা গুরুতর কাজে লিপ্ত থাকিতে পারিলে পরিবেশ এবং সে কাজের ফল যদি খুব বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার—সকল মানসিক দুর্বলতা দূর হইবে।

আমি এখনও অতিশয় ব্যস্ত। আশা করি শারীরিক কুশলে আছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ ও শুভকামনা জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—প্রত্যেক চিঠির উপরে তোমার নিজের ঠিকানা দিতে ভুলিও না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়।

৪. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত
[ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩]

ঢাকা
২২—২—৪৩

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ১ ফেব্রুয়ারী তারিখের কার্ড যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। এখানে নানা উৎপাত ও আশঙ্কার মধ্যে বাস করিতেছি—তাই তোমার পত্রের উত্তর দিতে দেরি হইল।

যে দুর্দিন আসিয়াছে এবং ক্রমেই সর্বপ্রকার বিপদ যেরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা করিবার, সান্ত্বনা দিবার অথবা কল্যাণ-কামনা করিবার শক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে—দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" তথাপি "এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।" যাহাদের

'পাখা' আছে, তাহাদিগকেই একথা বলা যাইতে পারে—পাখা অর্থাৎ নিরন্তর ঊর্ধ্বগতিশীলতা—মনের সেই শক্তি। তোমার তাহা আছে। তাই আশা করি, তুমি এই কালরাত্রি কোনরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে।

তোমার কি পরীক্ষা আবার আসিতেছে?—বুঝিতে পারিলাম না। 'সাহিত্য-বিতান' একেবারে সব পড়িবার অবকাশ না ঘটিলেও এক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শেষ করিতে পারো। এক সঙ্গে একটানা সব পড়িতে কষ্ট হইবে। 'কাব্যমঞ্জুষা' একখণ্ড তোমার জন্য পাঠাইয়াছি, 'শনিবারের চিঠি'র ঠিকানায়—সেইখান হইতে লইয়া আসিতে হইবে।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'র দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু নূতন বিষয় যোগ করিয়াছি। উহা পাইতে বিলম্ব হইবে।

তোমার কুশল সংবাদসহ পত্রের আশায় রহিলাম। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[আগষ্ট ১৯৪৩]

ঢাকা

১৭—৮—৪৩

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। বায়ুঘটিত বলিয়া মনে হইতেছে—হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা বোধ হয় সেইজন্য। যাই হোক—এখন স্বাস্থ্যহানি বড়ই চিন্তার বিষয়। আমাকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানাইবে।

দেশের অবস্থা—এবং তাহার অনিবার্য পরিণাম যাহা দাঁড়াইয়াছে—এবং আরও যাহা হইবে তাহা কোন মনস্বী ব্যক্তির অগোচর নাই—আমি মনশ্চক্ষে সকলই দেখিয়াছি, চর্মচক্ষে দেখিতে ভয় পাই। তোমার পত্রে কতকটা সেইরূপ দেখা হইয়াছে, এজন্য খুবই বিচলিত হইয়াছিলাম। আমার 'শনিবারের চিঠি'র লেখাগুলি তুমি বোধ হয় নিয়মিত পড় না। পড়িলে বুঝিবে, আমি এ বিষয়ে কিরূপ নৈরাশ্য-কাতর হইয়াছি।

তুমি চিন্তাশীল, অধীয়ান—কিন্তু বয়োধর্মে ভাবপ্রবণ। আজ যে মহাপ্রলয় পৃথিবীতে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের এই বহুকাল-কলুষিত ভূমির উপর দেখা দিয়াছে, তাহাতে মুহ্যমান হইলেই চলিবে না—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"। মহাকালের মূর্তি এইরূপই হয়—এবং তাহাও মঙ্গলময়। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারী'র উক্তি স্মরণ কর—"কাল যবে জাগে—সভয়ে অকাল কহে সবে।" এই ঝড়ে—আমার বিশ্বাস—পৃথিবীময় যত পাপ জমিয়াছে সব সাফ হইয়া যাইবে। আমাদের দেশে আমাদেরই কর্মফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে—পাপ করিয়াছি, এখন প্রায়শ্চিত্তকালে মূর্ছিত হইলে চলিবে কেন? বরং যতদূর সম্ভব শক্ত থাকিয়া এই পৈশাচিক নির্মমতার অগ্নিদাহ অন্তরের অন্তরে সহ্য করাই—পৌরুষ। মানুষের সাধ্য নাই যে ইহার প্রতিকার করে; কারণ এখন এই মহামন্বন্তরকালে কোন কর্ম নাই—থাকিলেও তাহা ফলপ্রসূ হইবে না। ভগবানের এই লোকক্ষয়কৃত মহাকাল-মূর্তি দেখিয়া অর্জুনের মত "দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম" বলিতেছি বটে, কিন্তু এমনই করিয়া তিনি সৃষ্টির ধারা সংশোধন করেন। অতিশয় দীনদরিদ্র অসহায় এবং অপেক্ষাকৃত পাপবর্জিত সরলস্বভাব জনগণের এইরূপ নিদারুণ দশা দেখিয়া বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ হয়। বুদ্ধের মতে—কর্ম যে করে ফলভোগ সেই করে না—অপরে করে; তার কারণ বৌদ্ধ দর্শনে ব্যক্তি-আত্মা স্বীকৃত হয় নাই। কর্মই প্রভু—কর্মই সুখদুঃখের ভোক্তা সৃষ্টি করে; আমরা সকলে কর্মের বিশাল স্রোত পুষ্ট করি মাত্র—সেই স্রোতের ঘূর্ণায় অসংখ্য 'পুদ্গল'-রূপ ভোক্তার সৃষ্টি হয়—দুঃখ ভোগ করিবার যন্ত্র তাহারাই। তুমি আমি—কেহ নই—আমাদের কর্মই সব—সেই কর্মের ফল ও ফলভোগী যাহারা হইবে তাহারাও সত্যবস্তু বা নিত্যবস্তু নয়—একমাত্র সত্যবস্তু ওই কর্ম এবং তাহার ধারা। এইজন্য বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছিলেন—কর্মত্যাগ কর—বাসনা কামনা নষ্ট কর, কর্মের ওই ধারা বদ্ধ করিয়া দাও। কামদিগ্ধ কর্ম করিবার সময় মনে রাখিও—কত দুঃখের কারণ সৃষ্টি করিতেছ—সেই দুঃখ ভোগ করিবার জন্য কত পুদ্গল-প্রাণীর উদ্ভব হইবে। আজ তুমি যাহাদিগের নিদারুণ দুর্দশা দেখিয়া এত কষ্ট পাইতেছ—তাহাদের সেই দুর্দশার জন্য দায়ী কে—চিন্তা করিয়া দেখ। আমাদের জাতি বহুকাল ধরিয়া বহু পাপ করিতেছে—এখনও তাহার বিরাম নাই; সেই পুঞ্জীভূত পাপের পরিণাম আজ বড় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। জগৎ বা সৃষ্টি নিয়মে বাঁধা আছে—বিনা নিয়মে (Law) একটা তৃণও শুকাইতে পারে না। ইহাই ধর্ম। এই ভীষণ পৈশাচিক তাণ্ডবের মধ্যেও সেই ধর্ম ঠিক আছে—ইহাই নিশ্চিত জানিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিবে।

তুমি লিখিয়াছ রবীন্দ্রনাথ কোথায় নাকি বলিয়াছেন "মানুষের শত প্রার্থনাতেও সৃষ্টির বিধান বিচলিত হয় না"—ইহা ত রবীন্দ্রনাথেরই কথা নয়—অতিশয় সাধারণ কথা। এইজন্যই কেবল ধ্যান বা ভাববিলাস মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়—রবীন্দ্রনাথের যে ধর্ম, সে ধর্ম মানুষের পক্ষে অতিশয় মিথ্যা। আমাদের দেশে (গত শতাব্দীতে) এক শ্রেণীর ভাববিলাসী ধর্মসাধনাকে বড়ই সহজ ও সুখকর করিয়া তুলিয়া মুক্তিলাভ করিবার ভাণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই দলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ঋষি। দুর্বল, চরিত্রভ্রষ্ট এবং ভাববিলাসী বাঙালীর পক্ষে যাহা মৃত্যুমন্ত্র—তিনি তাহাই অপূর্ব ছন্দে সকলের কানে বহুদিন ধরিয়া গুঞ্জন করিয়াছেন। যাহা ধর্মরূপে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে, তাহা ঐরূপ ভাববিলাসের ধর্ম নয়—কেবল ভাবনা কামনা ও প্রার্থনার দ্বারা 'লোক-সংগ্রহ' হয় না। তাই গীতায় শ্রীভগবান বারবার 'কর্মযোগে'র উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা যে কত দুরূহ সাধন-সাপেক্ষ তাহাও বলিয়াছেন। ইহাও বলিয়াছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এবং "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। কিন্তু এই 'কল্যাণকৃৎ' ত কর্মযোগী—ভাবসাধক—বাক্যবিলাসী নয় এবং কর্ম করিতে হইলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—সংযম ও চিত্তশুদ্ধি; তাহার পক্ষে নৃত্যগীত ও কাব্যকলার অনুশীলন মারাত্মক। বোলপুরে যে গুরুকুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে সর্বপ্রকার আত্মশাসন, কৃচ্ছ্রসাধন, অধিকারী-অনধিকারী ভেদ দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; বিশেষ করিয়া আমাদের জাতির প্রকৃতি ও সংস্কারের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর সেই যৌন প্রবৃত্তির উত্তেজক সর্বপ্রকার উপকরণ সেখানে আহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের ভোগ-মোক্ষ সাধনার জীবনেও 'রস' ছাড়া আর কিছুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই—এবং সেই ভোগবাদকে আজীবন নিজের অলৌকিক গীতিপ্রতিভার বলে এমন মোহনভঙ্গিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, এজাতির যেটুকু 'ধর্ম'-ও অবশিষ্ট ছিল তাহাও শেষ করিয়া গিয়াছেন। তুমি তোমার পত্রের একস্থানে রবীন্দ্রনাথের নাম ও উক্তির উল্লেখ করিয়াছ—আজিকার এই প্রলয়ান্ধকারে তাহা আমার নিকটে এতই মিথ্যা যে, আমি—অবান্তর হইলেও—এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম।

আমার স্বাস্থ্য বড় ভাঙ্গিয়াছে—একে শরীর এই, তার উপর স্থানীয় বিপদ ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছে যে, শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইব কিনা তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ হয়। আমার মনে হয়—আমি আর বেশিদিন বাঁচিব না; আমার অনেক কাজই বাকি রহিল—বোধ হয় প্রধান কাজই পড়িয়া রহিল। দুঃখ কেবল

তাহাই। ইহাই আরও দুঃখের কারণ যে, আমি ভিন্ন সে কাজ অন্ততঃ এই যুগে আর কেহ করিবে না—করিতে পারিবে না। কিন্তু সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

'কাব্যমঞ্জুষা' তৃতীয়বার ছাপা হইতেছে—এবারেও তোমাকে একখণ্ড পাঠাইব। তোমার সেই 'বনমালা'র একটু note এবার দিয়াছি। তুমি যে শিক্ষা বিষয়ে খুব নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল তাহা বুঝিয়াছি; তাই ঐ 'বনমালা'র প্রসঙ্গে তোমার ভুল সংশোধন করিয়া দিই। 'বনমালা'র আদি ও মুখ্য অর্থ 'বনফুলের মালা'ই বটে—ভাল করিয়া অভিধান দেখিবে। তোমার ঐ অর্থটি একটি বিশেষ অর্থ মাত্র। কালিদাসেও 'বনমালা' 'বনফুলের মালা' অর্থেই আছে।

তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত রহিলাম। পত্রের উত্তরে কুশল সংবাদ দিবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬. অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৪৬]

Bagnan P. O.
23. 10. 46.

কল্যাণীয় শ্রীমান অক্ষয়,

তোমার ৺বিজয়ার প্রণাম পাইয়াছি। তুমি আমার আশিস্ সহ স্নেহালিঙ্গন জানিবে।

তুমি ঢাকায় আছ—কাজ কর্ম কি করিতেছ তাহা জানাও নাই। এ সময়ে ঢাকায় বিনা কাজে থাকা উচিত নয়। অবশ্য যদি সেখানে আর সকলকে থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। তবু আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই উদ্বেগ অনুভব করি।

বাংলা দেশে এখন যাহা হইতেছে তাহার মূলে অতিশয় গুরুতর ও সাংঘাতিক কারণ আছে, অতএব এই অবস্থা সহজে দূর হইবে না, বরং ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিবে। তোমরা ইহাকে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক উপদ্রব মনে করিয়া ভুল করিও না। ইহার উদ্দেশ্য যেমন দৃঢ়, তেমনই গভীর। বাংলার নেতৃবর্গ ও সংবাদপত্র যাহা বলিতেছে তাহার উপর নির্ভর করিও না।

বাঙালী হিন্দুর বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—ধর্মও আর নাই; এখনও সকলকে কংগ্রেসের নামে আশ্বস্ত করিতেছে। গান্ধী-কংগ্রেসই বাঙালীর সর্বনাশ করিয়াছে—এখনও করিতেছে।

আমার শরীর ও মন দুইই এত ভগ্ন ও দুর্বল হইয়াছে যে এবার সত্যই ভয় পাইয়াছি বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচিব না। সাংসারিক দুশ্চিন্তাও কম নয়। আমি এখন প্রায় শয্যাগত আছি। তবুও এই অবস্থায় দেশের বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে অতিশয় চিন্তাপীড়িত আছি। কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছি। উহাই বোধ হয় দেশ ও জাতির সম্বন্ধে আমার—"dying declaration".

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন আশা না রাখাই ভাল। এমনকি ঢাকাতে না থাকাই কর্তব্য। এখনও কিছুদিন তোমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু লেখাপড়া ত' ছাড়া উচিত নয়? আশা করি তোমরা কুশলে আছ।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭. অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghosh Road
Baidyapara
Barisha P. O. (24 Pargs.)
18. 4. 47

স্নেহাস্পদেষু অক্ষয়,

তোমার প্রেরিত কাপড়গুলি কাল পাইয়াছি। কলিকাতায় যে অবস্থা তাহাতে পাইবার আশা ছিল না। তুমি কোন্ কাপড় (তিন রকমের পাইয়াছি) কি পরিমাণ পাঠাইয়াছিলে জানি না, আশাকরি যাহা পাঠাইয়াছ তাহাই পৌঁছিয়াছে। তবু পরিমাণ সম্বন্ধে জানাইও। (১০ গজ ও ৬ গজ? তোমার পত্র আবার দেখিলাম, মিলাইয়া দেখিব)।

আমি নূতন স্থানে আসিয়া নূতন রকমের কষ্ট ভোগ করিতেছি; ইহা শুধুই আমার অদৃষ্ট নয়—দেশের এই অবস্থায় বাঁচিয়া থাকাটাই একটা ঘোরতর

সমস্যা ; তবে আমার জীবনের এই ভাগে এবং এই শরীরে ও এই বয়সে আমার পক্ষে নানা কারণে একটু বেশি দুর্বহ হইয়া পড়িতেছে। আশা-ভরসার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও লোপ পাইতেছে; অথচ এখনও কত কাজ করিবার ছিল, এবং অবস্থা একটু অনুকূল হইলে করিতেও পারিতাম; কিন্তু তাহা বোধ হয় আর হইল না।

সবচেয়ে বড় নিরাশার কারণ হইয়াছে এই যে, এ জাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এ যেন মহাভারতের সেই যদুকুল-ধ্বংসের মত। অধর্ম ও মিথ্যাচার, পৈশাচিক স্বার্থপরতা, লোভের অন্ধতা এ জাতির সর্বস্তরে অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ; মানুষের সঙ্গে মানুষ হিসাবে কোন সম্বন্ধ আর নাই—ভাই নাই, বন্ধু নাই, সমাজ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, দয়া নাই। অতিশয় নিকট আত্মীয়ও—স্নেহ দূরে থাক, দয়াও করে না। এই একাকার পাপের সমারোহে মধ্যে মধ্যে যে দুই চারিটি অ-সহযাত্রীকে দেখিতে পাই, তাহারা যেন এই দেশ ও কালের কেহ নয় ; তাহারা অতিশয় অসহায়—ঝড় ও অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণপ্রাণ দীপশিখা। দেখিলে শুধু ইহাই মনে হয় যে, এই প্রেতভূমিতে শিব মূর্ছিত হইয়া থাকিলেও এখনও শবে পরিণত হয় নাই। এইটুকু মাত্র নিরাশার আশা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবন ক্রমেই দুর্বহ হইয়া পড়িতেছে।

আমাকে যেন একটা দুষ্টগ্রহ হাত-পা বাঁধিয়া অকর্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। কলিকাতার নিকটে থাকিয়া একটা কোন কাজ করিবার সুবিধা হইবে, এই আশায় ও বিশ্বাসে আমি এইঅবাঞ্ছিতস্থানে বাসা করিয়াছি। একটা কাজের সূচনাও হইয়াছিল; একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কথাবার্তা প্রায় ঠিক হইয়াছিল, তাহাতে আমার একটা নূতন কর্মজীবন আরম্ভ হইত। কিন্তু কলিকাতার ও দেশের এই নূতন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সেই-কাজ বিশেষ বাধাগ্রস্ত হইয়াছে—অপর পক্ষ উৎসাহ হারাইয়াছেন। এ অবস্থায় আর কোন কাজের সম্ভাবনাও দেখিতেছি না।

পুস্তকব্যবসায়ীদের অবস্থাও শোচনীয়। আমার প্রকাশক প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, এ পর্যন্ত অবস্থা যখন ভাল ছিল—আমাকে সকলেই দোহন করিয়াছে, কেহই মমতা করে নাই। 'শনিবারের চিঠি' আমাকে যেভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছে তাহা আমার এই জীবনের একটা বড় আঘাত।

সম্প্রতি তোমাদের ঐখানকার সাধু সত্যনিষ্ঠ—Library আমাকে বেশ একটু বে-কায়দায় ফেলিবার চেষ্টায় আছে। আমি যে দুইখানি বই রচনা বা প্রণয়ন করিয়াছি, তাহার স্বত্ব হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে অতিশয়

অসদাচরণ করিতেছে। আমি এ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া লেখকের বৃত্তি অবলম্বন করি নাই, কখনও করিব না। দুইখানি পুস্তক তৈয়ারী করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম—তাহার প্রকাশক তাঁহারাই বটে, কিন্তু আমি যে কিঞ্চিৎ রৌপ্য মূল্যে বইখানি বিক্রয় করিব, এমন কথা কখনও বলি নাই: উহারা তাহাই চায়; এজন্য বইগুলির ছাপাও আমাকে দেখাইবে না—একখানি বই, আমার লেখার উপরে নিজের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করিতেও চাহিয়াছিল! আর একখানির পূরা কপি না পাইয়া ছাপা বোধ হয় বন্ধ রাখিয়াছে, তবু আমার নির্দেশমত কিছুই করিবে না—পত্র লিখিলে উত্তর পর্যন্ত দেয় না। বাকি কপির (কপালকুণ্ডলার 'ভূমিকা') বার বার তাগিদ দিয়াছে—কিন্তু agreement বিষয়ে কিছুই করিবে না। আমি তাহার এই আচরণে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি—ভূমিকা পাঠানো স্থগিত রাখিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও আর কোন সাড়া-শব্দ নাই। অথচ, এই মাসের মধ্যে, এমন কি মার্চ মাসে বইখানি প্রকাশিত হওয়া অতিশয় আবশ্যক ছিল; হইতেও পারিত। আমি উহার মতলব বুঝিতে পারিতেছি না। শেষ পর্যন্ত একটা অপ্রীতিকর কিছু না হইয়া দাঁড়ায়। তুমি কি আর একবার উহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত কোন লেখাপড়া করে নাই; কাজেই এখন গোলমাল করিলে উহার সুবিধা হইবে না। আমি গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করিব না, ইহা নিশ্চিত। উনি অতিশয় ধার্মিক বলিয়া আমাকে যে নাম-মাত্র Royalty দিতে রাজী আছেন, তাহাও ধর্মসঙ্গত নয়। কলিকাতার কোন publisher এ পর্যন্ত, আমার সঙ্গে অধর্মাচারণ করে নাই, ইহা আমি উত্তমরূপেই জানি; না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; একটা কারণ, তাহারা আমাকে ভালরূপ চেনে, এবং ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধা এবং ভয়-ভক্তি করে। আরও বাস্তব কারণ আছে। সে যাই হোক, তুমি যদি এই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে উভয়কে উদ্ধার করিতে পারো, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিও। আমাকে কোন প্রুফ, অথবা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফর্মাগুলির ফাইল পাঠায় না—ইহাতেও আমি অতিশয় অবজ্ঞাত ও অপমানিত বোধ করিয়াছি। লোকটার সাধারণ সৌজন্য বা ভদ্রতাও নাই।

দেশের ও কলিকাতার এখন যে অবস্থা এবং নিকট ভবিষ্যতে আর যে ভয়ানক অবস্থা হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি তাহাতে উপস্থিত তোমাদের প্রাণরক্ষা ও সাধারণ কুশল-কামনা ছাড়া আর কোন চিন্তা করিতেছি না। তোমাদের কুশল-সংবাদ যেন সময়মত পাই। ঢাকার আর সকল বন্ধু-বান্ধব ও

ছাত্র-ছাত্রীগণের সংবাদও দিবে আমার অন্তরের শুভকামনা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৪৭]

Kailas Chandra Ghose Road.
Barisa P. O. (24 Parganas)
9. 9. 47.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি 'বঙ্গদর্শন' লইয়া এ কয়দিন এত ব্যস্ত আছি, যে উত্তর দিবার সময় পাই নাই। আপনি আমাকে যে গল্প লিখিয়া দিবার আশ্বাস দিয়াছেন, তাহাতে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি।

আপনি দিল্লীতে যদি গিয়া থাকেন তবে এই পত্র সময়ে পৌঁছিবে না। ফিরিয়া আসিলে পাইবেন। আমি 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে আপনার মতামত জানিতে উৎসুক আছি, এতদিনে নিশ্চয় পৌঁছিয়াছে।

আপনি ঐ সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, আমার সহিত যতই মত-বিরোধ হউক, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইব না, তার কারণ আপনার হৃদয়ে বা মনে কোন মলিনতা নাই; জগৎকে এবং সমাজকে আপনি যে চক্ষে দেখেন, তেমনই দেখিতে পারা পুণ্যের লক্ষণ। আপনি বাংলাদেশ হইতে দূরে থাকেন সেও আপনার সৌভাগ্য, বিশেষ করিয়া বাংলার লেখক-সম্প্রদায়, সম্পাদক ও চিন্তানায়কগণকে আপনি যে কেবল লেখার মারফতই জানেন, এবং তাঁহাদের অতি উদার উচ্চভাবের বাক্যসকলই যে আপনাকে বাংলার যথার্থ শুভ ও মঙ্গলের আদর্শ সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। আপনি নিজেও যে প্রকৃতির লোক তাহা আমি জানি—আপনি নিজের ক্ষতি করিয়া পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। আপনার লেখার মধ্যেও যে হৃদয়ের পরিচয় পাই, তাহা আমাকে কম মুগ্ধ করে না। আপনি আপনার গল্পগুলিতে যে humour সৃষ্টি করেন, তাহা করিতে হইলে

যে রসবোধ বা রসিকতা-শক্তির প্রয়োজন, তাহা কেবল চতুর শিল্পী হইলেই হয় না—একটা অপূর্ব তিতিক্ষা চাই। যাহার বলে, মানুষের যত ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বুদ্ধি, দুর্বলতা ও অজ্ঞতার উপরে এমন মধুর, অশ্রুসজল হাসি বিকীর্ণ করা যায়। অতএব, আপনার পত্রে আপনি ঐ বিষয়ে আপনার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমার কঠোরতায় দুঃখ পাইয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হইয়াছে; ঐ না হইলে আমি আপনার সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইতে পারিতাম না। আপনাকে পুনরায় বলি, আমি আপনাকে যথার্থই শ্রদ্ধা ও স্নেহ করি—শুধুই আপনার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য নয়—আপনার ঐ স্বভাব ও চরিত্রের জন্য।

কিন্তু এই সব বাহিরের বিষয়ে যতই মতভেদ হোক, আপনি একটা বিষয়ে আমার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবেন না, করিলে দুঃখ পাইবেন; তাহা এই যে আমি আমার সারাটি জীবন সত্যের সন্ধানে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় (আমি যেমন বিশ্বাস করি) একরূপ উৎসর্গ করিয়াছি। আজ আমার অবস্থা যে কত খারাপ, আমি সর্বপ্রকারে (শারীরিক ত বটেই) যে কিরূপ শক্তিহীন, সহায়হীন, বন্ধুহীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন না। আমার যদি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিত তবে আমি এই সকল আঘাতে এখনও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। এতদিন সাহিত্য লইয়াই ছিলাম, এখনও আছি; কিন্তু আজ এই অবস্থায় ও এই বয়সে আমি আমার দেশ ও জাতির যে আসন্ন নিপাত 'দিব্যচক্ষে' দেখিতে পাইতেছি, এবং ইহাও দেখিতেছি যে, একটি বাঙালী কোথাও নাই যে বাংলার কথা ভাবে, শুধু তাহাই নয়, দেশকে ও জাতিকে বিকাইয়া দিয়া, সকলেই (প্রায় একজনও বাদ নাই) ঘোরতর স্বার্থসাধনে উন্মত্তের মত রত হইয়াছে; তাহাতে আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এত বড় মিথ্যাচার, এবং এত বড় দেশদ্রোহিতা আমি কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। এই 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিতে গিয়া, আমি সেই সকল ব্যক্তির অতিশয় রোষভাজন হইয়াছি—এমন কি, আমাকে যৎপরোনাস্তি শিক্ষা দিবার জন্য সাহিত্যিক ষড়যন্ত্রও হইয়াছে তাহার আভাস পাইতেছি। এতদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাকে যাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই, আজ তাহারা পলিটিক্সের অর্থাৎ কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ ও গান্ধী-ভক্তির প্রতি অতি সহজ অছিলায় আমাকে যেন বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি জানি, আমার মত ও আমার বিশ্বাস সকলের সমর্থন লাভ করিবে না; কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা ত অন্ততঃ ইহা মনে করিয়া আমাকে সহ্য করিতে পারে যে, আমার ঐ মত ও বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত বা অপ্রীতিকর হোক, আমার প্রাণে কোন

পাপ নাই, আমার কোন স্বার্থ নাই ; বরং যদি স্বার্থ থাকিত, তবে আমি সম্পূর্ণ একা ঐ অতিশয় বিপদ্‌জনক মত ও বিশ্বাসকে ধরিয়া থাকিতাম না। কংগ্রেসের যে মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, এবং দিনে দিনে পাইবে, এবং আর যে প্রদেশের পক্ষে যেমন হোক, বাংলাকে কংগ্রেস কি করিয়া চোখের উপর হত্যা করিল, তাহা আমি আজ যেমন দেখিতেছি, কাল সকলেই তাহা দেখিবে ; যদি না দেখে, যদি আমার এই আশঙ্কা ও অবিশ্বাস একটা অতিশয় কু-স্বভাবের জন্যই হইয়া থাকে, তবে আমার ঘোর অগতি যেন হয়। আমি চোখের উপর যাহা দেখিতেছি, তাহা যদি না দেখিতাম, যদি আমি এখনও বাঁচিয়া না থাকিতাম, তবে আমি এ দুঃখ, এ অশান্তি ভোগ করিতাম না।

কিন্তু, মতভেদের কথা নয়, আমার তাতে দুঃখ নাই—আপনি যদি ভিন্ন মতাবলম্বী হন তাহাতে আমার দুঃখ অন্যরূপ হইবে, কিন্তু আমার প্রাণে আঘাত লাগিবে না ; কারণ আমি জানি, আপনি কত সত্যনিষ্ঠ, আপনার মন কত সরল ও সুন্দর। কিন্তু যাহারা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, যশ, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব এবং ঐশ্বর্যের অতিশয় কুৎসিত নগ্ন ও নির্লজ্জ সাধনায় যাহারা মনুষ্যত্ব একেবারে বিসর্জন দিয়াছে এবং যাহারা আজিকার এই পলিটিক্‌সের অতিশয় অনুকূল স্রোতে নিজ নিজ নৌকা ভাসাইয়া মহানন্দে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে, তাহারাই যখন দেশের ও জাতির এবং ধর্মের নামে অতিশয় দম্ভ সহকারে আত্মপ্রচার করে এবং তাহারাই (আমাকে যাহারা ভালরূপ জানে তাহারাও) আমার বিরুদ্ধে—স্বার্থনাশভয়ে দল বাঁধিতেছে, তখন তাহা দেখিয়া আমি যে কিরূপ মর্মাহত হইয়াছি, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। আমি নাম করিব না, আপনিও বোধ হয় শীঘ্র সেই অতিখ্যাত, দল-শক্তিমান এবং হঠাৎ ধনী সাহিত্য-পতিগণের আদেশ বা নির্দেশ লাভ করিবেন। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, বাঙালী জাতিটা এখনও একেবারে এমন মরে নাই যে, আমি এমন একজনকেও পাইব না যে আমার পাশে দাঁড়াইতে ভয় পাইবে না।

আপনার সেই পত্রের উত্তরেই আমি এত কথা লিখিলাম। মতটা কিছু নয়, মানুষটা এবং অবস্থাটাই আসল। আমি যে কেন ঐ মত পোষণ করি, তাহার তথ্য বা যুক্তি-প্রমাণ পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়—আপনি আমার 'জয়তু নেতাজী' নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। আপনাকে নিশ্চয় পাঠানো হইয়াছে। কতকটা আপনি তাহাতেই পাইবেন। কিন্তু আমি আপনার মত পরিবর্তন করিতে বলি না, আমি কেবল আমার হৃদয়ের সততায় বিশ্বাস করিতে বলি।

দিল্লার অধিবেশনের কোন সংবাদ আর পাই নাই, বোধ হয় তারিখ পিছাইয়া গেছে। আমি আপনার পত্র পড়িয়া আমার চিন্তাকে আরও সুবিন্যস্ত করিতে পারিয়াছি এবং উহার বিষয়ে একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখিয়াছি, বোধ হয় আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। উহাতে আপনার পত্রের কিছু উত্তর আছে—আপনি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি আশা করি, উহা পড়িয়া আপনি convinced না হউন, দুঃখ পাইব না, অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝিবেন না।

লেখা আর কোথাও পাইব না, একে ত' না পাওয়ার অন্য কারণ আছে, তার উপর, আমাকে জব্দ করাও একটি কারণ। এই ব্যাপারে আমি একজন ব্যক্তির ব্যবহারে বড়ই মর্মাহত হইয়াছি—আশঙ্কা অবশ্য ছিল, কিন্তু তবু তাহাকে বড় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। আপনি বিশ্বাস করুন, যাহার সাহিত্যিক প্রতিভা আছে সে-ই আমার পরমাত্মীয়, আমাকে যদি সে ছুরিও মারে, তাহাতেও আমি তাহাকে সাহিত্যিক হিসাবে সমান শ্রদ্ধা করিব।

'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য আমি আপনার মুখাপেক্ষী হইয়াছি—ইহাতে আপনি বিব্রত হইবেন না। আপনি এই সংকট কালে আমাকে যেটুকু সাহায্য করেন তাহা আমি আমার দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

১. শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৪৭]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সম্পাদক : বঙ্গদর্শন

Kailas Chandra Ghose Road
Barisa P. O. (24 Pargs.)
22. 9. 47

প্রীতিভাজনেষু,

এই মাত্র আপনার কার্ড ও গল্প পাইলাম। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব তাহা জানি না। আপনার এই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমাকে আজ এই দিনে বড়ই আশ্বস্ত করিয়াছে।

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিতে গিয়া আমি যে কি কঠোর স্নেহহীন প্রতিকূলতার পরিচয় পাইতেছি, তাহা আপনি বোধ হয় কিছু অনুমান করিতে পারিবেন। কারণগুলি আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। দলগত এবং ব্যক্তিগত উভয় প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে। আমার অপরাধ আমি বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক উভয়ের মতিগতি সত্য ও সাধু মনে করি না। যাহারা সাহিত্যধর্মী নয় তাহাদিগের জয়গান করিতে পারি না। আর একটি সুযোগ তাহারা পাইয়াছে—আমি বাংলা ও বাঙালীর জন্যই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আমি 'ভারত'-এর ভাবনা ভাবিতে পারিতেছি না—আমার বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ যে ধ্বংস পাইল ইহাই ভাবিয়া আমি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি। আমার এই আশঙ্কা মিথ্যা নহে, এই অবস্থা এবং কংগ্রেস-পলিটিক্‌স যদি জয়ী হয়, তবে বাংলাদেশ বলিয়া কিছু থাকিবে না। এই কারণে আমি আমার স্বজাতির অতিশয় রোষ-ভাজন হইয়াছি এবং ইহারই সুযোগে সাহিত্যিকগণ আমাকে এইবার বেশ একহাত লইবার চেষ্টায় আছেন।

আমি 'বঙ্গদর্শন'-এ পলিটিক্‌স চর্চা ত্যাগ করিব। পরে আপনাকে আরও খবর দিব। তাহাতে দেখিবেন, আমি কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

আপনি 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য একটি বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস লিখিলে বড় উপকার হয়, কার্তিকে আরম্ভ করিলে 'বঙ্গদর্শন'-এর বিশেষ উপকার হয়। তজ্জন্য আপনার যাহাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় সেদিকে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিব। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

মোহিতলাল

'বঙ্গদর্শন' আপনাকে পুনরায় Regtd. ডাকে পাঠানো হইয়াছে।

১০. অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮]

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ রোড
বরিষা পোঃ
১. ২. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু,

প্রায় একমাস পূর্বে তোমার এক কার্ড পাইয়াছিলাম—অতিশয় ব্যস্ত থাকি,

তার উপর গত কিছুদিন যাবৎ শরীরটা আরও অসুস্থ হইয়াছে, এইজন্য যথাসময়ে সকলের পত্রের উত্তর দিতে পারি না, সেজন্য মনে কিছু করিও না।

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনও আমার একার পক্ষে ক্রমে দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। পত্রিকা যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গতি ও সামর্থ্য অতিশয় সীমাবদ্ধ। গত দুইমাসেই 'বঙ্গদর্শন' বড় বিলম্বে প্রকাশিত হইয়াছে—প্রায় দুই মাসের এই ব্যবধান পূরণ করিয়া লওয়া সুসাধ্য নহে, ইহাতে পত্রিকার prestige-এরও হানি হইয়াছে। কিন্তু আমি নিরুপায়

দেশের অবস্থা, আমার বুদ্ধিতে যেরূপ ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমি আর কোন সাহিত্যকর্ম করিতে উৎসাহবোধ করিতেছি না। দেহে ও মনে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছি। বাঙালী জাতি—হিন্দু বাঙালী যে আর বাঁচিবে, এমন আশা ত্যাগ করিতে হইতেছে। তোমাদের ওখানকার অবস্থা ভালরূপ বুঝিতেছি—যে কোন সময়ে যাহা কিছু ঘটিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অতিশয় অনিশ্চিত—যে কোন সময়ে আক্রমণ হইতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস। অতএব, এই অবস্থায় আমি কিরূপ সাহিত্যচিন্তা করিতে পারি তাহা বুঝিতে পারিবে।

তোমাদের কুশল সংবাদ মাঝে মাঝে দিও। তোমার মাতুল মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাইবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩১, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত
[মে ১৯৪৮]

Barisa (24 Pargs.)
5. 5. 48

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কার্ড পেয়েছি—এবার যেন একটু দেরী হয়েছে। আপনাকে পূর্ব পত্রে যা লিখেছিলাম তাতে আপনি নিশ্চয় বিচলিত হন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে একটা দিক সর্বদা বন্ধ থাকাই উচিত—বৈঠকখানায় সবাই মিলতে পারি, কিন্তু পূজার ঘরটি শুধু নিজের জন্যে। একথা আমি জানি। কিন্তু বর্তমানে

দেশের এমন অবস্থা হয়েছে যে পূজোর ঘর বৈঠকখানা একখানা হয়ে গেছে—এমনকি যেখানে আমরা ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্যে জীবধর্ম পালন করব, সেখানেও ব্যক্তির মোক্ষমন্ত্র আমাদের হাত-পা চেপে ধরেছে। যে সঙ্কট আজ আমাদের—আবার বিশেষ করে বাঙালীর উপস্থিত হয়েছে, তাতে মানুষকে মানুষ-ধর্ম, পুরুষ-ধর্ম পালন করতে হবে—চাই বুদ্ধি, চরিত্র, লোককল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ অর্থাৎ সমষ্টিচেতনা, আর চাই পাপকে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ঠেকাবার জন্যে বাহুবল। রাজা নাই, রাষ্ট্রশক্তি একেবারে বিমূঢ়, ঘোর অরাজক। কতকগুলো অতি নির্বোধ, মনুষ্যত্বহীন, পৌরুষহীন, হীন পাটোয়ারী-বুদ্ধিসর্বস্ব পুরুষ—যারা 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া'র মত হঠাৎ একটা কর্তৃত্ব লাভ করেছে—তাদের না আছে ব্রাহ্মণবুদ্ধি, না আছে ক্ষাত্র শক্তি ; যদি কিছু থাকে তা বেনের বুদ্ধি। আজ সমস্ত হিন্দু-ভারত এই অতিশয় অকর্মণ্য ধাপ্পাবাজদের হাতে পড়ে ধ্বংস হতে চলেছে। যে মহাত্মার নাম করে এবং যে ধর্মমন্ত্র আউড়ে তারা বাজীমাৎ করতে চায়, তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু বলব না, তার কারণ ইহাই—ওটা আপনার পূজার ঘর, ওখানে আমার জোর করে প্রবেশ করা অতিশয় গর্হিত। কিন্তু আজ এই আসন্ন মহাবিনাশের দিনে যদি আমাদের আর কিছুই করবার না থাকে, কেবল সকলে মিলে "সবকো সম্মতি দে ভগবান" বলে অতিশয় বৈষ্ণবভাবে প্রাণটাকে আশ্বস্ত করতে হয়, তাহলে যারা বৈষ্ণব নয় ঘোরতর শাক্ত, তাদের খড়্গাঘাতে কোটি বলিদান করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখছি নে।

'সবকো সম্মতি দে ভগবান'—একথা বৈষ্ণব সাধুর কথা বটে কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত ঐ প্রার্থনাই একমাত্র সম্বল, তাহলে আমাদের কি দেখতে হবে না—কোন্ কারণে কোন্ অবস্থার বশে কত প্রমাদ ভুল-ভ্রান্তি, মিথ্যা আশা এবং অন্ধ বিশ্বাসের ফলে আজ আমাদের এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে! আপনি ভুল করবেন না—কোন এক ব্যক্তিকে অবতার বা মহাপুরুষ বলে ভক্তি করবার অধিকার সকলের আছে—সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ; কিন্তু যে-মানুষ কেবল নিজের প্রাণের পিপাসার তৃপ্তি (আধ্যাত্মিক) হলেই কৃতার্থ হয় না, যে লোকসংস্থিতি জাতি ও সমাজের বিনাশ, তার পক্ষে কোন ধর্মই ধর্ম নয়, কোন মন্ত্রই সত্য নয়—যা ঐ সমাজকে বাঁচাতে পারে না। ভারত স্বাধীন হয়েছে, আপনি বিশ্বাস করেন—বিশ্বাস করে সুখ আছে জানি, সে বিশ্বাস ভঙ্গ হলে প্রাণের সেই রসসম্ভোগে বাধা হয়, বড় অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা জিনিসটার যে অর্থই করা হোক—মানলাম ভারত স্বাধীন হয়েছে। আজ যে সারা হিন্দু-ভারত মহা-নরমেধযজ্ঞের আহুতি

হবার জন্য আপনা হতেই প্রস্তুত হচ্ছে, তা কি আপনার মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলিষ্ঠবুদ্ধি মানুষও দেখতে পাচ্ছেন না ! সংবাদপত্র বোধ হয় আপনি পড়েন না—পড়লেও কংগ্রেসী কাগজগুলোর ঢাকবাজানো প্রবন্ধ এবং প্রকৃত-অবস্থা-চাপা-দেওয়া তুচ্ছ সংবাদকে বড়-করা—মানুষকে ঘুম-পাড়ানো লেখা ও News গুলোই পড়েন। আপনাকে আমি অতি সংক্ষেপে আসন্ন ভবিষ্যতের একটা Forecast দিচ্ছি, আগামী জুন মাস থেকে (ভগবান না করুন) এর সত্যাসত্য 'দেখতে' পাবেন। আমার "জয়তু নেতাজী" বইখানা (পাঠিয়েছিলাম ত ?) এইবার একবার পড়ে দেখবেন।

ইংরেজ ভারতবর্ষে যা করেছে এবং করবে তার যদি হুবহু আর একটা দৃষ্টান্ত চান তবে বর্তমানে প্যালেষ্টাইনে (Palestine) যা হচ্ছে, খবরের কাগজে গত এক সপ্তাহ ধরে যে আলোচনা হয়েছে, তাই পড়ে নেবেন। প্রতি অক্ষরে সেই এক পলিসি ইংরেজ এখানেও প্রয়োগ করেছে। Lord Mountbatten-কে কিছুতে নেহেরু ধরে রাখতে পারলে না ; সেখানেও ঠিক তাই, ইংরেজ কিছুতেই Palestine-এ রইল না। একজন একে 'reckless generosity' নাম দিয়েছেন। ইংরেজ ভারতের সম্বন্ধেও এই রকম 'reckless generosity' করেছে। তাইতেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের স্বাধীনতারও একমাত্র প্রমাণ—ইংরেজের ভারত পরিত্যাগ। কিন্তু এইবার সারা হিন্দু-ভারত তিনদিক দিয়ে আক্রান্ত হবে ; হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাকিস্তান সর্বত্রই রণসজ্জা প্রায় complete —যেমন অস্ত্রসম্ভার, তেমনই অগণিত সৈন্যবাহিনী। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ (কংগ্রেসী সংবাদপত্র সেকথা বলে না) নেহেরু গবর্ণমেন্টের কাপুরুষতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রমাণ করে দিয়েছে—কোন কুতর্ক বা bluff দিয়ে তা ঢাকা যাবে না। ঐ পাকিস্তানাদের পিছনে প্রকাশ্যে রয়েছে ব্রিটিশজাতি—Atlee বা পার্লামেণ্ট নয় (তারাও অপ্রকাশ্যে আছে)—সমস্ত ব্রিটিশ কূটনীতিও দৃঢ়সঙ্কল্প। নেহেরু এদের ঠেকাতে পারবে না, তার ঐ বক্তৃতা ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে এ পর্যন্ত সে কেবল হাতে-ধরা পায়ে-পড়া ছাড়া আর কিছু করে নি। এর নাম—ধর্মপ্রাণতা অহিংসা বা আরও অনেক কিছু হতে পারে—কিন্তু একে রাষ্ট্রনীতি বা ক্ষাত্রনীতি বলে না। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করবে যে সে যদি সাধু মহাত্মার শিষ্য হয়ে কেবল 'সম্মতি দে ভগবান' বলে তবে তাকে বেশিদিন রাজত্ব করতে হবে না। তাছাড়া ঐ কেন্দ্রস্থ শাসকমণ্ডলীর কাহারও সাধুত্ব নেই—কারো আছে দুর্বলের চাতুরী, কেউ প্রকাশ্যেই অধার্মিক (যেমন, রা—)। সকল বিষয়ে

চোখ বুজে থেকে লাভ নেই। পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ আসন্ন—অবধারিত। যদি বলেন, ভারতরাষ্ট্র তার জন্য প্রস্তুত—পাকিস্তানের ঐ আস্পর্দ্ধা তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে দেবে। তার উত্তরে (১) ভারতরাষ্ট্র বর্তমান সামরিক শক্তিতে পাকিস্তানের তুলনায় নগণ্য বললেই হয়। সৈন্য সংখ্যা কম, রণবিশারদ (strategy) সেনাপতি নেই। (২) অস্ত্রসম্পদে পাকিস্তান (ইংরেজের সাহায্যে) বহুগুণ শক্তিশালী। (৩) ওরা সমগ্র মুসলমান সমাজকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করেছে, আপামর নির্বিশেষে সকলের হাতে অস্ত্র দিয়েছে—ভারতবর্ষ ঠিক তার বিপরীত। (৪) তারপরে, রীতিমত যুদ্ধ করা তাদের অভিপ্রায় নয়—কেবল একটা রক্তগঙ্গা বইয়ে, লুট ও নরহত্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারলেই ইংরেজের মতলব হাসিল হবে। সে মতলব কি, তা Palestine-এর policy হতে বুঝতে পারবেন। মোটের উপর ঐ গান্ধীনীতি ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়েছে। গান্ধীনীতি বলতে আমি তাঁর ধর্মনীতির কথা বলছি না সে বিচারও আপনার সঙ্গে করব না কারণ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কারণ আমাদের, জাতি হিসাবেই যেমন আমরা উৎসন্নে গিয়েছি, তেমনই আমরা অতিশয় অরক্ষিত অবস্থায় বাঘের একেবারে মুখের উপর বাস করছি।

আপনার বুদ্ধিভেদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—সে শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যে কি কারণে গান্ধীধর্মকে দূর হতে প্রণাম করি এবং এই স্বাধীনতালাভকে বিনাশের পূর্বাবস্থা মনে করি তা বন্ধুহিসাবে আপনাকে একটু খুলে না লিখে পারলাম না। তর্কের কথা এ নয়—সাক্ষাৎ ঘটনা সম্পর্কিত সত্য। আর কয়েকটা মাস অপেক্ষা করুন। যে বাঘ আক্রমণ করবে তার ধর্ম অহিংসা নয়; "সবকো সম্মতি দে ভগবান" বললে সে একবারও থমকে দাঁড়াবে না। ঐ 'সম্মতি' হিন্দুরই আবশ্যক হয়েছে—কারণ এমন ভীরু, কাপুরুষ, ভণ্ড ও মনুষ্যত্বহীন ঐ বাঘেরাও নয়।

আপনার আর কবিতা কই? অনুবাদ দুটা শেষ হল। চৈত্রে বাকিটা যাচ্ছে। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিবদ্ধ

মোহিতলাল

১২. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৮]

বড়িশা (২৪ পরগণা)

১২. ৭. ৪৮

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পেয়ে সুখী হলাম। আপনার সংবাদ—কুশল সংবাদ—মাঝে মাঝে পেলে সুখী হব। তার কারণ আপনি আমার একজন আত্মীয়, অর্থাৎ আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আমার এখন আত্মীয় খুব কম: গতযুদ্ধ এবং তারপর স্বাধীনতা-লাভ, এই দুইটি মহাশাস্তির ফলে বাংলাদেশে 'আত্মা জিনিষটা প্রায় লোপ পেয়েছে তাই 'আত্মীয়' আরও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। একটা মানুষও নেই যার সাধুতা এবং প্রেম বা স্বার্থহীনতা আছে—সত্যানুসরণ ত' পরের কথা। তাই বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। আপনার মত মানুষের অস্তিত্ব স্মরণ হলে একটু আনন্দ পাই।

আপনি বঙ্গদর্শনের লেখার সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তার দরকার ছিল না, কারণ আপনাকে আমি জানি; 'বঙ্গদর্শন' আমারও একটা নিঃস্বার্থ ব্রতের মত—ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থহানির কোন সম্পর্ক নেই, এটা আশাকরি আপনি বুঝতে পেরেছেন। এজন্যে আমার কোন কারণে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হবার কোন আশঙ্কা নেই। আপনি এ পর্যন্ত যে লেখাগুলি দিয়েছেন, সেই গুলি আমার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে আপনার সাত্ত্বিক দান বলেই আমি গ্রহণ করেছি। এই কথাই আমি আর সবাইকেও জানিয়েছিলাম; যাদের আমি সাহিত্যিক বলে, শ্রদ্ধা করতাম; একটা ভুল করেছিলাম—সাহিত্যিক হলেই যে 'মানুষ' হবে, এমন কথা নেই—তা জেনেও আমি তাদের কাছে ঐ রকমের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম, তার শাস্তিও খুব পেয়েছি। এই কয় মাস 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা ক'রে একটা শেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—সে হচ্ছে এই যে, সমাজে, ধর্মে, শিক্ষায় এবং সর্বপ্রকার কার্যে যেমন, তেমনই সাহিত্যেও 'পলিটিকস্' পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করেছে—জীবনের কোনখানটাতেই আর শুচিতা রইল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্ক—

এমনকি আত্মীয় সম্পর্কও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি পারিবারিক সম্পর্কও কলুষিত হয়ে উঠেছে। নিদারুণ অর্থপিপাসা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনা বাঙালী জাতটাকেই পেয়ে বসেছে আর কোন চিন্তা তার নেই। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে আমি আরও হতাশ হয়ে পড়েছি—সাহিত্যের নামেও বাঙ্গালীর কোথাও একটু সদ্‌বৃত্তির জাগরণ হয় না; অথচ ঐ একটা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অতিশয় অধঃপতিত আত্মাও চিরদিন সঙ্গ দিয়েছে। সর্বস্তরের শিক্ষিত, বিদ্বান ও প্রতিভাবান বাঙালীর দ্বারস্থ আমি হয়েছিলাম—কিন্তু দুই চারজন ছাড়া আমি তাদের যে চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার নিজের উপরেই ঘেন্না ধরে গেছে। আপনি কোন কারণে লজ্জিত হবেন না, আমি আপনাকে চিনি; আপনার দুর্বলতা কোথায় তা'ও যেমন জানি, তেমনই আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তা'ও জানি। আপনাকে পুনরায় আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বঙ্গদর্শন' চালানো প্রায় দুঃসাধ্য সাধন; তার কারণ, কলকাতার আবহাওয়া ওর পক্ষে বড়ই প্রতিকূল। দেশের শিক্ষিত সজ্জন যেটুকু সাড়া দিয়েছে, তাকেই 'বঙ্গদর্শন'-এর পক্ষে যথেষ্ট বলতে হবে, কিন্তু তাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার শক্তি নেই, পথও যেমন দুর্গম পাথেয়ও তেমনই অতিশয় অপর্যাপ্ত। তাই মনে করছি, আর কোন রকমে আর একটা বছর পূর্ণ করে 'বঙ্গদর্শন' ছেড়ে দেবো, অর্থাৎ তুলে দেবো। আপনি বাঙ্গালী হয়েও বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকেন—দূর থেকে অনেক জিনিষ চোখে পড়ে না; তার উপর বাংলা সংবাদপত্র-গুলো এক একটা মিথ্যার জাহাজ। নইলে আপনিও নিঃসংশয়ে বুঝতে পারতেন, এ জাত আর বাঁচবে না; এমন কি মরেই গেছে? যদি মরেই গিয়ে থাকে (আমি এতদিন তা নিশ্চিত বলে মনে করিনি), তাহলে 'বঙ্গদর্শন'-এর আর কি কাজ? 'বঙ্গ-অদর্শন'ই যে আরও সত্য! আমারও জীবনের শেষ হয়ে এসেছে—অনেকদিন থেকেই মৃত্যু আক্রমণ করেছে, কেবল দেশের নামে, ধর্মের নামে, সত্যের নামে আমি একটা অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করে সেই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার দেশ ও জাতির এই মহামৃত্যু দেখে আমি আর পারলাম না—জরা ও ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করে আমি যে গাণ্ডীব তুলে ধরেছিলাম, হাত থেকে তা খসে পড়েছে—

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥"

বাঙ্গালী জাতির বিধাতা যিনি তিনিও আমায় প্রাণের ভিতরে ডেকে বলেছেন—

"ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যণীকেষু যোধাঃ।"—যে সত্যকে আমি সারাজীবন আমার সর্বস্ব দিয়ে অর্চনা করেছিলাম, সেই সত্যই আমায় প্রাণের শেষ মিথ্যাকে ঐ আশাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ঐ সত্যের জন্য আমি বহু অপমান, বহু লাঞ্ছনা, বহু নিন্দা, মাথায় পেতে নিয়েছি, আমার পরিচয়টা নানা উপায়ে ও নানা আকারে বিকৃত হয়েছে; তার কারণ, আমি কারো মিত্র নই—সকলেরই শত্রু; আমার সেই আত্মনিরপেক্ষ সত্য আত্ম-সর্বস্ব বাঙ্গালীর বড়ই অপ্রীতিকর হয়েছে। সেই শত্রু এতদিনে নিপাত হবে। হওয়াও সঙ্গত; কারণ, আমি বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর—অর্থাৎ সেই অগ্নিহোত্রের শেষ অগ্নিকণা। এতে কোন আত্মশ্লাঘা নেই—এটাও সত্য, আত্মনিরপেক্ষ সত্য; আমার পরিচয় যদি কখনো কারো জানবার প্রয়োজন হয়, তবে এই কথাটা যে কত সত্য তাহা স্বীকার করতে হবে। আমার সঙ্গেই সেই যুগের শেষ হয়ে যাবে—অর্থাৎ সে যুগের শেষ চিহ্ন মুছে যাবে। আমি বড় নই—ছোট, আমি সেই আগুনের শিখা নই—একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র; তবু সেই আগুনের শেষ কণা এইবার নিবে যাবে—বিধাতার অমোঘ বিধানে।

আপনাকে এই চিঠি লিখছি—অতিশয় অসুস্থ অবস্থায়। মাঝে Blood pressure ভয়ানক বেড়ে উঠেছিল, একদিন একটা stroke-এর মতও হয়েছিল। তারপর আরও কয়েকটা অসুখ এবং দুর্ঘটনা পর পর ঘটেছে। 'বঙ্গদর্শনে'র অবস্থাও খুব critical। আমি এই অবস্থাতেও ডাক্তারদের আদেশ অগ্রাহ্য করে' —যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত—ওকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছি। একটা miracle ছাড়া, আমার বা ওর বাঁচানর কোন আশা নেই। 'বঙ্গদর্শন'ই আমার জীবনব্যাপী ব্যর্থ প্রয়াসের শেষ প্রয়াস।

এ চিঠি পড়ে' আপনার কষ্ট হবে, তা জানি; কিন্তু ভগবান যদি বিরূপ হ'ন তবে দুঃখ করাও যে মিছে। আমি এ ত জানি, যে ভেবে দেখলো অসত্য কিছুই নেই সবই সত্যি। ঐ যে দেশের মানুষ ওদের ভিতর দিয়েই সেই সত্যের ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঐ মানুষগুলোর ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে বলছেন আমার এ সাধনা কালকে অতিক্রম করতে চাইছে—তাই এ সাধনা একালের পক্ষে ব্যর্থ হবেই। তিনি 'সৎ' আবার তিনিই 'অসৎ'—সৃষ্টিও তিনি, ধ্বংসও তিনি; এখন তাঁর ধ্বংসমূর্তি—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো"—আমি কেবলই গীতার সেই অধ্যায়ের সেইরূপ স্মরণ করছি। আপনাকেও স্মরণ করতে বলি।

তবু আমার শরীর-মন বড়ই অবসন্ন; একটু সাহায্য একটু সাহস একটু

আশাও যদি পেতাম! কিন্তু সেটাও মনের দুর্বলতা—দেহটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ থাকবে।

আপনাকে গল্প লেখার জন্য আর তাড়া দিতে বোধ হয় হবে না, একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারবো। আপনি সেজন্যে দুঃখিত বা ল'জ্জত হবেন না। কেবল একটা ইচ্ছে ছিল, আমার সেই গল্পটা আপনার হাতে কেমন হয় তাই দেখবার। কিন্তু আপনার সময় নেই। 'বঙ্গদর্শন'ও বোধ হয় শেষ হয়ে এলো।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানাচ্ছি।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[আগস্ট ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা
১৭. ৮. ৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন আগে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম—একটু বড় চিঠি, তাতে Blood pressure বৃদ্ধির লক্ষণ খুব বেশী স্পষ্ট হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। আপনি কিন্তু সুচিকিৎসকের মত সে চিঠির আর কোন উত্তর দেননি, কারণ, ও রোগে বকুনির প্রশ্রয় দেওয়া বড় বিপজ্জনক। Blood pressure এখনও আছে, তবে বোধ হয় একটু কম; তাই আপনাকে আবার চিঠি লিখতে বসেছি—আশা-করি, এবার উত্তর দেবেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রায় ডুবুডুবু হয়ে বহুকষ্টে আবার একটু মাথা তোলবার চেষ্টা করছে—কতদূর সক্ষম হবে, তা আমি বলতে পারিনে। আমার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র আশা বা ভরসা নেই, কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য বললেই হয়, এবং যদি বাধে—আমরাই আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো—পূর্ব পাকিস্তানে তার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর যদি কংগ্রেস-কর্তাদের (অ্যাংলো-মুস্লিম

Axis-এর) কোন রকমে হাতে-পায়ে ধ'রে জাতটা বাঁচাতে পারেন, (তাও একেবারে অসম্ভব নয়) তাহোলেও বাঙ্গালী কি কারণে এবং কি উপায়ে নিশ্চিহ্ন হবে তাও আমি প্রত্যক্ষ করছি। এবং সেটা শুরু হবে খুব শিগ্‌গির—একরকম শুরু ত হয়েই গেছে! অতএব, আমি 'বঙ্গদর্শন'ও পূরা একবছর যে চালাতে পারবো তার ভরসা রাখিনে। তবে দিনগত পাপক্ষয় করতে হয়; সেই হিসাবে আমি আগামী বৎসরের যে ক'মাস পারি 'বঙ্গদর্শন' চালিয়ে যাবার সংকল্প করেছি—অবিশ্যি যদি ওরা পারে।

এখন, আপনার কাছে আমার একটি সনির্বন্ধ—অনুরোধ বলব না—প্রার্থনা এই যে, আপনি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্যে আমাকে একটি গল্প লিখে দেন। জানি এই সময়ে, আপনাকে এরকম তাগিদ দেওয়া নিষ্ঠুরের কাজ; কিন্তু জানেন তো—'Necessity has no law'. এর জন্যে আপনাকে 'বঙ্গদর্শন' যথাসাধ্য প্রণামী দেবে। জানি প্রণামীর জন্যেই আপনার কলম সচল হয়ে উঠবে না, ওটা কেবল জানিয়ে রাখলাম, কারণ আপনার ওপর অনেক দৌরাত্ম্য করেছি। আরও কারণ, দ্বিতীয় বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' আশ্বিন থেকে বেরুবে—যাত্রা বদল করবে। আবার ওটা পূজার সংখ্যাও বটে। তাই একটা গল্প না থাকলে বাজারে বেরুনো অসম্ভব। আপনি ছাড়া আর কেউ তো 'বঙ্গদর্শনে'র বিশিষ্ট গল্প-লেখক ন'ন। তাই, আপনার উপরে এই কর্মফলের বোঝা চাপছে।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার অবস্থা পূর্ববৎ। আপনি আমার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ নমস্কার এবং আলিঙ্গন নেবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

'বঙ্গদর্শন' বরাবর পাচ্ছেন তো?

১৪. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[সেপ্‌টেম্বর ১৯৪৮]

বড়িশা (২৪ পরগণা)

৯ আশ্বিন ১৩৫৫

সুহৃদ্বরেষু,

আপনাকে পত্র লিখিবার কথা আমারই; কারণ আপনি পত্র লেখার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করিয়াছেন, দুইবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; কাজেই

যতই পত্র না লিখুন, এবং আমি যতই লিখি, আপনি 'মহাজন' হইয়া থাকিবেন, আমি খাতক হইয়াই থাকিব। কিন্তু, সত্যই পত্র লিখিবার সময় আমার একটুও হয় না, বিশেষতঃ আপনাদের মত বন্ধুকে; কারণ, তাড়াতাড়ি দুই-চারি ছত্র লিখিলেই তো চলে না—যেমন প্রত্যহ আমাকে বহু লোককে লিখিতে হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর কাজ সবই আমাকে একা করিতে হয়; প্রবন্ধ লেখা, অনুবাদ করা, প্রুফ দেখা—প্রায় সমস্ত পত্রিকাখানাই আমাকে লিখিয়া দিতে হয়; কারণ যেসব 'সংগ্রহ' উহাতে থাকে তাহার পরিশ্রমও কম নয়, অনেক পড়িতে হয়, অনেক ঘাঁটিতে হয়, অনেক কাটিতে-ছাঁটিতে হয়, আবার অনুবাদও করিতে হয়। ইহা ছাড়া, গল্প বাছিয়া অনুবাদ এখন প্রতিমাসেই করিতে হইতেছে। তার উপর চিঠিপত্র লেখা। তারও উপরে আমার এই স্বাস্থ্য—Blood pressure, রাত্রে ঘুমের অভাব! কাজেই আমার পত্র পাইতে দেরী হইলে মনে কিছু করিবেন না।

আপনার পত্রে করুণাবাবুর যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন তাহাতে যেমন মর্মাহত, তেমনই ভীত হইছাছি। আমার আর কোন বিষয়ে ভাবালুতা নাই, বাঙালীর চরিত্র, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি, ধর্মবোধ এবং তাহার আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা যাহা হইয়াছে—তাহাতে তাহাকে আর মানুষের শ্রেণীতে ফেলা যায় না—পশু বলিলে, পশুকেই অপমান করা হয়। দেখিতেছেন না কেমন গান্ধীভক্ত হইয়াছে। কিরূপ 'ভারত' 'ভারত' বলিতে অজ্ঞান হইতেছে! এতবড় মূর্খ অথবা মহাস্বার্থপর পাষণ্ড আর আছে! যাহারা ঐরূপ 'গান্ধী' 'গান্ধী' করে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের ও চরিত্রের পরিচয় একটু ভাল করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন—তাহাদের কোন ধর্ম নাই—একমাত্র আত্মসুখ বা স্বৈরাচারের সুখ ছাড়া। তাই করুণাবাবুর মত ভাগ্যহত কবির (কবিদের ভাগ্য ঐরূপই হইয়া থাকে) শেষ দশা ভাবিয়া খুব বিচলিত হইলেও, আশ্চর্য হই নাই—আমারই বা ঐরূপ না হইবে কেন? আমার অবস্থাও তো সব দিক দিয়া ক্রমে কঠিন হইয়া পড়িতেছে! তাই তাঁহার ঐ অবস্থার সংবাদে আমিও ভয় পাইয়াছি। কাল আমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে পরশু আমারও ঐ অবস্থা হইবে। বাঙালীর কথা আমি একটুও ভাবিনা, কোন্ কালে বাঙালী কবির আদর করিয়াছে? একথাও সত্য, বাঙালী জাতির জীবনে পূর্বে কখনও মানুষের এরূপ অসহায় অবস্থা সহজে হইত না—আত্মীয়, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতির কিছু-না-কিছু যত্ন পাইত; এখনকার মত একদিকে অন্নহীন, এবং অপরদিকে পৈশাচক ধনশালী তাই এদেশের সমাজে ছিল না। যাক, বাঙালীর কথা আর বলিব না,—এজাতের কবি, পণ্ডিত, নেতা, সাহিত্যিক, ধনী, মানী সবই দেখিলাম,

দেখিয়া কেবল ইহাই বুঝিয়াছি, ভগবান এজাতকে ধ্বংস করিতেই মনস্থ করিয়াছেন, যত্নবংশের ধ্বংস্ করিয়াছিলেন যেমন করিয়া। …

কিন্তু আপনি ও শঙ্করের মা যে ভাবে করুণাবাবুর সেবা ও পালনের ভার লইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, আপনারা সত্যই পুণ্যবান। এই যে ভারটি আপনাদের উপর পড়িয়াছে, ইহা আর কোথাও পড়িতে পারিত না, কেন, তাহাই ভাবিয়া আমি আপনাদের উভয়কে আমার প্রাণের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। করুণাবাবুর সংবাদ মাঝে মাঝে দিবেন। তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

এবার আপনাকে আর একটি কথা দুঃখের সহিত জানাইতেছি। মোহিনীবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ভুল আপনিই করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে 'অভয়ের কথা'র সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানাইতে বলি নাই—কি জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা তিনিই জানেন, আর আমি জানি; তিনি তাঁহার গুরুর নিকটে প্রত্যাদেশ পাইলে আমাকে তাহা জানাইয়া আমার দুশ্চিন্তা দূর করিবেন। দুশ্চিন্তা আমার জন্য নয়, বাঙালীর জন্য, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু "অভয়ের কথা" সম্বন্ধে তাঁহার ঐ যে মত তিনি আমাকে জানাইয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই দুঃখ পাইয়াছি। এমন জানিলে আমি ঐ বই তাঁহাকে দিতাম না। ঐ বইখানি তাঁহাকে দিয়া আমি একটি পুণ্য কর্ম করিয়াছি মনে করিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম ৺ ক্ষেত্রমোহন আমাকে আশীর্বাদ করিবেন। এখন দেখিতেছি, কি ভুলই করিয়াছি! গোঁড়া ধর্মান্ধ সব সমাজেই আছে, কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে এমন ধর্মান্ধ, আত্মস্পর্ধী, মানুষের জ্ঞান ও বিদ্যাকে তুচ্ছকারী, এমন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি থাকিতে পারে, তাহা জানিতাম না। এরকম মানুষকে জ্ঞান বা বিদ্যা বা বুদ্ধির দ্বারা বশ করা যায় না, তার কারণ, ইহারা 'ভক্তি' ও 'গুরুর, কৃপা ছাড়া আর কোন জ্ঞানকেই আমল দেয় না। মোহিনীবাবুর এমনই আত্মম্ভরিতা যে. তিনি আমাকে ভক্তিধর্মের গূঢ় মর্ম জানাইতে চাহিয়াছেন, অথচ দেখিলাম, নিজেদের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগুলি ছাড়া আর কিছুই তাঁহার পড়া নাই—পড়িবার আবশ্যকতাই যে নাই। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরও মহামূর্খ—শঙ্করের মত এমন ভাগ্যহীন, 'কৃপা'-বঞ্চিত আর কে আছে? ইঁহাদের তুলনায়, ঐ ভক্তির অতলস্পর্শ কূপে ঐ যে মহামণ্ডুকেরা বাস করেন, তাঁহারাই যে একমাত্র সর্বজ্ঞান, সর্ববুদ্ধির অধিকারী হইয়া বসিয়া আছেন? কিন্তু তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই—'কৃপা' যাহারা পাইয়াছে, তাহাদিগকে কিছুমাত্র ঈর্ষা করি না, বরং অনুকম্পাই করি। ঐ 'কৃপার' কূপে যেন কখনও কোন জন্মে পড়িতে না হয়।

কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহাতে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। বেচারীর একমাত্র অপরাধ তিনি বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্যকেও আলোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন—সেই মত তিনিও গ্রহণ করেন নাই, কেবল তাহার বক্তব্যটাই তাহার মত করিয়াই বলিয়াছেন; এবং সেই 'শঙ্কর-দর্শন' যাহা ভারতের একটি অনন্যসাধারণ গৌরব, তাহাকে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে চাহিয়াছেন। তারপর তিনি তাঁহার নিজের বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাও নিশ্চিত যে, ক্ষেত্রমোহন যে শ্রেণীর ভক্ত সাধক ছিলেন, তাহার তুলনায় মোহিনীবাবুকে কি বলিব? না, আর বলিব না। নিজের বিদ্যাহীনতার জন্য তিনি ঐ বইখানির মর্ম বুঝিতে পারেন নাই—তাহাতে প্রমাণ হয় যে, কেবল 'কৃপা' লাভই যথেষ্ট নয়, একটু বিদ্যালাভও দরকার। আমি কি ভুলই করিয়াছি! স্বর্গীয় মহাপুরুষকে এমন একজনের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে হইল! আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন; তাই মোহিনীবাবুকে আর কিছু লিখিব না।

'বঙ্গদর্শন' আপনাকে নিয়মিত পাঠাইতে বলিব—আশা করি এবার হইতে পাইবেন। আপনার সপরিবার কুশল সংবাদ দিবেন। আমার গাঢ় আলিঙ্গন ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

আপনার
মোহিতলাল

১৫. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৪৯]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা—পোঃ
২৪ পরগণা
ইং ১।৪।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র পাইলাম। 'বঙ্গদর্শনের' জন্য আপনি যে এত উদ্বিগ্ন হইবেন, উহা আপনার মত মানুষের পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক। আপনার পত্রে আপনি যে শুভকামনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে 'বঙ্গদর্শনে'র একমাত্র ভরসা। ভগবান যদি বাঁচান তবেই বাঁচিবে, নতুবা আর কোন আশা নাই।

আপনি ভক্ত মানুষ—কল্যাণ ও সুন্দরকে বিশ্বাস করাই আপনার ধর্ম—উহাই আপনার আস্তিক্য; বিশ্বাস করিতে না পারিলে আপনার জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে। ভক্তের ঐ ভাবজগৎ সত্য; কিন্তু তাহা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেই বোঝাপড়া; উহা ব্যক্তির সাধনা—সিদ্ধিও ব্যক্তিগত। কিন্তু একটি বিষয়ে আপনার বিশ্বাসকে আমি একটু সংযত করিতে বলি; আপনি পলিটিকস্‌কেও ঐ ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত করিবেন না—শয়তানের শয়তানীকে আপনি ভগবানের কৃপালীলা বলিয়া মনে করিবেন না; তাহাতে আপনি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন; কারণ আপনি হিন্দু। ব্রজের রাখালরাজ যিনি, কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথিও তিনি; বাঁশী যাঁর—পাঞ্চজন্যও তাঁহার; বাঁশী বাজাইয়া তিনি ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেন নাই, এবং গান্ধী-অবতার কৃষ্ণ-অবতারের চেয়ে বড় নয়।···আপনি এমনই অতিবিশ্বাসী যে, ভারত স্বাধীন হইয়াছে ইহাও যেমন বিশ্বাস করেন, তেমনই হিন্দুর হিন্দুত্ব উদ্ধার হইল বলিয়া 'সোমনাথ'-এর জন্য আপনার কবি-প্রাণ সিন্ধু-তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। আপনি কি সত্যই জোর করিয়া চোখ দুইটা বুঁজিয়া থাকেন? বোধ হয় সেই বুঁজিয়া থাকার শক্তিও একটা শক্তি। আমি নিজেই পাপ চরিত্র ও পাপ কীর্তির একটি এমন কাহিনী লিখিব যে তাহাতে অতিবড় অন্ধভক্তেরও চোখের ঠুলি খুলিয়া যাইবে।

আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি এধারণা আপনারও হইয়াছে দেখিলাম, দুঃখিত হইলাম। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে উহা আপনিও বিশ্বাস করেন! ইংরেজ কি সত্যই গিয়াছে? ছোটবেলায় যাত্রায় 'রাবণবধ' পালায় রাবণবধ হইল দেখিয়া শিশুমনে কষ্ট হইয়াছিল, পরে দেখিলাম সেই লোকটিই আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। মনটা সুস্থ হইল। ইংরাজ তেমনই মরে নাই, যায় নাই, আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। [অসম্পূর্ণ]

১৬. 'কথাসাহিত্য'-সম্পাদককে লিখিত

[১৯৫০]

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার 'কথাসাহিত্যের' আগামী শ্রাবণ সংখ্যা 'তারাশঙ্কর' সংখ্যা করবেন শুনে আনন্দ হবারই কথা; কিন্তু আমাকেও কিছু লিখতে বলেছেন দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি, তার কারণ, আমি অনেকদিন সাহিত্য-সমাজ—এবং কিছুকাল

সাহিত্যও ত্যাগ করে' এখন এই বাকি পথটুকুর পাথেয় চিন্তায় মন দিয়েছি। আপনারা যে এখনও আমাকে আপনাদের একজন ভেবে, এবং একদা তারাশঙ্করকে আমিও অভ্যর্থনা করেছি তাই স্মরণ করে', এই উপলক্ষ্যে আমার কাছ থেকে দু'চার ছত্র আশা করেন, এতে প্রমাণ হয় যে, আমি 'আউট' হয়ে গেলেও আপনারা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি ন'ন। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, প্রাণটা একেবারে মরে গেছে, কিছুতেই আর সাড়া দেয় না; আমি ইহলোকে থেকেই পরলোকে বাস করছি। প্রাণ যে সাড়া দেয় না তার কারণ, আপনারা যে সমাজে ও যে দেশে বাস করছেন তাকে আমি আর চিনতে পারিনে—আমার দেশ, আমার সমাজ বলে মনে হয় না। অথচ আপনাদের আমি তো চিনতাম; সেই আপনারাই এই দেশে, এই সমাজে তেমনি স্বচ্ছন্দে—বরং আরও উৎসাহে আনন্দে বাস করছেন! এর চেয়ে বিস্ময় আমার পক্ষে আর কি হ'তে পারে? বেঁচে আছি, তবু বাঁচা-দের দলে নেই! নিশ্চয় আমিই মরে গেছি। চারিদিকে এত আশা, এত উৎসাহ,—একটা নতুন যুগের নতুন হাওয়ায়'সবাই যেন কত না-পাওয়া জিনিস পেয়েছে, এবং আরও পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আমি ঠিক উল্টোই দেখছি; পাওয়া তো দূরের কথা—সব হারিয়েছি; এমন অন্ধকার এ দেশে আর কখনো নামে নি। নিশ্চয় আমারই ভুল, নইলে, আপনারা যাকে মৃতসঞ্জীবনীর উৎস বলে আকণ্ঠ পান করেও তৃপ্ত হচ্ছেন না, আমি তাকেই মহামৃত্যুর গরলোচ্ছ্বাস বলে পান করতে ভয় পাই কেন? তার কারণ নিশ্চয় এই যে, আপনারা জীবিত, আমি মৃত।

কৈফিয়ৎটা একটু বড় হয়ে গেল—কিছু মনে করবেন না; হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার এই শেষ আলাপ, তাই আমার শেষ অবস্থার কথা একটু জানিয়ে গেলাম। না জানালে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন; তারাশঙ্করের নাম ক'রে আপনারা একটু লেখা চেয়েছেন, তাতেও আমার প্রাণে একটু সাড়া জাগে না, এর কারণ কি? তবে কি ভেতরে কিছু আছে নাকি? একেবারেই না। আসল কথা, আমার আর কিছুতেই রুচি নেই। এতদিন জীবন আর সাহিত্য এ দুটো আমার কাছে এক ছিল—জীবনের যেটুকু স্বাদ, তা আমি সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলাম। আজ সেই স্বাদ আমার দেহে মনে কোথাও নেই, তাই সাহিত্যও বিস্বাদ হয়ে গেছে। আমাকে আপনারা সাহিত্যিক বলে' যে একটুখানি খাতির এখনও করেন তা' যদি সত্য হয়, তা' হ'লে এ'ও জানবেন যে, আমি যতটুকু বাঙালী ততটুকুই সাহিত্যিক; আজ সেই বাঙালী জাতটাই আমার চোখের সামনে মরে গেল,—বাংলা সাহিত্যে আমার কি কাজ!

তবু তারাশঙ্করকে আর একবার আর একদিক দিয়ে আমি দেখছি—আপনাদের এই 'কথাসাহিত্যে' তাঁর স্মৃতি-কথা পড়ছি। এই স্মৃতি-কথায়, যে তারাশঙ্কর একদিন বাঙালীর মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলার প্রাণবহ্নির সেই গগনস্পর্শী শিখা যাঁর কৈশোর ও যৌবনের পূর্বাচল আলোকিত করেছিল—সেই তারাশঙ্কর, সেই বাংলার সেই স্মৃতি আজ যৌবনের অস্তাচলে বসে'. আরেক আকাশের আরেক আলোয় কেমন প্রাণে ধ্যান করেন, তাই দেখতে উৎসুক হয়েছি। আপনারা অনেকে একসঙ্গে যে কয় খণ্ড পাঠিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ (কেন জানিনে, প্রথম কয়খণ্ডপাঠান নি); তাতেই তারাশঙ্করকে এ অবস্থাতেও একটু চিনি-চিনি মনে হচ্ছে। ঐ স্মৃতিকথায়, মনের শাসনসত্ত্বেও তিনি যেসব প্রাণের কথা না বলে থাকতে পারছেন না, একালের এই গৌরবময় যুগের সামনে দাঁড়িয়ে এবং তারি আলোকচ্ছটায় ললাট উদ্ভাসিত করে', সেকালের জন্যে যে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লজ্জিত হচ্ছেন না—তা'তে আমি যেমন কৌতুক-বোধ করছি (কারণ ভারতের গৌরবে আজ বাংলার সব দুঃখ ঘুচেছে!) তেমনি. তারাশঙ্করের সেই বাঙালী ও সাহিত্যিক প্রাণ, আর আধুনিক সমাজ-জীবন—স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক জীবন এই দুইয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ-রেখা আবিষ্কার করে আমার এই মরা প্রাণেও একটু শিহরণ অনুভব করছি। নিজের দেশ—জাতির বাস-ভূমি, ও স্বজাতি-সমাজের প্রতি যে নিগূঢ় প্রেম ধার্মিক মাত্রেরই থাকে, এবং যে প্রেম না থাকলে কেউ সত্যিকার বড় সাহিত্য রচনা করতে পারে না—যে প্রেম না থাকলে দেশোদ্ধারের পুণ্য উন্মাদনাও রাজনীতির মিথ্যাচার ও পক্ষ-বিপক্ষের রেষা-রেষিতে পরিণত হয়, শেষে দেশ জাতি সমাজের নামে আত্মসুখসাধনাই ধর্ম হয়ে ওঠে—সেই প্রেম, এবং তারি কারণের সত্যকে জানবার ও স্বীকার করবার যে পুরুষোচিত সংকল্প, তার থেকে তারাশঙ্কর এখনও মুক্ত হতে পারেন নি,—মনে হয়, সেই প্রেম ও সত্যের চেতনা এখনও তাঁকে শান্তি পেতে দিচ্ছে না। সেকালের সেই সমাজের সেই মানুষগুলোকে একালের এই মহিমার মধ্যে তিনি স্মরণ করছেন; তারা আর নেই. সে কলঙ্ক মুছে গেছে; পাঁচ-শো বছরের জীর্ণ-ভগ্ন দেউলের সেই দেবত্বহীন দেবতা চিরদিনের জন্য বিদায় হয়েছে। তবু মনে হয়, তাদের সেই কুৎসিত আননেও একটু অমৃতহাস ছিল,—সেকালের সেই গলিত বিবর্ণ জীবন পত্রপুটে আনন্দের যে একটু প্রসাদ-মধু লেগে ছিল, আজকের এই মহাজীবনের মণিখচিত স্বর্ণপাত্রে সেটুকু আর নেই,—তারাশঙ্কর তাই স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন।

তাই আমার এই অন্ধকার এপার থেকে, আর সকলকেও যেমন—তেমনি, যে তারাশঙ্করকে আমি আর চিনিনে, তাঁকে মনে মনে আলিঙ্গন করে' এই কয় ছত্র লিখে পাঠলাম।

১৭. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৫১]

বাড়শা—পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ৭।৯।৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই বেদনা বোধ করিয়াছি; আপনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছে, তার উপর ক্রমাগত এত আঘাত—আমি অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। হওয়ার কারণ আরও এই যে, বেশ বুঝিতেছি এদিনে কোন সত্যবান, প্রাণবান মানুষের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

আমার অবস্থাও ঠিক আপনার মত; গত তিন-চার মাস ক্রমেই আমি অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। বর্তমানে Gastritis-এ কষ্ট পাইতেছি, অম্লশূলের আক্রমণে এখন প্রায় সকল খাদ্যই ত্যাগ করিতে হইয়াছে; liquid food খাইতেছি। শরীর খুব দুর্বল হইয়াছে। ইহার উপরে সাহিত্যিক জীবিকা-কর্ম করিতে হইতেছে।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ যেন দৈবের পরিহাসের মত একদল কুকুর আমার পিছনে লাগিয়াছে; তাতেও নিস্তার নাই, কে একজন আমার জবানীতে জবাব দিয়াছে তাহাতে সকলের বিশ্বাস আমি ঐ কুকুরের আক্রমণে বিচলিত হইয়াছি; কুকুরের দল তাহাতে বড় গৌরববোধ করিতেছে। কি বিপদ দেখুন!

দেশের অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে আর বেশীদিন আছে, খুব শীঘ্র একটা ভীষণ কিছু ঘটিবে; অন্ততঃ বাংলাদেশ এবারে ধ্বংস হইবে। ইহা এমনই আসন্ন বোধ হইতেছে যে, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে বিদায় লওয়া উচিত। দেখা হইলে সব বলিতাম। আর কিছু না হোক শীঘ্র কলিকাতায় বোমা পড়িবার সম্ভাবনা আদৌ অসম্ভব নয়। তার উপর এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ—পঞ্চাশের

মন্বন্তরের চেয়ে বেশি! অথচ কেহ ঐ নামটা করে না! যে দিক দিয়াই হোক আর রক্ষার আশা নাই।

আপনার কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ভালবাসা জানিবেন। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[ফেব্রুআরি ১৯৫২]

বড়িশা
কলি—৮
ইং ১০. ২, ৫২

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন হ'ল আপনার চিঠি পেয়েছি। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ শোভনের চিঠিও পেয়েছি। আপনার ওখানে সে কয়েকদিন ছিল এবং আপনার স্নেহ ও আতিথ্যে সে মুগ্ধ হয়েছে। এখনও সে বোধহয় ফেরেনি, ফিরলে তার মুখে সব গল্প শুনব।

আপনি গতপত্রে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের কথা লিখেছিলেন। ঐ প্রবাসী বাঙ্গালীর উপরেও যেমন, তেমনই ঐ সম্মেলনের উপর আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই আমি ঐ দুইকেই ঘৃণা করি। আপনি 'প্রবাসী' বাঙ্গালী ন'ন, তার কারণ আপনি যেখানে থাকবেন সেখানেই বাংলাদেশ থাকবে। আপনার সরল প্রীতিপ্রবণ প্রাণে আপনি সবই সুন্দর ও পবিত্র এবং শুভ দেখেন; আমি জানি 'প্রবাসী বাঙ্গালী' জীবটি কি। বাংলা ও বাঙালীর মুখ হেঁট করছে ঐ আর এক দল। ওরা ঐ যে সম্মেলনের নাম বদলেছে—ঠিকই করেছে—বাঙ্গালী নিজের দেশেই প্রবাসী হয়েছে, এখন তারা সারা ভারতে 'wandering Jew' হয়ে বেড়াবে; কাজেই 'নিখিল ভারত' ছাড়া ওদের গতি নেই যে! অতিশয় ঘৃণ্য মনোবৃত্তি।

আশা করি ভাল আছেন। অনেকদিন দেখিনি, এর মধ্যে কলকাতায় আসবেন না?

আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শিক্ষা-দর্শন

১. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৪৩]

ঢাকা

৩-৪-১৯৪৩

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি 'কাব্য-মঞ্জুষা' লইয়া গিয়াছ সে সংবাদ তখনই পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। তোমার স্বাস্থ্য এত ভাঙ্গিয়া গেল কেন? বরাবরই কি তোমার ঐরূপ দুর্বল স্বাস্থ্য? ইহা বড়ই অন্যায়—এই বয়সেই যদি স্নায়ু এত সহজে পীড়িত হয় তবে পরে যে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে। 'স্নায়ু' বলিতেছি এইজন্য যে তোমার মানসিক অসুস্থতাও অল্প নয়। তুমি একটু শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে। গ্রন্থকীট হইয়া থাকিলে আমার মত পরে দেহটি ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিবে —কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমার নিজের অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিলে তোমরা চিন্তিত হইবে। কেবল এই মাত্র আশা যে, আমার কাজ এখন অনেকই অসমাপ্ত আছে, এবং সে কাজ করিবার লোক উপস্থিত কেহ নাই— তাই হয়ত যেমন করিয়া হোক আমাকে আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিবে।

আমার একটা বাগান আছে—অনেক পয়সা নষ্ট করিয়াছি (অবস্থার পক্ষে তাহা উচিত হয় নাই)। এখন লোকাভাবে ও অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য সেই বাগান বাঁচাইয়া রাখা দুষ্কর হইয়াছে; তাছাড়া, এখানে আর কতদিন থাকিব তাহারও স্থিরতা নাই। যে কোন দিন প্রাণের দায়ে স্থানত্যাগ করিতে হইতে পারে। গাছে আর জল দেওয়া হয় না—অনেক গাছ, তাহার মধ্যে অতিশয় মূল্যবান গোলাপই বেশি—অনেক ইতিমধ্যে মরিয়াছে, এখনও ৫০।৬০ টা আছে। কিন্তু তাহারাও আর বেশিদিন বাঁচিবে না। যেখানে আছি সেখানে ভয়ানক জলকষ্ট। কিন্তু দেখিলাম কয়েকটি বন্যলতা (অর্থাৎ অযত্নবর্ধিত কঠিনজীবী দেশী ফুলের গাছ) এই বসন্তে ফুলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অনাহারেও তাহারা সমান সুস্থ ও সবল আছে। কিন্তু গোলাপ এমন করিয়া বাঁচে না। আমরা সেই গোলাপজাতীয় অতিশয় সুখী প্রাণী—এই ভীষণ দুর্দিনে আমরা বাঁচিব না। এই সঙ্কেত স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। মন নয়—দেহই জীবনের প্রধান ভিত্তি; মনের কর্ষণে দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে।

'কাব্য-মঞ্জুষার' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা অনেকাংশে যথার্থ হইলেও মূলে একটু ভুল ধারণা আছে। এইরূপ ভুল সকলেই করিয়াছেন। আমি তাহাতে একটু আশ্চর্য হইয়াছি। মুখবন্ধের প্রথমেই (প্রথম ৫ লাইন ভাল করিয়া পড়িয়া দেখ) আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কেহই বুঝিয়াও বুঝিবে না। এই পুস্তক বাংলা কাব্যসঞ্চয়ন নয়; ইহাতে কবিতাকে মুখ্য করা হয় নাই, 'কবিতা-পাঠ'কেই মুখ্য করা হইয়াছে। বাংলা দেশে শিক্ষা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে—শিক্ষকগুলি প্রায় সকলেই গণ্ডমূর্খ; তাহার ফলে ছাত্রগণের সর্বনাশ হইয়া থাকে। আমি কবিতা-রস নয় কবিতার ভাষা, বিষয়, রচনারীতি ও তৎসংক্রান্ত নানা বিদ্যা বা তত্ত্ব কেমন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়—কবিতার সমালোচনা যত দিক দিয়া করা যায়—তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন তেমন কতকগুলি কবিতা (একেবারে অপাঠ্য বা সৌষ্ঠবহীন নয়) সংগ্রহ করিয়া—সেইগুলিকে ছাত্রগণের পাঠের বিষয় করিয়া 'পাঠ' শিক্ষা দিয়াছি। কেবল, এই কাজ করিতে বসিয়া যতদূর সম্ভব একটা সাহিত্যিক আদর্শ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি বজায় রাখিয়াছি। 'কবিতা পাঠ' শিক্ষা দিবার জন্য কবিতার উচ্চতম রসের আদর্শ রক্ষা করা দুই কারণে অনুচিত—প্রথম ভাল এবং মন্দের contrast থাকা দরকার; দ্বিতীয়তঃ ছাত্রগণকে রসের আস্বাদন অপেক্ষা রচনার বৈচিত্র্য ও নানা দোষগুণ বিচারে সমর্থ করাই অধিকতর আবশ্যক। একখানি স্কুলপাঠ্য কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনে আমি তাহার সেই অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই যতখানি করিতে পারিতেছি তাহাতেই সকলের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুশাসন মানিয়া (অনেক বিষয়ে সাহসপূর্বক না মানিয়া) আমি যাহা করিয়াছি তাহা আর কেহ এপর্যন্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এই পুস্তক সাধারণ পাঠকের (এমন কি তোমাদের কালের মহা মহা সাহিত্যিকদিগেরও) যথেষ্ট কাজে লাগিবে—অনেক শিক্ষাভিমানী মূর্খকে প্রকৃত বিদ্যালাভের উপায় ও প্রয়োজন বুঝাইয়া দিবে। খুব বড় সাহিত্যিক আদর্শ বা বোলপুরী ব্রহ্মবিদ্যার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া, আমি প্রকৃত শিক্ষার গোড়া বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কাব্যরস ও সৌখীন সাহিত্যচর্চার যে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার রবীন্দ্রনাথের শোচনীয় চারিত্রিক অধঃপতনের ফলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে তাহা রোধ করিতে হইলে, সর্ববিভাগে খুব শক্ত করিয়া বাঁধন বাঁধিতে হইবে; আমি তাহারই একটা পন্থা নির্দেশ করিয়াছি। ঐ বইখানির মূল্য এখনও কাহারও সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। সকলেই এক ভুল করিতেছেন—রসপিপাসুর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ঐ

বই রচিত হয় নাই—বাংলা কবিতার উৎকৃষ্ট চয়ন উহা নহে—উহা বাংলা কবিতার পাঠপ্রণালী-প্রদর্শনের প্রয়োজনে—তাহারই সৌকর্যার্থে নির্বাচিত কতকগুলি কবিতা। তাই বলিয়া এই পুস্তকের মূল্য অল্প নহে, বরং এক হিসাবে অত্যধিক।

তুমি যে বৃহত্তর সংকলনের কথা বলিয়াছ এবং কয়েকখানির নাম করিয়াছ (তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামে সম্পাদিত বাংলা কাব্যপরিচয় জঘন্যতম) তাহা আমিও জানি। এই কাজ একটি বড় কাজ এবং ইহা আমাকেই করিতে হইবে, করিবার সঙ্কল্প বহুদিন হইতেই আছে। যুদ্ধের জন্য এই সর্বনাশ উপস্থিত না হইলে, তাহা এতদিন বোধ হয় আরম্ভ হইয়া যাইত। ঐ কাজ এবং একখানি গদ্য-সঞ্চয়ন, এই দুইখানি গ্রন্থ আমি সম্পাদনা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম—বাঁচিয়া থাকিলে এবং সুস্থ থাকিলে তাহা অসম্ভব হইবে না।

তুমি অনেক শিখিয়াছ—কিন্তু তাহার কোন সবিশেষ সংবাদ দাও নাই। 'কবিতা পাঠ' অংশটি খুব ভাল করিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবে, উহা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত পাঠ নয়—ইহাকেই বলে 'Modern study of Literature'। আগাগোড়া আধুনিক অর্থাৎ য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি। স্কুলের পণ্ডিতেরা যেমন ব্যাখ্যা করেন—তেমন নয়। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি রাখিয়াছি ভাষার উপরে—Idiom-এর খুঁটিনাটির দিকে। পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণের প্রয়োজন বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়াছি। সম্ভবতঃ কলিকাতার ছাত্রগণও 'ভাষা' ভুলিয়াছে। তুমি 'বনমালার' যে অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহাই ঠিক—উহাই শাস্ত্রসম্মত। আমার জানা ছিল না, থাকিলে উহার উল্লেখ করিতাম এবং পরে আমার অর্থটিও দিতাম। 'বনমালা' শব্দটি বোধ হয় বাংলা অর্থাৎ classical সংস্কৃত নয়। বাংলা বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্যের অভিধানে বোধ হয় ঐ অর্থ করা হইয়াছে। শব্দটি মূলে সংস্কৃত হইলে উহার প্রাথমিক (primary) অর্থ কি তাহা দেখিয়া লওয়া উচিত। শব্দের অর্থ কালে কালে পরিবর্তন হয় তাহা তুমি জানো। 'বনমালা' বলিতে বনফুলের মালা যদি বুঝি—তবে বস্তুটির সঠিক ধারণা হয়ত হইবে না; কিন্তু উহার দ্বারা যে জীবনযাত্রা সূচিত হয় তাহার কল্পনা আরও কবিত্বপূর্ণ। তথাপি শাস্ত্রনির্দিষ্ট অর্থ ছাত্রগণকে সর্বাগ্রে শিরোধার্য করিতে হইবে।

'নীতিকবিতার' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহা যথার্থ নহে। 'নীতিকবিতা' কখন রসপূর্ণ হইতে পারে না—'নীতি' ও 'রস' এই দুইটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তু—ইহাদের সমন্বয় হইতে পারে না। 'নীতিকবিতা' অনেক প্রকারের হইতে পারে—দৃষ্টান্ত উপমা ও শব্দার্থের নানা কৌশলই নীতিকবিতার প্রাণ। হিতোপদেশ

(পঞ্চতন্ত্র) এবং চাণক্যশ্লোকই আমাদের প্রাচীন নীতিকবিতার উৎকৃষ্ট নির্দশন।

'কাব্য-মঞ্জুষা' যে কপি তুমি লইয়া আসিয়াছ, তাহাতে তুমি কি নাম লিখিয়াছ? আমি তোমাকে আমার হাতে নাম লিখিয়া যে বই এখান হইতে পাঠাইয়াছিলাম তাহা পরে পৌঁছিয়াছে—সজনীবাবু জানিতেন না, তাই তাঁহার নিকট যেখানি ছিল তাহাই তোমাকে দিয়াছেন। তুমি যদি বইখানিতে নিজের নাম না লিখিয়া থাক, তবে ঐ খানি বদল করিয়া তোমার নামাঙ্কিত বইখানি লইয়া আসিও।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার সংবাদ দিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২. সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৪৫]

Bagnan P. O.
(Howrah)
29. 10. 45.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি—আমার ৺বিজয়ার প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহ আমি ভুলি নাই।

এবার যে কারণে এবং যে বিষয়ে আপনি এই পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝিতেছি আপনি বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; মাতৃভাষার প্রতি আপনার এই অনুরাগ এবং ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আপনার এই উৎকণ্ঠা—আপনার মত জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। 'ধার্মিক' বলিলাম এইজন্য যে মানুষের জন্মগত কয়েকটি ঋণ আছে—পিতৃ-ঋণের মত জাতি-ঋণও একটা ঋণ; জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, যে না করে সে অধার্মিক। ভাষাকে সকল অনাচার হইতে রক্ষা না করিলে জাতির ভাবজীবন, মনোজীবন এমন কি অধ্যাত্মজীবনও বিপন্ন হয়—জাতি আত্মভ্রষ্ট হয়। এজন্য সকল জ্ঞানী ও ধার্মিক

ব্যক্তির এই বিষয়েও একটি দায়িত্ব আছে। আপনার যে সে দায়িত্ববোধ থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষার যে স্বৈরাচার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্বে দেখা দিয়াছে। তারপর ঐ স্বৈরাচারের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আপনার প্রদর্শিত ঐ ভ্রমগুলি অতিশয় Innocent বা Innocuous বলা যায়; আপনি এতদিন Ripvan Winkle-এর অবস্থায় বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছেন—সে নিদ্রা না ভাঙ্গিলেই ভাল হইত। যেটুকু ভাঙ্গিয়াছে তাহাতেই আপনি এত বিচলিত হইয়াছেন। আমি আজ বিশ বৎসর প্রায় নিঃসঙ্গ ও একক ভাবে যে যুদ্ধ করিয়াছি, তারপর এখন প্রায় হতাশ হইয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়াছি। আপনি কয়েকটি ব্যাকরণদোষ দেখিয়াই এত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ব্যাকরণদোষ ত কিছুই নয়—ভাষারই জাতিনাশ হইয়াছে। ব্যাকরণদোষ মূর্খতার লক্ষণ, তাহা সংশোধন করাও সম্ভব, কিন্তু ভাষার মূল রীতি-পদ্ধতি এবং যাহা তাহার প্রাণ সেই Idiom আধুনিক সর্বসংস্কারমুক্তির পতাকাধারী মুক্তি-ফৌজের দল প্রায় শেষ করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ অনেক—গত বিশ বৎসর বা ততোধিক কালের শিক্ষা এবং শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত নব নব সাহিত্যিক ধারা ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আপনি একটা নিতান্তই বাহ্যলক্ষণ দেখিয়াছেন—ভিতরে দৃষ্টি করিলে আপনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া নির্বাক হইয়া যাইবেন।

আপনি যে কয়েকটি ব্যাকরণঘটিত দুষ্ট প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমি যে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, ইহাতে আপনার সন্দেহের কারণ কি থাকিতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই আমার রচনার সহিত সম্যক পরিচিত নহেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমাকে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। সাহিত্যিক অরাজকতার বিরুদ্ধে আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লেখনী চালনা করিয়াছি—এবং বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যধর্ম বা খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি যে দীর্ঘ তপস্যা করিয়াছি—আমার জীবন তাহাতেই সার্থক অথবা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি শুধুই ব্যাকরণ নয়, সাহিত্যের ধর্ম, মর্ম ও কর্ম এই ত্রিবিধ সমস্যার চিন্তা একই কালে করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে হইয়াছে যে, ভাষাই সাহিত্যের আদি, মধ্য ও শেষ; ব্যাকরণ তাহার প্রাথমিক শাসনবিধি মাত্র; সবচেয়ে বড় যাহা তাহা ভাষার Genius বা 'স্বধর্ম' এবং সেই স্বধর্ম ভাষায় শব্দযোজনা ও বাক্যগঠন-রীতিতেই

প্রকাশ পায়; শুধু তাহাই নয়; শব্দগুলির ব্যবহারও 'বাংলা' হওয়া চাই। ব্যাকরণ শিক্ষা দিবেন স্কুলের শিক্ষক—সেটা খুব দুরূহ কর্ম নয়; কিন্তু যদি ভাষার সেই স্বধর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধিনাশ হয়, তবে তাহা নিবারণ করা যে কত দুঃসাধ্য, তাহা আমি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি।

আপনি ব্যাকরণদোষ দেখাইয়াছেন—কিন্তু ব্যাকরণ-জ্ঞান ত পরের কথা, বর্ণ-জ্ঞানও যে লোপ পাইতে বসিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় যে নূতন বানানবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে 'ক্ষ' অক্ষরটিও বাংলা শব্দ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে—'ক্ষেত' না লিখিয়া 'খেত' লিখিতে হইবে; ইহার ফল এই হইয়াছে যে, 'আকাঙ্ক্ষা'ও আর 'ক্ষ' কে দরকার করে না—'আকাঙ্খা' হইয়াছে কোন আইন বা কোন যুক্তির বালাই আর নাই। 'মৌন' বিশেষণরূপে ব্যবহার শরৎচন্দ্রই প্রথমে করেন নাই—রবীন্দ্রনাথের বহু আর্য প্রয়োগের এইটি একটি notorious উদাহরণ। কবিতার ভাষা যে গদ্যে সংক্রামিত হয় তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আছে—বাঙালীর বিদ্যায় ও সংস্কারে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বরং গদ্য কাব্যগন্ধী হইলেই তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। আমি পূর্ববঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াও 'সাথে' শব্দটিকে শিষ্ট ভাষা হইতে বহিষ্কার করিতে পারি নাই। উহা যে একটি archaism এবং কবিতায় ব্যবহৃত হইলেও শিষ্ট প্রয়োগ নয়; কেবল নিম্নশ্রেণীর কথ্য ভাষায় এখনও বাঁচিয়া আছে—একথা কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই। 'আপ্রাণ' যে একটা অনাবশ্যক neologism—উহার অর্থও অসম্পূর্ণ, ইহা কেহ শুনিবে না 'ছোটদের' বা 'ছোটবেলায়' যে খাঁটি বাংলা Idiom নয়—'ছেলেদের' এবং 'ছেলেবেলা'ই যে বাংলা রীতি তাহা কেহ মানিবে না। বহু দৃষ্টান্ত আছে—শব্দের অর্থও বিকৃত হইতেছে, 'যোগাযোগ' কথাটি সাধারণ 'যোগ' বা সম্বন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অথচ উহার বিশেষ অর্থ—Combination of circumstances অথবা আরও ঠিক অর্থ 'সুবিধাজনক সংগঠন'। 'আওতা' একটি অতিশয় খাঁটি বাংলা বুলি, ইহার অর্থ—বৃক্ষ লতার বৃদ্ধিনাশক shade; কিন্তু এখন অর্থ হইয়াছে "বৃদ্ধিকারক influence"! ভাষাকে এইরূপ নষ্ট করিতেছে কাহারা এবং কি কারণে তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। ভাষার Idiom-ই ভাষার প্রাণ—ভাগীরথী তীরের ভাষায় যে অপূর্ব ইডিয়াম-সম্পদ ছিল তাহারই বলে এত শীঘ্র বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; আজ সেই Idiom নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

আমি জানি, ভাষাকে রক্ষা করিবার যে সকল উপায় আছে, আমাদের

শিক্ষাযন্ত্র সে উপায় কখনও করিবে না—কারণ আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নয়; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেই শিক্ষার সহায়ে গড়িয়া উঠে নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাঁচিয়া উঠিয়াছিল—অর্থাৎ 'because of' নয়, 'inspite of'। কিন্তু এ সাহিত্যের কোন শাসন-পরিষৎ এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাই যখন, সমগ্র জাতি শিক্ষাহীন ও ধর্মহীন হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার পরিবারে ও সমাজে যেমন নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তেমনই তাহার মনোজীবনের দেহ যে ভাষা তাহাতেও নানা দুষ্ট ব্রণ ও বিস্ফোটক দেখা দিতেছে। আপনার উৎকণ্ঠা যাহা লইয়া,তাহা অপেক্ষা আরও গভীর নৈরাশ্যজনক লক্ষণ আমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য স্কুলে ও কলেজে যাহারা পড়াইয়া থাকেন তাঁহারা যে কেমন শিক্ষক তাহাও আমি জানি। এইজন্য আমি একদা একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলাম—যাহাতে ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের উপকার হয়, কিন্তু সেই পুস্তক এখনও সর্বত্র পাঠ্য করাইতে পারি নাই। আপনি যদি না দেখিয়া থাকেন আমার প্রকাশককে আপনার ঠিকানায় একখণ্ড পাঠাইতে বলিব। ম্যাট্রিক শ্রেণীর জন্য একখানি কবিতাসংগ্রহ সম্পাদনায় এবং কবিতাগুলিকে অবলম্বন বা উপলক্ষ্য করিয়া বাংলা ভাষা ও শিক্ষাদানে, যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এ চেষ্টাও নিষ্ফল—এরূপ পরিশ্রমের মূল্য বা প্রয়োজন কে বুঝিবে?

সর্বশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করিব। আপনি আমার ভাষার একটি দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর ব্যাকরণ-দোষ আমার ভাষায় আছে। আমি 'কিন্তু তথাপি' এইরূপ যুগ্ম শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহার খাঁটি ব্যাকরণসম্মত হইলেও ভাবার্থের স্পষ্টতা-সাধক কি না? ইংরেজীতেও 'But still'—ঐরূপ শব্দযোজনা কি নিন্দনীয়? ব্যাকরণের শাসন শিরোধার্য বটে, কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত,—ভাষার একমাত্র ধর্ম ভাব প্রকাশ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যস্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা ব্যাকরণকে ন্যায্যমর্যাদা দিয়াই ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে মুক্ত রাখিয়াছেন, ইহা আপনিও জানেন।

আপনার শারীরিক কুশল প্রার্থনা করি। মাঝে মাঝে সংবাদ পাইলে সুখী হইব।

শ্রদ্ধাবনত—
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩. অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৫]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বাগনান পোঃ
হাওড়া
১. ১১. ৪৫

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, তার কারণ আমার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নয়—বেশি পরিশ্রম করিতে পারিনা, তার উপর লেখনীর বিরাম নাই, পত্রের সংখ্যাও কম নয়।

তুমি গত বৎসর যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহার উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছিল, পরে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমার পত্রে তুমি যে সকল কথা লিখিয়াছ, তাহার উত্তরে যেরূপ দীর্ঘ পত্র লিখিতে হয়, তাহাও ভীতিজনক। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহার একটিও আমার অজ্ঞাত বা অচিন্তিত নয়; আমার অভিজ্ঞতা এত বেশী যে সেরূপ বয়স ও অভিজ্ঞতা হইলে, তুমিও আর এত বিচলিত হইবে না। বাংলার Body-Social ব্যাধিগ্রস্ত, There is a "disease in the very order of things"—ইহার চিকিৎসা একরূপ দুঃসাধ্য। তোমার মত যাহারা আদর্শবাদী এবং সত্য ও মঙ্গলের সেবা করিতে ইচ্ছুক—তাহাদের ভাগ্যে গভীর দুঃখ ও বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছু ঘটিবে না। আমি সারা জীবন প্রায় একা যুদ্ধ করিয়া এক্ষণে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জীবনে সকল ক্ষেত্রেই মহা মিথ্যা, পাপ, অনাচার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এখন এ সমাজ হইতে অপসৃত হওয়াই মঙ্গল। আমি তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া আমার সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, প্রথম—বাংলা সাহিত্যের অরাজকতা নিবারণ, দ্বিতীয়—বাঙালীর শিক্ষায় বাংলাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান, এবং তৃতীয়—বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা—তজ্জন্য একটি প্রকাশালয় স্থাপন। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ফলটুকুও নষ্ট হইতে চলিয়াছে ... ... আমার একটা হাত যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি বড় আঘাত পাইয়াছি।

শিক্ষার যে ব্যবস্থা দেশে কায়েমী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে খাঁটি জাতীয় শিক্ষা বা বাংলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষানীতিই কলুষিত হইয়াছে—ইহার জন্য স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই দায়ী, গাছের গোড়া কাটিয়া এখন আগায় জল দিয়া কি হইবে? তুমি যে সকল কু-নিয়মের কথা বলিয়াছ

তাহার নিদান আরও গভীর ; আরও ভিতরে তাকাইতে হইবে। বাঙালী জাতিই শিক্ষার আদর্শ ভুলিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা এখন আর কেহ চায় না—য়ুনিভার্সিটি শিক্ষাকে যেরূপ সস্তা করিয়া দিয়াছে, তাহাতে এখন আর কেহ বেশি মূল্যে সেই শিক্ষা (অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা) লইতে চায় না। আমি সেদিন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকে ম্যাট্রিকের বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য দুইখানি পৃথক বই নির্ধারিত করিতে বলায় (তোমার চিঠি পাওয়ার আগে) তিনি বলিলেন, তাহা করা কঠিন, কারণ চতুর্দিক হইতে বড অভিযোগ হইতেছে বই-এর সংখ্যা ও পাঠ্যের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া ; আমার যুক্তি তিনি স্বীকার করিলেন, কিন্তু নিরুপায়। যে পাপকে এতদিন সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এখন তাহাকে নিরস্ত করিবে কে ? বাংলার ছাত্র ছাত্রীর যাহারা অভিভাবক, তাহারা একেবারে ধর্মহীন হইয়াছে। য়ুনিভার্সিটির সেই পাপের কথা আমি অনেকবার 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিয়াছি—তুমি হয়ত দেখ নাই। তবু একটা প্রবন্ধে কিছু উল্লেখ আছে—তুমি আমার "বিচিত্র কথা"'র 'জাতীয় জীবন সঙ্কটে' প্রবন্ধটি পড়িয়াছ কি ?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছ তাহা যে কর্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রীতিমত সে সাহিত্যের আলোচনা করিবার সময় বা সামর্থ্য কখনও হইবে কিনা জানিনা—বর্তমান অবস্থায় সে আশা নাই। তবে যদি একটু সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র একটি এমন ভাষ্য লিখিবার ইচ্ছা আছে যে, তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও কবি-কার্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিকে একত্র করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার সূত্র ধরিতে পারা যাইবে।

'নবযুগ' আরও একমাস পরে প্রকাশিত হইবে। "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" ও "সাহিত্য বিতান" out of print হইয়াছে। "সাহিত্যকথা" পাওয়া যায়—India Publishing House-এ সন্ধান করিও। না পাইলে আমাকে লিখিও। "বাংলা কবিতার ছন্দ" বোধ হয় পড়িয়াছ ?

... ...

তোমার মামার পত্রের উত্তর দিয়াছি। তাঁহাকে আমার প্রণাম দিবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪. সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৬]

Bagnan P. O.
Howrah
12. 3. 46

পূজনীয়েষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু নানা কারণে উত্তর দিতে বড় বিলম্ব হইল। আপনার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার কথা নয়, তবু ভগবানের কৃপায় আপনাদের মত মানুষ দীর্ঘজীবী না হইলে, দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি এই বয়সেই স্বাস্থ্য হারাইয়া প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। অথচ আমার কাজ এখনও কিছুই করা হইল না—'the little done and the vast undone'-এর দুঃখ রহিয়া গেল।

আমার উপর আপনার স্নেহের অধিকার ত আছেই, তাছাড়াও যেন আরও কিছু আছে; কারণ আমিও আপনাকে পরম আত্মীয়ের মতই স্মরণ করিয়া থাকি, বোধ হয় ইহা জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ। আপনি আমাকে যখন শুধুই স্নেহ নয় শ্রদ্ধাও করিয়াছিলেন তখন আমার ভবিষ্যৎ আমারও অজ্ঞাত; কিন্তু আপনি তখনই চিনিয়াছিলেন, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? আপনারা যে যুগ ও generation-এর মানুষ আমিও তাহারই একটি শেষ product; যুগান্তরের এই বন্যাস্রোতে আমাকে বহু সাধনায় দৃঢ় ও স্থির থাকিতে হইয়াছে—নূতনের আঘাতে পুরাতনকে আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। যুগ-সন্ধিস্থলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে যাহা সহিতে হইয়াছে, আপনাদিগকে তাহা সহিতে হয় নাই। আমাকে হইতে হইয়াছে—Interpreter between the two. তাই অনেক বিষয়ে আপনার সহিত মতভেদ বা দৃষ্টির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, তথাপি আমি যে মূলে আপনাদেরই সহধর্মী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।

আপনি আপনার পত্রে বানান সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন তাহা আপনার মত পণ্ডিতজনের উপযুক্ত, ভাষা ও সাহিত্যের মূলনীতি যাঁহারা অক্ষত রাখিতে চান, এবং জানেন যে, তাহা না হইলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধঃপতন অনিবার্য—তাঁহারাই আপনার সহিত একমত হইবেন। কিন্তু আপনি Ripvan Winkle হইয়া আছেন—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ১৯০৯ সাল

হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে New Regulations-এর প্রবর্তন হয় তাহাতেই এজাতির শিক্ষার সমাধি হয়; তারপর গত generation ধরিয়া বাংলা দেশে শিক্ষা বা সংস্কৃতির, কোন বালাই আর নাই। আপনি ভাষার বিশুদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন কিন্তু জাতির চরিত্র ও ধর্মই যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিদ্বানের সংখ্যা যেমন অতিশয় অল্প, তেমনই সেই বিদ্বানেরাও ধর্মহীন হইয়া অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছে; ভাষা বা সাহিত্য যাহার বাহন ও আধার, জাতির সেই মানসজীবন ও অধ্যাত্মজীবন যে একেবারে ভস্ম হইয়া গিয়াছে আপনি এ সকল কিছুই অবগত নহেন। ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ তাহার শাল-দোশালার কথা ভাবে না—সুপ্ত সন্তানগুলিকেই বাঁচাইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তেমনইবাঙালীর আত্মাই অতিশয় হীন দুর্বল কলুষিত হইয়াছে—এ যুগে তাহাকে আত্মস্থ করাই প্রধান কর্তব্য—যে দুর্নীতি ও মিথ্যা তাহার মনকে আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে, ভাষা ও সাহিত্য কিছুই বাঁচিবে না। আমি সাহিত্যের সমালোচনা ব্যপদেশে তাহার সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতির সংশোধন করিতে একাই যে পরিশ্রম করিয়াছি আজও তাহা সকলে বুঝিতে পারেন নাই। সাহিত্যই আমার সেই সাধনার ক্ষেত্র হইলেও, আমি "New Philosophy of life"-কে প্রাচীন এবং আধুনিকদের সাক্ষ্যপ্রমাণে খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার জ্ঞান ও শক্তি অল্প—কিন্তু তাহাই সম্বল করিয়া আমি যে উদ্যম করিয়াছি—বোধ হয় সেইজন্যই আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। কারণ আমার মস্তিষ্কচালনা অতিরিক্ত হওয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি বোধ হয় আমার সকল পুস্তক—অন্ততঃ প্রধানগুলিও পাঠ করেন নাই; তাছাড়া, বহু আলোচনা ও বাদ-বিতর্ক মাসিকের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে।

এই কাজ করিবার জন্য আমাকে নূতন মতবাদগুলিকে হজম করিতে হইয়াছে। আমাদের কালে Literary Criticism বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহা খুবই সংকীর্ণ এবং undeveloped অবস্থায় ছিল। বিংশ শতাব্দীতে (য়ুরোপে) ঐ Literary Criticism—মানুষের প্রায় সর্ববিদ্যার সঙ্গমস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সাহিত্যের অর্থ ও মনুষ্যজীবনের অর্থ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একে ত সাহিত্য জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়।—সর্বমানবের আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়-স্বরূপ হইয়াছে, তার উপর কাব্য-জিজ্ঞাসা সাহিত্য-সমালোচনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদসহোদর মাত্র নয়—তাহা একটা বিশিষ্ট 'জ্ঞানযোগ' ও বটে। অতএব আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় কোন্ সকল প্রশ্নের সমাধান

করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের দেশে কিছু সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত সাহিত্যের সমালোচনা—নূতন যুগের জীবনদর্শন বা জীবনজিজ্ঞাসার উপযোগী সাহিত্য-বিচার আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয় নাই, অথচ পশ্চিম হইতে নানা মতবাদের প্রতিধ্বনি ও আস্ফালনে, আমাদের সেই পুরাতন, অর্থাৎ মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সাহিত্য—সেই সাহিত্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই সাহিত্যিক আত্মহত্যা নিবারণের জন্য আজীবন লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস বা বিস্মৃত কবিগণের রচনা উদ্ধার, কিম্বা যাহা আপনিই স্বভাবের নিয়মেই মরিয়া গিয়াছে সেই সকল অপরিপুষ্ট এবং classical শ্রী-সৌষ্ঠব-হীন কাব্য-সাহিত্যকে সাহিত্যের এই উন্নত ও উচ্চতর আদর্শের যুগে তুলিয়া ধরা প্রভৃতি কাজ কেন যে করিতে পারি নাই, এবং সে প্রবৃত্তিও আমার নাই. তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। তাহা যদি করিতাম তবে আমার শক্তির অপচয় হইত—সে কাজ করিবার বহু লোক আছে; আমি ব্রাহ্মণের কাজই করিতে পারি, শূদ্রের কাজ আমার নয়। আমার প্রধান কাজ বাংলা সাহিত্যকে কৌলিন্য-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—আধুনিক বাঙালী সন্তান যেন তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে কোন লজ্জা বা অগৌরব বোধ না করে। যাহা একেবারে প্রথম শ্রেণীর, যাহা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাহার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাংলা সাহিত্য ইংরেজী যুগেই সাবালক হইয়াছে, তাহার গ্রাম্যতা দোষ ঘুচিয়াছে। সেই গ্রাম্যতার সংস্কার আমাদের জাতিগত রসপিপাসার অর্থাৎ আমাদের রক্তে এখনও আছে। কিন্তু তাহাকে লইয়া World's Republic of Letters-এ গৌরব করিবার কিছুই নাই। তথাপি খাঁটি বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ বাঙালীর সাহিত্যও বাঙালী জাতির আলোচনার যোগ্য, এবং তাহা রক্ষা করাও এক কারণে আবশ্যক। কিন্তু আমি তাহার উপযুক্ত নহি, সে কাজ অপরে করিবে।

আপনাকে আমার "কাব্য মঞ্জুষা" একখণ্ড পাঠাইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আপনি সামান্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝিলাম, আপনার গভীরতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম আপনিই এই পুস্তকখানির অভিপ্রায় এবং ইহার মূল্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। ঐ পুস্তক যে বাংলা কবিতার anthology নয়, ছাত্রপাঠ্য নিম্ন standard-এর একখানি বই এবং তজ্জন্য সরকারী নিয়মাবলী

যথাসাধ্য লঙ্ঘন না করিয়া আমি ছাত্রগণের সাহিত্যশিক্ষা, ভাষা-শিক্ষা ও একটা 'সীমা' পর্যন্ত কাব্য-রসবোধ—এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা পুস্তকের মুখবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছি, তৎসত্ত্বেও আপনি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। আমি যে এত পরিশ্রম করিলাম, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে—হইবারই কথা, কেননা, স্কুলে বা কলেজে সাহিত্যশিক্ষার ব্যবস্থা ত নাই-ই বরং বাধাই যথেষ্ট আছে। বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন যে পদ্ধতিতে যে সকল পণ্ডিতের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর নাই। আমি একদা এই কথা ভাবিয়াই, কোন প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে একখানি 'কবিতা সংগ্রহ' সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, এবং এই তথা-কথিত পাঠ্য-পুস্তকের মারফতে আমি সেই দুর্ভাগা ছাত্রগণকে সাহিত্যশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ পুস্তকের মত বাংলার ইদানীন্তন পাঠ্য-পুস্তক যে আর নাই ইহা আমি housetop হইতে উচ্চস্বরে বলিতে পারি। কবিতার নির্বাচন ও সজ্জা যতদূর সম্ভব আমার অভিপ্রায়ের উপযোগী করিরা (anthology'র আদর্শে নয়) আমি যে 'উন্মোচনী' রচনা করিয়াছি, তাহার প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্র এবং প্রতি অক্ষর না পড়িলে, আমার ঐ পুস্তকের মূল্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। আপনি কি আর একবার তাহা করিবেন ? আশা করি আপনি উপস্থিত কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানিবেন। শ্রীমান পৃথ্বীশকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবেন।

স্নেহার্থী
শ্রীমোহিতলাল

পুঃ নিঃ—পৃথ্বীশকে বলিবেন, আমি রামতনু অধ্যাপকপদের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই—দরখাস্ত করি নাই। গুজব মিথ্যা।

৫. সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত
[জুলাই ১৯৪৬]

বাগনান
১৪ জুলাই, ১৯৪৬

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার স্নেহাশীর্বাদলিপি অনেক দিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু এযাবৎ উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত আছি। আমার স্বাস্থ্য যেরূপ ভাঙ্গিয়াছে তাহাতে

আরোগ্যলাভের আশা করিনা ; Chronic Bronchitis এবং Blood pressure-এর কোন চিকিৎসা নাই, তথাপি পৈতৃক জীবনীশক্তি বোধ হয় কিছু অধিক মাত্রায় পাইয়াছিলাম ; সেই পিতৃশক্তির বলে এখনও টিকিয়া আছি এবং এমনই রোগযাতনা সহ্য করিয়া এখনও কিছু কাজ করিতে পারিব, তবে আর বেশি দিন বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। এই অবস্থাতেই জীবিকার চিন্তা করিতে হয়, সাহিত্য-কর্মকে জীবিকা-কর্ম কখনও করি নাই, এখন তাহাই করিতে হইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক বলিয়া মনে করি। আমার সাহিত্যিক-ব্রত এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে—অনেক কাজ বাকী, সেও একটা বড় দুর্ভাবনা।

শ্রীমান পৃথ্বীশকে একটি কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম—অনেক দিন আগে তাহার এক চিঠি পাইয়াছিলাম, তাহার উত্তরে ঐ কথাটি বাদ পড়িয়াছিল। তাহাকে বলিবেন, আমি কলিকাতা য়ুনির্ভাসিটির রামতনু চেয়ারের প্রার্থী হইয়াছিলাম এ সংবাদ মিথ্যা, আমি ঐ পদের জন্য কোন চেষ্টা বা চিন্তা করি নাই। অতএব, আমি যে ঐ পদ পাই নাই, তাহাতে তাহার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আমার পত্রে ও সাক্ষাতে খুব খোলাখুলি আলোচনা হইয়াছে ; য়ুনির্ভাসিটি সম্পর্কে আমার মনোভাব তিনি জানেন, আমি উহার পাপাচার সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছুই বলিতে বাকী রাখি নাই ; অতএব উহার মধ্যে আমাকে লইবার কোন কথাই হইতে পারে না। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ধর্মের প্রতিষ্ঠান নয়, উহা যে একটি রাজনৈতিক Power-House ইহা তিনিও জানেন, তিনি নিজে Educationist নহেন Politician, তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাই অন্যরূপে য়ুনির্ভাসিটি আমাকে সম্মান করিয়া থাকে, Ph. D. ও P. R. S-এর Thesis আমাকে পাঠায়। আরও কিছু যথাসাধ্য করিয়া থাকে। ইহার অধিক তাহার সাধ্যাতীত। পৃথ্বীশকে ইহা বলিবেন।

আমার একখানি নব প্রকাশিত পুস্তক আপনাকে শীঘ্র উপহার পাঠাইব, নাম—'বাংলার নবযুগ'। বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগিবে, ভাষার ব্যাকরণ দোষ বহু স্থলে আছে, আশা করি তাহা পীড়াদায়ক হইবে না। 'আশ্চর্য' শব্দটির বিশেষরূপে ব্যবহার বাংলা রীতি হইয়া উঠিয়াছে, এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে—এখন আর উহাকে সংশোধন করা যাইবে না। Usage যে Grammar-কে অগ্রাহ্য করে, তাহা আপনি ত জানেন ; কেবল ইহাই বিচার্য যে কোন একটি ওইরূপ ব্যবহার সত্যই Usage-পদবাচ্য কিনা। আপনি আপনার পত্রে ভাষাঘটিত যে সকল অনাচারের জন্য বিস্ময় ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন—সে

সম্বন্ধে পূর্বে আপনাকে লিখিয়াছি; তথাপি আপনার দুঃখ আপনি ভুলিতে পারেন না। আমি নিত্য যে সকল নূতন লেখকের গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বা উপহার-স্বরূপ পাই, তাহা পাঠ করিলে আপনি বোধ হয় আর কোন অভিযোগ করিতেন না। বাঙালীর শিক্ষা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া যেরূপ অধঃপাতে গিয়াছে, তাহাতে উহার অধিক কি আশা করিতে পারেন? শিক্ষক বা পরীক্ষক কেহ আর ঐ সকল ত্রুটি গ্রাহ্য করে না—শিক্ষকদিগের বিদ্যাও ঠিক ঐ ওজনের। যাহাদের চরিত্র নাই, ধর্ম নাই, জীবনের কোথাও সত্যনিষ্ঠা নাই, তাহারা ভাষা বা সাহিত্যের শুচিতা রক্ষা করিবে কেন? জাতি-হিসাবে আমাদের মৃত্যু আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে। 'অবদান' ও 'অবচেতন'—এ দুইটির গোত্র এক নয়। 'অবদান' একটি fashionable শব্দ, কিন্তু 'অবচেতন' শব্দটি বাংলা অনুবাদ। মূর্খের হাতে তাহার প্রয়োগ হাস্যকর হইতে পারে, কিন্তু শব্দটি নিরপরাধ। 'অবদান' অর্থ, ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গমূলক কোন কীর্তি; বাংলায় ঐ অর্থের degradation হইয়াছে।

আজ এই পর্যন্ত। আপনার কুশল সংবাদ দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

স্নেহার্থী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬- অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে লিখিত
[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা পোঃ (২৪ পরগণা)
ইং ১৫।২।৪৯

তোমার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি। এ পর্যন্ত উত্তর লিখিবার অবকাশ পাই নাই। একে শরীর অতিশয় অসুস্থ—নিত্যপীড়িত বলিলেই হয়, তার উপর 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য যাবতীয় পরিশ্রম সব আমাকেই করিতে হয়। এজন্য আমি আর নিয়মিত ভাবে বাহিরের সহিত কোন যোগ রাখিতে পারি না। ইতিমধ্যে কিছুদিন Blood pressure খুব বাড়িয়াছে তার উপর হাঁপানি কাশির দারুণ আক্রমণে প্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম। এখন একটু ভালো।

'বঙ্গদর্শন'-এর কাজ এমনই পরিশ্রম ও অবসরশূন্যতার কাজ যে আমি আর কিছুই করিতে পারি না। ঐ ছোট পত্রিকাখানির পশ্চাতে যে পরিশ্রম আছে তাহা

অনেকেই বুঝিতে অক্ষম। আমাকে সংকলন ও সম্পাদন তো করিতেই হয় তার উপর অনুবাদের কাজও কম নয়। নিজের লেখা ছাড়াও ঐ রকম অনুবাদ (এবং গল্পও) এবং তাহাও অনেক খাটিয়া 'বঙ্গদর্শন'-এর আদর্শ ও প্রয়োজন মত বাছিয়া লওয়া—সে যে কি পরিশ্রম তাহা আমিই বুঝিতেছি। ইহার উপর আমাকে আগাগোড়া প্রুফ দেখিতে হয় এবং কপিও প্রস্তুত করিতে হয়। অর্থাৎ সম্পাদন নয় প্রত্যেক সংখ্যাটি আদ্যন্ত তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়। এইজন্য আমি আর কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। ইহার উপর অনেক চিঠিও লিখিতে হয়। ভাবিয়া দেখ, আমার এই অবস্থায় এত রকমের মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম কিরূপ দুঃসহ হইয়াছে।

'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' শেষ হইতে এখনও দেরী আছে। শেষের দিকে আমাকে বড় বেশী চিন্তা ও কল্পনা করিতে হইতেছে। অবশ্য যদি শেষ হয় তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেই।

তোমাদের ওখানে কোন গ্রাহক ও পাঠক আছে কি?

কলেজের অবস্থা ও ব্যবস্থার যেটুকু পরিচয় দিয়াছ তাহাতে আশ্চর্য হই নাই। তবু সরকারী কলেজ বলিয়া আর কিছু না থাক আইন কানুনের খুব কড়াকড়ি আছে তাহাও মন্দের ভালো। লেখাপড়া ভালরূপই জানি। শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত আছেন যাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী নহেন; তারপর যাঁহারা উচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া বাহির হন, তাঁহাদের নিজেদের শিক্ষা প্রায় হয় নাই বলিলেই হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বড় অপবিত্র বিদ্যাস্থান বোধ [হয়] ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই—আজ দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙালীর বিদ্যাশিক্ষাকে একটা অতিশয় মিথ্যা অধর্ম ও জুয়াচুরীর ব্যাপার করিয়া রাখিয়াছে। উহার কথা ভাবিলেও আমার মর্মচ্ছেদ হয়। যাই হোক, তুমি যথাসাধ্য তোমার কর্তব্য পালন করিবে, এবং নিজের শিক্ষা নিজেই পূর্ণতর করিয়া তুলিবে।

ঢাকার খবর আমিও বিশেষ পাই নাই। হরনাথ লিখিয়াছে তাহাকে নাকি পাকা চাকরীতে বহাল করিয়াছে, মাহিনা ২৫০৲ টাকা দিবে। তবে সে ওখানে থাকিতে ইচ্ছুক নয়।

তোমার সংবাদ মাঝে মাঝে দিও। এবং কলিকাতায় আসিলে দেখা করিও। আশা করি ভাল আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[আগষ্ট ১৯৩০]

38 Nilkhet Road

Ramna P.O., Dacca

১লা ভাদ্র, ১৩৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন দেখিয়া যেমন বিস্মিত তেমনই প্রীত হইয়াছি। আপনার ইদানীন্তন 'উপাসনা' আমি কখনও দেখি নাই এবং এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, ইতিপূর্বে যে পত্র ও পত্রিকা আপনি পাঠাইয়াছিলেন তাহাও পাত্রভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয়, আপনি ঠিকানা-ভুল করিয়াছিলেন। আমি Intermediate College-এ শিক্ষকতা করি না; ঢাকা ইয়ুনিভারসিটি আমার কর্মস্থল। উপরে ঠিকানা দিলাম।

আপনার সহিত আমার সৌহার্দ্য নূতন নয়। কিন্তু আমি লেখকমাত্র—আপনি লেখক ও সম্পাদক দুই-ই। অতএব সম্পর্ক বজায় থাকা দুরূহ। আমি দূর প্রবাসে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় আছি—বাংলা সাময়িক সাহিত্যের বা সাহিত্য-সমাজের কোনও সংবাদ আমি পাই না। তথাপি, কোনও কোনও মহানুভব সম্পাদক এ যাবৎ আমাকে তাঁহাদের পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইয়া আমার অশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু লজ্জার কথা এই যে, আমি তাহার প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাদের পত্রিকায় কচিৎ কখনও লেখা দিতে পারিয়াছি। তথাপি তাঁহারা এই অধমকে বিস্মৃত হন নাই দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তাহার কারণ এই যে, অন্য দেশের মত বাংলা দেশেও পত্রিকা পরিচালন ব্যবসায়নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, মাদৃশ অক্ষম ব্যক্তিকে বিনামূল্যে তাঁহাদের পত্রিকা পাঠাইতে দেখিলে এই ব্যবসায়-প্রচেষ্টার মধ্যেও একটা সামাজিকতার পরিচয় পাই—কেবল পণ্য-শালার আদান-প্রদান-নীতি নয়—সাহিত্যের প্রতি মমতা আছে বলিয়া এই অভাজন সাহিত্যিককে তাঁহারা হেলায় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া আমি আনন্দ পাই। আপনিও যে এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন—ইহা সেই মমতারই নিদর্শন; অতএব আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমি লেখা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছি—তাহা বোধ হয় আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কবিতা আর বড় একটা লিখি না। তথাপি আপনার মত বন্ধুর এই অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু পূজার সংখ্যার পক্ষে সময়মত হইয়া উঠিবে কিনা বলিতে পারি না।

আশা করি আপনার সাহিত্যসেবা ও বিষয়কর্ম সমান-উৎসাহে চলিতেছে আমি গত হইয়াছি। দেহ ও মন কোনটাই ভালো নাই। এখন আপনাদের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২. যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৩১]

আমার ঠিকানা—

38 Nilkhet Road

Ramna P.O., Dacca

৩ ফাল্গুন, ১৩৩৮

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার স্নেহসিঞ্চিত পত্রখানি যথাসময়েই পাইয়াছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার উত্তর দিতে না পারায় অতিশয় লজ্জিত আছি। দেরী হওয়ার কারণ আর যাহাই থাক, প্রাণে সাড়া পাই নাই ইহা সত্য নহে জানিবেন। আপনার পত্রে আমার প্রতি যে প্রীতি ও স্নেহের আন্তরিক আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমি পুলকিত হইয়াছি। আমার লেখাগুলি যে আপনার ভালো লাগিয়াছে তাহাতে আপনার সাহিত্যানুরাগের ও সত্যনিষ্ঠার যে প্রমাণ পাই তাহাও অপ্রত্যাশিত নহে, কেননা, আদর্শ সম্বন্ধে মূলে আপনার সঙ্গে আমার মনের অমিল নাই তাহা জানি। অমিল যাহা কিছু, তাহা ব্যক্তিকে লইয়া, সাহিত্যের আদর্শ লইয়া নহে।

আপনি লিখিয়াছেন আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য আপনি উৎসুক—মনের ভিতরে অনেক কথা জমিয়া আছে; আমিও আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করিবার প্রয়োজন অনুভব করি; কিন্তু উপায় কি? এবারে মাত্র ৫।৭ দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম, কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। অথচ কত কথাই বলিবার আছে! পত্রে যতটুকু সম্ভব আলাপ-আলোচনা করিতে আমিও উৎসুক। আপনি মাঝে মাঝে আপনার অভিমত জানাইলে সুখী হইব। কলিকাতায় গেলে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিতে প্রতিবারই চেষ্টা করিব। এবার যখন যাইব, এখান হইতে আপনাকে খবর দিব।

সজনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিলে বা তাহার সংবাদ লইলে সুখী হইব। তাহার অবস্থা নানা দিকে এমনই সঙ্গীন যে সে নিজে খোঁজ-খবর লইতে পারিবে না; অথচ আপনাদের উৎসাহ ও পরামর্শ দান বাঞ্ছনীয়। 'শনিবারের চিঠি'-র মধ্যে এখনও কোনও সুস্পষ্ট অভিপ্রায় বা সুবিবেচিত নীতির পরিচয় আপনারা প্রত্যাশা করিবেন না; উহাতে মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁঝ আছে—ব্যক্তি ও ব্যাপারনির্বিশেষে নির্মম আঘাত করাই এ পর্যন্ত উহার একমাত্র কর্মনীতি হইয়া আছে। ইহা যেন desperate ব্যাধির desperate remedy—আর কোনও justification নাই। এ নীতির সমর্থন করিতে আমিও বাধ্য হইয়াছি—সর্ব প্রকার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ সত্ত্বেও। সকল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন করিয়া এই যে 'দুর্বৃত্তপনা'—ইহা যে সর্বাঙ্গীন হিতকর নয় তাহা জানি, তথাপি অমঙ্গলকেই আহ্বান করা আবশ্যক হইয়াছে, এইরূপ অমঙ্গলের প্রতিঘাতে মঙ্গলবুদ্ধি জাগিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। সে মঙ্গলসাধন হয়ত আমাদের কাজ নয়, কিন্তু যাহারা তাহা করিবে তাহারা গৌণভাবে আমাদেরই অনুপন্থী। 'শনিবারের চিঠি'-র বর্তমান এখনও সুস্থির নয়, হয়ত কখনই তাহা হইবে না। এজন্য উহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে এখনই কোনও কল্পনা করিতে সাহস হয় না। তবে, উহার সম্বন্ধে আমার একটা আশ্বাস এই যে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা ও মতামতের প্রকাশ জন্য—আমাদিগকে অবলম্বন করিয়া—দেশের একটা বৃহত্তর সমাজের উহাই একমাত্র পত্রিকা; বিশেষতঃ অতি আধুনিক সাহিত্য ও সমাজের বিরুদ্ধে যে স্পষ্ট আন্তরিক প্রতিবাদ সমাজের এক প্রদেশে কণ্ঠরুদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গুমরিয়া উঠিতেছে—'চিঠি' তাহাকে কতকটা ভাষা লাগাইতেছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। যে সাহিত্য এখন প্রবীণ ও তরুণ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্কর, culture ও dilettantism, জাতি-ধর্ম ও আত্ম-বিলাস, শুদ্ধান্তঃপুর ও রঙ্গালয়—এই সকলকে একাকার করিয়া সাহিত্যজ্ঞানহীন সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীসমাজকে ধর্মভ্রষ্ট করিতেছে ও সেইসঙ্গে রুচি ও রসবোধ বিনষ্ট করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে সকল সুশিক্ষিত সুস্থচেতা বাঙ্গালীই যে একমত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-ভাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণ্ডলীতেও তাহার প্রশ্রয় দান চলিতেছে, তাহাতে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। আপনি যে আমার লেখাগুলির প্রশংসা করিয়াছেন, সেগুলি প্রাণের দায়ে লেখা; ভারতীর পূজাবেদী ছাড়িয়া এখন আমাকে দ্বার

রক্ষায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। এই পুলিশের কাজে লাগিয়া আত্মীয় বন্ধু গুরু কাহারো সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক রাখিতে পারি না। বাঁশী ছাড়িয়া যে লাঠি ধরে তাহার উত্তেজনা কিছু অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য, যাহাদের মুখ চাহিয়া কিছু ভরসা পাইতে চাই তাহারাই যখন গড্ডালিকার দল বৃদ্ধি করিতেছে দেখি তখন একেবারে মরিয়া হইতে হয়। এজন্য 'চিঠি'র সম্পর্কে আমি আপনাদের সকলের নিকটেই কিছু প্রশ্রয় দাবী করি।

আপনার সংবর্ধনা সম্পর্কে আমি কালিদাস-ভায়াকে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সত্যভাষণে কুণ্ঠা করি নাই অথচ তাহাই আপনাদের মনঃপূত হইয়াছে, ইহাতে আশ্বস্ত হইলাম।

কলিদাস-ভায়াকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইবেন ; আপনার 'মিতা'কেও আমার অমিত শ্রদ্ধানুরাগ জানাইবেন। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা উভয়েই আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি
স্নেহমুগ্ধ
মোহিতলাল

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৩৩]

নীলক্ষেত, রমণা
ঢাকা, ১১-৪-৩৩

ভাই সাবিত্রীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি—এ কয়দিন অতিশয় ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, সেজন্য মনে কিছু করিবেন না।

'উপাসনা'র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু জানিতাম এবং তাহাতে দুঃখবোধ করিয়াছি। আজিকার দিনে সাহিত্যসেবা সাত্ত্বিকভাবে করার উপায় নাই ; দিনে দিনে যাহা হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সাহিত্য হইতে অবসর লওয়াই ধর্মরক্ষার একমাত্র উপায়। শুনিতেছি, এক বিলাতী ঔষধওয়ালার বিজ্ঞাপনভার স্কন্ধে লইয়া অতঃপর একখানি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতে কাঙালী সাহিত্যিকেরা নিয়মিত মুষ্টিভিক্ষার

আশায় অতিশয় উৎফুল্ল হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রাদ্ধ আরও অনেকদূর গড়াইবে, বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক দুর্গতি দেখিতে হইবে।

এহেন দুর্যোগের দিনেও আপনি যে পুনরায় একখানি পত্রিকা বাহির করিতে সংকল্প করিয়াছেন তাহাতে আপনার দুঃসাহসে মুগ্ধ হইয়াছি—কিন্তু কবিজনোচিত অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভাবিয়া ভয়ও পাইতেছি। কেবলমাত্র লেখনীর বলে কাগজ টিঁকিবে কি?—লেখা যতই ভালো হউক, তাহাতে ভবী ভুলিবে কি? না, পিছনে অন্য শক্তিও আছে? যদি থাকে তবেই এ কাজে অগ্রসর হইতে বলি; নতুবা হাস্যাস্পদ হইয়া লাভ কি?

আমাকে যেভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে আমি লজ্জা পাইয়াছি, ব্যথাও পাইয়াছি। আমি লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি। জীবনে আর কোনও আশা, উৎসাহ বা রসপিপাসা নাই। পূর্বকর্মের জের টানিয়া চলিতেছি মাত্র। দেহ মন প্রাণ ভগ্ন হইয়াছে—নিজের উপরে আর কোনও আস্থা নাই। একদিন আপনারা আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে যে আশা ও বিশ্বাসে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—তাহার উপযুক্ত হইতে পারিলাম কই? অর্ধপথেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছি। একমাত্র 'শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত আমাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই উৎসাহে ও নির্বন্ধাতিশয্যে আমি একটু আধটু লেখা এখনও ছাড়িতে পারি নাই। আপনারা যে এখনও আমার আশা ত্যাগ করেন নাই ইহাতে একপ্রকার সবিষাদ কৌতুক অনুভব করি। আপনি জানেন, আমি সত্যই কোন দলভুক্ত নই—যদি আমার কোন দল থাকে, সে সত্যানুরাগীর দল, সাহিত্য সম্বন্ধে নিদারুণ অনাচার বোধই এখনও আমাকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; এই মোহ (ইহাও মোহ মাত্র) কাটিলে আমি আর কিছুই লিখিব না—মুক্তিলাভ করিব। আপনাদের স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রীতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সেই কারণে আপনারা আমার আত্মীয় এবং তাহা জানিয়া, আপনি যে আমার সাহায্য চাহিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার নূতন পত্রিকায় আমি যে সাধ্যমত লিখিব তাহাতে সন্দেহ করিবেন না। কিন্তু, আপনি জানেন, আমি লিখি খুব কম, কবিতা লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি—প্রবন্ধ যাহা লিখি, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। তথাপি, প্রাণপণ চেষ্টা করিব, যদি আপনার পত্রিকায় কিছু দিতে পারি। উপস্থিত খুব ব্যস্ত আছি—প্রথম সংখ্যার জন্য কিছু হইয়া উঠিবে না। পরের সংখ্যায় যাহা পারি দিব, নূতন পত্রিকায় আপনাদের পুরাতন দলের সকলেই থাকিবেন নিশ্চয়?

আশা করি কুশলে আছেন। সেন-কবি ও বাগচি-কবিকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবেন ; আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার স্নেহমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত
[মে ১৯৩৩]

বৈশাখ ১৩৪০

ভাই সাবিত্রীবাবু,

চিঠি ও 'অভ্যুদয়' পেলাম। আপনার বাহাদুরী আছে—বড় সুশ্রী হয়েছে। লেখক ও লেখার গৌরবও কম নয়। প্রার্থনা করি, আপনার পুণ্যব্রত এবার সফল হোক।

একটা কথা বলব—ভালভাবে নেবেন। সাহিত্যব্রতটি একেবারে নিঃস্বার্থ হওয়া চাই। কঠিন অপ্রিয় উক্তি বা সমালোচনা আমি পছন্দই করি, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠা চাই, আন্তরিকতা চাই। সাহিত্যের মর্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে—কিন্তু সাহিত্যিকের নয়। তা'হলে সত্যভ্রষ্ট হবেন। দলের বিরুদ্ধে দল পাকাবার জন্য বড়র তোষামোদ এবং ছোটর লাঞ্ছনা যেন policy হয়ে না দাঁড়ায়। তা'হলে সর্বচেষ্টা পণ্ড হ'বে ; আপনার এই প্রাণান্ত আয়োজনও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যা মন্দ ও মিথ্যা তাকে দহন করবার জন্য বজ্রশক্তি প্রয়োগ করুন—কিন্তু তাতে আদর্শনিষ্ঠার নিঃস্বার্থতা যেন প্রকাশ পায়, ব্যক্তিগত বা দলগত বিদ্বেষ যেন তাতে না থাকে। মনে থাকে যেন যে আপনি একটা বড় Ideal নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

একটি কবিতা লিখছি—আশাকরি দুই চারি দিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

আপনাকে প্রীতিসম্ভাষণ ও আলিঙ্গন পাঠাই। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫. অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথকে লিখিত

[মার্চ ১৯৩৬]

নীলক্ষেত, রমণা, ঢাকা

২৮. ৩. ৩৬

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ভাবাবেগপূর্ণ পত্র পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছি। হঠাৎ আমার প্রতি এই অতিরিক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব খুব ভরসার কথা নয়। আমার ভরসা নয়,—তোমার সম্বন্ধে ভরসার কথাই বলিতেছি। তুমি যে মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছ তাহা তোমার পক্ষে অপরাধজনক নহে; আমি তোমাকে সময়ে সময়ে যে-সব কথা বলিয়াছি তাহাতে শিষ্টতার অভাব ছিল; কারণ-তোমার বয়সে সহসা নূতন ও বিপরীত সংস্কারে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া দুরূহ জানিয়াই আমি তোমাকে কোনদিন প্রশ্রয় দিই নাই। তাই বলিয়া এত শীঘ্র তুমি তোমার মত পরিবর্তন করিবে ইহাও আশা করি না। এইরূপ ঘটনাও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, কারণ আমার সহিত আলাপ-আলোচনা তুমি খুব কমই করিয়াছ। এইজন্য তোমার এই ভক্তি কাঁচা বলিয়াই মনে হইতেছে, তোমাকে আরো কিছুদিন সাহিত্যের মূলনীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীরতর চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে বলি।

তুমি আমার এইরূপ উত্তর পড়িয়া বোধ হয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইবে। তার কারণ, তুমি আমার মত লোক আজিকার সাহিত্যক্ষেত্রে কোথাও দেখ নাই, দেখিবে না। আমার একটা অহঙ্কার আছে তাহা এই, আমি যশ বা প্রতিপত্তির কাঙাল নই—আমি কাহারও ভক্তি বা প্রশংসাও কামনা করি না—তোমার মত ছাত্রের নিকটও নয়। আমার স্নেহ আছে—আমি প্রশংসাও করি (সত্যকার প্রশংসা আমার মত বোধ হয় কেহ করে না) কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে। আমি নিজে জীবনে আমার জ্ঞান-শক্তি মত সারস্বত সাধনা করিয়াছি—যে সাধনায় সরস্বতী ছাড়া কোন ব্যক্তি অথবা নিজেকেও এতটুকু নির্বিচারে সম্মান দিই নাই—অর্থাৎ, আমি সাহিত্যের রস-ব্রহ্মের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি—আর সকলকে বিস্মৃত হইবার সাধনা করিয়াছি। ব্যক্তির দিক দিয়া সরস্বতীকে দেখি নাই। সরস্বতীর দিক দিয়াই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। অবশ্য সে সরস্বতী আমারই প্রাণ ও জ্ঞানের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথকে আমি যতটুকু শ্রদ্ধা করি তার অধিক শ্রদ্ধা যে করে সে হয় মূঢ়, নয় স্তাবক ভণ্ড। আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার নিকটে বদ্ধাঞ্জলী হইয়া দাঁড়াইতে পারি; কিন্তু শেলী-ব্রাউনিং বা সেক্স্‌পীয়রকে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যে উদ্যম, ততখানি ভক্তি আমার নাই—যদি থাকিত তবে আমি ধর্মভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে যাইতাম—আমার আত্মার

মৃত্যু হইত: কারণ সাহিত্যই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা—একমাত্র ধর্ম; উহাতে কোনও মিথ্যা বা মোহ যুক্ত হইলে আমি বাঁচিতাম না। লোকে অর্থ-রসে যশোরসে অথবা স্নেহ-রসে বাঁচিয়া থাকে—তোমাদের মত সাহিত্যিক তাহাদের কেহই আমার মত কেবলমাত্র সাহিত্য-রসেই বাঁচিয়া থাকিতে রাজী নহে। একে এই কাল, তার উপর বাংলা দেশ—কর্তাভজার দেশ। একবার গৌরাঙ্গ অবতার হইয়াছিলেন, তারপর পাঁচশত বৎসর "গৌর-গৌর" করিয়া কাটাইল। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যাহা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় আবার পাঁচশত বৎসর আর কিছু হইবে না।

তুমি আমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। আমি কেহ নই জানিবে। তোমার নিজের ভিতরে যিনি আছেন তাঁহাকেই শ্রদ্ধা করিবে, এবং তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিবে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র বর্তমান বাঙালী জীবনের মতই বড় অশুচি ও অপরিচ্ছন্ন। খুব সাবধানে নিজের শুচিতা বাঁচাইয়া চলিবে। পি-আর-এস ও পি-এইচ-ডি দেখিলেই নিজের বুদ্ধিটাকে মুঠা করিয়া ধরিয়া থাকিবে, যেন পকেট কাটা না যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত বড় বিভীষিকা আর নাই।

আমার সম্বন্ধে কে কি লিখিয়াছে বা লিখিতেছে তাহা আমি প্রায় জানিতে পারিনা। তুমি যে দুইটি সংবাদ দিয়াছ তার একটাও আমি জানিনা। নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই আমাকে 'কাবু' করে না—তাই এ পর্যন্ত আমি অন্তরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছি—ধর্মনাশ হয় নাই। নতুবা দেখিতে আমি এতদিনে একটা মস্তবড় দলপতি ও দিক্‌পাল হইয়া রবি ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতাম—প্রতিভায় নয়, শিষ্য-সম্পদে, কিন্তু আমার এমনই দুর্বুদ্ধি আমি কোন propaganda করিলাম না—প্রশংসা-ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কাহারও দ্বারস্থ হইলাম না। এ যে কত বড় অপরাধ তাহা জানি; সেইজন্য আমাকে শাস্তিও কম ভোগ করিতে হইতেছে না—আমার বই ছাপিবার publisher নাই···। যাই হোক, তোমার সেই সংবাদে আমার কৌতূহল হইয়াছে—প্রশংসার ছলে কতখানি নিন্দা করিয়াছে তাহাই দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যদি পারো আমার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিও। আমার প্রশংসা কেহ করিবে—ইহা কখনও আমি বিশ্বাস ও আশা করি না; বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আমার প্রাপ্য নয় বলিয়াই জানি—পাইলে অতিশয় disappointed হই; কারণ সে প্রশংসা অপ্রশংসার চেয়ে হানিকর। ইহা আমার অন্তরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

তুমি আমাকে নব্য সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তকরূপে সংবর্ধনা করিয়াছ এরূপ কথা বলিলে বিদ্বজ্জনসমাজে—যেখানে তোমাকে স্থান লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতে হইবে—সেখানে তুমি জাতিচ্যুত হইয়া থাকিবে। ইহা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা আমার লেখা এতই পড়িয়াছে যে আমার সৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই (যথা—"ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য", "গতি-প্রকৃতি") তাহারাও সাবধানে আমাকে পাশ কাটাইয়া চলে। কিন্তু তোমার সেই সমালোচক—hero যিনি রবীন্দ্রনাথকে সেক্স্‌পীয়রের উপরে স্থান দিতে পারিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, তিনি যে দুইজনকে গুরু-নমস্কার জানাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমার তাঁর প্রতি করুণারই উদ্রেক হয়; তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম, সম্মুখে সমুদ্র থাকতে এঁদো পুকুরে স্নান করিও না। তথাপি ভয় হয়; কারণ ইহারাও ত' সমুদ্রস্নানের সুযোগ পাইয়াছে,—তবে কেন গোষ্পদে মাথা ডুবাইতে গেল? ইহাকেই বলে ললাট লিখন।......কাব্য কাহাকে বলে যে জানে না, সে রবীন্দ্র-শেলী-সেক্স্‌পীয়র-ব্রাউনিংকে এক গ্রাসে তুলিয়া মুগুচর্বণ করিবেই ত। রবীন্দ্রনাথের কবি-অভিমানের সব চেয়ে বড 'ন্যাকামী' যেটা—সেই 'জীবন-দেবতা'কে লইয়া কী গভীর গবেষণা! ইহারা ভারতীয় সাধনার ক-অক্ষরও জানেনা, ইহাও জানেনা যে, রবীন্দ্রনাথ কবি-সাধক বটেন কিন্তু যোগী-সাধক নহেন। দেশীয় সাধনা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইহারা এতই অজ্ঞ যে রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে যাহা একটা ভাববিলাস মাত্র—তাঁহার কাব্যকে যাহা কিছুমাত্র সত্যকার মূল্যে মূল্যবান করে নাই—যাহা কবির একটা নিতান্তই দোকানদারী—অতিশয় third rate ছলনা মাত্র তাহাকে লইয়া ইহারা অস্থির। যাক্—পত্রে এ সব কথার সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নয়—প্রয়োজনও নাই।

তুমি পড়াশুনা করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ঐ একটি কাজ যদি করিতে পার তবেই মানুষ হইবে। বাংলা সাহিত্যের চোরা-বাজারে যাওয়া-আসা করিও না।

আমার স্বাস্থ্য পূর্ববৎ। শরীর ভাঙ্গিয়াছে—বোধ হয় আর বেশীদিন টিকিবে না।

আশা করি কুশলে আছ। আমার শুভাশিস্ জানিবে।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬. সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত

[আগস্ট, ১৯৩৯]

Mohitlal Majumdar
Lecturer, Dacca University

38 Nilkhet Road
Ramna
Dacca 24.8.1939

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। তোমরা যে একখানি পত্রিকা বাহির করিতেছ তাহা শুনিয়া সুখী হইতে পারিলাম না ; কারণ, এখানেও ছাত্রগণের মধ্যে পত্রিকা-প্রকাশ-ব্যাধি অতিশয় প্রবল হইয়াছে—ইতিমধ্যে তিনচারখানি পত্রিকা—কেহ প্রকাশিত কেহ প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে ; তা'ছাড়া হাতে লেখা ত' আছেই। সে'দিন ময়মনসিংহ হইতেও ছাত্রগণের এক অনুরোধপত্র পাইয়াছি—তাহারা "সপ্তর্ষি" নাম দিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করিতেছে বা করিয়াছে।

লক্ষণ ভাল নয় ; অন্যান্য খেলার মত, বা নেশার মত, এও একটা খেলা বা নেশা ; এবং সম্পূর্ণ নির্দোষও নহে। কারণ, তোমাদের বয়েসের ছেলেদের পক্ষে শক্তি ও সাধনা অনুসারে সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হইলেও—যে হাওয়া এখন দেশে কিছুকাল যাবৎ বহিতেছে, তাহাতে সাহিত্যের কিছু না হউক, তোমাদের যাহা হইবে তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। সাহিত্যের ভাষাটি একেবারে নষ্ট হইবে ; তোমাদের অকালপক্কতা আরও বাড়িবে। আড্ডাটি আরও ভালরূপ জমিবে। প্রমথ চৌধুরীর মত জ্যাঠামহাশয়কে যখন পাইয়াছ, তখন 'কায়দা' ও 'চালিয়াতি' আরও ভাল রকমেই অভ্যাস হইবে। লেখা-পড়া যত অল্পই হোক, মুরুব্বিয়ানায় সিদ্ধহস্ত হইতে পারিবে।

আর কেহ হইলে আমিও তোমার পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিতাম ; কিন্তু তোমাকে তাহা পারি না, তাই সোজা কথা লিখিলাম। 'প্রগতিবাদ' মুখে স্বীকার' না করিলেও, ও ছাড়া যে আর গত্যন্তর নাই ! বয়স ও কালধর্মে, এবং সাহিত্যের নামে, তোমাদের সকলকেই একজাত হইতে হইবে ; তাই যাহাদের মধ্যে সত্যকার পদার্থ আছে এবং যাহারা সাধনা না করিয়া সিদ্ধিলাভের আশা করে না, তাহারা এই সাহিত্যব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবারই চেষ্টা করিবে ;—এমন করিয়া উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। সাহিত্য জিনিষটা আমার কাছে একটা ধর্মসাধন—একটা মহাব্রত ; হুজুগ, ফ্যাশন, খেলা বা চা-সিগারেটের মত বৈঠকী নেশা নয়।

তাই আমি ওপথে কাহাকেও আসিতে দিতে সহসা রাজী নই। অতএব, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর শ্রীমুখের সিগার-ধূপের ধূম্র দিয়াই তোমরা যাঁহার অর্চনা আরম্ভ করিয়াছ, তাঁহাকে আমি দূর হইতেই নমস্কার করিতেছি। কেবল আশাকরি, তোমাদের 'রূপরীতি' রূপার অভাবে রীতিভ্রষ্ট হইবে না—'রূপরঙ্গ', 'রূপরেখা', 'রূপবাণী'র মত জপের মন্ত্রে যুবজনকে দীক্ষিত করিবে—অন্ততঃ ঐ 'রূপ' শব্দটি বারবার জপ করিবার সুবিধা হইবে; কলিতে জপেই সিদ্ধিলাভ হয়; রূপ বস্তু না থাক্, উহার নাম জপ করিলেই তোমরা অন্তরে-বাহিরে রূপবান হইয়া উঠিবে। কিন্তু রূপার বাজার ত' বড় মন্দ, অতএব তাহার বন্দোবস্ত পাকা করিয়াছ ত?

এখন দেখিতেছ—কেমন লোকের কাছে আশীর্বাদ চাহিয়াছ! আশীর্বাদ করিতে ভয় হয় বলিয়াই তাহা এখন করিতে পারিলাম না। তোমাদের পত্রিকা বাহির হইলে এবং দুই চারি সংখ্যা দেখিয়া যদি আশ্বস্ত হইবার কারণ ঘটে, তবে আশীর্বাদ না হোক্, উৎসাহ পাইবে।

আমার শরীর বর্তমানে অতিশয় অসুস্থ, লেখা-পড়া এখন বন্ধ আছে। ইহাও একটা কারণ।

আশাকরি তোমরা সকলে কুশলে আছ। আমার আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

মেসোমহাশয়

৭. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৩৯]

Mohitlal Majumdar
Lecturer, Dacca University

38 Nilkhet Road
Ramna
Dacca 15.12.1939

সুহৃদ্বরেষু,

বহুদিন পরে আপনার পত্র পাইয়া বড় আনন্দলাভ করিলাম; মাঝে মাঝে এইরূপ পত্র পাইলে খুশী হই, কারণ তাহাতে যৌবনের সুখস্মৃতি ও বন্ধুভাগ্যের কথা মনে পড়ে। এ বয়সে, আর একালে, শুভসংবাদ বড় আর আশা করি না; রোগ-শোক ও নানাবিধ দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি কাহারও নাই। আপনার দুর্ভাগ্যের

কথা স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হই। আমারও স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হওয়ায় আমি বড় কষ্টে আছি—মস্তিষ্কের দুর্বলতা, বুকে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং পরিশেষে পাকস্থলীর বিকলতা—এই তিন ব্যাধির মিলিত আক্রমণে আমি ক্রমেই নির্জীব হইয়া পড়িতেছি অথচ সংসারের কোনও ব্যবস্থাই হইয়া উঠিল না। আটটি বালক ও শিশুর যে কি হইবে তাহা জানি না। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমার সেই ছেলেটি এখনও বাঁচিয়া আছে—রোগ সারিবার নয়, তবে একটু যেন সামলাইয়া উঠিয়াছে।

আমি কোথাও যাইতে, অর্থাৎ বাহির হইতে ভয় পাই, কোনও রকমে অতিসন্তর্পণে নিজেকে খাড়া করিয়াছি। তাই কোথাও গিয়া কাহাকেও দেখিয়া আসিতে পারি না। আপনাকে অনেক দিন দেখি নাই—দেখিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু, বোধ হয় তাহা আর হইয়া উঠিবে না। এবার ফেব্রুয়ারী মাসে একবার পাটনায় একটা সাহিত্যিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বড় ধরিয়াছে, কলিকাতা হইয়া যাইব—যদি যাইতে পারি। ঐ সময়ে আপনি একবার ঐদিকে আসিতে পারেন না?

কবিতার ফাইল পাইয়াছি। লেখকের আবেগ আছে কিন্তু কবিত্বশক্তি এখনও পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই। ভাষা ও ছন্দের উপরেও অধিকার হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সাধনা বজায় থাকিলে অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হইবে। বয়স কত জানি না, লেখাপড়াও কেমন তাহাও জানি না—আপনি তাহা জানেন। উৎসাহ দিবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ভূমিকা লিখিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। এ পর্যন্ত তাহা করি নাই, আমার পক্ষে তাহা শোভন নয় বলিয়াই করি নাই—কাব্য সাহিত্যের যে আদর্শ আমি কঠিনভাবে ধরিয়া আছি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচার করিয়াছি, তাহাতে ব্যক্তিগত স্নেহ-সহানুভূতির উপায় নাই। এজন্য আপনার অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।

আপনাকে আমার অধুনা প্রকাশিত কোন বই দিই নাই—দুইখানি গল্পগ্রন্থ ও একখানি কাব্য আপনাকে যেমন করিয়া হোক পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন। আশাকরি উপস্থিত সকলই কুশল।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪০]

Mohitlal Majumdar
Lecturer, Dacca University

38 Nilkhet Road
Ramna.
Dacca 4. 10. 1940

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র ও 'দেহালি'র ফাইল যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে; এ পর্যন্ত সেগুলি দেখিবার সময় পাই নাই—বড় ব্যস্ত ছিলাম, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি একটি অতিশয় অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছি—এতদিনে অর্থাৎ আপনার পত্র পাইয়া তাহা স্মরণ হইল। আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার কলিকাতা গিয়াছিলাম—মেদিনীপুর সাহিত্যপরিষদে বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য; কিন্তু ফিরিয়া কলিকাতায় ১ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রায় ১॥ মাস ছিলাম; অথচ আপনাকে একটা সংবাদও দিতে পারি নাই। অবশ্য, আমি অতিশয় অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম—কলিকাতাতেও সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, হাবড়া হাসপাতালের ডাক্তার, একজন আত্মীয় ও ভক্ত প্রিয়জনের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহার কোয়ার্টার্সে ছিলাম—এদিকে পরিবারবর্গ কাঁচড়াপাড়া বারাকপুর ও কলিকাতায় যাযাবরবৃত্তি করিতেছেন। তথাপি বোধ হয় আপনাকে জানাইলে আপনি একবার আসিতে পারিতেন। এখন তাহা মনে করিয়া বড় দুঃখ হইতেছে। আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হাঁপানি, মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং পাকস্থলীর পীড়া—এই তিন মারাত্মক ব্যাধিই কখনও একা কখনো মিলিয়া আমাকে অতিশয় দুর্বল করিয়াছে; কোনরূপে অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি; হঠাৎ মারা গেলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অথচ জ্যোতিষ-গণনায় আমার আয়ু নাকি অনেক! যাই হোক, আপনার পত্র পাইয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। আপনারও শরীর ভাল নয় লিখিয়াছেন, আশা করি আমার মত এত নৈরাশ্যজনক নয়।

'দেহালি'র প্রথম নমুনা পাইয়া আপনাকে যাহা লিখিয়াছিলাম এখনও তাহাই লিখিতেছি। তরুণ লেখকের স্বভাব-কবিত্ব যে আছে, অর্থাৎ ভাবালুতা ও ভাষা-ছন্দের মুখরতা যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কবিতাগুলি

অতিশয় কাঁচা, এগুলিকে ছাপিয়া ভুল করা হইয়াছে। অল্পবয়সের অসংযম ইহাতে এত বেশি যে ইহাকে সুসমৃদ্ধ কবিতা বলা যায় না—ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ পংক্তিরাশি বলা যাইতে পারে। কবি যদি সত্যকার কবিযশঃপ্রার্থী হন, তবে তাঁহাকে ধৈর্য ধরিয়া আরও কিছুকাল সাধনা করিতে হইবে। জয়দেবের অনুসরণে লেখা কবিতাটিতে রচনার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে—খুব আশাপ্রদ। আর অধিক কি লিখিব? 'দেহালি' নামটিও ভাল হয় নাই।

আশা করি, মাঝে মাঝে এইরূপ পত্র দিয়া আমাকে স্মরণ করিবেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কাব আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

চিরস্নেহবদ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৯. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) কে লিখিত
[আগষ্ট ১৯৪১]

ঢাকা
২২।৮।৪১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে আপনি অতি সংক্ষেপে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন—বাঙালী মাত্রেই (যাহার মনুষ্যোচিত শিক্ষা-দীক্ষা আছে) তাহা অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেইরূপ মানুষ-বাঙালীর সংখ্যা এত কম, যে এই গগন-বিদারী শোককোলাহলে, কোথাও প্রাণ একটু অবকাশ পাইতেছে না। আমি সেই প্রথম দিন হইতে এখনও হয় সভা নয় পত্রিকা, এই দুই-এর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়াছি। রবীন্দ্র-বিয়োগের যে বেদনা আমরা অনুভব করিতেছি, তাও অল্প লোকেই করিবে। তাই, এই যে শোকোচ্ছ্বাস ইহা রবীন্দ্রনাথের জন্য ততটা নয় যতটা তাঁহার কীর্তি ও খ্যাতির গর্ব ঘোষণার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে কে ছিলেন ও কি ছিলেন, এ জ্ঞান ভাল করিয়া না জন্মাইবার আগেই বাঙালীর সর্ববিধ অধঃপতন সুরু হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মত মন ও হৃদয়ের স্বাস্থ্য এবং মনুষ্যত্বসংস্কার যাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি নাই, তাহারা আজ এই যে রবীন্দ্রশোকে শোকার্ত হইয়াছে, সে শোক, এবং তাহা যে রবীন্দ্রনাথের জন্য, তাহাতে আমাদের মত ব্যক্তির শ্বাসরোধ হয়—বুদ্ধকে

বৌদ্ধরা যাহা করিয়া তুলিয়াছিল, ইহারা রবীন্দ্রনাথকে এখনই তাই করিয়া তুলিয়াছে; এজন্য আমার শোক অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। আপনার পত্রে যাহা পাইলাম তাহাই আসল বস্তু, আমি তাহা অন্তরে গ্রহণ করিয়াছি।

আজ এই পর্যন্ত। আমার প্রীতি ও সমবেদনা জানিবেন।

ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১০. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪১]

ঢাকা

৬।১০।৪১

স্নেহাস্পদেষু,

অনেক দিন হলো তোমার একখানি চিঠি ও শ্রীমান নিশিকান্তর কবিতা পেয়েছি। তবে জবাব দেওয়া এ পর্যন্ত আমার সাধ্যাতীত ছিল; কারণ, আজ আমি তিন সপ্তাহ যাবৎ শয্যাগত আছি। প্রায় উত্থানশক্তিরহিত, চিঠি লেখবার ক্ষমতাও ছিল না। এখনও প্রায় শয্যাগত, তবে জ্বরটা আর নেই। অসুখটা হচ্ছে filaria, আর একবার বছর ৪।৫ আগে হয়েছিল। এবার attack-টা কিছু গুরুতর। আশা করি ২।১ সপ্তাহের মধ্যে একটু সুস্থ হ'তে পারব।

তুমি এবং আর আর যাঁরা আমার সাহিত্যিক আত্মীয় তাঁরা আমার বিজয়াকৃত নমস্কার আলিঙ্গন এবং স্নেহসম্ভাষণ জেনো। আমি এখন একেবারে গাছ-পাথরের মতো হ'য়ে আছি— শরীর অতিশয় রুগ্ন ও দুর্বল।

ইতিমধ্যে আমার 'বিচিত্র কথা' ও 'বিবিধ কথা' বাজারে বেরিয়েছে। মাত্র ২০ খানি করে আমাকে উপস্থিত দিয়েছে, তার ১০ খানি কলিকাতায় এবং আর ১০ খানি এখানে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। তোমার অবশ্য দাবী খুবই জোর কিন্তু তুমি নিতান্ত ঘরের লোক ব'লে তোমাকে সব শেষে দেব। প্রকাশকদের ব'লে রেখেছি আরও ৫ খানা ক'রে আমায় দিতে হবে। সেই ৫ খানা থেকে তোমাকে দেব। কিন্তু তার একটু দেরী আছে। Get-up মন্দ হয়নি কিন্তু দাম বড় বেশি হয়েছে—২৷৹ টাকা।

তোমার চিঠিতে সেই মাদ্রাজপ্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের কথা পড়ে খুব আশ্বস্ত বোধ করলাম। আমি জানি, অনেকেই আমার লেখার সঙ্গে এতদিনে পরিচিত হয়েছেন, এবং যারা তথাকথিত সাহিত্যিক নন, নীরবে লেখাপড়ার চর্চা করেন, তাঁরাই সত্যিকার সৎসাহিত্যের পাঠক ও বিচারক। এমন লোক দেশে অনেক আছেন, যাঁদের খবর পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তাঁরা আমার লেখা পড়ে থাকেন। এই রকম চিন্তাশীল বিদ্যানুরাগী পাঠকের উপরই আমার ভরসা, আমি তাঁদের জন্যেই এই সাহিত্যিক পরিশ্রম ক'রে চলেছি। আশা আছে, একদিন আমার এই লেখার কিছু ফল ফলবে। বাংলা দেশে সাহিত্য—বিশেষ করে কাব্য আর বেঁচে নেই। যারা যত সাহিত্যের নামে দল বেঁধে কাগজে কাগজে হল্লা করছে, তারা সাহিত্য দূরের কথা, কোন গুরুতর চিন্তা বা সত্য জিজ্ঞাসার ধার ধারে না। অতিশয় অক্ষম অর্বাচীন মূর্খের দল সাহিত্যের নামে যে হাট বসিয়েছে এবং দেশের যত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র তাদের যে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাতে বাংলা দেশ থেকে সাধনা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। ঐ যে তুমি ভদ্রলোকটির কথা লিখেছ—ওঁদের মতো দু'দশজন এখনও সাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা বজায় রেখেছেন, তাইতেই পরবর্তীকালে আমার ঐ আগুনের কণাটুকু থেকে যদি দেশময় একটা আলো জ্বলে ওঠে—নইলে আর কোন ভরসা নেই। তুমি তাঁকে লিখে দিও যে, তাঁর সঙ্গে আমি অতিশয় আনন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করব।

আশা করি তুমি এখন মনে ও দেহে কিছু সুস্থ হ'য়েছ। ওখানে কতদিন থাকবে?

শ্রীমান নিশিকান্তকে আমার প্রীতি ও স্নেহ-সম্ভাষণ জানাবে। কবিতার উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব হবে না, পরে যদি তেমন mood আসে নিশ্চয়ই লিখব।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুনঃ—তোমার সেই Electric Heater-টা কোন কাজে লাগল না, এখানকার D. C. current অত voltage সহ্য করতে পারে না।

১১. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৪২]

ঢাকা
৬।২।১৯৪২

স্নেহাস্পদেষু,

হীরেন, তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি, তোমার পূর্বপত্রও পাইয়াছিলাম। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য আমি এখন সর্বপ্রকার কার্য এবং চিন্তা ত্যাগ করিয়া একরূপ উদ্ভিদ্‌-জীবন যাপন করিতেছি তাই নিয়মিত পত্র ব্যবহার করিতে পারি না। তোমার গত পত্রে তুমি আমার কাজগুলি যে ভাবে করিয়াছ লিখিয়াছিলে, তাহাতে আমি উৎসাহ বোধ করি নাই। আমার এখন এমন অবস্থা যে আমার প্রতি স্নেহ বা ভক্তি বা প্রীতির একমাত্র নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমার যাহা প্রয়োজন তাহা কতদূর কে সম্পন্ন করিতে আগ্রহবান। দেখিতেছি, এমন কেহ কলিকাতার মত বিশাল আত্মীয় বন্ধু ও সাহিত্যিক সমাজে নাই, যাহাকে আমি কোন সামান্য একটু উপকারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।...আমার কোন কাজ করিবেন না, তাহা আমি জানিয়াও স্নেহের মোহবশতঃ তাঁহাকে যে কাজের ভার দিয়াছিলাম, তাহা তিনি শেষ পর্যন্ত করিতে একরূপ স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার অবশ্য কারণ আছে, কিন্তু মূল কারণ আমাকে কেহ সত্যকার স্নেহ করে না। বই দুইখানির জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলাম তাহা তিনি করিবেন না এবং করিলেন না। আর তুমি! তোমাকে পত্র দিলে কাজ যেমনই হোক, উত্তর পর্যন্ত পাইতে বিলম্ব হয়। ...সম্পর্কে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম তাহা তুমি কর নাই। আমার বই কেমন বিক্রয় হইতেছে, বিজ্ঞাপন আর দেয় কি না; এবং আমার প্রাপ্য এখনও যাহা আছে তাহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা প্রভৃতি আমি তোমাকে করিতে বলিয়াছিলাম। ...আসিবার দিন পর্যন্ত আমাকে আবশ্যক সংখ্যা বই তিনি দেন নাই আরও যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি অতিশয় ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইয়াছিলাম, যদিও আমার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করিয়া ভদ্রলোক কতকটা অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ভাল করিয়া বাঁধাইয়া তবে সমালোচকদিগের নিকটে বই পাঠাইবেন; উপস্থিত বাঁধাই ভাল হয় নাই তাই তিনি দিবেন না এবং আমিও বই সম্বন্ধে সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছিলাম। লোকটা অসৎ নহে কিন্তু দারুণ মূর্খ এবং অতিশয় কৃপণ অর্থাৎ মলিনচিত্ত। এরূপ লোকের সহিত ব্যবহার করা আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক। তাই আমি...সম্বন্ধে সকল ভাবনা ত্যাগ

করিয়াছি। এখন একমাত্র প্রয়োজন, আমার জন্য বাকি বই আদায় করিয়া অবিলম্বে কালিদাস রায় ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দিয়া আসা। লিখিয়া দিতে পারিব না তুমি বা তোমাদের কেহ আমার হইয়া দিয়া আসিবে।

তোমার চিঠিতে আমার সংবাদের জন্য যে আকুলতা প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। গত ৪।৫ মাস যাবৎ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পরেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পরোক্ষভাবে নানাদিক দিয়া আমার মনের উপরে একটি গুরুতর আঘাত করিয়া থাকিবে। Nervous breakdown পূর্ব হইতেই হইয়াছিল, তার উপর এই ঘটনায় (রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু) মনের উপরে ধাক্কা এবং অতিশয় অসুস্থ অবস্থায় অনেক লেখা ও সভা প্রভৃতিতে যোগদান করার জন্য সেই যে একটা মস্তিষ্কের পীড়া তাহা বাড়িয়া গেল। পরে শীতের সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরোনো ব্যাধি—হাঁপানি ও কাশি আরও বাড়িয়াছে। প্রায় দুই মাস আমি Chronic Bronchitis ও Blood pressure-এর চাপে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে উঠিতে বসিতে হাঁটিতে কষ্ট বোধ হইত। কিছু মন দিয়া পড়িতেও পারিতাম না। এই রুগ্ন অবস্থায় আমি বাঁচিবার আশাও ত্যাগ করিয়াছিলাম। এখনও স্বাস্থ্য পূর্ববৎ সবল হয় নাই। তবু অনেকটা ভাল। কিন্তু হাঁপানি ও কাশিতে কষ্ট পাইতেছি। আরও দুই এক মাস না গেলে বুঝিতে পারিব না যে এ যাত্রা টিকিয়া যাইব কিনা। আমি এখন লেখার কাজ একেবারে বন্ধ রাখিয়াছি। কিছু কিছু পড়িতেছি। অনেক লিখিবার আছে, জীবনের ব্রত এখনও অর্দ্ধেকও সমাপ্ত হয় নাই, আমার সাহিত্য-চিন্তার বড় কাজ এখনও বাকি আছে। তাই এইরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আমি বড়ই মনঃকষ্টে আছি। যশ বা popularity কিম্বা কোনরূপ পুরস্কার আমি এ যুগের স্বজাতি-সমাজে কখনও আশা করি নাই, এখনও করি না, বরং তাহাতে একরূপ বিতৃষ্ণাই আছে, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও। আমি কেবল আমার ব্রত পূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে চাই। এ সমাজে সত্যকার ধর্ম, সত্য সুন্দরের সেবা করিবার লোক প্রায় নাই বলিলেই হয়। মনুষ্যত্বও নাই; সে বিষয়ে কোন মিথ্যা সুখকর ধারণা আমি কখনও পোষণ করিনা, তাই আমার মন অতিশয় মুক্ত ও নির্বিকার। আমি কোন মানুষের মুখ চাহিয়া আমার অন্তরের সত্যকে অনুজ্জ্বল হইতে দিই না। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তির কথা বারবার লিখিয়াছ তাহা যদি আমার প্রতি না হইয়া তোমাদের অন্তরের সত্য ও সুন্দরের প্রতি হয়, তবেই তাহা আমার প্রতিও সত্যকার ভক্তি হইতে পারিবে।

আমার ব্যক্তিগত আমিটাকে বড় করিও না, আমার ভিতরে যদি কোন আত্মার প্রকাশ দেখিয়া থাক, তবে তাঁহাকেই প্রণাম করিবে কারণ সেই 'আত্মা' তোমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন। স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির মূল্যও অবশ্য আছে কারণ তাহার দ্বারা মানুষের দুর্বল দেহ-জীবনকে, তাহার প্রাণধর্মকে উজ্জীবিত করিয়া সেই 'আত্মা'রই সেবায় তাহার সহায়তা করা হয়। আমার দ্বারা অর্থাৎ আমার মারফতে তোমরা যদি কিছু পাইয়া থাক, তবে অবশ্য সেজন্য আমার প্রতি তোমাদের যে আত্মীয়তা-বোধ বা মমতার আবেগ, তাহা তোমাদের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, এবং সে মনুষ্যত্ব যেন তোমাদের কখনও লোপ না পায়, আমাকে পূজা করার জন্য নয়, তোমাদেরই কল্যাণের জন্য এই আশীর্বাদ করি।

…য় আমার বই-এর কি সমালোচনা করিয়াছে আমি দেখি নাই। কোন্ সংখ্যায়, জানাইবে। আমার 'স্বপন-পসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে এবং তৃতীয় গদ্য-গ্রন্থও ছাপা হইতে হইতে কাগজের জন্য আটকাইয়া আছে। ঐ পুস্তকের নাম দিয়াছি 'সাহিত্য-বিতান'। ··আমার বই আরও ছাপাইতে চায় শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। একখানি বই দিয়া আমি জাত হারাইয়াছি—আবার!

…লোকটি অতিশয় ধড়িবাজ ও ধূর্ত।…তোমার এইসব সাহিত্যিক বন্ধু এমনই ধর্মহীন যে তোমাকে আমি এই সকল বন্ধু হইতে দূরে থাকিতে বলি।…

ভূমীন, নিরঞ্জন, চন্দ্রকান্ত, জিতেন প্রভৃতিকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ ও শুভ কামনা জানাইবে। যদি বাঁচিয়া থাকি তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে ও অনেক আলাপ আলোচনা করিয়া সুখী হইব। তুমি আমার স্নেহাশিস জানিবে।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১২. অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত

[মে ১৯৪২]

ঢাকা

১৫।৫।৪২

প্রীতিভাজনেষু,

আমি সারাজীবন আমার দেশের, আমার স্বজাতির সেবায় আমার সামান্য শক্তি (ভগবান আমাকে যেটুকু দিয়াছেন) নিয়োজিত করিয়া যদি এতদিনে কিছু

ফললাভ করিয়া থাকি, তাহাতেও আমার অধিকার নাই। আমি যশ বা অর্থ কামনা করিয়া এই 'ব্রহ্মযজ্ঞ' করি নাই; আমার লেখাগুলি যে আজ সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাহাতে আমার সৌভাগ্য নয়ঃ আমার কোন ব্যক্তিগত বা বৈষয়িক সম্পদ লাভ তাহাও হইবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার সেরূপ ইচ্ছা নয়; আমার অনেকগুলি পুস্তক (গদ্য ও পদ্য) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা আমি কিছুমাত্র আর্থিক লাভবান হই নাই। তাহাতে দুঃখ নাই;···আমি পুস্তক বিক্রয়ের টাকায় কখনও ধনবান হই নাই, হইবার আশাও রাখি না; এতদিন আমি কোথাও আমার রচনার জন্য কোন মূল্য দাবী করি নাই—নিস্পৃহ সাধকের মত সাধনা করিয়াছি। কিন্তু আজ রোগজীর্ণ শরীরে এবং জীবনে কিছু সঞ্চয় করিতে না পারার ফলে ভবিষ্যতের ভাবনা হইয়াছে; চাকরীও আর বেশীদিন করিতে পারিব না। তাই যে দেবতাকে এতদিন প্রাণের পূজাই নিবেদন করিয়াছি—কোন বর প্রার্থনা করি নাই, তাঁহার নিকটে অর্থ যাচ্ঞা করিতে হইতেছে। ভাবিয়াছিলাম, আমি কেবল দানই করিব, গ্রহণ করিব না—সে কামনা পূর্ণ হইল না। আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যে বইগুলি আমার সাধনার ফল, পূজার নির্মাল্য—কোথায় কাহার কাছে কত মূল্যে বিক্রয় করিব—সে চিন্তা অনিবার্য হইয়াছে; ইহাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

১৩. অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত
[আগষ্ট ১৯৪২]

ঢাকা
৩০।৮।৪২

কল্যাণবরেষু,

দেশের ও জাতির বড় দুর্দিন যাইতেছে। আমি আজীবন চেষ্টা করিয়া আমার সকল শক্তি নিঃশেষ করিয়া এবং সকল স্বার্থ (নিজের জীবিকা-নির্বাহের নানা উপায় ও সুযোগ পর্যন্ত) ত্যাগ করিয়া এ যাবৎ বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। আমার সাংসারিক ও বৈষয়িক অবস্থার কথা শুনিলে তুমি বিস্মিত হইবে; তার উপর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। তথাপি আমি কায়মনোবাক্যে আমার দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তা করিয়াছি—ভগবান আমাকে যেদিকে যেটুকু শক্তি দিয়াছিলেন তাহার অপব্যবহার করি নাই। সত্যকে, ন্যায়কে, আমি প্রাণপণে ধরিয়া রাখিয়া যাইলাম; বন্ধুর বন্ধুত্ব, আত্মীয়ের মমতা, সমাজের আদর,

বড়লোকের অনুগ্রহ, ভক্তের তোষামোদ—কিছুই আমাকে বিচলিত করে নাই : আমার কেহ বন্ধু নাই! আত্মীয় নাই! আমার শত্রু অনেক! আমাকে সকলে ভয় করে, কেহ স্নেহ করে না ; আমাকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ও আমার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক ; কিন্তু কেহ আমাকে তুচ্ছ করিতে পারিল না—আমার শক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমার জীবনের বিশেষতঃ সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে, কি গদ্যে কি পদ্যে, আমার স্থান কি তাহা জানি এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরাও জানিবে ; কিন্তু আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি—কাহারও মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিল না—যাহা দেয় তাহা বাধ্য হইয়া ; কিন্তু আমার তাহাতে দুঃখ নাই। আমি ভগবৎ-নির্দিষ্ট কাজ করিতে জন্মিয়াছিলাম, আমার সুখদুঃখ জয়পরাজয় আমার নয়, তাঁহার—এই বিশ্বাসে আমি সকল দুঃখ সহ্য করিয়াছি।

১৪. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৪২]

নীলক্ষেত, রমণা

ঢাকা ২৬।৯।৪২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি, তারপর আর দ্বিতীয়বার দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। গত বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আপনাকে খবর দিতে পারিলাম না, কালিদাসবাবুর বাড়ী হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

আমি আপনার ভক্ত তাহা জানেন বোধ হয়। জানাইতে আনন্দ ও কৌতুক বোধ করি আরও এই কারণে যে, আমার কবিতার ভক্ত আপনি যে নহেন তাহা জানি। এই জন্যই আপনাকে আরও শ্রদ্ধা করি। কারণ, আপনার কবি-প্রকৃতি আমার বিপরীত বলিয়া আপনি যে আমার কবিতা উপভোগ করিতে পারেন না—ইহাতে আপনার কবিচরিত্রের একটি সত্যকার পরিচয় পাই—আমি যে কেবল সুন্দরের দাস নই, সত্যেরও দাস তাহা আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিবেন।

আমি একখানি 'কবিতা-সঞ্চয়ন' প্রণয়ন করিয়াছি। তাহাতে আপনার

দুইটি কবিতা 'ঝঞ্ঝা' ও 'কচি ডাব' আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আত্মসাৎ করিয়াছি; আশা করি, এ অপরাধ মার্জনা করিবেন। বই ছাপা শেষ হইলেই আপনাকে পাঠাইব। আশা করি, এই পুস্তকেই আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমার কথা বিশ্বাস করিবেন।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

ইতি
অনুগ্রহপ্রার্থী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৫. দিলীপকুমার রায়কে লিখিত
[ডিসেম্বর ১৯৪২]

Mohitlal Majumdar
Lecturer, Dacca University.

38 Nilkhet Road
Ramna,
Dacca 14. 12. 1942

পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান দিলীপকুমার,

আপনার স্নেহের উপহার যথাসময়ে পাইয়াছি। 'নানারূপী' ও 'প্রতিদিনের তীরে' যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে। আমি কিছুদিন ধরিয়া বড় অসুস্থ আছি, তাহার উপর কয়েকখানি পুস্তকের মুদ্রণ ও সম্পাদনকার্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হওয়ায় বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আপনার বই দুইখানি এখনও পড়িবার অবসর পাই নাই।

আপনি আমাকে আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন—সেটা আপনারই মুক্তপ্রাণ ও অশেষ প্রীতি-প্রবণতার পরিচয়। কলিকাতায় আপনাকে দেখিয়া আমিও সাক্ষাৎ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি, আপনাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্যিক আদর্শ ও মতামত লইয়া ব্যক্তি-স্বরূপের প্রতি যেন যথোচিত শ্রদ্ধার অভাব না ঘটে —মানুষের মত অপেক্ষা মানুষ অনেক বড় এবং মহামূল্যবান। সাহিত্যিক মতামত ও আদর্শের বিরোধ—আপনার ও আমার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী; কারণ, আমার সাহিত্যই একমাত্র ধর্ম, উহাই আমার আধ্যাত্মিক সাধনারও অঙ্গ, বাণীই আমার একমাত্র সাধন-বিগ্রহ; সত্য ও সুন্দরের পূর্ণতম ও নিখুঁত প্রকাশ আমি তাহার মধ্য

দিয়াই চাই। এজন্য ভাব-কল্পনার মূল্য ও প্রকাশযোগ্যতাও যেমন তেমনই তাহার বাণীরূপের অনবদ্যতাও আমার একান্তভাবে কাম্য। এবিষয়ে কোনরূপ শৈথিল্য, স্বৈরবৃত্তি বা লাম্পট্য আমার পক্ষে অসহ্য। আরও কথা এই যে, আমি বাণী-পূজায় একমন্ত্রেরই উপাসক—দুই বা ততোধিক মন্ত্র জানি না। এ সকল কারণে আমি আপনাদের অনেকেরই সমাজে 'একঘরে' হইয়া আছি। আপনার সাধনমন্ত্রও যে স্বতন্ত্র তাহা বুঝি, আপনি সর্বতত্ত্ব, সর্বমন্ত্র, সর্ববিদ্যা ও সর্বরস এক অধ্যাত্মসাধনার সমান অঙ্গরূপে চর্চা করিয়া চরম ও পরম আত্মোপলব্ধি করিতে চান—আপনার আদর্শ বুঝি, সে বিষয়ে আমাকে কিছু বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি নিজে সাহিত্য ছাড়া আর কোন পন্থাকে আমার 'স্বধর্ম' মনে করি না, সর্বপন্থা-সমন্বয়ে আমি:বিশ্বাস করি না। আমি পৃথক পন্থায় বাক্-সাধনাকে মানি বটে, কিন্তু একই কালে সর্বপন্থা বা বাত্ময়তাকে শ্রদ্ধা করি না। আপনাকে এত কথা লিখিবার বোধ হয় প্রয়োজন ছিল না—কিন্তু আমার সাহিত্যিক অসামাজিকতা আপনার মত দরদী ব্যক্তিরও দুঃখের কারণ যে কেন হয় তাহা জানিলেও আমি যে নিরুপায় তাহাই আপনাকে জানাইলাম। কিন্তু একটা কথা আপনাকে এই সঙ্গে জানাই—আপনার সাহিত্যিক আদর্শ আমার মনোমত না হইলেও আপনার নিজের শিল্পকর্ম যেমনই হোক—আপনি নিজে বিধাতার হাতের যে একটি শিল্পকর্ম, তাহা আমার আদর্শের সম্পূর্ণ অনুমত, সেই শিল্প-কর্মের রচনাস্বাদ আমি করিয়াছি।

যাক, এখন একটা কাজের কথা বলি। আমি একখানি ক্ষুদ্র পাঠ্য কবিতাপুস্তক সংকলন করিয়াছি তাহাতে আপনার স্বর্গত পিতৃদেবের তিনটি কবিতা আপনার অনুমতি না লইয়াই আত্মসাৎ করিয়াছি, আশা করি আপনি আমার এই অভদ্রতা মার্জনা করিবেন। বইখানি শীঘ্রই বাহির হইবে, হইলেই আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। আপনি তাহার আদ্যোপান্ত ছাত্রের মত পড়িয়া আমাকে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিখিয়া পাঠাইলে বড়ই আনন্দলাভ করিব। আমার আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহার এক কপি আপনার শ্রীকরকমলে উপহারস্বরূপ পৌঁছিবে। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

আপনাদের আশ্রমের অপর কবি শ্রীমান নিশিকান্তকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন। আমার প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে খুশী হওয়াটা শোভন না হইলেও আমি তাঁহার কবিশক্তি ও রসবোধের—উভয়ের জন্যই তাঁহাকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, কখন যে হঠাৎ বিদায় লইব তাহার স্থিরতা নাই ; যদি তাহাই ঘটে তবে আপনাদের স্মরণে কিছুদিনও যেন থাকি এই কামনা করি। তখন নিশ্চয়ই আমার সকল দোষ আপনারা মার্জনা করিবেন।

আমার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৬. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[জানুয়ারি ১৯৪৩]

ঢাকা

১৯।১।৪৩

কল্যাণীয়েষু,

বহুদিন তোমার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি কুশলে আছ। আমাকে মাঝে মাঝে তোমার কুশল সংবাদ দিলে সুখী হইব।

এই দারুণ দুঃসময়ে, বিশেষতঃ রাজধানীর বর্তমান অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া অথবা সাহিত্যচর্চা অবশ্যই চলিবে না ; তবু তোমাদের বয়সে অনেক ধৈর্য, আশা ও সাহস রাখিতে হইবে। সাংসারিক নানা সঙ্কট এই বয়সেই আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবককে উদ্‌ভ্রান্ত করে—কোনরূপ ব্যক্তিগত সাধনা প্রায়ই দুরূহ হয়। তথাপি প্রাক্তন-পুণ্যফলে বিশ্বাস করি—আশীর্বাদ ও কামনা করি, তোমার জীবন সুন্দর ও সার্থক হউক।

তুমি আমাকে তোমার সংবাদ সবিশেষ জানাইবে। কলিকাতার খবর দিবে।

'সাহিত্য-বিতান' মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছ কি ? 'কাব্যমঞ্জুষা' তোমাকে একখানি পাঠাইব।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

আমি নানা ভাবনায় এবং শরীর লইয়া উদ্বিগ্ন আছি। 'শনিবারের চিঠি'তে আমার লেখা দেখিতেছ ?

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৭. রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[আগষ্ট ১৯৪৩]

ঢাকা

৯।৮।৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার একখানি পত্র বহুদিন হইল হস্তগত হইয়াছে। নানা কারণে, প্রধানতঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকল পত্রের যথাসময় উত্তর দিতে পারি না; এজন্য এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমি কোন পত্রিকারই লেখক শ্রেণীভুক্ত হইবার মত গৌরব বা সামর্থ দাবি করি না। 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিতে একরকম বাধ্য, কারণ উহাকে আমিই একরূপ জন্মদান করিয়াছি—আর কোন পত্রিকায় যদি লিখিবার প্রবৃত্তি থাকিত তবে এতদিনে বোধ হয় সকল পত্রিকারই 'লেখকশ্রেণীভুক্ত' হইতাম। 'বঙ্গশ্রী' যে এখনও চলিতেছে তাহা আমার জানা ছিল না—ঐ পত্রিকার প্রচার বোধ হয় খুবই সীমাবদ্ধ—কেবল সত্ত্বাধিকারীর ইচ্ছায় ও অর্থবলে উহা চলিতেছে। যে পত্রিকার প্রচার নাই, তাহাতে লিখিয়া ফল কি? কয়জন পড়িবে?

তথাপি আপনি যে 'বঙ্গশ্রী'তে যোগ দিয়াছেন এ সংবাদে সুখী হইলাম। 'কবিপূজা' আপনার ভাল লাগিয়াছে, 'মানুষপূজা' ভাল লাগে নাই—তার কারণ আপনার আদর্শ কিছু ভিন্ন রকমের। যাই হোক আমার লেখা 'বঙ্গশ্রী'তে যদি প্রকাশযোগ্য হয় তবে তাহা কোন্ ধরণের লেখা? এবং লেখার জন্য দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকিলে তাহার পরিমাণ কত? এ সকল বিষয় জানাইলে আপনাকে আমার অভিপ্রায় জানাইব।

আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮. বঙ্কুবিহারী মাইতিকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৩]

বাগনান

১৩।১১।৪৩

পরমাত্মীয়বরেষু

দাদামহাশয়,

বড় বিপন্ন হইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমি যে বড় দুঃসময়ে পড়িয়াছি তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। ভগবানের দয়ায় এ পর্যন্ত আপনাদের সাহায্যে অনেক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এখনও নানা কারণে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনার নিকটে আবদার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই বলিয়াই, আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, সেই আশায় লিখিতেছি।

ঢাকা হইতে যে ভাবে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া আপনারা আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভগবানের নির্দেশ বলিয়াই মনে করি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমি বড়ই আশ্বাস পাইয়াছি। আপনি বয়সে প্রবীণ, বহুদর্শিতাও কম নয়, সকলের উপরে আপনি ধার্মিক ও দয়াবান—এজন্য ছোট ভাইএর মত আপনার উপর নির্ভর করিতে আমার বাধিবে না। তথাপি আমি আপনাদের উপর কতখানি ভার চাপাইতেছি তাহা বুঝিতেছি না—পাছে অতিরিক্ত হয় এই ভয়ও আছে। অর্থঘটিত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু এই যে কষ্ট করিতেছেন ইহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এখন আমার কেবল এই আশা যে গণেশপুর হইতে যেটুকু সাহায্য (সাংসারিক প্রয়োজনে) পাওয়া সম্ভব, তাহা কষ্ট করিয়াও আমাকে যেন করা হয়। আমাকে শ্যামসুন্দর বলিয়াছে যে, আবশ্যক হইলেই খবর দিলে সে চলিয়া আসিবে। উপস্থিত আর কোন তেমন আবশ্যক নাই। কেবল চাল ফুরাইলেই মুস্কিল। আমি তাহাকে সবই লিখিয়াছি, বোধ হয় এতদিনে চিঠি পাইয়াছে; ছেলেমানুষ—আমাকে লইয়া এত বিব্রত হইয়াছে যে আমার তার জন্য দুঃখ হয়। সে যথাসাধ্য করিতেছে ও করিবে তাহা জানি। তথাপি আপনাকেও এ বিষয়ে লেখা কর্তব্য, তাই লিখিলাম।

আশা করি আপনারা ওখানে কুশলে আছেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিবেন। ইতি

স্নেহার্থী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৯. অধ্যাপক অক্ষয় সেনশর্মাকে লিখিত

[জানুয়ারি ১৯৪৪]

Bagnan P. O.
(Howrah)
19. 1. 44.

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি।' আমি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি, এজন্য চিঠিপত্র লেখাও নিয়মমত পারি না, য়ুনিভার্সিটির বাকি দাসত্বকাল লইয়াও বড় বিপন্ন হইয়াছি—আবার ৩ মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছি। এবার এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে রীতিমত শঙ্কিত হইয়াছি।

কলিকাতার পথে তুমি আমার সহিত দেখা করিয়া যাইলে সুখী হইতাম—বোধহয় তোমার ভুল হইয়াছে। আমি তোমার কথা স্মরণ করিয়া থাকি—তুমি যে নানা বাধা বিঘ্ন এবং দুঃখের মধ্যে পড়িয়াছ তাহা জানি। যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এবং খুব ধৈর্য অভ্যাস করিবে। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, এবং ভিতরে যদি শক্তি রক্ষা করিতে পারো, তবে জীবনের ব্রত কখনও নিষ্ফল হইবে না। সকল দুঃখ-কষ্ট বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিবার এই বয়স: কেবল স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই হইল। আমি কিছু নই—আমার আদর্শ যদি প্রাণে বুঝিয়া থাক, তবে তাহাই তোমাকে শক্তি ও সাহস দিবে। যাহা সত্য ও সুন্দর—যাহা উচ্চ ও মহৎ, তাহাকে একবার হৃদয়ে যদি সত্যই বরণ করিয়া থাক তবে জীবনে কখনও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—সেই আদর্শই গুরুর মত তোমাকে নিরন্তর সিদ্ধিলাভের পথে চালিত করিবে। সারস্বত-সাধনার মত আত্মার এমন রসায়ন আর নাই; আমি আজও বাঁচিয়া আছি উহারই অমৃত-প্রেরণার বলে। তুমিও সেই মন্ত্রে আপনাকে সঞ্জীবিত রাখিবে।

পড়াশুনা কখনও ছাড়িবে না—সাংসারিক সকল কর্তব্য ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও প্রতিদিন একটু সময় করিয়া আসনে বসিবে। যাহা পড়িবে তাহার একটু নোট রাখিবে। সংসার সংগ্রামেও ভয় পাইবে না। ইহাকেই বলে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করা। কলিকাতায় থাকিবার যদি সুযোগ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে—হওয়া অসম্ভব নয়, আশা রাখিবে।

ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এখন আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই—যদি হয় তোমার কথা বলিব।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

আশীর্বাদক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২০. হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪]

বাগনান

১২।২।৪৪

শ্রীমান হীরেন,

তোমার চিঠি পেলাম। এবার তোমার আরও আগে আসিবার কথা ছিল—তোমার কি যে কাজ তাহা বুঝি না। যাই হোক, তুমি মঙ্গলবারে আসিবে শুনিয়া সুখী হইলাম।

আমি এখনও সুস্থ হই নাই। মাঝে মাঝে বেশ অসুস্থ হইয়া পড়ি। বোধ হয় সাহিত্যিক পরিশ্রম কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে। কেবল তোমাদের সঙ্গে একটু সাহিত্যিক আলাপ ছাড়া আর কিছু এখন করা উচিত হইবে না। তাই তুমি কষ্ট করিয়া মাঝে মাঝে আসিলে আমার তবু একটু মানসিক recreation হয়।

তুমি এবার আমার জন্য যাহা পারো বই লইয়া আসিবে। শরৎচন্দ্রের সব চাই। Maugham-এর বই আনিও:। শ্রীকান্ত ১ম পর্ব মঞ্জুর মা চান।

আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম চেক ভাঙ্গাইতে, প্রাণের দায়ে। তোমাদের খোঁজ লইবার সময় পাই নাই।

আমার একখানি ক্ষুর Electric Machine-এ শান করাইতে হইবে। তুমি ঠিক করিয়া আসিও—কোথায় দেওয়া যাইবে, এবং কত charge করিবে। এক দিনে দিতে পারিলে ভাল হয়। মঞ্জুকে দিয়া পাঠাইব।

আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে আর কত দিন চলিবে? সর্ববিষয়ে অতিশয় unsettled অবস্থায় আছি। নানা দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইতেছি। মন ভাল করিবার উপায় নাই। তোমরা যতটুকু যাহা পারো করিবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২১. অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৪]

পোঃ বাগনান
হাওড়া
২৭. ৩. ৪৪

কল্যাণীয় শ্রীমান্ পৃথ্বীশ,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তুমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করে থাক এবং তোমার চিন্তাও খুব চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তুমি যে বাংলা সাহিত্য এমন ভাবে চর্চা করছ তাতে আশা করছি, তুমি নিজেও এদিকে কিছু করবে। তোমার চিঠিখানি খুব ভাল লাগল, দুঃখের বিষয় সেটা হারিয়ে গেছে।

আমি অতিশয় পীড়িত হয়ে ৫।৬ মাস ছুটিতে আছি এবং উপরের ঠিকানায় আছি। আমার Retire করবার সময়ও এসেছে—আগামী জুনমাস থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিচ্ছি, তার পূর্বে মহাবিদায়ও ঘটতে পারে। খুব বেশি অসুস্থ—চিকিৎসায় এ পর্যন্ত কোন বিশেষ ফল হয়নি। Blood pressure, Nervous breakdown ও হাঁপানি, এই সব আমাকে একেবারে মুমূর্ষু করে ফেলেছে। এই অবস্থাতেও আমাকে ঢাকায় যেতে হচ্ছে, একবার join ক'রে (৭।৮ দিনের জন্য) আবার চলে আসব ; পরে আর যেতে হবে না। আমি কালই রওনা হচ্ছি। বড় ব্যস্ত আছি। ঢাকা থেকে বোধ হয় ১৩।৪।৪৪ নাগাদ ফিরব। তারপর এইখানেই আরও ২।৩ মাস থাকতে হবে—যতদিন না একটা স্থায়ী আশ্রয় কোথাও পাই।

আমি সাহিত্য-চর্চা প্রায় বন্ধ করেছি। কারণ এ অবস্থায় তার উপায় নেই। যদি বেঁচে থাকি তবে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ধরব, এই সঙ্কল্প করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র এখনও আরম্ভ করিনি, এখন যা লিখছি তার বিষয় ভিন্ন, 'বাংলার নবযুগ'। 'মধুসূদন শেষ' করেছি তা বোধ হয় জানো। এর পর বঙ্কিম, তারও পর রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শরীরের যে অবস্থা—কখন কি হয় বলা যায় না।

তোমার কুশল কামনা করি—আশীর্বাদ করি তুমি জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছ তাতে কীর্তি ও যশ লাভ কর—সাহিত্যের সাধনাও যেন অব্যাহত থাকে।

তোমার মামার সংবাদ পেয়ে সুখী হলাম। এ বয়সে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকার সম্ভাবনা নেই, তবু তিনি আরও কিছু কাল বেঁচে থেকে সমাজের ও

সংসারের হিত সাধন করুন, এই কামনা করি। তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২২. অধ্যাপক অক্ষয় সেনশর্মাকে লিখিত
[আগস্ট ১৯৪৪]

Bagnan
(Howrah)
20 8.44

কল্যাণবরেষু,

তোমার পূর্বপত্র ও পরে মনি অর্ডার পাইয়াছি।

আমি প্রায় ১॥ মাস যাবৎ বড বিপদের ভিতর দিয়া চলিতেছি—আমার সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে দুইটি এক সঙ্গে typhoid জ্বরে আক্রান্ত হইয়া এখনও শয্যাগত আছে—প্রায় ৫ সপ্তাহে জ্বর ছাড়িয়াছে, এখনও পথ্য পাইবার মত অবস্থা হয় নাই; তার উপর কাল হইতেই একটির Dysentry হইয়াছে। একে জীবনের একটা বড় অবস্থান্তর, নিজের দারুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ—প্রভৃতির ধাক্কায় যেন বসিয়া পড়িয়াছি, তার উপর এইসব বিপদে আরও মুহ্যমান হইয়াছি; এ দারুণ দুঃসময় কতদিনে অন্ত হইবে অথবা হইবে না—তাহা জানি না। শরীর এত অপটু যে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটিতে একটা কাজ অনায়াসে পাইতাম—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ইচ্ছা আমি সেখানে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করি—তথাপি তাহা গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। তার উপর কলিকাতার নিকটে না থাকায় প্রায় নির্বাসন ভোগ করিতেছি। একটা ভাল বাসস্থান এখনও স্থির করিতে পারি নাই। শ্রীমান মথুর কলিকাতায় আসিয়াছিল—চাকরীর সন্ধানে। আমার এই অবস্থা হওয়ায়, সে আজ প্রায় ১॥ মাস আমারই এখানে বদ্ধ হইয়া আছে—ছেলেদের nursing সেই করিতেছে। সেও শীঘ্র চাকরীর আশায় কানপুর যাইবে।

তুমি একটি চাকরি পাইয়াছ এবং প্রথম বেতন পাইয়া আমাকে প্রণামী স্বরূপ টাকা পাঠাইয়াছ। ইহাতে আমি খুবই আনন্দলাভ করিলাম। আমার নিজের ছেলেরা মানুষ হইল না—হইবে বলিয়াও মনে হয় না; তোমরাই আমার পুত্র-স্থানীয়; আমার দেহজ সন্তান আমার কোন কাজে লাগিবে না—যাহারা

Spiritual সন্ততি—ছাত্র এবং শিষ্য ও ভক্তগণ—তাহারাই আমার ভাবজীবনের ধারা রক্ষা করিবে, এই আশা করি। আমার জীবনের কোন সাংসারিক মূল্য নাই—ইহা আমি ভালরূপ বুঝিয়াছি। সামাজিক বা সাংসারিক সম্পর্কে আমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাই, কারণ আমি সে সাধনা করি নাই। এবারকার জীবনটা 'হরির লুট' করিয়া দিলাম। কিছু বীজ মাত্র ছড়াইয়াছি—হয়ত উপস্থিত কিছুকাল তাহা মৃত্তিকাতলে নির্জীব হইয়া থাকিবে ; পরে, আমার মৃত্যুর অনেক পরে, তাহার কিছু অঙ্কুরিত হইতে পারে, তখনও সেই বীজের সংবাদ কেহ রাখিবে না। তাহাতে দুঃখ করা উচিত নয় ; কারণ মানুষের জীবনের যে কণাটুকু সত্য, তাহার স্বত্বাধিকারী ভগবান—মানুষ নয় ; যাহা ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা তাহা মানুষের নিজের। যদি সেই সত্যের এক কণাও আমার জীবনের সাধনায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতেই আমি ধন্য কারণ, সেই "পূর্ণের পদপরশ" তাহাতে পড়িয়াছে ; আমার নিজের নামাঙ্কিত হইবার কি প্রয়োজন আছে ? আমার নিজের লাভালাভ চিন্তা আমি কখনও করি নাই—এমন কি নামটা অনেক সময়ে গোপন করিয়াছি। আজ সেই নামের জন্য—অর্থ বা যশের জন্য ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন ? কেবল, আমার সাধনমন্ত্রকে বুঝিতে ও ধরিতে পারিয়া যদি একটি গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে, তবে আমার ব্রত কিছুকাল আরও টিকিয়া থাকিবে। সেই কাজ তোমাদেরই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন অধ্যাপনা করিয়া যদি একটি ছাত্র না গড়িয়া থাকি, তবে সেই জীবনও ব্যর্থ হইয়াছে।

তুমি চাকরী লইয়াছ বলিয়া যে লজ্জা ও ভয় পাইতেছ—তাহা আমার মতে ঠিক নয়। যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে একহাতে সংসারযুদ্ধ ও অপর হাতে ইষ্টদেবতার অর্চনা যে না করিতে পারিবে সে কিছুই পারিবে না—সে নিতান্তই শক্তিহীন। ইহাকেই বলে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করা। জীবনের মন্ত্র কিছুতেই ভুলিবে না এবং শত সংসারকর্মের মধ্যেও ইষ্ট সাধনার সময় করিয়া লইবে ; চিত্তকে অতিশয় দৃঢ় রাখিবে, বাঁ হাতের কাজ বাঁ হাতে করিবে ; ডান হাতের কাজও ছাড়িবে না। তুমি যে চাকরী করিতেছ তাহা অস্থায়ী এইজন্যই তোমার আশঙ্কার কারণ খুব কম—কোনো ভয় নাই। এখন যদি পার কিছু অর্থ সঞ্চয় কর—পরে কাজে লাগিবে ; ব্রহ্মসাধনা করিতে হইলে বস্তুসাধনা অতিশয় প্রয়োজন, ইহাই কালধর্ম ; সে ধর্ম যে লঙ্ঘন করিবে, তাহার দ্বারা কিছুই হইবে না। তবে, মনকে যতদূর সম্ভব অনাসক্ত রাখিবে—কেবল নিজের ইষ্টমন্ত্র স্মরণ ও জপ করিবে। যেন সংসার তোমাকে একেবারে গ্রাস না করে। যদি ভাগ্যবান ও পুণ্যবান হও,

তবে তোমার ব্রত তুমি যথাসময়ে আরম্ভ ও উদ্‌যাপন করিতে পারিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র করিবে না। আপনাকে প্রশ্ন করিয়া দেখ—তুমি জীবনে সত্যই ব্রহ্মের পথ গ্রহণ করিতে চাও কিনা। বস্তুর সহিত ব্রহ্মের বিরোধ নাই—কিন্তু সেই নিষ্ঠার শক্তি চাই যাহা দ্বারা বস্তুর উপরে ব্রহ্মকে সর্বদা জয়ী রাখা যায়। আমিও আমার জীবনে, একবার আমার ইষ্টসাধনা ত্যাগ করিয়া—এমন কি প্রত্যাবর্তনের আশাও বিসর্জন দিয়া, Settlement এর চাকরী লইয়াছিলাম—সে চাকরী তোমার চাকরীর চেয়েও ভয়ানক। তাহাতে আমার যে উপকার হইয়াছে, তাহা আমার জীবনদেবতাই জানেন এবং আমি জানি। সেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম—তাহাতেই জীবনকে আমি গভীর করিয়া দেখিয়াছি—মনুষ্যসমাজ ও প্রকৃতি এই দুয়ের সহিত কঠিন সংঘর্ষে আমার দেহচৈতন্য যে ভাবে যে মাত্রায় জাগিয়াছিল—তাহার ফল আমার আজীবন সাহিত্যচিন্তায় আমি পাইয়াছি। অতএব এই যে চাকরী করিতেছ তাহাতে হতাশ না হইয়া বরং উৎসাহিত হও—এই চাকরী-জীবনেও এমন অনেক কিছু শিক্ষা করিবে, যাহা তোমার ব্রহ্মসাধনার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজন।

Radio সংক্রান্ত যে চাকরীর সন্ধান লইতে বলিয়াছ তাহা তোমার পক্ষে পাওয়া অসম্ভব; তা ছাড়া সে চাকরীর চেয়ে উপস্থিত ঐ চাকরীও নানাকারণে বাঞ্ছনীয়। তুমি কিছুমাত্র অস্থির হইও না। ঐ চাকরীই কর—বেশি দিন নয়; তারপর, সুযোগ মত তোমার নিজের পথ সন্ধান করিলেই চলিবে এবং সত্যকার পিপাসা থাকিলে, তেমন একটা সুবিধা লাভ করিবে। এখন, আমার মতে, ঐ চাকরীই ভাল—বাংলার পল্লীসমাজ ও পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়া লও।

আজ এই পর্যন্ত। তোমার সংবাদ আমাকে নিয়মিত জানাইলে আমি খুব সুখী হইব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আশা করি ভাল আছ।

ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—তোমার প্রবন্ধটি ছাপা হইলেই আমাকে পাঠাইবে। বাকি প্রবন্ধের একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া পাঠাইবে।

শাণ্টুর ভাল নাম :—মণিলাল মজুমদার।

২৩. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৪৪]

Bagnan P. O.
(Howrah)
12 9. 44

পূজনীয় কবিবর,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার পত্র পড়িয়া আবার একটি দুঃখ পাইলাম।

আমি বর্তমানে সর্বপ্রকারে বিপন্ন এবং অসুস্থ আছি। আপনার পত্রখানি শ্রীমান্ সজনীকান্তকে দিয়াছি এবং এ বিষয়ে যতটুকু সাধ্য তাহা করাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিশেষ কিছু হইবে এমন আশা করি না, তবে আমাদের একটা বড় কর্তব্য বটে। যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধুর নিকটেও এতটুকু উপকার প্রত্যাশা করা ভুল। আমি নিজে তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি
স্নেহার্থী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৪. মাণিকচন্দ্র দাশকে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৪৪]

Bagnan P. o.
(Howrah)
21. 10. 44.

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার দীর্ঘ পত্র পেয়ে সুখী হলাম। আগে আমার কথাই বলি। আমি বাড়ী কিনিবার সঙ্কল্প এখন ত্যাগ্ করেছি, তার কারণ, এই সময়ে একটা ছোট বাড়ী কিনবার মতও আমার সঙ্গতি নেই। আমি আদৌ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি যে নই তা তোমাদের বুঝা উচিত। আমি জীবনে বিষয়চিন্তা করিনি; বরং যে চিন্তা করেছি তাতে মানুষ ধনী হয় না—দরিদ্রই হয়। আমি একখানা বাসোপযোগী বাড়ী ঐ অঞ্চলে—একটু ফাঁকা জায়গায় পেলে কিছুদিন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজ

করতে পারি। আমার স্বাস্থ্যও খুব খারাপ হয়েছে। এজন্তে একটু খোলা হাওয়া এবং শান্তিপূর্ণ স্থান আমার বড় দরকার। আমি এখন কাজকর্মহীন (জীবিকার কাজ) হয়ে আছি—সেটাও আমার পক্ষে অচল; এই জন্য কলকাতার কাছে থাকতে চাই—যত কাছে হয় তত ভাল। সবাইকেই জানাচ্ছি, তোমাদেরও সেই রকম জানিয়েছি। আমার নিজের ঘোরাঘুরি করবার ক্ষমতা নেই; তাই আত্মীয় বন্ধুর সাহায্য চাই; আমার কোন বিশেষ আত্মীয় নেই, বাংলাদেশের সকলেই আমার আত্মীয়—বিশেষ করে যাদের জন্যে আমি সারাজীবন ভেবেছি এবং এখনও ভাবছি।

তোমার সাহিত্যিক প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া চিঠিতে সম্ভব নয়; প্রশ্নটা খুব বড় প্রশ্ন, একেবারে গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার ঠিক যুক্তিতর্কের—অর্থাৎ খুব Logical argument-এর ধরণে লেখা নয়। কবির দৃষ্টি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাই লিখে গেছেন। সেগুলো আসলে খুব ঠিক, কিন্তু তাঁর যুক্তিপ্রণালী বা মীমাংসার পদ্ধতি খুব পরিষ্কার নয়। সাহিত্যের বস্তু ও বিজ্ঞানের বস্তু এক নয়—দর্শনের যা প্রতিপাদ্য তাও সাহিত্যের বস্তু নয়। একথা খুব ঠিক। সাহিত্যের সত্য—একটা সত্য বটে, কিন্তু তাকে আমরা শুধু বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে অনুভব করিনে। সমগ্র সত্তা দিয়ে করি। তাকে কোন স্পষ্ট অর্থযুক্ত বাক্যে বিধিবদ্ধ করা যায় না। সে সৃষ্টির সত্য—জীবনের সত্য—সে সত্য জীবন বা জগতের কোন একটা বিশেষ সত্য নয়। যেমন, সমাজের, ধর্মের, রাষ্ট্রের অথবা Astronomy, Ethics বা Mathematics-র সত্য। একটা সত্যকার বড় কাব্য পাঠ করলে, আমরা যদি তেমন ভাবগ্রাহী রসিক পাঠক হই—তাহলে আমাদের যে গভীর ভাবানুভূতি হয়, তাতে ওসব খণ্ড খণ্ড সত্যের উপলব্ধি নয়—একটা অখণ্ড রসচেতনার উদ্রেক হয়—এমন একটা উপলব্ধি হয় যাতে জীবনকে আরও বড়, আরো গভীর করে পাই। খুব বড় সাহিত্য যেমন 'সত্য'-হীন বা 'নীতি'-হীন নয়, তেমনই তার সার্থকতা ঐরূপ সত্য বা নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতএব সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তা কোন বিশেষ Idea বা চিন্তা বা বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়—সেই রকম Knowledge সাহিত্যের অভিপ্রায় নয়। এইজন্য ব্যাপক অর্থে সাহিত্যকে একজন ইংরেজ মনীষী দুই ভাগে ভাগ করেছেন—'Literature of Knowledge' ও 'Literature of Power", ঐ শেষেরটিই খাঁটি সত্য। যাক্ এ আলোচনা ঠিক এরকম করে করলে তোমার সুবিধে হবে না—কত প্রশ্ন তোমার মনে উঠবে, তার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাবে না। তাই এইটুকুই

লিখলাম—ওর থেকে তুমি নিজেই আবার ভেবে নেবার চেষ্টা কোরো। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত আলোচনা চাও, তাহলে আমার 'সাহিত্য-কথা' বইখানা ভালো করে পোড়ো। Indian Publishing House ওটা প্রকাশিত করেছে।

সজনীর সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা পড়ে খুব দুঃখিত হলাম। সজনী আমার ছোট ভাই-এর মত, তাছাড়া একরকম সাহিত্যিক শিষ্যও বটে। তার সম্বন্ধে ঠিক এই অভিযোগ আমি আরও শুনেছি। কিন্তু তোমরা তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছ। সে ঠিক প্রচারক, উপদেষ্টা বা গুরু নয়। যারা সাহিত্যচর্চা করে অর্থাৎ লেখক হতে চায় তাদের অনেকে তার ওখানে ভিড় করে; তাদের লেখা প্রকাশ করা, ভূমিকা লিখে দেওয়া, এইসব নিয়ে তাকে খুবই ব্যস্ত করে। 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালনা ও সম্পাদনা এবং নানা সাহিত্যিক-অনুষ্ঠান উৎসবে নেতৃত্ব করাও তার একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্পর্কের যে সামাজিকতা তাই তার প্রকৃতি ও প্রতিভার অনুকূল; দেশের যুবকসমাজকে কোন একটা ধর্ম বা সত্যের পথ নির্দেশ করা, তার সাধ্যাতীত না হলেও, সে সুযোগ বা সুবিধা তার নেই। তাছাড়া তার মত ব্যস্ত মানুষ খুব কম আছে। একদিকে সামাজিকতার অসংখ্য রকমের দাবী, তার উপর সে একজন সংসারী ও বিষয়ী লোক—প্রকাণ্ড সংসার, একসঙ্গে দুই তিনটি ব্যবসায় এবং তার উপর নানা সাহিত্যিক পরিশ্রম। এইজন্য, সে আর ঐ রকম পত্র ব্যবহার করবার সময় পায় না। অবশ্য প্রাপ্তিস্বীকার করা খুবই উচিত—কিন্তু বোধ হয় আগে আগে তা করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে। আমি তার আচরণ সমর্থন করছি নে, তবু এই কথা বলছি যে, তুমি তার জন্যে যে দুঃখ প্রকাশ করেছ সেটা তোমার একটা ভুল ধারণার জন্য। তুমি বা তোমরা যা চাও—তোমাদের প্রতি যে কর্তব্য আছে, তা খুবই যথার্থ। কিন্তু সকলের কাছে সব আশা করাও ভুল। যার শক্তি যেটুকু সে তাই করলেই যথেষ্ট। তোমাদেরও সেটা বুঝে নেওয়া উচিত। সজনীর কথা ছেড়ে দিই—সে যা করছে, অন্ততঃ যেটুকু করবার সুযোগ সে পাচ্ছে তাই যথেষ্ট। 'শনিবারের চিঠি' খানা যে সে দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছে এবং তাকে যখন একটা অবশ্যপাঠ্য পত্রিকা করে তুলতে পেরেছে (বর্তমানে তার গ্রাহক সংখ্যা আর সকল পত্রিকার চেয়ে বেশি) সেইটাই তার এক বড় কীর্তি। সে একজন প্রতিভাবান Journalist এবং অতিশয় সামাজিক ব্যক্তি—সেই সাহিত্যিক গুণের সঙ্গে সামাজিকতার গুণ যুক্ত হয়েছে বলেই সে বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন একটা স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু একজন Idealist এমন কি সাহিত্যিক Idealist

বলে তাকে ভুল করলে চলবে না। তা যদি সে হোত তাহলে সে ঐ কাজটি করতে পারত না। অতএব সে যদি তোমার ঐ ধরণের চিঠির উত্তর না দিয়ে থাকে তাতে তুমি অতটা দুঃখিত হোয়ো না। তুমি বা তোমরা যা চাও, তা করার মত মানুষও বর্তমান সমাজে নেই—দেশের সত্যকার হিতের জন্য—বাঙালীর চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করবার এবং সত্যপথে পরিচালিত করবার মত মানুষ—অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটাও নেই, তার কারণ সেরকম তপস্যাও কেউ করেনি এবং ততখানি দেশের প্রতি মমতাও কারও নেই। দুঃখ করে কোন লাভ নেই। আমি সারাজীবন এই দুঃখই পেলাম—একমাত্র আমিই আমার অতিসামান্য শক্তি নিয়ে এই ঘোর অন্ধকার ও ঘোরতর স্বার্থপরতা ঠেলে চলেছি—এখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি দিবারাত্র এই চিন্তাই করে থাকি—দেশের এবং জাতির ধর্মকে সত্যের দ্বারা উদ্ধার করবার চেষ্টা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যথাসাধ্য করছি—সম্পূর্ণ একক ও অসহায়ভাবে। বালক বৃদ্ধ যুবা কাউকে আমি ফেরাই নি। এই রকম চিঠি কত লিখতে হয়, কিন্তু আর পারছিনে; লেখার ভিতর দিয়ে, এই রকম পত্ররচনার ভিতর দিয়ে এবং সাক্ষাতে যে কোন আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে আমি আমার আয়ু প্রায় ক্ষয় করে ঐ কাজ করেছি। কিন্তু একার কাজ ত নয়। আমি একা এই রাশিরাশি মিথ্যা (ক্রমেই বেড়ে চলেছে) আর কত ঠেকিয়ে রাখব? দেশ গেল, এ জাত আর বাঁচে না! ধ্বংস হয়ে গেল।

তবু মনে হয় যেন একটু স্রোত ফিরেছে—আমাকে নানা বয়সের নানা বৃত্তির লোক যে সব চিঠি লেখেন তাতে একটু আশা হয় যে হয়তো আমার আজীবন সাধনা একেবারে ব্যর্থ হবে না। কিন্তু আমার কথা খুব বিস্তারিত ক'রে প্রচার করবার সামর্থ্য আমার আর নেই—আমি যে সত্যকে পেয়েছি সে সত্যকে সব দিক দিয়ে স্পষ্ট করে সকলের চোখের সামনে ধরতে হবে। আমি একাই তা পারতাম, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে, জরা এবং ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করেছে। তোমার চিঠিতে তোমরা—একালের যুবকদল—যা পেতে চাও কিন্তু পাচ্ছ না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছ, তাই পড়ে আমি এতকথা লিখলাম। বাংলা দেশের সকলের চিত্তে এমনই আকুলতার সঞ্চার হোক এবং আমরা যা দিতে পারলাম না, তোমরা তোমাদের তপস্যার জোরে যেন নিজেরা তা অর্জন করতে পার—এই আশীর্বাদ করি। কেবল বুদ্ধি যেন নির্মল ও সাত্ত্বিক শুভবুদ্ধি হয়; মানুষের মধ্যেও মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত না হও—বাহিরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকেই মহত্ত্বের লক্ষণ বলে কখনও মোহগ্রস্ত হোয়ো না। যে মুক্তি

আনবে সে সকলের অগোচরে, কেবল সত্যকে আশ্রয় ক'রে তপস্যা করছে—হাটে-বাজারে তাকে পাবে না। তোমাদের নিজেদের ভেতরে যদি সত্যকে পাবার ব্যাকুলতা জাগে, তবে বাইরেও সেই সত্যকে চিনে নিতে পারবে—কেউ ঠকাতে পারবে না; নইলে সত্যের অবতার যেমন ঠকাবে, শিষ্যও তেমনই ঠকাবে—মহাত্মা গান্ধীও ত্রাণ করতে পারবেন না—শিষ্য সতীশ দাশগুপ্তের তো কথাই নেই। দেখো, সজনীকান্ত তোমার কাছে ছোট হয়ে গেছেন—কিন্তু সতীশ দাশগুপ্ত সেই তুলনায় বড় হয়ে উঠেছেন। মানুষকে বিচার করা বড় শক্ত। মনে রেখো মনুষ্য-চরিত্রের মত এতবড় রহস্য আর নেই।

একটা কথা মনে পড়ল। তুমি বেলুড়ে যাও? যদি সেখানে একটা বাড়ীর সন্ধান করতে পারো বড ভালো হয়। ওখানকার মঠের কোন উপরওয়ালা মহারাজের কাছে আমার কথা বললে হয়তো তিনি মনোযোগ করতে পারেন।

আজ অনেকখানি সময় তোমাকেই দিলাম। এ রকম চিঠির আশা কিন্তু কোরো না—তাহলে আমার উপর শেষে বিরক্ত হতে হবে। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

মোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—

কবিত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তরও সহজ নয়। অনেকদিন আগে প্রবাসীতে 'সত্যসুন্দর দাস' নামে আমি "কাব্যকথা" লিখেছিলাম, যদি পাও পড়ে নিও। চার সংখ্যায় বেরিয়েছিল—১৩৩২ পৌষ ও ফাল্গুন; ১৩৩৩ আষাঢ় ও আশ্বিন। একখানি উৎকৃষ্ট বই-এর নাম 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'—প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। সর্বাগ্রে পড়বে।

২৫. মাণিকচন্দ্র দাশকে লিখিত
[মার্চ ১৯৪৫]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

P.O. Bagnan
Howrah
23.3.45

কল্যাণবরেষু,

বহুদিন পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইয়াছে এবং একটি কনিষ্ঠপুত্র প্রায় দু' মাস যাবৎ কঠিন রোগে শয্যাগত আছে—বাঁচিবার আশা নাই বলিলেই হয়। এই কারণে আমি আর কোন সংবাদ কোথাও দিতে বা লইতে পারি নাই। তোমার কোনো সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু হতাশ হই নাই। কারণ একালে মানুষের সমাজে কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক—কাহারও সঙ্গে সত্যকার হৃদয়ের যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ আর সম্ভব নয়। সমস্ত মনুষ্যসমাজ ও মনুষ্যজীবন নষ্ট হইয়া গেল—সম্মুখের প্রায় দুই পুরুষ জগৎ ধর্মহীন হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের কাল শেষ হইয়াছে—আমি গত যুগের একটা নিরর্থক জঞ্জালরূপে এখনও টিকিয়া আছি। কাহারও সঙ্গে আমার বনিবে না, আমাকে কেহ বুঝিবে না। এখনও আশা করি, হয়তো তোমাদের বয়সী যাহারা তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতের নূতন ধর্ম ও নূতন সমাজের বীজ কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন আছে; কিন্তু সে আশাকেও দুরাশা বলিয়া মনে হয়। তোমার মধ্যে যে সরল সাহসী ও সত্যপিপাসু যুবকহৃদয়ের আভাস পাই, তাহাতে যেমন আশা হয়, তেমনই তোমার মানসিক দুর্বলতা ও সংশয়-আকুলতা দেখিয়া শঙ্কিত হই। দীর্ঘ পত্র লিখিবার অবকাশ আমার নাই; তথাপি তোমার পত্র পাঠ করিয়া কিছু না লিখিয়া পারিলাম না। কয়েকটি কথা মনে রাখিবে যথা—

১। যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে তাহা আচরণ করিতে ভয় পাইবে না।

২। যে কাজ করিবে না জানো—তাহা 'করিব' বলিবে না, স্পষ্ট বলিবে 'পারিব না'। কখনও সহজে প্রতিশ্রুতি দিবে না—যদি দাও তবে তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এমনকি নিজের ক্ষতি করিয়াও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। তোমার নিজের নিকটে তোমার যে মূল্য—পরের নিকটেও তোমার কথার সেই মূল্য—ইহা কখনও ভুলিবে না। সত্যরক্ষাই সকল-ধর্মের মূল, এবং তাহার তুল্য ধর্ম নাই।

৩। কোনো কাজ দুরূহ বলিয়া ভয় পাইবে না—যদি তাহা কর্তব্য বলিয়া মনে কর, তবে যথাসাধ্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে; প্রাণ দিয়া চেষ্টা করিয়া যদি অকৃতকার্য হও, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। কিন্তু মনে যেন দ্বিধা না থাকে এবং আলস্য করিবে না।

৪। প্রত্যহ যেমন শারীরিক ব্যায়াম, তেমনিই মানসিক ব্যায়াম করিবে। অতিশয় প্রত্যুষে অথবা সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ নির্জনস্থানে আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ মনকে স্থির রাখিবার অভ্যাস করিবে—কোন একটা বিষয়ে মনকে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিবে; দেখিবে প্রথম প্রথম আধ মিনিটও পারিবে না।

৫। দৈনিক কাজের একটা সময় ভাগ করিয়া লইবে—ঘড়ি ধরিয়া তাহা পালন করিবে।

৬। অসৎসঙ্গ করিবে না, তাহাতে তোমার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে।

৭। প্রত্যহ কোন ভাল পুস্তক—ইংরাজী বা বাংলা—১ ঘণ্টা পড়িবে; এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্বে তোমার একটি Diaryতে কিছু কিছু লিখিবে—সেইদিন যাহা পড়িয়াছ, যাহা দেখিয়াছ বা যাহা ভাবিয়াছ।

আমি তোমাকে দেখি নাই—কখনও দেখিব কিনা তাহাও জানি না, পাছে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কর এই ভয়ে তোমাকে আমি আমার বিষয়ে কোন আদেশ বা অনুরোধ করিব না। দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে এইরূপ সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, এবং হয়তো তোমার কিছু কল্যাণ হইতে পারে এইজন্য তোমাকে মাঝে মাঝে এইরূপ উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয়।

দারুণ দুরবস্থার মধ্যেও দেশের ও জাতির জন্য চিন্তিত হই। যাহারা সৎ ও সাধু তাহাদের জয় হোক, যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখ মেটান হউক—ইহাই ভগবানের কাছে আমার চিরন্তন প্রার্থনা। তোমাদের মত যুবক যদি আমার দ্বারা এতটুকু অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত হয় তবে দেশের মঙ্গল হইবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৬. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[মে ১৯৪৫]

বাগনান

২।৫।৪৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কার্ড যথাসময়ে পেয়েছি। আমার এখন যে অবস্থা তাতে চিঠি লেখাও কষ্টকর। এই অবস্থাতেই 'Radio'র কাজে কলিকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি প্রায় মূর্ছাপন্ন অবস্থায় পড়েছিলাম। তখনই ডাক্তার ডেকে ঔষধ খেতে হয়েছিল। বহুকষ্টে সেদিনকার দায় উদ্ধার হয়েছি। আবার ৯ তারিখে আছে। না গেলেও নয়। তুমি যদি দেখা করতে চাও ৬নং Serpentine Lane-এ ঐদিন বিকালে আমার দেখা পাবে। আমার ঢাকায় যাবার খুব প্রয়োজন ছিল, যেতে পারলাম না। আমার মাথা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার উপর Gastric Trouble, পেটে ও বুকে আহারের পর একরকম যন্ত্রণা হয়। আমার Heart-ও বড় দুর্বল। তাই ঢাকায় যাওয়া বন্ধ করতে হল।

এবার সত্যই ভয় পেয়েছি। কোন আশাভরসা আর পাচ্ছি নে। শরীরের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। ভিতরে একটা বড় আঘাত লেগেছে, এ বয়সে আর এই অবস্থায় সহ্য হবে কিনা সন্দেহ। সেবারে, যে শক্তি ছিল এবারে আর তা নেই। এই সব আঘাতে নিজেদের অন্তরতম পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে পরিচয় আমার পক্ষে ভাল নয়। যা সারা জীবন ভুলে থাকতে চেয়েছি, তাকেই যেন অট্টহাস্য করে আমার চোখের উপর তুলে ধরছে, আমি যে সাধারণ সুস্থ-সংসারী মানুষ নই—কত অ-মানুষ—তাই আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে। দেহকে আমি গ্রাহ্য কারনি, তারই ফল এখন ভোগ করছি।

আশা করি ভাল আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

শুঃ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৭. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৫]

Bagnan P. O.
(Howrah)
3. 11. 45.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি আমার ৺বিজয়ার প্রণাম জানিবেন।

অনেকদিন পূর্বে আপনার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে আপনার দেশের ঠিকানা না থাকায় সে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তারপর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াও আপনাকে পত্র লিখিতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ—আমি বড় বিপন্ন অবস্থায় আছি; সাংসারিক সংকটও যেমন, শারীরিক তেমনই। তথাপি এই অবস্থাতেও যতদূর সাধ্য আমার জীবনের একমাত্র ব্রত—বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছি; যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে প্রাণপণে তাহা নিয়োগ করিতেছি।

আমার বহুদিন হইতে ইচ্ছা আছে, আপনার কাব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করি—বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। একবার আপনার কয়েকখানি কাব্য আমি পাইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার প্রায় সবগুলিই দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী থাকায় উইএ নষ্ট করিয়াছে, কেবল 'অজয়' ও 'তূণীর' মাত্র আছে। আপনি যদি বাকি কাব্যগুলি আমাকে আর এক সেট উপহার দেন—তবে বড়ই উপকৃত হইব। এবার আপনার কাব্যপরিচয় শীঘ্র লিখিয়া ফেলিব, স্থির করিয়াছি।

ইতিমধ্যে কলিকাতার বেতার-ভবন হইতে আমি ধারাবাহিক ভাবে বাংলার আধুনিক কবিগণের কবি-পরিচয় ও কবিতা-আবৃত্তি broadcast করিতেছি। আগামীকাল (রবিবার) আপনার কবিতা আবৃত্তি করিব।

আমার Publisher-কে একখণ্ড 'কাব্যমঞ্জুষা' আপনাকে পাঠাইতে লিখিয়াছি —পাইলে একটু সংবাদ দিবেন।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। ইতি—

স্নেহমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৮. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৫]

Bagnan P. O.
Howrah
17. 11. 45.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আশীর্বাদী চিঠি এবং প্রকাশকের লিখিত পত্র দুই-ই যথাসময়ে পাইয়াছি। পরে আপনার প্রেরিত 'রজনীগন্ধা' উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আপনার প্রকাশক আমাকে মাত্র তিনখানি কাব্য দিতে পারিয়াছেন—বীথি, অজয় ও উজানি ; আর সকলই out of print হইয়াছে। আমার কাজের জন্য ঐ গুলিতেই হইবে না ; আমি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের নিকটে বাকিগুলি ব্যবহারের জন্য চাহিয়া লইব স্থির করিয়াছি।

আপনার কাব্যগুলির প্রকাশ-তারিখ জানা দরকার। বাংলা পুস্তকে প্রকাশ-তারিখ থাকে না ; আপনি পুস্তকগুলির পুনর্মুদ্রণ কালে প্রত্যেকের নাম-পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশের তারিখ দিতে ভুলিবেন না। ছাপা-ভুলও অনেক থাকে।

আপনাব লেখনীর বিরাম নাই—কাজেই আপনার সকল কবিতা, বিশেষতঃ গত ৫।৭ বৎসরের রচনা সম্ভবতঃ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। আমার কাজের জন্য আপনার কবিজীবনের সমগ্র ইতিহাস চাই—যে জীবন কবিতার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। এজন্য আপনার প্রথম রচনা হইতে অদ্যাবধি সকল কবিতাই পাঠ করা প্রয়োজন। নতুবা আমার আলোচনা সত্যভ্রষ্ট হইবে। যদি আধুনিক কবিতার cutting বা কপি পাঠান তবে বড়ই ভাল হয়।

আর একটি কথা। আমি স্থির করিয়াছি—আপনার কবিতার একটি সুনির্বাচিত সঞ্চয়ন প্রকাশিত করিব, খুব প্রয়োজন হইয়াছে। আশা করি তাহাতে আপনার সম্মতি লাভ করিব।

আপনার আশীর্বাদ যেন আমাকে সুস্থ ও পাপমুক্ত করে। আপনি আমার প্রণাম জনিবেন। ইতি



স্নেহমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৯. অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

বাগনান

১৮।১২।৪৫

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার রৌপ্যমূল্যময়ী ভক্তি ডাকযোগে পৌঁছিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আর একটি শিষ্য এমনই পূজা পাঠাইয়াছিল—অতএব তুমি মৌলিকতা দাবী কবতে পাব না, এবং আমিও এইরূপ গুরুদক্ষিণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি—কাজেই আমারও দ্বিধা ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। এখন একটা কাজ কবিলে বোধ হয় ভাল হয়—আমার জন্য একটা গুরুদক্ষিণা-fund খুলিলে কেমন হয়? এই ঘোর কলিতে কেবল শ্রদ্ধাভক্তি গুরুব কোন্ কাজে লাগিবে? রৌপ্যবসমিশ্রা ভক্তিই গুরুর গ্রাহ্য, অতএব "শৃণ্বন্তু বিশ্বে মদ্‌ভক্ত শিষ্যঃ।" (খাঁটি বৈদিক ভাষা, অতএব ব্যাকরণ দেখিও না)—আমি ভক্তিমার্গেব অতিশয় আশু সিদ্ধিলাভেব মন্ত্র পাইয়াছি, তোমরা তাহারই সাধনা করিয়া ভক্তিব 'গুরুত্ব' লাভ কব।"—

—"ময্যেব ধনমাধৎস্ব ময়ি অর্থং নিবেশয়,
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

ইহাই ভক্তিযোগের সার কথা। এবং

"যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে
শ্রদ্ধধানা মৎপবমা ভক্তাস্তেঽতীবমেপ্রিয়াঃ॥"

কিন্তু দেবতাকে ত আমাদেব দেশে পাঁচসিকার পূজা দিলেই দেবতা খুশী হন। মানুষ-দেবতাকে তাহাই দিলে চলে না—অনেক ভাবতে হয়। তুমি একেবারে এত টাকা পাঠাইয়াছ, বোধ হয় বেতন প্রায় অর্দ্ধেক! ভয় হইয়াছে এ ত চালকলা বাঁধা বামুন নয়; সত্যই তাই কি না? টাকা জিনিষটাই এমন পাজী—উহার সঙ্গে পাপ হিসাব-বুদ্ধি জড়িত হইয়া থাকিবেই। আমি তোমার ভক্তিকে কিছু মাত্র অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু এই টাকাটা তোমার পক্ষেও খুব বেশি কিনা তাহাই ভাবিতেছি। যাই হোক, তোমার একটা কামনা পূর্ণ করিয়া তুমি যে আনন্দ পাইয়াছ—সেই আনন্দ অক্ষয় হউক—তোমার ভক্তি, জ্ঞান ও শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া সত্য ও সার্থক হউক, ইহাই আমার অন্তরের আশীর্বাদ। আর একটা কথা—আমাকে এই প্রণামী দেওয়ার আগে তোমার মায়ের পায়ে সর্বপ্রথম প্রণামী নিবেদন করিয়াছ ত?

আমার বইগুলির কথা মনে রাখিও। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ সন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবে—ঐ প্রবন্ধগুলি আমি কেমন করিয়া পড়িয়া লইতে পারি তাহা চিন্তা করিও। তোমার কাছে 'শান্তিজল' আছে—বইখানি যেন হারায় না।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩০. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) কে লিখিত
[মার্চ ১৯৪৬]

Bagnan P. O.
(Howrah)
14. 3. 46.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। তাহাতে আপনার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সংবাদ আছে, তজ্জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং আনন্দ, দুইই জানাইতেছি। দুইটি সংবাদই পূর্বে পাইয়াছিলাম। মাতৃবিয়োগে সন্তানমাত্রেরই কাতর হইবার কথা, যে হয় না সে 'মানুষ' নয়। বাড়ীখানির জন্য আপনাকে যেরূপে অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং যে মূল্যে তাহা পাইয়াছেন তাহাও আপনার সাহিত্যিক প্রতিভার পুরস্কার হিসাবে অভিনন্দনীয়। আমি সে বিষয়ে কিছু ভিতরের সংবাদ পাইয়াছিলাম, ইহাও শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে তাহাতে বন্ধুত্বের শক্তিও যুক্ত ছিল। আপনি শুধুই খ্যাতিমান নহেন, ভাগ্যবানও বটে। সুস্থ ও সবল জীবনচর্যার সহিত সাহিত্যসেবার অকৃত্রিম নিষ্ঠা থাকিলে যাহা হয়, আপনার তাহাই হইয়াছে। আমি জীবন ও সাহিত্যকে এক করিয়া দেখি বলিয়াই আপনার জীবনে তাহার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, আমার আনন্দের ইহাও একটা কারণ।

আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এতদিন করেন নাই কেন, তাহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমি আর সংসার বা সমাজের কেহ নই, ভদ্র সমাজের ত নহেই; যে জীবনযাপন করিতেছি তাহাতে

আমাকে স্মরণ করায় প্রত্যবায় আছে। আপনি শুধুই স্মরণ করেন নাই, এক্ষণে আপনার নিজ গৃহের গৃহস্বামীরূপে আমাকে আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ ও বিচলিত করিয়াছে। আপনার 'ভূয়োদর্শন' পড়িয়াছি। আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষেও ধৃষ্টতা। আপনার গৃহে একদিন অতিথি হইয়াছিলাম, সে দিনের সেই কয় ঘণ্টার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাক্। আমার আর সে দিন নাই, আমার সমাগমে সে আনন্দ আর পাইবেন না। সকলই কালের অধীন, দুঃখ করিয়া লাভ কি?

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত্যাগের জন্য আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। আপনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—দুঃখটা কিরূপ? আমার জন্য, না বাংলা সাহিত্যের জন্য? আমি কি কেহ নই? আর সকলেরই জীবনের সুখ, দুঃখে সিদ্ধি ও ঋদ্ধিলাভে অধিকার আছে, নাই কেবল আমার? আমার সম্বন্ধে কেবল সাহিত্যসেবা, আর কোন দাবীর কথা ওঠে না, অর্থ বা যশ ত নহেই, এমন কি মান-অপমানের কথাটাও অবান্তর! 'শনিবারের চিঠি' আমি ছাডিয়াছি, সেটা বুঝি আমার পক্ষেও দুঃখকর নয়! নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজে উৎপাটন করিয়া ফেলে যে, সে কি কম দুঃখে তাহা করে! কবি লিখিয়াছেন—

কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া—না জানি সে কত জ্বালা!

—এ জ্বালা কে বুঝিবে? 'শনিবারের চিঠি' আমার কি এবং আমিই বা 'শনিবারের চিঠি'র কে তাহা ত আপনি কখন জানিবেন না, জানিলেও বিশ্বাস করিবেন না (তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি)। আপনি যাহা লিখিয়াছেন—তাহা ত সাহিত্যিক শিষ্টাচার মাত্র; এ ঘটনা যে বিশেষ কিছু নয়, আপনাব মত আশাবাদী আত্মপ্রত্যয়শালী স্বাস্থ্যবান সাহিত্যিকের একটু সহানুভূতিই যথেষ্ট; সেই সহানুভূতিও গভীর হইবার অবকাশ নাই, কারণ অপরপক্ষে আপনার একটা দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব প্রেমের—যে প্রেম সর্ব অপরাধ মার্জনা করিতেই উৎসুক। আপনি প্রেমিক, অতএব পুণ্যবান।

'জঙ্গম' প্রথম খণ্ড পাইয়াছিলাম। তারপর আর কোন খণ্ড পাই নাই। আপনার আদর্শচরিত্র জঙ্গমের যিনি নায়ক, তাঁহার কাহিনী আপনার হাতে কেমন কাব্যশ্রী লাভ করে তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল; তখন মনে হয় নাই যে, তাহার Counterfoil হিসাবে আমার চরিত্রটাও আবশ্যক হইবে। আপনারা আর্টিষ্ট, আপনাদের প্রয়োজনের ত অন্ত নাই! বাস্তবকে লইয়া যখন রসসৃষ্টি করিতে

হয় তখন কল্পনা একটু অধিক স্বাধীনতা দাবী করিবেই। শঙ্করের কাহিনী আপনি জানেন (যতটা জানা সম্ভব এবং আবশ্যক), কিন্তু আমার কাহিনী ত জানেন না; তথাপি যেটুকু সাক্ষাতে দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন (অতি মূল্যবান সাক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই) এবং আমার যে সাহিত্যিক Personality, আপনার মত রসিক ব্যক্তির ভয় ভক্তি ও জুগুপ্সা উদ্রেক করে, এই সকল হইতে আপনি একটি পরম রমণীয় রসবিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন, শুনিয়াছি। এখনও দেখি নাই তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? অতিশয় অসাহিত্যিক পাঠক যাহারা তাহারাই ইহার রস বুঝিবে না, আমার চারিত্রিক পরিচয় হিসাবেই উহা মূল্যবান মনে করিবে (শুনিলাম উহাতে স্ত্রীকে প্রহার করাও আছে), কিন্তু আপনি সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমাকে রসিক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাকৃতজনসুলভ মনোবৃত্তির বলে আমি যেন ক্ষুব্ধ না হই। আমার সাহিত্যিক আত্মার অচল-প্রতিষ্ঠ রসিকতার প্রতি আপনার এই শ্রদ্ধাই আমাকে বিচলিত করিয়াছে। আমি সত্যই রসের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছি, শুধুই সাহিত্যিক মান-অপমান নয়, আমার ব্যক্তিগত কোন অনুভূতিও নাই! সত্যই কি আমি দেহধারী জীব নই! এতদিন কি আমি আপনাদিগকে এমনই প্রতারিত করিয়াছি! লোক বলিতেছে ঐ চরিত্র আমারই, লোকে ত' অত আর্ট বোঝে না। আপনিও বলিতেছেন উহাতে আমার চরিত্রের 'ছাপ' আছে, সে ছাপটা কালির ছাপ না রঙের ছাপ? আপনার নায়কের সুগভীর মনুষ্যত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে ত?

পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, এবং লেখাও শিষ্টাচার সম্মত হইল না; তাহার একটা কারণ, আমার Blood pressure আবার বাড়িয়াছে। আপনি কিছু মনে করিবেন না; আমার দিন খুব সম্ভব ফুরাইয়া আসিয়াছে। জীবনে আমি আমার জন্য কিছুই চাই নাই। মৃত্যুকেও ভয় করি না। কেবল দুঃখ হয়, কি দেখিয়া গেলাম! এ যুগে, এ সমাজে স্বার্থ ছাড়া কি আর ধর্ম নাই! ঐ স্বার্থ ব্যক্তির আত্মাত্তিক শক্তির সহায়ে দিকে দিকে কি মিথ্যা মহিমায় মণ্ডিত হইতেছে! জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে যে, পিশাচই দেবতার ছদ্মবেশে পূজা আদায় করিতেছে, এবং দেবত্ব ঘৃণিত ও বিকৃত হইতেছে! আমি বড় নই। কিন্তু বড়ত্বের স্পৃহা আমার ছিল। তাই আমি ধন-মান, পদ-প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতায় কাহারও সহিত লড়ি নাই; বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—

'When vice prevails and impious men bear sway,
The post of honour is a private station.'

এই Private station-ই আমার কাম্য ছিল, তাই নিজের রচনাও নিজের নামে প্রকাশিত করিতে চাহি নাই। কিন্তু সেই আমারও কি লাঞ্ছনা! আজ রোগে শোকে এবং দারিদ্র্যের আসন্ন আক্রমণে আমি মুমূর্ষু ও মুহ্যমান, তথাপি আমি মানুষকে ঈর্ষা করিনা, আমার সত্য হইতেও বিচলিত হই নাই; বরং ইহাই মনে করিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইতেছি যে, এ যুগে বাংলায় সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে আমার মত ত্যাগী তপস্বী আর কেহ নাই। সমগ্র জাতির হইয়া আমি-ই এই অগ্নিহোত্র একা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলাম আর কেহ নাই,—কেহ নাই! ইহাও আমার আত্মশ্লাঘা নয়, বড় দুঃখের কারণও বটে; যদি মরিবার আগে দেখিয়া যাইতাম আর একজনও এই অগ্নিহোত্রের ভার লইবে! সেই আমাকে অপমান ও আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। আমার সরস্বতী শিব-প্রণয়িণী সতী, সেই সতীর অপমান শিব সহ্য করিবেন না—ধনগর্বিত ও ঈর্ষামদমত্ত দক্ষ সর্বযুগেই আছে, শিবও সনাতন। মৃত্যুর অন্ধকারে ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

আপনাকে আর কি শুভ ইচ্ছা জানাইব? — আপনার সকল কামনা সফল হউক। এ কামনা আমি না করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, আপনি শক্তিমান, আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ। এইমাত্র ডাক আসিল, আপনার 'উপহার' পৌঁছিয়াছে। ধন্যবাদ।

৩১. সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৭]

Kailash Ch. Ghosh Road,
Baidyapara,
Barisa. P. O. (24 Parganas)
19. 3. 47.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পাইয়াছি। আমি বাগনান ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি এইস্থানে বাসা করিয়াছি। কলিকাতার নিকটবর্তী হওয়ায়, আশা করি, এইবার আপনাদের সহিত নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে।

আপনি যে নূতন সম্পাদনভার পাইয়াছেন তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমিও একখানি সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক হইবার ক্ষীণ আশা পোষণ করিতেছি,

এখনও কিছুই স্থির হয় নাই—বাধা অনেক। তবে, ইহা নিশ্চিত, একখানি পত্রিকা না থাকিলে আমার মনের এবং (অধুনা) উদরের সংস্থান হইবে না। সাহিত্য এতদিন আমার একটা ধর্মব্রত ছিল, আজ এই বয়সে তাহাকে ওই সঙ্গে জীবিকা করিতে হইতেছে। তা' ছাড়া, আমার বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে বাঁচাইয়া একটি Institution-এর মত করিয়া তুলিয়াছিলাম—সেই 'শনিবারের চিঠি' আমাকেও যেমন—ধর্মকেও তেমনি—ত্যাগ করিয়া যে পথে চলিয়াছে, তাহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইবে। যেটুকু শক্তি ও আয়ু অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা দ্বারা যতদূর সম্ভব উহার কুপ্রভাব রোধ করিতে চাই। আমি আজ দুইবৎসর সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় আছি—আজিকার দিনে এইরূপ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হইলে আমার দৈহিক পরিণাম যে কি হইবে তাহা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। সাহিত্যব্রত আমার জীবনের ব্রত, তাহা ত্যাগ করিতে আমি পারিব না—সেই ধর্ম বজায় রাখিতে যদি উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া তাহাই করিব। আমার বর্তমান সংকল্প ইহাই।

আপনার "বর্তমান" কেমন তাহা জানি না—আর একটু সবিশেষ জানাইলে সুখী হইব। আপনি আমার নিকট ইইতে একটি কবিতা বা প্রবন্ধ, বোধ হয়, বন্ধু হিসাবে উপহার চাহিয়াছেন। আমার কি আর সেদিন আছে? এখন প্রকাশকের কবলে পড়িয়াই অগ্রিম প্রাপ্তির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া গ্রন্থনির্মাণ-কর্মেই সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছে। তাহাতেও কিছুই হয় না—প্রকাশকজাতীয় মনুষ্যগণ যে গ্রন্থকারের কেমন সুহৃদ্ তাহাও আপনার অজানা নাই। আপনার পত্রিকা কবে বাহির হইতেছে? Plan ও Policy কি? লেখার জন্য দক্ষিণার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই আছে? আমার লেখার জন্য কিছু অতিরিক্ত সম্মানমূল্য দিবেন? রাজনীতি সম্পর্কিত কিছু চলিবে না জানি—কারণ, সে বিষয়ে আমি একজন কালাপাহাড়—তার জন্য আমার নিজের একখানি পত্রিকা চাই। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ যদি ঈপ্সিত হয় তবে আমাকে জানাইবেন; প্রতিমাসে ধারাবাহিক (যেমন 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিতাম) প্রবন্ধ অথবা ক্ষুদ্রাকার রচনা দিতে পারি। কবিতা আজকাল আর লিখিনা; যদি নিতান্তই প্রথম সংখ্যায় আমার নামের কবিতা আবশ্যক হয় তবে আপনাকে উপহারস্বরূপ একটি ছোট কবিতা দিব, বন্ধু হিসাবে। আমার শেষ লেখা একটি সত্যকার ভালো কবিতাও আছে (করুণানিধানের সম্বর্ধনা উপলক্ষে)—সে কবিতা এখনও কাহাকেও দিই নাই, কিন্তু তার জন্য কিছু দক্ষিণা চাই। কবিতাটি

কবিতা হিসাবে লোভনীয়—আমার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। যদি আপনার লোভ হয় জানাইবেন।

আর একটি খুব বড় ও মূল্যবান প্রবন্ধ আছে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র ভূমিকা—উহা ভূমিকা হইলেও স্বতন্ত্র সমালোচনা-প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু সময় নাই; বইও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। যদি বই প্রকাশিত হইবার পূর্বেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারিত, তবে খুবই ভালো হইত; কারণ প্রচারের সুবিধা হইত। আপনার পত্রিকা কি বৈশাখে বাহির হইবে? আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইলে বড় ভালো হইত। কিন্তু মদন মিত্র লেন বড় দূর। মাঝ পথে কোথাও দেখা করা যায় না? আপনার Phone আছে? নং কত?

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩২. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[মে ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghosh Road
Barisa P. O. (24 Parganas)
21. 5. 47.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার স্নেহ-লিপি পাইয়াছি। আমার ঠিকানা-পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন।

আমি এখনও খুব অনিশ্চিত অবস্থায় আছি—শরীরও পূর্বের মত অসুস্থ। এই অবস্থায় একখানি পত্রিকা-সম্পাদনের প্রস্তাবে প্রায় সম্মত হইয়াছি—পারিব কিনা জানি না।

যদি এই পত্রিকা চলে, তবে এইবার আপনার কাব্য সমালোচনা করিব। তজ্জন্য আপনার পরিণত রচনার একটি বড় গুচ্ছ আমাকে পাঠাইতে হইবে—উহা না পাইলে ঐ সমালোচনা সম্ভব হইবে না। ইচ্ছা আছে দুই-চারি মাসের মধ্যেই ঐ কাজটি সম্পন্ন করিব। এখন পত্রিকার উদ্যোগ-আয়োজনে বড় ব্যস্ত আছি। আমার পত্রিকায় নূতন কবিতা প্রায় থাকিবে না—উৎকৃষ্ট পুরাণো কবিতা হইতে প্রতিমাসে দুই-চারিটি উদ্ধৃত করিব। তথাপি আপনার কবিতা (নূতন) দুই-চারিটি পাঠাইবেন —যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহাও ছাপিব।

আর একটি কথা, আমি প্রতিমাসে প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকের একখানি করিয়া চিত্র প্রকাশিত করিব। আপনার ভালো ফটো থাকিলে পাঠাইবেন—খুব স্পষ্ট হওয়া চাই—বেশি ছোট না হইলে ভাল হয়।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল

৩৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[জুন ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailash Chandra Ghose Road
Barisa P. O. (24 Pargs.)
3. 6. 1947

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বহুদিন কোন সংবাদ পাই নাই; আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। সুনীল এখন কোথায়, কেমন আছে?

আমি এই দারুণ দুর্যোগের মুখেও একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছি। দুঃসাহস সব দিক দিয়াই বটে; তবু নানা কারণে সম্মত হইতে হইল। এখনও জানি না, আদৌ কার্যে পরিণত হইতে পারিবে কি না, দেশের অবস্থাও যেমন, মানুষের মতলবেরও তেমনই স্থিরতা নাই।

যদি শেষ পর্যন্ত নামিতেই হয়, তবে আমার নিজের এক আদর্শ পরিকল্পনা আছে; পত্রিকাখানি একটি বিশেষ অভাবমোচন বা প্রয়োজনসাধনের জন্য প্রচারিত হইবে। সাহিত্যিক চিত্তশুদ্ধিই হইবে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—সেইখানে আশা করি, কোন সাহিত্যসেবীর মতভেদ থাকিবে না। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ, এমনকি বিরুদ্ধ আন্দোলনই প্রার্থনীয়, না হইলে পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হইবে না। আমি সেই স্বাতন্ত্র্যই ঘোষণা করিতে চাই। পত্রিকা সম্বন্ধে আপনাকে এইটুকু মাত্র জানাইলাম—তাহাতে আশা করি আপনি আমাকে নিরুৎসাহিত করিবেন না।

আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহার কারণ আমি বাহিরের লেখার উপর বেশী নির্ভর করিতে পারিব না, কেবল যে কয়জনকে আমি লেখক হিসাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, তাহাদের শরণাপন্ন হইতেছি। সাহিত্যরুচি বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত

পার্থক্য যেমনই থাকুক, আমার একটু এই অভিমান আছে যে, বর্তমান লেখকগণের মধ্যে যেখানে যতখানি প্রতিভা আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত আমি বুঝিয়াছি তাহা আমি অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতে পারি, ইহা আমার একটা বড় অভিমান। জীবিত কবিগণের মধ্যে আপনাকে আমি অতিশয় শক্তিশালী বলিয়াই জানি—আমি আপনার মুগ্ধ ভক্ত। অথচ আপনার ও আমার কবিপ্রকৃতিতে বা দৃষ্টি-প্রেরণায় একটা মৌলিক বৈপরীত্য আছে। আমার কবিতা ও আপনার কবিতা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এইজন্যই হয়ত আপনার কবিধর্ম আমার কবিধর্মকে স্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু আমি আমার ধর্মে অটল থাকিয়াই আপনার কবিতার রস আকণ্ঠ পান করিয়া থাকি। এটা একটা বড় দৃষ্টান্ত বলিয়াই উল্লেখ করিলাম, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, রসসৃষ্টিতে যেমনই হোক রসবোধে আমি সত্যই ভাগ্যবান। পত্রিকাখানিতে কবিতা সম্ভবতঃ থাকিবে না এমনকি, খ্যাতিমান প্রবীণ কবিদেরও স্বাক্ষরমাত্রই আমাকে তুষ্ট করিবে না। এখনও যাঁহারা লিখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনাকেই কবি হিসাবে জীবিত বলিয়া মনে হইতেছে। তাই কবিতার জন্য কেবল আপনারই শরণাপন্ন হইতেছি; কেবল আপনার লেখা বলিয়াই নহে—ভরসা আছে, আপনি আমার জন্য সেইরূপ কবিতা (যদি শীঘ্র আসিয়া পড়ে) পাঠাইবেন, যাহা আমাকে বড় মুগ্ধ করে; কোন্ কবিতা আমাকে মুগ্ধ করিবে তাহা আপনিও জানেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপনার গদ্য রচনাও আমার বড় ভালো লাগে। একধরণের লেখা আপনি লিখিতে পারেন—সেইরূপ অত্যন্ত স্বাধীন ও মৌলিক সমালোচনামূলক নিবন্ধ (ছোট বা বড়) যদি লিখিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পাঠাইলে কৃতার্থ হইব।

আপনার 'অনুপূর্বা' শুনিলাম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অবশ্য দাবী করিতে পারি না; তবে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে একখানির প্রয়োজন আছে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রতিমাসে একখানি মাত্র পুস্তকের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। আপনার পুস্তকখানিকে তালিকাভুক্ত করিয়াছি।

আরও একটা প্রার্থনা আছে—আপনার একখানি ফটোচিত্র খুব স্পষ্ট এবং একটু বড় হইলে ভালো হয়। প্রতি মাসেই একখানি করিয়া full page ফটোচিত্র (কবি ও সাহিত্যিকগণের) প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

শেষে শুধু লেখা নয়, আপনার সহানুভূতি চাই, আমার এই উদ্যম আপনাদের আস্থা ও সাফল্য কামনাই আমার একমাত্র সম্বল।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং কুশল-কামনা জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৪. অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখিত

[জুন ১৯৪৭]

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ রোড

বরিষা পোঃ

২৪ পরগণা

৩০.৬.৪৭.

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান্ পৃথ্বীশ, তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি অতিশয় ব্যস্ত আছি বলিয়া উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। ব্যস্ত থাকার কারণ পরে বুঝিতে পারিবে।

তোমার দীর্ঘপত্রের সকল প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা একবারেই সম্ভব নয়, তবু কিছু কিছু লিখিতেছি। আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই আমি যেটুকু সাহিত্যিক পরিশ্রম করিয়া থাকি তাহা অপরে বোধ হয় পারিত না, কারণ আমার শরীর শুধু দুর্বল নয় মস্তিষ্কের পীড়াই (Blood pressure) গুরুতর। তুমি আর একটি ভুল করিয়াছ, সাহিত্যসেবার জন্য শুধুই অবসর নয় পারিপার্শ্বিক নির্বিঘ্নতাও চাই, আরও চাই সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি। আমি প্রায় ৩ বৎসর বেকার অবস্থায় আছি, সংসার ছোট নয়; তার উপর নিজের বাড়ী বা স্থায়ী আশ্রয় নাই; কেন নাই তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। কাজেই তুমি আমার নিকট হইতে যে পরিমাণ সাহিত্যকর্ম আশা কর তাহা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে, আমার কাজ প্রায় অধিকাংশই বাকী রহিয়া গেল, আশা ছিল জীবনের এই অবসরের কালে আমি অতিক্রুত তাহার কতকগুলি সমাধান করিব; কিন্তু শুধুই আমার এই অবস্থা নয়, দেশের এই দারুণ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য তাহা বোধ হয় আর হইয়া উঠিল না। আমার কাজ যে কত ছিল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তোমাকে দিতেছি।

১। বৈষ্ণব পদাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মণিরত্নগুলি চয়ন ও সম্পাদন করিয়া কয়েকখানি সমান আকারের গ্রন্থে নিবদ্ধ করা অর্থাৎ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটা Golden Treasury Series প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত বাঙালীকে তাহার সাহিত্যের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া, এই কাজই

সবচেয়ে বড় কাজ—কেবল সাহিত্য-সমালোচনা দ্বারা কিছু হইবে না, বাংলা ভাষায় বাঙালীকে সাহিত্য-আস্বাদন করাইতে হইবে এবং Classics-গুলিকে উদ্ধার করিয়া বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট tradition রক্ষা করিতে হইবে। এ কাজ বড় বিচার-শক্তির কাজ, কারণ ঐ selection-ই আসল সমালোচনা।

২। এখনও কাব্যবিচার-মূলক কোন গ্রন্থ আমি রচনা করিতে পারি নাই—আধুনিক পদ্ধতিতে আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসার উপযোগী একটি Theory of Poetry বাংলায় লিখিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য (কবিতা বাদে) ; আমি এখনও তাহাদের সমালোচনা লিখিতে পারি নাই।

৪। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে আমি অনেক প্রবন্ধে অনেক মূলকথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু কবিতাগুলির Critical estimate এখনও লিখিতে পারি নাই। রবীন্দ্রকাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি, বিকাশ ও পরিণতি—তাঁহার mind ও Art-এর বিবর্তন—অন্ধভক্তি বা পৌত্তলিক দেবপূজার আবেগে নয়—অতিশয় সংযত ও সমাহিত দৃষ্টিতে অনুসরণ ও তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে ; না করিলে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা আমাদের কল্যাণকর না হইয়া অকল্যাণকর হইবে—উদ্বুদ্ধ না করিয়া বিমোহিত করিবে। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অধঃপতনের একটা বড় কারণ তাহাই। বাংলা দেশ অতি-ভক্তির দেশ, বাঙালী বড়ই Sentimental, এজন্য খুব বড় কিছুকে সে না বুঝিয়াই কেবল পূজা করে, ফলে অমৃত বিষ হইয়া উঠে। তুমি নিশ্চয় আমার 'বাংলার নবযুগ' পড়িয়াছ ; তাহার শেষ দিকে আমি এ সম্বন্ধে অতিশয় সংক্ষেপে কয়েকটি গভীর কথা বলিয়াছি। এই রবীন্দ্র-পরিচয় একটু সবিস্তারে এখনও রচনা করিতে পারি নাই।

৫। Palgrave's Golden Treasury-র মত একখানি বাংলা কাব্য-সঞ্চয়ন সম্পাদন করা এখনও হইয়া উঠিল না—এ কাজও বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে ইহাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

আরও অনেক কাজ করিবার ছিল—কিন্তু এই কয়টি সবচেয়ে বড়। এই সকল কাজের আর একটি গুরুতর বাধা ঘটিতেছে—কাগজ দুষ্প্রাপ্য এবং প্রেস পাওয়াও একটা গুরুতর সমস্যা। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি এখনও করিতেছি ; আমার নিজেরই কয়েকখানি গ্রন্থ এই কারণে মুদ্রিত হইতেছে না।

... ...

আমি একখানি পত্রিকা সম্পাদনের ভার পাইয়াছি—আজ দুই বৎসর ইহাই

কামনা করিতেছিলাম, এতদিনে হঠাৎ অতিশয় অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়াছে—একটু দৈব বলিয়াই মনে হইতেছে। লগ্নও অতিশয় উপযুক্ত, তাই আমি এই দুর্বল, প্রায় শয্যাগত অবস্থাতেও একটু উঠিয়া বসিয়াছি, যদি সত্যই উপর হইতে আদেশ আসিয়া থাকে, তবেই কিছু করিতে পারিব, নতুবা কিছু না হইলেও দুঃখ নাই। আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই মন্ত্রে তাঁহারই 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি নিমিত্ত মাত্র—আমার শক্তি বা সামর্থ্যের উপর আমার বিশ্বাস নাই, এ অবস্থায় এ বয়সে সেই গাণ্ডীব তুলিবার শক্তি কোথায়? আগামী শ্রাবণে প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে—কিন্তু এখনও বাহিরের লেখা প্রায় কিছুই পাই নাই। বাহিরের উপরে নির্ভর করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছি, এজন্য আমার পরিশ্রম যে কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে। উপস্থিত, প্রায় পুরাতন 'বঙ্গদর্শনে'র আকারে ৮০ পৃষ্ঠা লেখা থাকিবে। অনুবাদ ও সঙ্কলন থাকিবে ৩০ পৃষ্ঠা, বাকি ৫০ পৃষ্ঠায় আমার তিনটি লেখা, একটি বাহিরের প্রবন্ধ, একটি উপন্যাস, ও একটি ছোট গল্প। আমার লেখা এইরূপ—

১। একটি সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ (যেমন, 'শনিবারের চিঠি'তে থাকিত) ২। একটি গ্রন্থ-সমালোচনা—প্রতি সংখ্যায় একখানি মাত্র বিশিষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা, প্রবন্ধের আকারে। ৩। সম্পাদকীয়—ইহাই হইবে 'বঙ্গদর্শন' বা বাংলা ও বাঙালীর সম্বন্ধে অতিশয় স্পষ্ট ও নির্ভীক মতামত। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমার মত সবিস্তারে বাহির হইবে—প্রথম সংখ্যায়; পত্রে আর কিছু লিখিলাম না। 'বঙ্গদর্শনে' আমি বাংলা ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করিব—গান্ধী-কংগ্রেসের ওকালতী করিব না এবং তাহার মোহ হইতে বাঙালীর চৈতন্য সম্পাদনই হইবে আমার প্রধান লক্ষ্য।

বর্তমানে আমি একাই 'বঙ্গদর্শন' লইয়া বড়ই বিব্রত আছি। পরিশ্রম ও চিন্তার অন্ত নাই। এই পত্রিকা যদি চলে, তবে ইহার দ্বারা আমি আমার বহু চিন্তা প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারিব। মেঘনাদ-বধ কাব্যের সমালোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি—কয়েকটি বিশেষ কারণে উহা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে। এতদিনে একটা সুযোগ মিলিয়াছে কিন্তু আবার একটা বাধা ঘটিয়াছে, বোধহয় আবার বিলম্ব হইবে। ঢাকার এক প্রকাশক (Presidency Library) আমাকে বড় ঠকাইয়াছে—আমার 'কপালকুণ্ডলা' প্রায় বিনামূল্যে copyright হরণ করিবার ফন্দী করিয়াছে। একখানি স্কুলপাঠ্য Reader লিখাইয়া লইয়াছে, অতিশয় কৌশল করিয়া; এখন

আমাকে সম্পূর্ণ ছাটিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। ইহাতে আমি একটু বিশেষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করিতেছি; শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আইনের সাহায্য লওয়াই উচিত হইবে। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য বা অবসর কোথায়?

য়ুনিভার্সিটির সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নাই—অনেকদিন উহাকে ত্যাগ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকে আমি অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় তাহা বলিয়াছি। উহা কেবল মেরামত করিলেই হইবে না, উহার ভিত পর্যন্ত বদল করিতে হইবে।...... এইজন্য আমি য়ুনিভার্সিটির সহিত কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখিতে রাজী হই নাই। ওখানকার পণ্ডিতেরাও তাহা জানে—আমাকে সকলেই বিষচক্ষে দেখে, এবং নানারূপ নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। উহারা জানে না, তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না, যদি করিতাম তবে এতদিনে আমার কোন পদার্থই থাকিত না। তুমি যে Syllabus সংশোধন করিয়াছ তাহা দেখিয়া আমার একটু হাসি পাইয়াছে,—প্রথমতঃ, বই কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, পড়াইবে কে? ঐ ভুতদলই তো? তুমি বোধ হয় ঢাকা-য়ুনিভার্সিটির Syllabus (M. A. ও Hons.) দেখ নাই? উহা (পূর্বে যেমন ছিল) সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ম্যাট্রিকের জন্য একখানি পৃথক Poetry Text, আমিও শ্যামাপ্রসাদকে suggest করিয়াছিলাম, তিনি তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। অরণ্যে রোদন করিয়া কোন ফল নাই। তোমার মাতুল মহাশয়কে আমার প্রণাম দিবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুঃ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৫. সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghosh Rd.
Barisa P. O.
(24 Parganas)
22. 7. 47

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু

ভাই সরোজ, 'বর্তমান' ও তোমার কার্ড পেয়েছি। আমি খুব ব্যস্ত আছি। তার উপর কয়দিন বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। 'কপালকুণ্ডলা'র শেষ কিস্তি তৈরী হয়েছিল, তোমার 'বর্তমান' বা চিঠি না পেয়ে পাঠাই নি। আজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবুর হাত দিয়ে এই চিঠি আর প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি।

এবারের তুমি আমাকে 'ফাইল' দাও নি। অন্য বিষয়েও কোন সাড়া পাই নি। আমার মনে হয়, তোমার ভুল হয়েছে।

আমার 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ করিনি, 'বর্তমান' সম্বন্ধেও আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। আমার শরীর ফের অসুস্থ হওয়ায় এবং কলিকাতায় আবার ঐ কাণ্ড শুরু হওয়ায় আমি নিশ্চল হয়ে আছি। 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে আমি একটা বিষয়ে বড় বিপন্ন হয়েছি, সেসব কথা সাক্ষাতে বলব। যেদিন যেতে পারব তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখব।

উপস্থিত একটা কথা তোমাকে এক্ষুনি জানাই। তুমি জানো, যে কয়জন কথাসাহিত্যিককে আমি লেখক হিসাবে শ্রদ্ধা করি তুমি তাদের মধ্যে একজন; সবচেয়ে প্রশংসা করি তোমার দৃঢ়তা ও সংযমের। এইখানে তোমার আদর্শের সঙ্গে আমার মিল আছে—এটা সাহিত্যিক; রাজনৈতিক মতামতের যথেষ্ট অমিল থাকতে পারে সেটা বাইরের ব্যাপার; প্রাণ নয়, বুদ্ধির ক্ষেত্রে। বিষয়ী বুদ্ধি অথবা ধর্মবিশ্বাস এই দুয়েরই কারণে সেখানে অমিল হয়, অন্ততঃ আজকের দিনের বাঙালী সমাজে। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যের উচ্চতর ও উদারতার ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করব না কেন? যাহারা সাহিত্যকেও নিজের চেয়ে ছোট মনে করে তারাই এমন কাজ করতে পারে যার দ্বারা নিজেকে ছাড়া আর কিছুকে শ্রদ্ধা করা যায় না। আমি 'বঙ্গদর্শনে' যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপন করতে চাই—আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যাদের প্রতিভার সম্মান করি, তারা আমার সেই আদর্শকে সম্মান করবে; কিন্তু দেখছি আমি সে আশা করতে পারিনে। বড় আঘাত পেয়েছি—সাক্ষাতে বলব। তুমি তোমার কাগজ নিয়ে ব্যস্ত, তাই তোমাকে আমি 'বঙ্গদর্শনে' লিখবার জন্যে অনুরোধ করিনি। আরও করিনি এইজন্যে যে, পত্রিকাখানি যে অবস্থায় বার হচ্ছে সেটা খুব সচ্ছল অবস্থা নয়। প্রথম দুই চার মাস যদি চালিয়ে নিতে পারি তাহলে ৪র্থ বা পঞ্চম সংখ্যা থেকেই 'লেখকদের উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা আমি করবই। এজন্যই প্রথমে আমি তোমাকে লিখবার জন্য বলি নি। কিন্তু আজ তোমাকে বলে রাখছি, তুমি আমার জন্য কিছু লেখা যা 'বঙ্গদর্শনে'র উপযুক্ত হতে পারে, সঞ্চয় করে রেখো—ছোট গল্প প্রথমে একটা চাই, বোধ হয় পরে উপন্যাসই লিখতে হবে; তার জন্য অবশ্য তুমি দক্ষিণা পাবে—তবে তোমাদের সকলের কাছে আমি একটি করে ছোট গল্প 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য অঞ্জলি চাইছি, ঐ প্রথমে একটি মাত্র। উপন্যাস যদি লেখো তার জন্য 'বঙ্গদর্শন' যথাসাধ্য আশীর্বাদী দিবে। আমার বড় ইচ্ছে তুমি বাংলার বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়া নিয়ে এমন একটি

উপন্যাস লেখ যাতে বাংলার বিশিষ্ট সাধনার মর্মমূল লোকের চোখে পড়ে। এর আগে কিছু কিছু লেখা হয়েছে, গল্পে উপন্যাসে। তুমিও লিখেছ। কিন্তু ওইটাকে আরও একটু বিশেষ করে ও বিস্তৃত করে লেখা যায় না? আমি তোমার হাত থেকে অমনি একখানি উপন্যাস পেলে বড়ই সুখী হব; হয়তো এখন আর পারবে না! সে প্রতিবেশ যে নেই। যাই হোক, তুমি কি করতে পারো 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য, আমাকে জানিও। একটি ছোট গল্প আপাততঃ পেলে বড়ই উপকার হয়—তোমার কাছে উপস্থিত ওই একটির বেশী আমি উপহার চাই নে। তবে গল্পটি তোমার 'জিপ ও জ্যাকের' মত উৎকৃষ্ট হওয়া চাই।

আমি পারব কিনা জানিনে—কিন্তু তোমার 'বর্তমানে' নিয়মিত লেখা দেবার খুবই ইচ্ছে আছে—খুব চেষ্টা করবো। 'কপালকুণ্ডলা'র পরে 'বিষবৃক্ষ' ধরবার ইচ্ছে আছে—খুব চেষ্টা করবো। আলোচনা বড় গুরুতর বলে একটু আশঙ্কা হচ্ছে—'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম ধাক্কাটা পার হলেই বোধ হয় পারব। অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের আলোচনা তোমার জন্য রইল। এখনই না হয়ে ওঠে, অন্য প্রবন্ধ দেব।

আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল-কামনা জেনো। ইতি

মোহিতদা

৩৬. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[আগষ্ট ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা
১৫।৮।৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শরীর অসুস্থ এবং তাহার উপর অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকার জন্য আপনাকে উত্তর দিতে দেরী হইল—অথচ পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ, আপনি একটি কবিতার আশা দিয়াছেন। আশা করি, সেটি আমাকে পাঠাইতে দেরী করিবেন না।

আপনি আমার রসগ্রাহিতার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসা আমি দাবী করিতে পারি। কিন্তু রসেরও একটা বিশুদ্ধি আছে—যত স্বাদ-বৈচিত্র্য থাক। বোধ হয় আরও একটা বাধা আছে—পাত্রটা শুচি হওয়া চাই। রস মাত্রেই শুচি

তাহা মানি, কিন্তু পাত্রটা অশুচি হইলে একটা বিঘ্ন ঘটে বৈকি। কিন্তু আপনার ঐ কবিতার রসও বিশুদ্ধরস নয়; বিদ্রূপও রস হইয়া উঠে—যখন তাহা বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষকে ছাড়িয়া একটা বৃহত্তর অনুভূতিকে স্পর্শ করে—যেমন আপনার কবিতা-গুলিতে হইয়াছে। আপনি অতবড় একটা বিদ্রোহের কবি হইয়া শেষে 'গুড়ি-কাষ্ঠ নুড়ি-শিলা'র এমন ভক্তিমান হইয়া উঠিবেন! বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় 'অরণ্যের আর বাকি কি?'

'ঘুমিওপ্যাথি' তো আপনারই আবিষ্কার, আমি ঘুমিওপ্যাথির ব্যবস্থা কখনো আমার ধাতের উপযোগী মনে কবি নাই। আপনি নিজেই যদি সে-ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে রোগী পাইবেন কেমন করিয়া? Physician, heal thyself!

আপনি যে গুরুভাইটির সঙ্গে ভজন গান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে একটু সাবধান করিয়া দিই—আপনার যে কোন ক্ষতি হইবে তা নয়, বরং লাভ হইতে পারিত, যদি আপনি তেমন বিচক্ষণ হইতেন কিন্তু আপনি তো তাহা নন, তবে ভণ্ডের ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেওয়া কেন? ক্ষতি হোক বা না হোক উহা যে কতখানি বিসদৃশ, তাহা আমার মত বোধ হয় কেহই বুঝিবে না। আপনাকে আমি কখনও অশ্রদ্ধা করি নাই, কিন্তু যে আপনাকেও কুৎসিতভাবে আক্রমণ করিতে পারে (করিয়াছিল, তাহা জানেন) আপনি কি কেবল গুরুভক্তির বশে আজ তাহার সহিত এমন ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন? না পত্রিকার প্রচার-বাহুল্যের লোভে? মাপ করিবেন, কথাটা অনেকদিনই মনে হইয়াছে, আজ বলিয়া ফেলিলাম—তার কারণ আমি আপনাকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করি এবং আপনার সুনামটার প্রতি আমার দরদ আছে। সাপ—মানুষ-সাপ দেখিয়াছেন? যাহাকে Viper বলে? আপনি কি মনে করেন তেমন মানুষ কখনো কোনো মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে পারে? কিন্তু ভক্তির ঘটা আপনি দেখিতেছেন ত'? সেই ভক্তির নর্দমায় আপনি আপনার ঐ পুষ্পাগুলি ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠি; তাই এতকথা লিখিলাম। আপনাকে দংশন করিতে পারিবে না, তাহা জানি—প্রথমতঃ প্রয়োজন নাই, দ্বিতীয়, আপনি তাহার ভণ্ডামীর ভাণ্ডটি কিছু কিছু পূরণ করিয়া দিতেছেন ত? আপনার তাহাতে বিশেষ লাভ নাই—কিন্তু উহার আছে। আপনাকে খুব খাতির করিতেছে নিশ্চয়?

কিন্তু এ সব কি বকিতেছি। আপনি ইহার জবাব দিবেন না। আমার Blood pressure এখন বাড়িয়াই আছে—ইহাই মনে করিয়া এ সব কথা ঝাড়িয়া ফেলিবেন।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৭. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত
[আগষ্ট ১৯৪৭]

Kailash Ghose Road,
Barisa P. O.
24 Parganas
29.8.47

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমি ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় আপনার সকল পত্রের যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য আশা করি মনে কিছু করিবেন না। আমি একা, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রায় সব কাজ আমাকেই করিতে হইতেছে। এজন্য উপস্থিত আমার আর সকল কাজই বন্ধ আছে।

আপনার 'স্বর্ণ-সন্ধ্যা'র বাকি দুইখানি খাতার একখানি অনেক কষ্টে শেষ করিয়াছি। হাতে-লেখা—manuscript পড়া অভ্যাস কখনো ছিল না। কবিতা-পাঠে ব্যাঘাত হইলে রসসম্ভোগেও বাধা হয়। বাকি খাতাখানি একটু অবসর পাইলেই শেষ করিব এবং আপনাকে মোট নির্বাচিত কবিতার নাম ও সংখ্যা জানাইব।

আমার ছাত্র শ্রীমান···আপনার কাব্যখানি ছাপিতে চায়, তাহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আপনার নূতন কবিতাগুলি বাছিয়া একত্র করিয়া একটি বই করিয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য উহার খুব প্রয়োজন আছে। কিন্তু একখানি বইতে অতগুলি কবিতা যাইবে না; আরও বোধ হয় অনেক কবিতা এখনও সংগ্রহ করা হয় নাই। অতএব এখনও অন্ততঃ তিনখানি বই দরকার। শ্রীমান···বেশি কবিতা ছাপিতে ইচ্ছুক নহেন—একশত পৃষ্ঠায় একখানি হইলেই ভাল হয়। তাহাতে আপনার ৩০।৪০টি মাঝারি আকারের কবিতা স্থান পাইতে পারে। আরও, যাহা বুঝিলাম, সে বড় বেশি সাবধানী; আমি তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও তেমন উৎসাহী নয়। আমার কাছে

আসিয়াছিল অন্য অভিপ্রায়ে—অর্থাৎ আমাকে exploit করিতে; ভয়ানক ঝানু। তথাপি ঐ একখানি বইও যাহাতে তাহার দ্বারা ছাপাইয়া লওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু উহাকে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। আমি কলিকাতার পুস্তকব্যবসায়ীদের খুব ভাল করিয়া চিনিয়াছি; উহারা সংঘবদ্ধভাবে বাঙালী লেখক ও গ্রন্থকারকে শিকার করিয়া বেড়ায়; আমার বন্ধু, শিষ্য, ছাত্র—কেহই ঐ পাপ হইতে মুক্ত নয়। তারপর বই ছাপিতে লইয়া বোধ হয় দুই বৎসরের কমে বাহির করিবে না। সেও এক বিষম বিপদ, আপনি তখন অন্যত্র ছাপার ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন না। দুই এক ফর্মা ছাপাইয়া ফেলিয়া রাখিবে। আমি উহাদের খুব ভালভাবে চিনি।

এই জন্যই আমি আজ কিছুকাল যাবৎ একটা সংকল্প করিয়াছি যে, আমার বইগুলির প্রকাশ-অধিকার দিয়া এবং বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্য-গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তাহা প্রকাশের ভার দিয়া, আমি একটি পৃথক পুস্তকপ্রকাশনার সৃজন করাইব। এমন সম্ভাবনা হইয়াছে; কিন্তু এখনও কাগজ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। একবার কাগজের Control উঠিয়া গেলেই আমি তাহা করিব—Capitalist আমার শিষ্য প্রস্তুত আছে। তখন আপনার কাব্যের একখানি উৎকৃষ্ট সংকলন, ভূমিকাসহ প্রথমেই প্রকাশিত করিব। এজন্য এখন হইতে আমাকে কিছু কিছু প্রস্তুত হইতে হইবে। সময় বড় কম। আপনাকে কেবল এই অনুরোধ যে, আপনার যত কবিতা যেখানে আছে, আপনি তাহা ঐরূপ খাতায় কপি করিয়া আমাকে পাঠাইতে থাকুন। আমি আপনার জন্য একটু পৃথক পরিশ্রম করিব।

'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন—তাহাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু আপনার কবিতাটি হারাইয়া ফেলিয়াছি—'বঙ্কিমচন্দ্র' ও। আপনি অপর দুই একটি ভাল কবিতা—বেশ নির্বাচনযোগ্য—পাঠাইলে বড়ই উপকৃত হইব।

আজ এই পর্যন্ত। আপনার শারীরিক কুশল প্রার্থনা করি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghose Road
Barisa P. O.
24 Parganas
3.9.47.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কার্ড পাইয়াছি। মধ্যে আর একখানি পত্র দিয়াছিলাম, পান নাই কি?

আপনি 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি আপনার সমালোচনা-দৃষ্টি ও রসবোধের পরিচয় দিতেছে। অন্ততঃ দুই একজন সত্যকার সাহিত্যরসিকের—আমি যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি—নিকটে এইরূপ উৎসাহ পাইলেই যথেষ্ট। আমি খুব আশ্বস্তবোধ করিয়াছি।

প্রতিমাসে যতটা সম্ভব ঐ Standard বজায় রাখিবার চেষ্টা করিব—তাহাতে আপনাদের মত দুই চারি জনের যদি একটু সাহায্য পাই, তাহাতেই আমি চালাইয়া লইব।

এবার বাহির হইতে প্রায় কিছুই পাই নাই। আপনার মিতা একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলেন তাহা মনোমত না হওয়ায় ফেরৎ দিয়াছি। বুঝিতেই পারিতেছেন—Standard রক্ষা করা কতখানি কষ্টকর। কবিদের ঠেকাইয়া রাখাই সবচেয়ে কঠিন। আমার উপর কত অভিশাপ বর্ষিত হইবে তাহা জানি।

কিন্তু আমি যে আপনার নিকট হইতে কিছু গদ্য-কর্ম আশা করিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? না, আপনাকে আমার চাই। আবশ্যক হইলে বেনামীতে লিখিতে পারেন। পত্রের উত্তরের আশায় রহিলাম। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৯. শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৭]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
সম্পাদক : বঙ্গদর্শন

Kailash Chandra Ghose Road
Barisa P. O.
24 Parganas
২৭ অক্টোবর ১৯৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার ৺বিজয়ার নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার পত্র ও প্রেরিত কবিতাটি পাইয়া সুখী হইলাম। দেখা করিবার সুযোগ না হওয়ায় আমিও দুঃখিত আছি।

আপনার ঐ কবিতাটি 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে, একটু বিলম্ব হইতে পারে।

আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আপনার হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। আমি একজন সেবক মাত্র—বাংলা দেশে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবক ও অনুরাগী আমি তাঁহাদেরই সেবক। যদি আপনাদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া থাকি, তবে আমার সেই সেবা সার্থক হইয়াছে।

আপনার দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করি। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৭]

বড়িশা—পোঃ
২৪ পরগণা
১৬।৭।৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এইমাত্র অনেকদিন পরে আপনার কার্ড পাইলাম। আপনার সংবাদে দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম; এখনো চাকরী করিতেছেন! আমার অবস্থা প্রায় সেইরূপই, অর্থাৎ আমিও করিতেছি, অর্থাৎ জীবিকার চিন্তা সমান; তবে যদি 'স্বাধীন' হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনার চেয়ে ভাল থাকিতাম।

আমার শরীর আগের চেয়ে খারাপ। Blood pressure বেড়েছে, মাঝে একটা Stroke-এর মত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও Brain-work করতে হচ্ছে। 'বঙ্গদর্শনে'র অবস্থা ভাল নয়, অন্ততঃ এ রকম করে আমি আর চালাতে পারব না। তা ছাড়া বাংলাদেশই যখন ম্যাপ থেকে মুছে যাচ্ছে এবং বাঙালীর ছেলে 'সব কো সন্মতি দে ভগবান' এই ভাষাতেই ভারত-ভগবানের পূজা-অর্চনা করবে, তখন 'বঙ্গদর্শন'-এ আর দরকার কি?

'শনিবারের চিঠি'তে আপনার চমৎকার কবিতাটি পড়লাম। ঠাট্টা করছিনে, সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। 'ভারতী' নাম্নী মেয়েটি যে নিরাময় হয়ে উঠেছে, এতদিন কবিরাজী ডাক্তারীতে কিছু হচ্ছিল না, শেষে একটা হোমিওপ্যাথি হাতুড়ে ডাক্তারের দু'ফোঁটা জল খেয়ে বেঁচে উঠেছে—এ খবরটাও ভালো খবর। আপনার নিজের 'ঘুমিওপ্যাথির' কি হল? প্র্যাকটিসটা ছেড়ে দিলেন নাকি?

'বঙ্গদর্শনে'র ভাবনা বোধ হয় আমাকে আর বেশীদিন করতে হবে না—কারণ 'দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে' সেই অবস্থা। আমি আগে যাবো কি 'বঙ্গদর্শন' আগে যাবে, সেইটেই বুঝতে পারছিনে। অতএব আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না। আপনার 'ভারতী' বেঁচে থাক।

'স্মর-গরল' খানা আপনাকে আমি পড়বার জন্যে পাঠাইনি তো? ও রকম কবিতা আপনার ভালো লাগবে না, জানি। আমি কেবল বইখানিই পাঠিয়েছি—দেখবার জন্যে। দেখে যদি খুশী হন তাহলে সুখী হব। কেমন, একটা দেখবার মত জিনিষ কিনা? আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার নেবেন। কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল

৪১. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[আগষ্ট ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন বড়িশা (পোঃ)

সম্পাদকঃ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ২৪।৮।৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটি ভালো লাগিল—আপনার স্নেহ ও সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ। আশ্বিন সংখ্যায় (অর্থাৎ আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যায়) ছাপা হইবে।

আপনি আমার পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা না লিখিলেও শোভন হইত—আপনার ঐ পত্র আমার পক্ষে শোভন না হইলে, সত্যই একটা মার্জনা আছে। আমার Blood pressure খুব বেশি হইয়াছে, আপনার তো Blood pressure নাই।

আপনি যে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তাহা আমি জানি—আপনার সেই আত্মকেন্দ্রিকতাই আপনাকে এমন কবিশক্তির অধিকারী করিয়াছে। সেইজন্য আপনি যেমন সম্পূর্ণ মুক্ত—কিছুতেই আপনাকে স্বধর্মভ্রষ্ট বা আত্মসন্তোষ-বঞ্চিত করিতে পারে না তাহা অতিশয় সত্য ; আমি তাহা বিশ্বাস করি। আপনি আপনার বাহিরে কাহারও অস্তিত্ব কোন শুভাশুভ ভবিষ্যৎ প্রভৃতির চিন্তা করেন না, তাই দেশ জাতি সমাজ সম্বন্ধে আপনার কোন মাথাব্যথা নাই—আপনি সে সম্বন্ধে সর্বচিন্তাশূন্য নাস্তিক। আপনার প্রাণের যাহা বিশ্বাস তাহাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট—সেই বিশ্বাসের সহিত বাহিরের কোন ঘটনার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই ; যদি কোন সম্বন্ধ ঘটে, তাহা আপনার ঐ আত্মকেন্দ্রিকতার সমর্থনে। আজ গান্ধী আপনার পূজনীয় হইয়াছেন—কেবল তাঁহার ঐ ধর্ম এবং 'চরিত্র' আপনার ভাল লাগিয়াছে বলিয়া। ভারত বা হিন্দু বা বাঙালী জাতির বর্তমান বা ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাতে যুক্ত হইয়া নাই—সে কথা তুলিলেই আপনি 'ঘুমিওপ্যাথির' তত্ত্বে দৃঢ় হইয়া উঠিবেন। ইংরাজীতে ইহাকেই Egoism বলে ; আপনার মধ্যে তাহার একটি দুর্ধর্ষ এবং মৌলিক প্রকাশ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হই—সত্যই মুগ্ধ হই ; আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছি না ; আমার একটা সত্য-জিজ্ঞাসাও আছে—সেই জিজ্ঞাসার দিক দিয়া আমি সকল সত্যকেই (দেখিতে পাইলে) বড়ই আনন্দিত হই।

কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ছিল তাহা ত আপনি বুঝিতে পারিবেন না ? আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ দংশন করিতে এ পর্যন্ত পারে নাই—'শনিবারের চিঠি' তাহা পারিবে না। যেখানে দংশন করিয়াছে—সে আপনাকে এবং আপনাদের মত আরও অনেককে দংশন করার মত নয়। আমি কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা দুঃখের কারণে আপনাকে ঐ সব লিখি নাই। যদিও দুঃখ বা ক্ষোভ যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, তাহা প্রকাশের ভঙ্গিতে ব্যক্তির ভাব থাকিবেই। 'শনিবারের চিঠি' যাহাদিগকে দংশন করিয়াছে তাহার সেই সকল দংশনে আমারও দংশন ছিল না। আমিই 'শনিবারের চিঠি'র একরূপ জন্মদাতা ও পালকপিতা ছিলাম—কিন্তু দংশন করাটাই আমার ধর্ম বা নীতির পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। তবু আমাকে সে বিষয়ে কেন যে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিতে

হইয়াছে তাহা আপনাকে বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল, কারণ আপনার 'গান্ধীভক্তি' যে কারণে, ঠিক সেই কারণে আপনি তাহা বুঝিবেন না। আপনি আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই ; আমি কিন্তু নিজেকেই হত্যা করিয়াছি—দেশের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য। আমার দাম্ভিকতা বা গর্ব বা খাদ যাহা কিছু দোষ থাক—তাহার মূলে 'আমি' 'আমার' নাই। আমার সেই 'আদর্শ' ভ্রান্ত হইতে পারে, আমার সেই কল্যাণসাধনের চেষ্টা একটা স্পর্ধা হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে কোন সজ্ঞান স্বার্থ বা মিথ্যাচার নাই। 'শনিবারের চিঠি' আমারই বাণী বহন করিয়াছে—তাহার সমুদয় প্রেরণাই ছিল আমার। তাহাতে সেইকালের সেই মিথ্যা ও অনাচারের বন্যা যে কিছুও রুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর কল্যাণকামী চিন্তাশীল 'অহং জ্ঞানদর্শী' ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। আজ 'শনিবারের চিঠি'র এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি গান্ধীবাদ ও কংগ্রেসী নীতির জন্যই নয়, সে প্রতিষ্ঠা যে একমাত্র আমার প্রাণপাত একাক্ষর-মন্ত্রের সাধনায়, তাহা কে না জানে ?

অতএব আমাকে 'শনিবারের চিঠি'র দংশন আর কাহাকেও দংশনের মত নয়। আমি সেইরূপ ব্যক্তিগত মমতার বশে বিবেকের অধীন হই নাই। 'শনিবারের চিঠি'র সেই দংশনে যে নিরীহ প্রাণীগুলি মাঝে মাঝে কাতর হইত—তাহাদের দিকে আমার তেমন সহৃদয় দৃষ্টি ছিল না কেন এবং বড় বড় গুণীকে দংশন করার ব্যাপারে আমার পূর্ণ সমর্থন কেন ছিল তাহা আপনার মত 'নির্মম' মানুষ কখনো বুঝিতে পারিবেন না। আমি তাহার জন্য কখনও কিছুমাত্র অনুতপ্ত নই—বরং সেই 'দংশনে' আমি এখন আরও বড় ফণা বিস্তার করিতেছি তাহা দেখিতে পাইতেছেন। আপনারা পুণ্যবান ভাগ্যবান—আপনাদের এমন পাপকর্ম করিতে হয় নাই, হইবেও না ; কিন্তু বিধাতা আমার ললাটে ঐ লিপিই লিখিয়াছিলেন যে !

যাক্! আপনি আমাকে যে প্রতিঘাত করিয়াছেন তাহাতে আমার কঠিন মর্মে কিছুমাত্র লজ্জা বা অনুশোচনার উদ্রেক করিতে পারে না, ইহাই বলিতেছিলাম। এখন আসল কথাটা আর একবার বলি।

আমি ভুল করেছিলাম, ঐ চিঠি লেখার ভঙ্গিটাও ঠিক হয়নি। দংশন এবং দংশনকারী ব্যক্তির কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে ওখানে। কিন্তু আমার কথাটা ছিল—আপনার ঐ ভক্তি আন্তরিক, ওতে কোন ভাণ বা ছল নেই ; তাই সম্পূর্ণ একটা বিপরীত স্থানে ঢালতে দেখে মনে একটা ধাক্কা, Shock লেগেছিল। এখন

দেখছি, আমিই ভুল করেছি। একজন ভণ্ড, আর একজন নাস্তিক; একজনের বিশ্বাসটা স্বার্থঘটিত, আর একজনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলে কিছু নেই, কোন স্বার্থও নেই—নিছক আত্মভাবের বিলাস। আপনার ভারতও যা, বাংলা দেশও তাই; গান্ধীবাদও যা, জাতিপ্রেমও তাই। কোনটাকেই আপনি সত্য বলে অন্তরে বিশ্বাস করেন না—কারণ আপনি প্রেম-ভক্তিকে দুর্বলতা, বুদ্ধিহীনতা, মূঢ়তা বলেই মনে করেন—কারণ আপনি যে হঠাৎ ভারত-প্রেমিক হয়েছেন, তা হতেই পারে না, গান্ধীর প্রতি আপনার একটা fancy হয়েছে। যেহেতু সেটা আপনার fancy, তাই তার একটা মূল্য আপনার কাছে থাকতেই হবে—কেননা, আপনি একজন Arch-Egoist। আপনার প্রতিবাদ করলে আপনার আত্মাভিমানে লাগে; সত্য-মিথ্যাঘটিত কোন বিশ্বাসে নয়—আপনার আত্মাভিমানে। সজনীকান্ত যেমনই হোক, ভণ্ডই হোক আর দুর্জনই হোক, তাতে আপনার কিছুই আসে যায় না—কেননা ওটা আপনার আত্মজগতের বহির্গত একটা বস্তু। আমি ভুল করেছিলাম। কিন্তু একথাও বলেছিলাম যে, আমার ঐ চিঠিখানা Blood Pressure-এর ফল, ওটাকে আপনি গ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু আপনি তা পারেন নি—আপনি আমাকে 'শনিবারের চিঠি'র সজনী-অংশের সঙ্গে যুক্ত করে বেশ একটু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। আপনি তো জানেন না যে, আমার 'দংশন' আমার 'দম্ভ' আমার 'আক্ষেপ'—কোনটা ব্যক্তিগত নয়—আমার Ego-টা আমার নয়, আমি নাস্তিক নই আমি বিশ্বাসী, আমি 'আমাকে' ভালবাসতে পারি না—'আমা'-ছাড়া একটা বস্তুকেই ভালবেসেছি, তাই আমার বিদ্বেষের মধ্যে যে আগুন আছে, তাও 'পাবক', আমার অহঙ্কারটাকে উজ্জ্বল করে।

আপনাকে কেবল একটা কথা জিজ্ঞেস করি। যদি 'ঘুমিওপ্যাথি' আপনার নিজের philosophy হয় তাহলে আপনি গান্ধীকে নিয়ে, ভারতকে নিয়ে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক করেন কেন? সে বিষয়ে একটা মত ঘোষণা করেন কেন? আপনার তো ওটা বিলাস! যে নিজের জাতকে, সমাজকে, দেশকে—বোধ হয় কাউকে জানতে চিনতে বুঝতেও চায়নি এবং ভালবাসতে পারেনি—সে 'ভারত' নিয়ে এত মাতামাতি করে কেন? ওটা কিন্তু আপনার পক্ষে মিথ্যাচার হবে। আগেই বলেছি আমি আপনাকে ঠিক আপনি যা, তার জন্যেই শ্রদ্ধা করি। একটা কথা বললেই বিশ্বাস হবে। গত সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' (সম্পাদকীয়) আমি স্বাধীন বাংলার একটা 'সেনসাস' তৈরী করে দিয়েছি—বোধ হয় দেখেছেন। তাতে পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ আছে; আমার বিশ্বাস,

দেশে যত মানুষ আছে—সকলেই ওই পাঁচটার একটা না একটাতে পড়বে। এজন্যে আমার ঐ 'সেনসাস'টির জন্যে আমার একটু গর্ববোধ হয়েছে। কিন্তু পরে দেখেছি, অন্ততঃ একজন ব্যক্তি ওর কোনটাতে পড়ে না—সে আপনি। আপনার ঐ মৌলিকতাকেই আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনি যখন গান্ধী এবং ভারত নিয়ে আমার বাঙালী ও বাংলা-প্রীতিকে আক্রমণ করেন (বন্ধুর মুখেই শুনেছি) তখন আমি দুই কারণে দুঃখিত হই; প্রথম, আপনি নিজেকে ছোট করেন, দ্বিতীয়, আপনার সেই অধিকার নেই—আপনি কিছুকেই বিশ্বাস করেন না, কিছু-কেই ভালবাসেন না। আপনি ভারত এবং বাংলা কোনটার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—গড্ডলিকা মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন। ঐ দেখুন, আত্মশ্লাঘা হয়ে পড়ল। অপনার জ্ঞান, বুদ্ধির প্রখরতা, আশ্চর্যলিপি ও বাকপটুতা সবই আমি মানি; কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে যে-'ভারতে'র বিরুদ্ধে বাংলা ও বাঙালীকে রক্ষা করতে চাই এবং যে-ধর্মতত্ত্বের কঠিন দৃষ্টি নিয়ে গান্ধীকে অশ্রদ্ধা করি—ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দিই না—আপনি সেখানে এসে দাঁড়াতে পারবেন না, একথাও বলে দিচ্ছি। শাস্ত্র, দর্শন, আপ্তবাক্য ইতিহাস কিছুই মানেন না। আপনার সত্য আপনার দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বটে, সেটা আপনার শক্তিরই পরিচয়, কিন্তু জ্ঞানের নয়। অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে এবং নিতান্ত বাধ্য হয়ে একথা আমাকে লিখতে হল। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করলে, আপনি তা বুঝতে পারতেন; কিন্তু আমি আপনার ঐ স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করি; তাই গড্ডলিকার সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনি এই যে 'গান্ধীবাদ' আর 'স্বাধীন ভারতের' ওকালতী করছেন, এতে নিজেকেই ছোট করছেন। আপনি নির্মলকুমার বসুর লেখা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন। আমিও হচ্ছি। লোকটা ভক্ত-বৈষ্ণব, ওর ভক্তিটা খাঁটি তাই লেখাটিও খুব পরিচ্ছন্ন; কিন্তু আপনার ভালো লাগে কেন? আমারও ভালো লাগে কিন্তু লেখকের উপরে কৃপাও হয়। আন্তরিকতার গুণে ওর style-টা সত্য; কিন্তু ওর প্রত্যেক যুক্তি এবং ভাব-চিন্তা দুর্বল। আমি ওর ঐ কথাগুলি দিয়েই প্রমাণ করতে পারি। ওর দেবতাটি হিমালয় নয়, একটি বিরাট বল্মীক স্তূপ। ভারতবর্ষে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন—তাঁদের কারও পায়ের নখের তুল্য নয়। তবে যদি সম্পূর্ণ নূতন অবতার হন, সে কথা স্বতন্ত্র। ভক্তরা তাই দাবী করবে। আজ আর নয়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

মোহিতলাল

৪২. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন   ১৫।১০।৪৮

সম্পাদক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার ৺বিজয়ার নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

'বর্তমানে' আপনার অনুবাদটি (কবিতা) যেরূপ হইযাছে দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় ঐ কবিতাটি (Ancient Mariner) অতঃপর বাংলা ভাষার সামগ্রী হইয়া উঠিল। কিন্তু 'বর্তমান' উহার যে দুর্দশা করিতেছে তা দেখিয়া চোখে সত্যই জল আসে—এমন সাহিত্যিক বর্বরতা একালের বাংলা দেশেই সম্ভব, তার কারণ বাঙালী এখন গান্ধী ভজন করিতেছে। প্রতি মাসে এক একটি টুকরা এমন করিয়া ছাপে যে সমগ্র কবিতাটির রূপ বা রঙ কখনও কাহারও মনে লাগিবে না। আপনার কাব্য 'অনুপূর্বা'ও মুদ্রিত হইয়া অপ্রকাশিত হইয়া রহিল। একটা অভিশাপ আছে বলিয়া মনে হয়। আপনি ঠিকই করিয়াছেন—'শনিবারের চিঠি'তে গান্ধী-ভজন করাই আপনার একমাত্র মোক্ষলাভের উপায়।

আমার মোক্ষ আসন্ন—আপনার পূর্বেই তাহা লাভ করিব। ইতি

অনুরক্ত

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৩, জীবনকালী রায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৮]

কৈলাস ঘোষের বাগান,

বড়িশা পোঃ

(২৪ পরগণা)

২১।১০।৪৮

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ-লিপি যথাসময়ে পেয়েছি। আমার ঐ দিনের গাঢ় প্রেমালিঙ্গন ও কুশলকামনা জানিবেন। বিলম্বের কারণ, আমি দেহ-

মনে বড় ভেঙে পড়েছি, তার উপর এক রাশি পত্রের উত্তর দিতে দিশাহারা হয়ে পড়ি। আপনার চিঠির উত্তরে মাত্র দুই লাইন লিখলে তো হবে না, অন্ততঃ ১০।১২ লাইন লিখতে হবে। তাই দেরী হয়ে গেল।

করুণাবাবুর আশীর্বাদী চিঠিও পেয়েছি। তিনি আপনার কাছে আছেন, এইটেই একমাত্র নির্ভাবনার কারণ। আপনাকে আমি পূর্বে যে দীর্ঘপত্র লিখেছিলাম, তা কি আপনি পাননি? তাতে অনেক কথা লিখেছিলাম, যদি চিঠিখানা মারা গিয়ে থাকে তাহলে বড়ই দুঃখের কথা। কারণ, আমার এমন শক্তি বা সময় নেই যে, চিঠি দুবার করে লিখি। খুব সম্ভব সে চিঠি পাননি।

'বঙ্গদর্শন' আপনাকে পাঠাতে ব'লে দিয়েছি। এবার নিশ্চয় পাঠাবে। ওদের ব্যাপার যা' তা' ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করবার নয়, আমাকেও ওরা শেষ করবে।

সেখানকার যাঁরা পরিচিত বন্ধু আছেন তাঁদের আমার বিজয়ার প্রীতিনমস্কার ও আলিঙ্গন জানাবেন। শঙ্কর বাবাজীউ এবং ছেলেমেয়েদের জানাবেন। ভাইদের কারু ঠিকানা জানি নে। জগজ্জীবনকে মাঝে মাঝে দেখতে পেলে সুখী হই। তাদের দুই ভাইকে (যারা কলিকাতায় আছে) আমার স্নেহালিঙ্গন আপনার মারফতেই জানাচ্ছি।

'বঙ্গদর্শন' পেলেন কিনা জানাবেন।

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন নিন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সঙ্গের চিঠিখানি করুণাবাবুকে দেবেন

৬৪, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[নভেম্বর ১৯৪৮]

বড়িশা পোঃ

১০।১১।৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। 'অনুপূর্বা'র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আশ্বস্ত হইলাম।

'বঙ্গদর্শন' লইয়া আমি সত্যই বড় বিপন্ন হইয়াছি; ছাড়িতেও পারি না—

রাখিতেও পারি না ; অর্থাৎ যে প্রকারে চালাইতে হইতেছে, তাহা আমার এই স্বাস্থ্য এবং অবস্থায় দুঃসাধ্য। তার উপর, দেশের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যাহা হইতে চলিয়াছে—অনুক্ষণ তাহার বেদনায় মুহ্যমান আছি। কত বড় অধর্ম ও কত বড় মিথ্যাকে আমরা আশ্রয় করিয়াছি—তাহার প্রমাণ দিন দিন দীপ্ত সূর্যের মত জ্বলন্ত হওয়া সত্বেও—মৃত্যুমোহে সকলে আচ্ছন্ন ; ধর্ম আর কোথাও নাই বলিয়া, সত্য আমাদের জীবন হইতে নির্বাসিত হইয়াছে, ধ্বংস হইতেই হইবে। ইহাই আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে।

আপনি যে গীতার অনুবাদ করেছেন, তা দেখবার জন্যে খুবই উৎসুক হয়েছি—ভালো হবারই কথা। আমি নিজে একবার দেখতে চাই—আমাকে পড়তে দিতেও কি আপনার আপত্তি আছে? 'বঙ্গদর্শনে' নাই-বা ছাপা হ'ল—তাতে আপনার মনে আঘাত না হবার কারণ নেই তো? আমি আপনার ঐ কবিতাটি পড়িতে উৎসুক হইয়াছি—উহা ভালো হইবে বলিয়াই বিশ্বাস ; যদি ভালো হয়, তবে ছাপাইতে পারিব, এমন কথা বলিতেছি না—যদি বলিতাম, তবে কবিতা ফেরৎ দিলে আপনার অসম্মান হইতে পারে।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি। শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৫. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৪৯]

বড়িশা

ইং ২০।৪।৪৯

সুহৃত্তমেষু,

আপনার পূর্বপত্র ও পোষ্টকার্ড, দুই-ই পাইয়াছি। আমার শারীরিক অবস্থা, পরে মানসিক অবস্থাও এমন হইয়াছে যে, আর কিছুই করিতে—চিঠি লিখিতেও ইচ্ছা হয় না ; যেন মরিয়া গিয়াছি। আপনার চিঠিতে (পূর্বের) আপনি আমাকে আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় ব্যথা বোধ করিয়াছি,—যৌবনে একবার একসঙ্গে পরম আনন্দভোগ করিয়াছি, আজ আবার বার্ধক্যে কি একসঙ্গে শ্মশানগীত গাহিতে হইবে? আশ্চর্য! উৎসবে, ব্যসনে, এবং শেষে শ্মশানেও! জন্মান্তরীণ স্নেহ-সম্বন্ধ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু অদৃষ্টের এই পরিহাস বড়ই বেদনাময় হইয়া উঠিয়াছে। আপনার ঐ পত্র পড়িয়া

এবং আমারও অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি আরও মুহ্যমান হইয়াছি। এখন কেবলই মনে হয় যাহারাই আমাকে স্নেহ করে—প্রাণে বা মনে, দূরে বা নিকটে যাহারাই আমার একটু ঘনিষ্ঠ—তাহারাই যেন আমারই এই দুর্ভাগ্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু, আমার জীবন ও আপনার জীবন তো একরূপ নয়; আপনি স্নেহে, প্রেমে, কর্তব্যে, ধর্মপালনে আমা হইতে কত উর্ধ্বে; সংসার আপনাকে শাস্তি দিবে কেন? আমি যে শাস্তিভোগ করিতেছি তার জন্য ভগবানকে কখনও দোষী করিব না; কিন্তু আপনার যদি ঐ পরিণাম হয়, তবে সংসারকেও ধিক্, ধর্মকেও ধিক্!

শঙ্করের অবস্থা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ আশ্বাসজনক নহে। এতবড় একটা দুর্ঘটনা যে উহার উপরেই ঘটিল, তাহাই ভাবিয়া বড় বিমূঢ়তা বোধ করিতেছি। হাড় কি খুব খারাপভাবে ভাঙ্গিয়াছে—সম্পূর্ণ আরাম হইবার আশা নাই? আরও কিছুদিন সময় লাগে তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু ঐ সময়টার পরে সে সহজভাবে চলা-ফেরা করিতে পারিবে তো? মাঝে কবি কুমুদরঞ্জনের পত্রে জানিয়াছি—করুণাবাবু এখন জামসেদপুরে আছেন।

জগজ্জীবন যদি এক-আধবার আমার সঙ্গে দেখা করিবার সময় পাইত, তবে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া একটু শান্তি পাইতাম। কিন্তু বোধ হয়, তাহার সে সময় বা সুযোগ নাই।

বধূমাতার একটি কবিতা আমি অনেক বিলম্বে পাইয়াছিলাম—এমন কি, বোধ হয় আমার হাতে কখনও আসিত না; কারণ আফিসের ঠিকানায় যে সকল লেখা আসে তাহা প্রায় সেইখানে পড়িয়া থাকে; এবং কবিতার রাশি জমা হইয়া উঠে, পরে আর আমার দেখিবার অবকাশ হয় না। সবই তো আমাকে একাই করিতে হয়। সময়ে পাইলে নেতাজীর মাসে উহা ছাপিয়া দিতাম।

'বঙ্গদর্শনে'র অবস্থা আমার অবস্থার মত। আমি বাঁচিলে বাঁচিতে পারে; দুই-এরই গ্রহ এক; এবং গ্রহবৈগুণ্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় দুইমাস বন্ধ আছে। আবার বাহির হইবে কি না, এখনও বলিতে পারি না; গুরুর ইচ্ছা থাকিলে, হইতে পারে। উপস্থিত ফাল্গুন সংখ্যাটা বাহির হইলেও বাঁচি।

আপনি কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। যদি আসা হয়, আমাকে পূর্বে একটু সংবাদ দিবেন—দিনটাও জানাইবেন।

ভগবানের নিকট আপনার কুশল এবং সর্ববিপদ' হইতে মুক্তিলাভ

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কুশল সংবাদ দিবেন। আমার ভালবাসাপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন লউন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৬. জীবনকালী রায়কে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৪৯]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
ইং ৩০।৪।৪৯

সুহৃত্তমেষু,

আপনার সুন্দর চিঠিখানি পড়িয়া সুখী হইলাম কি দুঃখী হইলাম বুঝিতে পারিতেছি না। তার কারণ, উহার সুর মোটের উপর দুঃখেরই; আবার সে এমন দুঃখের যে তাহাতেই কেমন একটা সুখ আছে—অতএব কবির ভাষায় বলিতে হয় —"পাইনু বুকে সুখের মত ব্যথা"। কিন্তু আপনি যে ব্যথার কথা লিখিয়াছেন—আপনার তাহা নিশ্চয়ই 'সুখের মত' নয় কারণ তাহা হৃদয়ের নয়—পদযুগলের। অর্থাৎ ব্যথাটা ভদ্র স্থানের নয়, কাজেই তাহা অবিমিশ্র ব্যথা। ঐ ব্যথার ব্যথী যদিও আমি নই, তথাপি আপনি তাহাতে নিরাশ হইবেন না, কারণ, পদমূলে না হইলেও বাহুমূলে উনি যেরূপ নাড়া দেন, তাহাতে আমার বাহুতে আপনার জানুতে একটা প্রেমের ফাঁসী লাগিয়াছে, এমন ভরসা করিতে পারেন। আরও একটা কারণে আমি আপনার ঐ ব্যথার ব্যথী না হইয়া বরং ভয় পাইয়াছি, তাহা এই যে রসাধিক্য উহার একটি কারণ। তাহা আপনার পত্রে সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি; আমারও আধিক্য কম নয়—এত শুকাইয়াও এখনও হাতে হাতে বহিতেছে; আপনার মত যদি উহাকে ভিতরে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হই (অবস্থা ক্রমে সেইরূপ হইয়া আসিতেছে) তবে কোনদিন হয়তো কাঁদিয়া সে পায়ে ধরিবে—কে জানে? যাই হোক, আশা করি ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন।

শঙ্করের পা সারিয়া না উঠা পর্যন্ত, আমি সত্যই আপনার কথা স্মরণ করিয়া সুস্থ বোধ করিব না। ডাক্তারের মত কি তাহা জানি না, আশা করি বিলম্বে হইলেও সে আবার কার্যক্ষম হইবে।

আপনার কন্যা উপস্থিত ঐ একটি—আর নাই? আপনি তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবেন, উহা স্বাভাবিক; কিন্তু সেজন্য খুব বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবেন

না ; এবং খুব তাড়াতাড়ি-হুড়াহুড়ি করিবেন না। কলিকাতায় পাত্র সন্ধান করিতে আসিবেন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ অঞ্চলের এ সমাজের দিকে দৃষ্টি না রাখাই ভালো। দেশের যে অবস্থা, এবং অদূর ভবিষ্যতে জীবনযাত্রা ও সমাজ যেরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সহর অপেক্ষা পল্লীসমাজের সম্পন্নগৃহস্থের ঘরে কন্যাদান করাই সঙ্গত—শিক্ষিত চাকুরিয়ার মত অপাত্র আর নাই।

আর একটি কথা। ইতিমধ্যে শ্রীমান প্রশান্ত বাগচী (শান্তিপুরের) আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ; তিনি কাঁথিতে করুণাবাবুর নিকটে প্রায় ১৫ দিন ছিলেন, তাঁহার মুখে সব সংবাদ পাইয়াছি। একটি ভয়ের কথা এই যে, তাঁহার জন্য কলিকাতায় নাকি একটি ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছে—পুত্র পূর্ণ সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। অনেক কারণে আমি ইহাতে শঙ্কিত হইয়াছি। কলিকাতার জীবন—বিশেষ ঐরূপ বাসস্থানে করুণাবাবু অল্পদিন থাকিলেও বাঁচিবেন না ; কলিকাতার আবহাওয়াও অতিশয় বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘর-ভাড়া যে কিরূপ হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি। শহরে সাধারণ মানুষ যে ভাবে বাস করিতেছে, তাহা মনে করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। তারপর পূর্ণ তাহার পিতাকে কিরূপ সেবা-যত্ন করিবে, সে সম্বন্ধে আপনি হয় তো আমার চেয়ে ভাল জানেন। মোটের উপর করুণাবাবুর কলিকাতায় অবস্থান আমার আদৌ শুভসূচক বোধ হইতেছে না। করুণাবাবু একটি বালক, সেইজন্য আরও ভয় হয়।

আপনি আমার সম্বন্ধে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কথাগুলি লিখিয়াছেন তাহাতে আমার নিজের কারণে নয়—অন্য কারণে একটু আশা ও আশ্বাস হয়। আমি দেশের ও জাতির জন্য যাহা করিতেছি, তাহাতে কোন ফললাভের আশা করি না—একান্ত প্রাণের দায়ে এবং ধর্ম ও কর্তব্যবোধে তাহা করিতেছি ; এবং এমনও বিশ্বাস করি, উহা আমার করা নয়, কেহ করাইতেছেন। কারণ আমার এক্ষণে দেহের এবং সর্বপ্রকারে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমি এখনও যে ঐ পরিশ্রম করিতে পারি —ইহা স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক।

শুধু তাহাই নয়—একেবারে একা। একটি দোসর নাই—যেন শবের উপর আসন করিয়া নির্জন শ্মশানে বসিয়া আছি ; এবং চতুর্দিকে প্রেতের চীৎকার শুনিতেছি ; আমার উপরে তাহাদের কি আক্রোশ ! আমার এই জীবন অ-মানুষিক ; আমি যদি 'মানুষ' হইতাম তবে নিজের প্রতি এবং নিজের এই সংসারের প্রতি নির্মম হইয়া এই শব-সাধনা করিতে পারিতাম না। এই রোগজীর্ণ ও যন্ত্রণাকাতর দেহ, এই সংসার-নির্বাহের ভাবনা, এবং তাহারও উপরে দিনরাত এই দেশের ও জাতির

ভাবনা। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, এ জাতি ধ্বংস হইয়া গেল, তবু আমি যে এখনও বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য! আহার বহুদিন প্রায় অনাহারে ঠেকিয়াছে —নিদ্রা নাই, অতিরিক্ত Blood pressure; তার উপর হাঁপানী কাশির নিত্য ও নৈমিত্তিক পীড়ন! ভাবিয়া দেখুন, তবু আমি যে অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করিতেছি—শুধু লেখা নয়, পড়িতেও কম হয় না—এ শক্তি আসে কোথা হইতে? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমি এক্ষণে যাহা করিতেছি, তাহা আমার কাজ নয়। কিন্তু ফল কি? চারিদিকে আমার বিরুদ্ধে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও অভিশাপের যেন ঝড় বহিতেছে—উৎসাহ, সহানুভূতি, সাহায্য তো দূরের কথা।

'বঙ্গদর্শন' বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল, তার কারণ ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় উহার প্রতিকূল। বাংলা দেশে এমন একজন ধনী নাই যাহার কিছুমাত্র প্রেম আছে; ধনী—অর্থাৎ নিঃস্বার্থতা একেবারে লোপ পাইয়াছে! একেবারে! কোথাও, কোনখানে, কাহারও মধ্যে নাই—যাহাদের আছে তাহারা একেবারেই অর্থসামর্থ্যহীন; এমনও মনে হয়, যদি তাহারা অর্থশালী হইত তবে তাহারাও ঐরূপ পিশাচ হইত। আমি অনেক স্থান হইতে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র পাই, তাহাতে বুঝিতে পারি—বাংলা দেশে এখনও বাঙালী-প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে; শুধুই প্রবীণ নয়, তরুণের নিকট হইতেও আমি যে সকল প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধানিবেদন পাই, তাহাতে মনে হয়, আমাকে এদেশের প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বিধি বড়ই বাম, আমি কি করিব?

আপনি লিখিয়াছেন, আপনাতে আমাতে সত্যই অনেক তফাৎ—আপনি সাধারণ মানুষ, আমি অসাধারণ। কিন্তু আমি যদি আপনার মত সাধারণ হইতাম, তবে আমার ব্যক্তিজীবন ধন্য হইত, নিজেকে পুণ্যবান মনে করিতাম। দেখুন, গয়াধামে গয়াসুর হরিপাদপদ্ম ধারণ করিয়া আছে, তাহাতেই সকলে—ত্রিলোক উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, কিন্তু গয়াসুরের উদ্ধার নাই। আর আপনারা তো ছোট মানুষ নন, আপনারা তো জাতির মেরুদণ্ড; সেই মেরুদণ্ডকে পুষ্ট ও দৃঢ় করিবার জন্যই তো আমার মত সেবকের প্রয়োজন—নহিলে আমার তো কোন মূল্যই নাই! আপনারাই দেবমন্দির, আমি মিস্ত্রী-মজুর বই তো নয়! দুঃখ এই যে, জেলখানার কয়েদী-মজুর—মাহিনাও নাই, বকশিসও নাই; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে।

আপনি আমার এখানে এক দিন-রাত্রি আসিয়া থাকিবেন, এ সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমার যে তাহাতে কত আনন্দ হইবে, তাহা

আপনাকে বলাই বাহুল্য। আশা করি উপাস্থিত আর সব ভাল। আপনার ও শঙ্করের খবর দিবেন। প্রীতিপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৭. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[মে ১৯৪৯]

বড়িশা

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

সুহৃত্তমেষু,

সেদিনের সেই দিনব্যাপী প্রেম-প্রীতি ও কাব্যবাসর-উৎসব-শেষে একটি গভীর বিষাদ ও অবসাদ বহিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম। পথে একটি দুঃসংবাদ পাইলাম—আমার অন্যতম যৌবনসাথী এক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। আপনি তাহাকে হয়ত জানিতেন—বোধ হয় দেখিয়াছেন—তাহার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতাবাসী হইলেও, প্রায় ৭।৮ মাস আমি তাহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই—জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক চাপে বেচারী আমাকে প্রায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ ঢাকা হইতে ফিরিয়া বাগনানে বাসকালে আমার একটা বড় দুঃসময়ে সে আমার যে স্নেহ-শুশ্রূষা করিয়াছিল—আমার সেই মরণাপন্ন অবস্থায় এবং নিদারুণ পুত্রবিয়োগ-ব্যথায়, সে আমাকে যেন তাহার বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। বাগনান হইতে কলিকাতায় আসিলে আমি তাহারই সংকীর্ণ গৃহস্থালিতে দেব-অতিথির মত সেবা ও প্রাণঢালা যত্ন পাইয়াছি। আজ প্রায় এক বৎসর তাহার সহিত একটু ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল—যদিও এ বাসাতে সে ৩/৪ বার আসিয়াছিল।

কিন্তু আমার বড় দুঃখ হইতেছে এই যে, আমি প্রায় ৭।৮ মাস তাহার কোন সংবাদ রাখি নাই; তারপর এই মৃত্যুসংবাদও যেভাবে পাইয়াছি—তাহা ভাবিলে বড়ই লজ্জা পাই। এখনও আমি তাহার বাড়ীতে সংবাদ লইতে পারি নাই। সংবাদপত্রে তাহার মৃত্যুসংবাদ কিছুদিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল—পথে একজনের প্রমুখাৎ তাহাই শুনিলাম।

যাক, বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিলে, অনেক বিয়োগদুঃখই পাইতে হয়, এখন তো একে একে বিদায়ের পালা—ভাঙ্গা আসর ক্রমে শূন্য হইয়া আসিতেছে, সকলেই

উঠিয়া গেল, আমার ডাক পড়িয়াছে, তবুও আরও কয়দিন হয়তো বসিয়া থাকিতে হইবে। এই বিদায়ের সুর বড়ই বেদনাময়; তাই সেদিন আপনার ওখান হইতে উঠিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল।

আপনি বোধ হয় আজকালের মধ্যেই ফিরিবেন, আর এ যাত্রায় বোধ হয় দেখা হইবে না। আপনাকে আমার 'নবযুগ' একখানি উপহার পাঠাইলাম। কাহাকেও পড়িতে দিবেন না; নিজেই একটু একটু করিয়া অবকাশ মত পড়িবেন। এই বইখানি আমার অন্যান্য বই হইতে স্বতন্ত্র। অতি দুরূহ ও দুঃসাহসিক চিন্তা-কার্য ইহাতে আছে।

করুণাবাবুর সংবাদ বোধ হয় আর পান নাই। আমার শরীর আরও অসুস্থ হইয়াছে, তার উপর সাংসারিক ভাবনাও বাড়িয়াছে। তবু এই অবস্থাতেও আর একবার করুণাবাবুর সহিত দেখা করিবার সংকল্প করিয়াছি। তাঁহার ঠিকানা কি?

আশা করি আপনার সংবাদ কুশল। আমার গাঢ় আলিঙ্গন ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্য তারাচরণ আপনার হাতে তাঁহার বইখানি পাঠাইতেছে, আপনি কবিকে পঁহুছিয়া দিবেন।

৪৮, সাহিত্য-সেবক সমিতির সম্পাদককে লিখিত

[আগস্ট ১৯৪৯]

বড়িশা পোঃ

(২৪ পরগণা)

ইং ২৪।৮.৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনা করিতে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। রমেশচন্দ্র অতিশয় অসুস্থ শরীরেও দীর্ঘকাল যেরূপ নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলার অধিকাংশ প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যসেবক তাঁহার শ্রদ্ধা স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া যে ঋণে আবদ্ধ আছেন সেই ঋণ স্বীকার করিবার এই উপলক্ষ্যটি বড়ই শোভন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমিও তাঁহাদের

সহিত অন্তরে যোগদান করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি—সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিলে কর্তব্য আরও সুসম্পন্ন হইত, কিন্তু স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হইল না বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শুধুই সাহিত্য-প্রেমিক নহেন—সাহিত্য-রচনাতেও তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সামান্য নহে।

আমি তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করি, তিনি যেন সুস্থ হইয়া তাঁহার সাহিত্যিক-সেবা ও সাহিত্যসেবা-ব্রত আশানুরূপ উদ্‌যাপন করিতে পারেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৯. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ

(২৪ পরগণা)

৮. ১০. ৫০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার শেষ চিঠিতে আমার প্রতি আপনার অসীম স্নেহ এবং আমার জীবনে নিষ্ফলতার জন্য দুঃখ—এই দুই-ই আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমার শেষ জীবন শ্মশানেই কাটবে—অনেক দুঃখের, অনেক ভোগ-লালসার অনেক মিথ্যাচারণের স্বস্ত্যয়ন করতে হবে তো। আমার গুরু ঐ দুঃখ আমাকে কিছু পেতে দেবেন না—অন্তরে তাঁর বাণী ছাড়া। খুব কষ্ট পাচ্ছি—সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছি দিকে দিকে মিথ্যা ও মিথ্যাচারের সর্বব্যাপী বিস্তার দেখে। দেহ-জীবনটা বড় কষ্টে গেল, বুকেও অনেক দুঃখ-শোক পেলাম, এখন একমাত্র আশা—শেষ রক্ষা; গুরু আমাকে পথ-কুকুরের মত মরতে দেবেন না।

আমার প্রকাশককে আপনার নামে আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' একখানি পাঠাতে বলেছি। সম্ভবতঃ পেয়েছেন, বা শীঘ্র পাবেন। এই বইখানি আদ্যোপান্ত একটানে আপনাকে পড়তে অনুরোধ করি—একটু একটু করে নয়। আমার বিশ্বাস এ বইখানি আপনার বিশেষ ভাল লাগবে, আপনি ওর থেকে আমার অন্তর্জীবনের পরিচয়ও একটু পাবেন।

আপনি কলকাতায় আসবেন কবে? এলে যেন সংবাদ পাই। আশা করি, সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানবেন।

স্নেহধন্য
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫০. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[অক্টোবর ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
১৪. ১০. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রপাঠে বড় সন্তপ্ত হইলাম। সবচেয়ে ভাবনার কথা—আপনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছে। সাংসারিক যে দুর্ভাবনা ও সঙ্কটের কথা লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে ভয় হয়—আমি নিজে যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে, উহা যে কি আমি তাহা জানি। তবু আমি প্রায় যাত্রা শেষ করিয়াছি—গুরুর কৃপায় হয়তো বাকি দুই-চারিদিন কোন রকমে মান বাঁচাইয়া দেহত্যাগ করিতে পারিব। কিন্তু আপনার জীবনের এই মধ্যাহ্নকালে যদি রাহুগ্রাস হয়, তবে বড়ই আফশোসের কথা। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।

আমি পূজার দ্বাদশীতেই কবিতার বৈঠক করিব স্থির করিয়াছি। রমেশবাবুকে জানাইবেন। আপনি, যদি সম্ভব হয়, বীরেনকে (ভগ্নদূত) খবর দিবেন—সেও যেন আসে। কুমুদকে সঙ্গে লইয়া আসে।

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। জীবিকার জন্য, এই বয়সে এত সাহিত্যিক শ্রম-কর্ম করিতে হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।

কুশল সংবাদ চাই। প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫১ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৫১]

Barisa P. O.
Calcutta—8
27.10.51

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রে ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ পাইয়া আনন্দিত হইলাম; আপানও আমার ঐ দিনের নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন। আমার অবস্থাও আপনার মতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আপনি একটু সুস্থ হইয়াছেন জানিয়া চিন্তা দূর হইল। আমার সুস্থ হওয়ার আশা খুব কম। এবার আমাকে বোধ হয় মহাযাত্রা করিতে হইবে। গুরুর কি ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি না।

একটু সুস্থ ও সমর্থ হইলে আমার এখানে একদিন আসিবেন—পূর্বে সংবাদ দিবেন।

'র' বাবু এখন একটি বড় সাহিত্যিক—নব্যতম উপন্যাস-সম্রাটের 'Friend, Philosopher and Guide' হইয়া পরম গৌরবে কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে সিংহাসন পাতিয়াছেন। তাঁহাকে আর আপনার মত দীন-হীন সাহিত্যিকের বন্ধুত্ব মানায় না। ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে, বক্রতাও আছে। উহার জন্য দুঃখ করিবেন না।

আমার পিছনে কুকুর লাগিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই—আমাদের দেশে পথেঘাটে চলিতে হইলে অমন অনেক নেড়ীকুত্তার উপদ্রব সহ্য করিতে হয়।

আপনার সংবাদ দিবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—মধ্যে একদিন বীরেন ও কুমুদ আসিয়াছিল—তাহারা ভাল আছে।

শ্রীমো

৫২. হেমেন্দ্র কুমার রায়কে লিখিত

ভাই হেমেন্দ্রকুমার,

তোমার অতীত স্মৃতির আবেগভরা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদের কাল এখন 'সেকাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যুগ এখনই কাব্য-স্মৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। দুই-চারিজন এখনও যাহারা এখানে ওখানে ছড়াইয়া আছি, তাহাদের মধ্যে প্রাণের সূক্ষ্মতন্ত্রীর যোগ অদৃশ্য হইলেও দৃঢ় ও অটুট হইয়া আছে, বরং জীবন-সায়াহ্নে প্রভাতের সেই অরুণ-রাগ ক্রমেই করুণ ও কোমল হইয়া উঠিতেছে, তার প্রমাণ তোমার ও আরও দুই-একজন বন্ধুর চিঠি। তুমি জানো, সাহিত্য আমার ধর্মব্রত ছিল; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জন্য নির্মমভাবে নিজের সকল স্বার্থ, আত্মপ্রীতি ও মমতা, সকলই বর্জন করিয়াছি। সেজন্য 'কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ'। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, মনের উৎসাহ-আবেগ আর নাই, গত কয়েক মাস যাবৎ আমি লেখনী-কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি একটু সুস্থ হইতে পারি, তবে হয়ত জন্মগত ব্যবসায় আবার কিছু কিছু করিতে হইবে। তুমি যে এখনও সমান উৎসাহে সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রার্থনা করি, তোমার আয়ুষ্কাল দার্ঘ হউক, এবং আমাদের বিদায়গ্রহণের বহু পরেও গত যুগের সাক্ষীরূপে তুমি মাঝে মাঝে আমাদিগকে স্মরণ করিও। সেজন্যও তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

৫৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত

বহুদিন আমি আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই—আমার সংবাদও আপনারা রাখেন না। আমি ইহলোকেই পরলোকবাসী হইয়াছি। আপনার মনে আমার প্রতি আপনার সেই পুরাতন শ্রদ্ধা এখনো অটুট আছে দেখিয়া বুঝিলাম —আমার মধ্যে যাহা সত্য তাহাকে আপনি ভুল করেন নাই, মানুষ আমি যেমনই হই। সত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা সবচেয়ে বড় সম্পদ—আপনি ভাগ্যবান।

আমি এক্ষণে আমার জীবনের শেষ দেনা পরিশোধের চেষ্টা করিতেছি। সকল দিকে এত নিরাশ হইয়াছি এবং দেহ-মন এত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে জন্মান্তরের অপরিমেয় ঋণ এবারেও শোধ করিতে বোধ হয় পারিলাম না। এ জীবনেও অনেক ঋণ করিয়াছি—বহু বান্ধব বিমুখ হইয়াছে—সেই হৃদয়ঘটিত দেনা-পাওনার দেনাটাই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই এখন আমি এই নির্বান্ধব বনবাসে শেষ কয়টা দিন কাটাইতেছি।

আপনার 'কল্লোল যুগ' আমাকে একজন দেখাইয়াছিল, তাহাতে আমি আপনার হৃদয়ের সরলতা ও সহজ বিশ্বাসের পরিচয় পাইলাম। আপনি ছোট-বড় সকলকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন; এই শ্রদ্ধাশীলতাই আপনার চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের সম্বন্ধে আর একটু critical হইতে পারিলে ভাল হইত। বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। আমার সহিত নজরুলের পরিচয় ও তাহার সহিত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি সত্য বিবরণ আপনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন। ওই বিষয় এ পর্যন্ত কেহ কিছু জানে না; তার কারণ আমি চিরদিনই নিজের সম্বন্ধে নির্মম, কখনো আমার কোন কৃতিত্ব বা কোন শুভ চেষ্টার ঘোষণা করি নাই। নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় shock—তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না। যদি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখিয়া যাইতে পারি, তবে তাহার একটি বড় অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শোনা কথা—কয়েকটি বড় ভুলও আছে; তাই ভাবিয়াছিলাম, যখন কথাটা আপনি এখন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তখন আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়, আমার কর্তব্য আপনার অজ্ঞানকৃত ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া। তথাপি, আপনি যে কয়েকটি সত্য ও তথ্য নানা জনের নানা কথা হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বিচারশক্তি ও সত্যনিষ্ঠার বলে এমন করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আপনি একটি বিশেষ গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। একালে আত্মপ্রচার ও মিথ্যা রটনা এত বাড়িয়াছে যে, যেখানে যেটুকু সত্যজিজ্ঞাসা ও সত্যনিষ্ঠা আছে তাহার গৌরব আরও বেশি।...

অনেক লিখিয়া ফেলিলাম; আশা করি, এমন কিছু লিখি নাই যাহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হন। আমার সাহিত্যিক আদর্শ ও মতামত চিরদিন কিছু কঠোর তাহা আপনি জানেন; কিন্তু সাহিত্যিকের প্রতি নির্মম হইলেও, আমি 'মানুষের'

প্রতি কখনই শ্রদ্ধাহীন হই নাই। জীবনে এক আপশোষ রহিল যে সেই 'মানুষ' খুঁজিতে গিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া বড় ঠকিয়াছি—বার বার আঘাত পাইয়াছি। আপনার ভিতরে একটু সেই বস্তুর পরিচয় পাইয়া এত কথা লিখিতে উৎসাহ হইল।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও স্নেহালিঙ্গন জানিবেন। ইতি—

৫৪. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[জুন ১৯৫২]

পোঃ বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ৬. ৬. ৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনাকে ভুলিয়া যাইব কেন? শ্রীরামপুরে আপনার গৃহে সেই আতিথ্য—গৃহিণীরও অতিথিসেবা বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাছাড়া সচ্চিদানন্দ প্রায় দেখা করিতে আসে। অতএব আপনারা আমার আত্মীয়-বন্ধুর মত।

আপনি 'বাংলা ও বাঙালী' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তার একমাত্র কারণ আপনি বাঙালী। এবং আমি আপনাকে আপনার পিতৃকুল ও পিতৃধর্মের কথা শুনাইয়াছি। কোন্ মানুষের তাহা শুনিতে ভালো না লাগে? আমি ঐ বইখানিতে আমার পিতা, পিতৃভূমি ও পিতৃধর্মের জয়গান করিয়াছি এবং ধন্য হইয়াছি। আর দুইখানি গ্রন্থে আমি বাংলা ও বাঙালীর গৌরব কীর্তন করিয়াছি —'বাংলার নবযুগ' ও 'জয়তু নেতাজী' এই তিনখানি বই আমি আমার স্বজাতির চৈতন্যসম্পাদনের জন্য লিখিয়াছি; কিন্তু এ জাতির নিদানকাল উপস্থিত—বাঁচিবার বা বাঁচাইবার কোন আশা আর নাই। সবচেয়ে দুঃখ এই যে, আর কেহ তাহা দেখিল না। দেখিয়া এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। শেষ কটা দিন আমি বড় দুঃখ পাইয়া গেলাম, কেন যে এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম তাহা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু এইবার আমার সময় হইয়াছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচিব না, দেহ একেবারে ভাঙিয়াছে। বোধ হয় খুব শীঘ্র হঠাৎ বিদায় লইব। আমি কি

অবস্থায় যাত্রা শেষ করিতেছি তাহা কেহ জানে না। এ অবস্থাতেও লেখনী ত্যাগ করিবার উপায় নাই। দেশের কাছে আমি কিছুই চাহি নাই। আমি শ্মশানে বসিয়া শিবের আরাধনা করিয়াছি,—তাহাতে কোন কামনার কথা নাই, থাকিলে সত্যকে হারাইতাম। শ্মশানে শিয়াল-কুকুর থাকে, তাহারা চিৎকার করে, করিবেই। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। কেবল যখন আমার গুরুকে, আমার সেই শিবকে, সত্যকে অপমান করে তখন মুখে অভিশাপ আসে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের দুর্বলতা। জানি, আমার গুরুর তাহাতে কিছুই হয় না। কেবল উহাদের অকল্যাণ হয়। কিন্তু কাহারও নিকটে যেমন কিছুই চাহিবার পাইবার নাই, তেমনি অভিশাপ দিব কাহাকে? সকলেই তো মর। দেশ বাঁচিয়া থাকিলে, আমি আরও কিছুদিন হয়ত বাঁচিতাম। দুই তিনটা কাজ বাকি ছিল—শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই;—কাহার জন্য?

'বঙ্গভারতী'র কথা লিখিয়াছেন। উহার ভিতরকার কথা কৌতুককর। আমি উহার কিছুরই সংবাদ রাখি না, কেবল ভিতরকার লেখাগুলি ঠিক করিয়া দিই। আমার এই অবস্থায় কোন পত্রিকার ভার লওয়া অনুচিত এবং অসাধ্য। তবু পাঁচজন অতি নিকট ভক্ত ও শিষ্য আমাকে জোর করিয়া উহাতে সম্মত করিয়াছে, যে ব্যক্তি উহার প্রকাশক সে আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছামত উহার আকৃতি এবং মূল্য প্রভৃতি স্থির করিয়াছে—লোকসান সেই দিবে, কাজেই আমার কোন কথা কহিবার যো নাই। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। তবু কেন যে আমি আমার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া ঐটুকু দায়িত্ব লইয়াছি, তার কারণ তবু দুইটা কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। এ কয় বৎসর আমার মুখ একেবারে উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশের কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও প্রকাশিত হয় না, আমাকে উহারা বয়কট করিয়াছে। ইহার মূলে আছে সজনীকান্ত দাস। সেই কলিকাতার সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে শাসন-দমন করিতেছে এবং গভীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া আমাকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ কেহই তাহা সন্দেহও করে না। এমনই কূটকৌশল তাহার। আমার মৃত্যু না হইলে সে স্বস্তি পাইবে না। 'বঙ্গভারতী' টিঁকিবে না। উহার 'বিজনেস পলিসি' একদম আত্মঘাতী। কিন্তু আমার কথাও শুনিবে না। আমিও সম্ভবত উহা শীঘ্র ত্যাগ করিব, তার প্রধান কারণ আর আমি পারিতেছি না। একে আমার মৃত্যুকাল

উপস্থিত, তার উপর এত প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়িতে হইলে আমি এক মুহূর্তও বাঁচিব না। এখনই 'বঙ্গভারতী'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসিতে শুরু হইয়াছে।

আশাকরি আপনি সপরিবারে কুশলেই আছেন। আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি—

আপনাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[জুন ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ২০. ৬. ৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার প্রতি আপনার এই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আপনারই অন্তরের শুচিতা ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচায়ক, নইলে আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্য কিছুই নাই। সাহিত্য-সেবা আমার অধ্যাত্মসাধনার সত্তায়, বিলাস নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অর্থলাভের উপায় উহা নহে। এইটুকু বিশ্বাস যদি রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই ধন্য হইব। তারপর, আমি কি করিতে পারিলাম—শেষ পর্যন্ত এইসব গ্রন্থের কোন মূল্য থাকিবে কিনা সে চিন্তা করি না, কারণ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—উহা আমার গুরু-নির্দিষ্ট কাজ—আমার কাজ নয়; অতএব উহার জন্য তিনিই দায়ী। এবং ইহাই ভাবি, সারাজীবন এই যে আমাকে তিনি ঐ যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিলেন, তাহাতে আমার কি লাভ হইল—আমার আত্মার কোন্ শান্তি, কোন্ সুস্থতা আমি লাভ করিলাম! আমার তিনি কি করিলেন!

'রবীন্দ্র-কাব্যে'র আপনি যা পরিচয় ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত করাইয়াছেন—তাহাতে প্রকাশকের উপকার হইবে; কারণ বিজ্ঞপ্তিটি ভাল হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ একটা এমন বস্তু যে, উহার সমালোচনা খুবই দুরূহ। উহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও তাঁহার কাব্য-দৃষ্টি দুইয়েরই সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা ও পরিচয় করা হইতেছে—যাহা এ পর্যন্ত কেহ করে নাই, করিতে পারে না; বরং এমনই সংস্কারবিরুদ্ধ যে কিছুতে উহা কেহ গ্রহণ করিবে না। আমি উহাতে যাহা করিয়া গেলাম তাহা সমগ্র বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় যুগান্তর আনিবে; কিন্তু এখনই নয়, এই মোহের

অবস্থা কাটিয়া গেলে। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায়, আশা করি, কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে পারিব। আপনি আমার এখানে আসিবেন বলিয়াছেন—কলিকাতায় তো প্রায়ই আসেন, মাঝে মাঝে আর একটু কষ্ট করিয়া আমার এখানে আসিলে সুখী হইব। সোমবার ও শনিবার বাদ দিয়া, যে কোনদিন বেলা ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে পাইবেন।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গভারতী' লইয়া এই শারীরিক ও মানসিক দারুণ পীড়িত অবস্থায়, কি যে বিপদে পড়িয়াছি এবং কি অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি তাহা আপনারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। আমার মনে হয়, উহাই সাক্ষাৎ মৃত্যুশেল হইয়া উঠিবে। আমার Blood pressure ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—উহা গুরুর নির্দেশ, না শনির নিগ্রহ। ঐ পত্রিকা লইয়া ভিতরে তো দুর্গতির একশেষ, তার উপরে আমার পিছনে যে কুকুর ও শেয়াল দল বাঁধিয়াছে তাহারা নাকি আবার তাহাদের সেই বিষ্ঠাভাণ্ড হইতে বিষ্ঠা ছড়াইতে থাকিবে। আমাকে এবার তাহারা চরম শাস্তি দিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তাহাতে কোনরূপ রাগ বা দুঃখ নাই তাহা আপনি জানেন। কিন্তু এতবড় একটা পাপ শহরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া এমন আস্ফালন করিতে পারে—দেশের যত সাহিত্যিক ও কবি তাহাদের পৃষ্ঠপোষক—এই কথা ভাবিয়া আমার Blood pressure বাড়িয়া যায়। আমার অপরাধ—আমি 'বঙ্গভারতী'তে উহাদের শয়তানী ধরাইয়া দিয়াছি। বড় ওস্তাদ যিনি তিনি আড়ালে আছেন—ছোটটি চারিদিকে হুঙ্কার করিতেছে। সে মনে করে, বাংলা সাহিত্যে তার চেয়ে বড় কেহ আর নাই। আমার শরীর বড় দুর্বল, যে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাতে এই যাহা এখন করিতেছি তাহাই আশ্চর্য। কিন্তু এই শরীরেও এতবড় পাপকে তো প্রশ্রয় দিতে পারিব না। তাই ভয় হয়, উহাতেই আমাকে শেষ করিবে।

আপনি আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি—

আপনাদের

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিবিধ

১. মুরলীধর বসুকে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯২৭]

৯৩।১ মাণিকতলা স্ট্রীট,
১০ই জানুয়ারী ১৯২৭
রবিবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। এই সামান্য ব্যাপারে আমার অনুমতি লইবার আবশ্যক ছিল না। ইহাতে আমাকে লজ্জা দিয়াছেন। কবিতাটি এক্ষণে আপনাদের সম্পত্তি, যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। 'বিদায় বাদল' পৌষ মাসে বা মাঘ মাসে হইতে আপত্তি কি? অন্ততঃ অসম্ভব নয়!

আপনাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪১]

ঢাকা
৯.১২.৪১

স্নেহাস্পদেষু,

হীরেন, তোমাকে তোমার পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই উত্তর দিয়াছিলাম—বই দুইখানি পাইবার ব্যবস্থাও তাহাতে ছিল। তারপর এ পর্যন্ত তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত ও চিন্তিত আছি।

আমি এবারে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি—এমন অবস্থা আমার আর কখনও হয় নাই। তোমাকে সামান্য একটু কাজের ভার দিয়াছিলাম, তুমি তাহাও করিলে না, অতিশয় মর্মাহত হইয়াছি। দুই প্রকাশকের নিকট ঠিকানা দিয়া বই পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম, তাহার কি হইল, সংবাদ তুমি লইতে পারিতে। 'হেমন্ত গোধূলি'র কোন সংবাদ আর এ পর্যন্ত পাই নাই। প্রকাশক (শ্রীমানী মহাশয়) কি করিলেন, পুস্তকের Review কি হইল, 'উত্তরা'র সুরেশই বা কি করিল, কিছুই জানিলাম না। 'হেমন্ত-গোধূলি' আমার নিজের এখনও ৫ খানি প্রাপ্য আছে।

আশা করি ভালই আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৪২]

38, Nilkhet Road
P. O.—Ramna, Dacca
16. 4. 42.

কল্যাণীয়েষু,

অনেক কারণে তোমার চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। একে শরীর খারাপ, তার ওপর নানা দুশ্চিন্তায় মনও ভাল নাই। কলিকাতার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতেও ভাবনার কারণ হইয়াছে। আমার বই দু'খানির একখানি ('স্বপন-পসারী') ছাপা অনেকদিন শেষ হইয়াছে কিন্তু এযাবৎ তাহার কোন সংবাদ নাই। দপ্তরী-সমস্যাতেই বোধ হয় আটকাইয়া গিয়াছে। অপর বইখানি মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে এমন আশা করিয়াছিলাম, এখন জানিলাম তাহার ছাপা বন্ধ করা হইয়াছে, কারণ প্রেসে লোকাভাব। ঐ একই কারণে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। এইসব কারণে মন আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

'স্বপনপসারী' এখনও পাইবার আশা আছে। পাইলেই তোমাদিগকে পাঠাইব। ভূমীনের ঠিকানা দিয়াছ বটে কিন্তু পুরা নাম দাও নাই এবং বাড়ীর নম্বরের সঙ্গে যে letter আছে তাহা কোন্ অক্ষর?—(জি) বোধ হয়? আমি তোমার চিঠি পাইলেই আবার বিস্তারিত লিখিব এবং ভূমীনকেও পত্র দিব। তোমাদের সংবাদ শীঘ্র দিবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

আর একটি কাজ নিশ্চয় করিবে।···ওখানে গিয়া ভাল করিয়া জানিয়া আসিবে আমার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' উহাদের নিকট পাওয়া যায় কিনা। একটু কায়দা করিয়া জানিতে হইবে কারণ বই আর নাই। ২।৪ খানা মাত্র থাকিতে পারে কিন্তু বোধ হয় উহারা তাহা জানাইবে না। তুমি জানিবার চেষ্টা করিও যে বইখানি out of print কিনা।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪. পরিমল গোস্বামীকে লিখিত

[নবেম্বর ১৯৪৩]

ঢাকা

৮. ১১. ৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই—আশা করি সেজন্য দুঃখিত হইবেন না। আমার বিজয়ার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

মাঝে অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম—এজন্য লেখা পাঠাইতে বড় বিলম্ব হইল। আশা করি, এখনও সময় আছে। আজ লেখা পাঠাইলাম। শীঘ্র প্রাপ্তি-সংবাদ দিবেন।

অসুস্থতাবশতঃ 'বঙ্গশ্রী'র প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারি নাই—আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু এত অল্প সময়ে হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। সজনীবাবুকে বলিবেন, তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষায় আছি—না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি। সংবাদ দিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[নবেম্বর ১৯৪৩]

বাগনান

৯.১১.৪৩

কল্যাণবরেষু,

হীরেন, তোমার চিঠি কলিকাতায়…র ঠিকানায় Redirected হইয়া আসে, অনেক পরে। গত প্রায় একমাসের ইতিহাস অতিশয় ঘটনাবহুল। এজন্য পত্রে আর কিছু লিখিলাম না। বর্তমানের সংবাদ মাত্র দিব।

আমি গত ৪।১১।৪৩ তারিখে ব্যারাকপুর হইতে কলিকাতায় এবং তথা হইতে এইখানে পৌঁছিয়াছি। উপস্থিত এইখানে বাস করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু এখনও একটা আমার উপযোগী বাসা পাই নাই। এখানে যে বাসায় আছি তাহা একটা পথপ্রান্তের দোকান ঘর বলিলেই হয়। শুইবার বসিবার স্থান নাই। এজন্য বড় কষ্ট পাইতেছি। তুমি যদি একবার এই অবস্থায় আমার সঙ্গে এখানে আসিয়া দেখা করিতে পার তবে সব অবগত হইবে। এখানে আসিবার ট্রেণ সকালে

কয়েকখানা আছে, বিকালে ও সন্ধ্যার দিকে যাইবার ট্রেণ আছে। ভাড়া ।৹ আনা। এ বাসায় রাত্রি কাটাইতে পারিবে না। একবার আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারো। আসিলে সুখী হইব।

আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ, সেইজন্যই আমি সর্বাপেক্ষা চিন্তিত ও অবসন্ন হইয়াছি। সাক্ষাতে সব জানিতে পারিবে। কবে আসিবে জানাইলে তোমার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

বাড়ী চিনিতে কষ্ট হইবে না। ষ্টেশন হইতে ২ মিনিটের পথ। প্লাটফর্ম হইতে বাহির হইলেই অদূরে ধান ক্ষেতের মধ্যে একটি ছোট সাদা বাড়ী দেখিতে পাইবে। ষ্টেশনের নীচেই বাজার। সেই বাজারের পথ ধরিয়া একটু চলিয়া আসিলেই বাঁ দিকে বাড়ী পাইবে। বাড়ীওয়ালার নাম দুলাল মিত্র।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আশা করি ভাল আছ।

নিত্যশুভাকাঙ্খী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৪৪]

বাগনান
২২. ৪. ৪৪

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার কার্ড পাইলাম। তোমার আশা আমি একরূপ ত্যাগ করিয়াছি। তোমার মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই। এখন তুমি আর একটা নেশায় ডুবিয়া আছ—আর কোন কর্তব্য তোমার নাই। প্রায় মাসখানেক পরে তুমি আমার সংবাদ লইতেছ এবং এখনও এত ব্যস্ত যে আমার সহিত সাক্ষাতের অবকাশ বোধ হয় হইবে না।

আমি গত ১৭।৪।৪৪ তারিখে ঢাকা হইতে ফিরিয়াছি। সেখানে খুব ভাল ছিলাম। এখানে আসিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিলাম। তোমার ঠিকানা এখন কি, তাহা না জানায় তোমার সংবাদ লইতে পারি নাই। আমার এখন অনেক কাজ; তোমার দ্বারা আর কিছু হইবে না বুঝিয়াছি।

নিশিকান্তর কবিতার খাতা কোথায় ফেলিয়াছি জানি না। ঢাকায় যাওয়ার পর সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া আমি এখন নানা কাজে ব্যস্ত, কবিতা

পড়িবার সময় নাই। বোধ হয় এখন হইতে ২।৩ মাস আমি এতরকমে ব্যস্ত থাকিব যে মরিবার সময় থাকিবে না।

তোমার জুতা এখনও আছে কিনা জানি না—সম্ভবতঃ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তোমার মাথা একেবারে খারাপ, নইলে এতদিন পরে জুতার খোঁজ করিতে না। জুতার প্রয়োজনই বা কি? খড়ম হইলেই চলিবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭. অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত

[জুন ১৯৪৪]

Bagnan P. O.
Howrah
1. 6. 44.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবন্ধগুলিও পৌঁছিয়াছে।

যদিও পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইতেছে তথাপি নানা রকমের ঝঞ্ঝাটে ও বহু চিন্তায় মনের অবসর একটুও নাই, সেজন্য লেখা প্রায় বন্ধ আছে। তার উপর অসহ্য গরমে প্রায় সমস্ত দিন মুহ্যমান হইয়া থাকি। তোমাদের 'বাসন্তিকা'র জন্য একটি পুরানো কবিতা (অপ্রকাশিত) একটু revise করিয়া পাঠাইতেছি। ঐ সঙ্গে 'পঁচিশে বৈশাখ' নাম দিয়া একটি ছোট বক্তৃতা (স্থানীয় রবীন্দ্র-উৎসবে পঠিত) পাঠাইতেছি। প্রবন্ধগুলি আরও দুই-এক দিন পরে ফেরৎ পাঠাইব।

তোমার জুতার সম্বন্ধে একটু কথা আছে—ইতিমধ্যে চামড়ার দাম খুব বাড়িয়া যাওয়ায় পূর্বের দামে জুতা পাওয়া যাইবে না— দাম প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে —অর্থাৎ ৭ টাকার স্থানে ৯৷৷০ টাকা বা ১০৲ টাকা পড়িবে। তুমি কি তাহা লাভজনক মনে কর? যদি কর তবে আমি জুতা করাইয়া দিতে পারি। কিন্তু পায়ে ঠিক ফিট করিল কিনা তাহা দেখিয়া লইবার উপায় নাই। সব বুঝিয়া আমাকে জানাইবে।

তুমি কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করিবে। আমার মন

আদৌ ভাল নাই। এখনও কোথায় থাকিব—কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের সংবাদ দিবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮. মাণিকচন্দ্র দাশকে লিখিত
[ডিসেম্বর ১৯৪৪]

Bagnan P. o.
(Howrah)
28. 12. 44

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার আর কোন সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত ও চিন্তিত আছি। আশা করি কুশলে আছ। পরীক্ষার পরে আমার এখানে আসিবার কথা ছিল—তাহার কি হইল?

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নিকট আমার বন্ধু গিয়াছিলেন—তাঁহার সৌজন্য ও আন্তরিকতায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বাড়ীটির সম্বন্ধে একরূপ কথা স্থির হইয়াছে। বাড়ীর মালিকও আমার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

তোমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশেষ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি—তিনি পত্রযোগে বক্তৃতা দ্বারা আমার মত old fossil-এর চৈতন্য সম্পাদন করবার আশা ত্যাগ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তোমার যে এমন বন্ধু আছেন, তাহা জানিতাম না। তাঁহার পত্রের আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না। তুমিই বলিও যে আমার সত্যই আর কোন আশা নাই—বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তিনি যেন ব'লকদিগের গুরুগিরি করেন।

আশা করি তুমিও আমার উপর শ্রদ্ধা হারাও নাই। তোমার জন্য অটোগ্রাফ্ ও ফটো ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৪]

বাগনান

৩০.১২. ৪৪

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine-ও পেয়েছি। এখন খুব ব্যস্ত আছি, অন্য কাজে। তাই পড়তে দেরী হবে।

তুমি যে একবারও আমার এখানে আসিবার সময় পাও না—এ আমার বিশ্বাস হয় না, তুমিও জানো যে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল কথা তুমি এখন আর এক রকম নেশায় ডুবে আছ।

আমার স্বাস্থ্য একটুও ভাল হয়নি। ম্যালেরিয়ায় ভুগে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। শীঘ্র এখান থেকে চলে যাব। উত্তরপাড়ায় একটা বাড়ী প্রায় ঠিক হয়েছে। এবার বোধ হয় সর্বদা দেখতে পাব।

শ্রীমানীর সঙ্গে অনেকদিন আগে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে টাকা ১০৷১২র হিসেব দিয়েছিল—আমি সেটা আর নিই নি। শুনলাম তোমায় বলেছে, আরও বেশী পাওনা হয়েছে। সত্য কি?

তোমার উত্তরপাড়ার ঠিকানা কি? তুমি এতদিন সেখানে রয়েছ, অথচ আমার জন্যে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে দিতে পারো না! শুনলাম অনেক ভাল ভাল বাড়ী প্রায়ই খালি হয়, সম্প্রতি এইরকম একখানা বাড়ী হাতছাড়া হয়ে গেছে। তোমার ভাবগতিক বুঝতে পারি নে।

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—আমি আগামী ১১।১।৪৫ তারিখে কলিকাতায় যাইব। সজনীর ওখানে বেলা ৩।৪ টায় দেখিতে পাইবে।

১০. মাণিকচন্দ্র দাসকে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯৪৫]

Bagnan P. o.
27.1.45.

কল্যাণবরেষু,

তোমার কার্ড পাইলাম। পূর্বে Book-Post পাইয়াছি। আমি প্রায় তিনসপ্তাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলাম। এখনও প্রায় শয্যাগত আছি—রোগমুক্ত হইলেও ভয়ানক দুর্বল।

তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই। আর তোমাদের বয়সের দোষ আছে—কোন বিষয়ে মতির স্থিরতা, কথা ও কাজের সঙ্গতি রক্ষা করা প্রায় সম্ভব হয় না। আমি একটি বিষয়ে সকল যুবককে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়া থাকি। কখনও এমন কথা কাহাকে বলিবে না—যাহা পরে রক্ষা করিতে পারিবে না। কথার সত্য রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এতবড় ধর্ম আর নাই। তুমি একটি গুরুতর বিষয়ে এই সত্য রক্ষা কর নাই—এমন কি সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছ। আমার শেষ পত্র আবার পড়িয়া দেখিও।

উত্তরপাড়ায় যে বাড়ীর আশা করিয়া আছি—সে বাড়ী এখনো মেরামত করা শেষ হইয়াছে কিনা, জানি না। শেষ হইলে আমাকে ভাড়া দিবার কথা ছিল। আমি এই অবসরে আর সংবাদ লইতে পারি নাই। তুমি জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে এ বিষয়ে সজাগ থাকিতে বলিও। তিনি যেন বাড়ীখানার দিকে দৃষ্টি রাখেন—আর কেহ না ভাড়া করিয়া লয়। আমি এখানে আর বেশিদিন বাস করা কর্তব্য মনে করি না।

আশা করি তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছ। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১১. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৫]

বাগনান

২২.৩.৪৫

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার আর কোন সংবাদ না পেয়ে দুঃখিত আছি। আমার জন্য তুমি কিরূপ চেষ্টা করিতেছ, তাহা জানিতে পারি নাই।

তোমাকে যে বইগুলি আমাকে পড়াইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহার মাত্র একখানি পাইয়াছি। আর কিছুই পাই নাই।

তুমি যে দুইখানি আমার বই ফেরৎ দিয়াছ তাহা পাইয়াছি।

Maugham-এর **Altogether** বইখানা এপর্যন্ত দেখলাম না। আরও কয়েকখানি বই দিবে বলিয়াছিলে। অন্ততঃ এটুকু তোমার কাছে আশা করি। কোন গুরুতর কাজ তুমি হয়ত পারিবে না, যদিও তোমার পারিতে ইচ্ছা আছে। উত্তরপাড়ার ঐ বাড়ীতেই কি শেষে আমাকে যাইতে হইবে?

ছেলের অবস্থা আরও খারাপ। কোন আশা আর নাই। আমার শারীরিক ও মানসিক চরম দুর্দশা চলিতেছে।

আশা করি ভাল আছ।

নিত্যশুভার্থী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১২. অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

Bagnan

Howrah

10.12.45

কল্যাণীয় শ্রীমান অক্ষয়,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম। মাঝে বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, প্রথমে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দিকাশি পরে আমাশয়, এ জন্যে প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক সেই সময়ে শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষের চিঠি পাই—তিনি অতি অল্পদিন মাত্র কলকাতায় ছিলেন, দেখা করা সম্ভব হল না; আমি আশা

করেছিলাম কোনরকমে দেখাটা হবে, কিন্তু এমনই অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে Radio engagement-ও রক্ষা করতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার ছিল—অনেক কিছু জানবার ছিল। তিনি লিখেছিলেন আবার শীঘ্র আসবেন, এবার এলে যেন একটু আগে সংবাদ পাই।

তোমার ভাই অবিনাশের অসুস্থতা এবং পরে আরোগ্যলাভ এবং তার চাকরীর সংবাদে খুবই আনন্দিত হলাম। সে যে বড় ভাল ছেলে তা আমি জানতাম—তোমরা যে কি রকম struggle ক'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছ, তা'ও জানি। অবিনাশের এই চাকরিটি তোমাদের প্রথম সাফল্যলাভ। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এখন থেকে তোমাদের যেন ক্রমেই সবদিকে উন্নতি হয়।

আমার বৈষয়িক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছে—প্রধান কারণ অবশ্য আমার নিজের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ। যদি সুস্থ থাকতাম, তাহলে আমার কোন চিন্তার কারণ ছিল না। এই বৈগুণ্যও কম নয়, সর্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এখানে আমার আত্মীয় বা বন্ধুও কেউ নেই—এমন দুর্দিনে আমার এই অবস্থায়, আমাকে যে কোন সাহায্য করে বা পরামর্শ দেয় এমন কেউ নেই। তার উপর আমার নিজের চরিত্রই এমন যে, সাংসারিক বা সামাজিক কোন বুদ্ধি আমার পক্ষে অসম্ভব—কখনও ছিল না, এখনও নেই। অন্যদেশ হলে আমার মত লোকের উপকার করবার জন্যে অনেক মানুষ পাওয়া যেত—এদেশে উপকার করা দূরের কথা—একদল ঈর্ষা করে। আর একদল আমাকে সর্বপ্রকারে exploit করবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে। এই সময়ে আমি কয়েকটা বড় আঘাতও পেয়েছি—একটা বড় শোক পেয়েছি; আর, এমন ব্যক্তির কাছে এমন হৃদয়হীন ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি যে শুধুই ব্যথিত নয়, ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি—আমার সাহিত্যিক জীবনে সে একটা বড় আঘাত। আমার স্বভাবে একটা ঔদাসীন্য আছে বলেই আমি এ সব দুঃখ বহন করতে পারছি। তার উপর, আমি এখন এক রকম অজ্ঞাতবাস ও বনবাসে আছি—নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব অবস্থায়, তবু একেবারে ভেঙ্গে পড়িনি, এখনও আশা ত্যাগ করি নি। কিন্তু কত দিন এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব তা জানিনে।

সম্প্রতি আর এক দুঃসংবাদ পেয়েছি—ঢাকা বোর্ড থেকে আমার 'কাব্য-মঞ্জুষা' পরিত্যক্ত হয়েছে, তার স্থানে পার্বতীবাবুর বই নেওয়া হয়েছে। অনেকদিন যুদ্ধ চলেছিল—কিন্তু আমার Publisher ততটা ধূর্ত ও কৌশলী নয় বলে পরাস্ত হয়েছেন। এর ফলে আমার একটা আয় বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের এখন যে অবস্থা তাতে উপস্থিত কোন আশা নেই। বইগুলি ছাপানো

কম দুরূহ নয় ; সুরেশ অতিশয় চতুর ; সে আমার সব বইগুলি আটকে রাখতে চায়, কিন্তু ছাপাবার কোন তাড়া নেই—তার অনেক কাজ। তুমি বোধ হয় জানো, আমি একটি সম্পূর্ণ নূতন Publishing firm প্রতিষ্ঠা করবার কল্পনা করেছিলাম। তার নাম দিয়েছিলাম 'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়' ; এই গ্রন্থালয় থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ ছাড়া আর কিছু প্রকাশিত হবে না। একজন উদ্যোগী ও আদর্শ-বোধসম্পন্ন অর্থশালী যুবক এ কার্যে ব্রতী হয়েছেন। যুদ্ধের গোলমালে ও নানা কারণে তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। সে এইবার আবার আমার শরণাপন্ন হয়েছে, এবং এবার আন্তরিক আগ্রহে ও পূর্ণ উদ্যমে ঐ কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আমি তাহাকে আর একটা chance দিব—যদিও কাহাকেও আর বিশ্বাস করি না। সে আমার নির্বাচিত, প্রণীত ও সম্পাদিত বই ছাড়া আর কোন বই প্রকাশিত করিবে না। আমার যাহা কিছু উপস্থিত প্রকাশযোগ্য আছে তাহা, এবং সম্পাদিত কাব্য, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন সে ছাপিবে—একখানি বাংলা কাব্য-সঞ্চয়ন ছাপিবার জন্য সে বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। সে নিজে ইংরেজী সাহিত্যে এম,এ, পাশ করিয়াছে—কাজেই একটু জ্ঞান আছে। আমি আর একবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তুমি কি তাহাই উচিত মনে কর না ? Reader—রচনার জন্য আমার ঢাকার ঐ publisher অনেকদিন হইতে তাগিদ করিতেছে। ঐ বিষয়ে তোমাদের মতই বোধ হয় ঠিক ; কিন্তু আমি অনিশ্চিতের জন্য আর কোন পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক নই। শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলে খুব ভাল হইত।

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। শ্রীমতী স্নলতার সংবাদ দিবে। তাহার জন্য একটি Testimonial লিখিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম—তাহাকে দিবে। আশা করি যাহা লিখিয়াছি তাহাই ঠিক, এবং তাহাতেই তাহার কাজ হইবে। সে আমাকে যে গুরুপ্রণামী দিবে—তাহা যেমনই হোক, খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু বস্তুটির যে নাম করিয়াছ, তাহাতে কৌতূহল হইয়াছে—Book-case ত' একটা ভারী জিনিষ, ডাকে আসিবে কেমন করিয়া ? আমাকে বেশ একটু সমস্যাকুল করিয়াছে। তাহাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে—তুমিও জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৩, অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত

[জানুয়ারি ১৯৪৬]

Bagnan P. O.
24.1.46

স্নেহাস্পদেষু,

অক্ষয়, তোমার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হইল। তোমার পত্রে তুমি আমার সম্বন্ধে যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছ তাহা স্বাভাবিক। একে স্বাস্থ্য কিছুতেই একটু ভাল হইতেছে না, তার উপর সাংসারিক সমস্যা সর্বপ্রকারে জটিল হইয়া উঠিতেছে; তাই আমি ক্রমেই বড় অবসাদগ্রস্ত হইতেছি। একটি আত্মীয় বা বন্ধু নাই, যাহার নিকট পরামর্শ বা সাহায্য পাইতে পারি। এই ভাবে আর কতদিন অকর্মণ্য হইয়া থাকিব জানি না।

মধ্যে একটু আশা হইয়াছিল—একটা Publishing Business-এর অধ্যক্ষ-রূপে কিছু কাজ করিতে পারিব, এখনও সে আশা একেবারে দূর হয় নাই—Paper Control-এর জন্য কাজ আরম্ভ করা যাইতেছে না। কাগজ পাওয়া গেলেই আমার প্রায় পাঁচখানি বই—একে একে ছাপা আরম্ভ হইবে—যিনি এই কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক একরকম পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে—তাঁহার দিক হইতে সঙ্কল্পচ্যুতির কোন কারণ নাই—আমি সে বিষয়ে আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। এইটি যদি কার্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনের একটা বড় কাজ অন্তত: কিছুও সম্পন্ন করিতে পারিব—ধর্মের সঙ্গে কিছু অর্থও মিলিবে। কিন্তু শুনিলাম Paper Control আরও কিছুদিন—September পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে বুঝিতেছি আমার গ্রহদোষ এখনও কাটে নাই। এদিকে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের যে অবস্থা, তাহাও আমার পক্ষে শুভ নয়। কলিকাতা য়ুনিভর্সিটি—তাহাদের এ বৎসরের Girish Chandra Ghose Lecturership আমার উপরেই চাপাইয়াছে। ওদিকে আমার 'কাব্যমঞ্জুষা' ঢাকা বোর্ড হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে—তাহা বোধ হয় শুনিয়াছ। সময়টা যে খুব খারাপ তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষ মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিলাম, তিনি আমার 'মধুসূদন'-এর জন্যই খুব আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে বলিবে দেখা করিও) যে, ঐ বই তাঁহাকে দিবার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি

যেন সে আশা না করেন। তুমি কি তাঁহাকে বল নাই? তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুঃ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৪. সত্যেন জানাকে লিখিত
[মে ১৯৪৬]

বাগনান—পোঃ
ইং ১৪.৫.৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কাল নলিনীও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সব বলিয়া দিয়াছি। শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে। যদি বেশি অসুস্থ না হই, তবে ঐ দিনই আমি যাইব। আমার খাওয়ার জন্য কিছুই করিতে হইবে না। কেবল একটু দুধ এবং সাবু (রাত্রের জন্য) যোগাড় করিয়া রাখিবেন। সকালে একটু গঙ্গাজল চাই। বোধ হয় তাহা পাওয়া যাইবে; সামান্য একটুখানি মাত্র।

আমার রাত্রে ঘুম হয় না। একটু খোলা হাওয়ায় মুক্ত স্থান হইলে ভাল হয়।

ঐ দিন বিকাল বা সন্ধ্যায় সেখানকার সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক ভাবাপন্ন শিক্ষিতমণ্ডলীর সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনা করিব। সভার মত নয়, বৈঠক। পরদিন সকালে আরও ক্ষুদ্র একটি আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করিবেন।

আশা করি আপনাদের কুশল। আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৫. অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সেনশর্মাকে লিখিত
[জুন ১৯৪৬]

বাগনান
18.6.46

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। এ পর্যন্ত উত্তর দিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। তোমাদের খবর মাঝে মাঝে পাইলে সুখী হই—ভাল খবর পাইলে আনন্দ হয়।

আমার অবস্থা ক্রমেই আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তার কারণ আমি এতই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি যে, কোন কাজ করিবার শক্তি যেন আর নাই। অথচ আমার এখনই retire করিয়া বিশ্রাম ভোগ করিবার অবস্থা নয়—রীতিমত জীবিকা-অর্জনের জন্য পরিশ্রম করিবার কথা। আমার অবস্থায় যাঁহারা যেখানেই retire করিয়াছেন. তাঁহারাই কোন না কোন একটা চাকরী করিতেছেন—অথচ তাঁহাদের সকলেরই অবস্থা আমার চেয়ে অনেক ভাল। আমি প্রথমে অনেক আশা করিয়াছিলাম—আশা করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল ; যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন অর্থাভাব ঘটিবে না, এমন বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা এমনই প্রতিকূল যে আমার মত ব্যক্তির পক্ষে যাহা সহজ ও সম্ভব—সেই জীবিকা-কর্মও অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। আমাকে এই বয়সে যদি সাহিত্যের আদর্শ ও আমার স্বধর্ম-ত্যাগ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি করিতে হয়, তবে আমার পেটও ভরিবে না, ধর্মও নষ্ট হইবে। কিন্তু উপায় কি? এই চিন্তায় আমি আরও অবসন্ন হইয়াছি—এবং সেই কারণেই আমার স্বাস্থ্য আরও দ্রুত নষ্ট হইতেছে। একটি বন্ধু বা আত্মীয় নাই—সহায়-সম্পদ একেবারে নাই। যাহার উপর সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করিয়াছিলাম—সেও আমাকে এই অবস্থায় অতিশয় কদর্য ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই ধাক্কাও আমাকে খুব বিচলিত করিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহা সহ্য হইয়া আসিতেছে। বই অনেক লিখিবার আছে—এত কাজ করিবার আছে যে, এখনও ২০।২৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে তবে তাহা শেষ করিতে পারি। কিন্তু এখন তো' সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন চাই—সেই ভাবনা আমার সকল শক্তি হরণ করিতেছে।

নিজে একটি পুস্তক-প্রকাশের firm প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় ও সুযোগ এখনও রহিয়াছে—এবার তাহা আরও নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাগজ ও publishing-সংক্রান্ত আইনের চাপে এ পর্যন্ত কিছুই হইতে পারে নাই, আজ প্রায় ৬ মাস সব বন্ধ হইয়া আছে, এই নূতন Publishing Business-টিকে খাড়া করিবার একটা প্রধান কারণ, উহা সম্পূর্ণ আমার অভিপ্রায় ও আদর্শমত পরিচালিত হইবে—আমার মনোনীত ও সম্পাদিত বই ভিন্ন আর কিছুই ছাপিতে পারিবে না—এইরূপ সর্তে আমি উহাকে সাহায্য করিব, এই চুক্তি আছে। ইহা আমার জীবনেরও একটা বড় কাজ। বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিবার ঐ একটি মাত্র উপায় আছে, এবং তাহা বর্তমানে আমি ছাড়া আর কেহ করিবার নাই। কিন্তু বিধি বাদী ; আমি কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছি না। এমন সুযোগ বোধহয় আর হইবে না, কারণ যে এই কর্মে ব্রতী হইতে চায়, তাহার অর্থ-

সামর্থ্যও যেমন আছে তেমনই নিজে শিক্ষিত (M.A.B.L.) বলিয়া তাহার একটা বড় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে—তাহার আগ্রহও আমার চেয়ে বেশী। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ক্রমে নিরাশ হইয়া পড়িতেছি। এদিকে আমিও একরকম বেকার।

অনিলবাবুর প্রস্তাবে আমি খুবই উৎসাহিত হইয়াছিলাম—তাঁহার terms যদিও আমার পক্ষে খুব লোভনীয় নয়, তথাপি এরূপ একটা চুক্তির তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে আমার বহুদিনের চিন্তা কিছু লিখিয়া রাখিতে পারিব,—এই আশায় আমি সম্মত হইয়াছি। উপস্থিত 'কপালকুণ্ডলা'র একটি ছাত্র-পাঠ্য সমালোচনা, পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিবার ভার লইয়াছি। ঐ সঙ্গে একখানি বাংলা স্কুলপাঠ্য রীডার লিখিতেও হইতেছে, তাহা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। অনিলবাবু আমার বিলম্ব দেখিয়া বোধ হয় ক্ষুণ্ণ এবং বিরক্ত হইয়াছেন। কারণ, তিনি আর আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন না। অথচ, আমি তাঁহার নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়াছি। আমার অবস্থা বুঝিতেই পারিতেছ। এই সময়ে আমাকে এত রকমের অতিশয় urgent কাজ করিতে হইতেছে যে, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। দুই-তিন খানি বই-এর প্রুফ দেখা—পরীক্ষার কাগজ, Cal. University-র দুইখানি Thesis (বিনামূল্যে) এবং 'কাব্যমঞ্জুষার' নূতন সংস্করণের notes লেখা। আমি অনিলবাবুকে ওই Reader-এর গদ্য-অংশ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়াছি—ওই পদ্য-অংশ পাঠাইতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া 'কপালকুণ্ডলা' আরম্ভ করিব—উহা শেষ করিতে বেশি বিলম্ব হইবে না। Reader-খানির জন্য আমাকে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—কাঁচি কাটা কাজ নয়, প্রত্যেক রচনাটি আমাকে revise করিয়া দিতে হইয়াছে—প্রায় অর্ধেক আমাকেই লিখিতে হইয়াছে। নির্বাচন-কর্মটিও যে কত পরিশ্রম-সাপেক্ষ তাহা অনেকেই বুঝিবে না। যে লেখাটি নির্বাচন করি, দেখি সেইটা আর কেহ না কেহ ইতিমধ্যেই আত্মসাৎ করিয়াছে। আমি প্রায় ১০।১২ খানি এরূপ পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিয়াছি। কাজেই আমাকে নিজেই নূতন 'রচনা' প্রায় সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যতগুলি বই দেখিলাম তাহার কোনটারই কবিতা-নির্বাচন ভাল নয়। আমি এই নির্বাচন বা চয়ন কাজটি এতই নূতন আদর্শে ও নূতন styleএ-করিয়াছি, যে যাহাদের একটু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে—এই পুস্তক বাহিরে দেখিতে যেমন হউক. ভিতরের বস্তুতে সম্পূর্ণ নূতন। এখন কবিতাগুলি পাঠাইতে পারিলেই আমি মুক্তিস্নান করিতে পারিব।

Manuscript কপিও আমাকেই করিতে হইতেছে। অথচ পুস্তকে আমার স্বত্ব এবং আমার প্রাপ্য কিরূপ তাহা এখনও স্পষ্ট জানি না। অনিলবাবু নিজে ঐ Series-এর বই লিখিয়াছেন—জানিলে আমি ঐ কাজে হাত দিতাম না। তবে, এখন আমার একটা Idea হইয়াছে, আমি সম্ভবতঃ বাকি তিনখানিও রচনা করিব।

তুমি এ সম্বন্ধে অনিলবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে ভাল হয়।

তোমার Radio-র চাকরির চেষ্টার কথা জানিতাম না—না হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। ও চাকরি তোমার উপযুক্ত নয়। সময় না হইলে কাহারও কিছু হয় না। মথুরও খুব কষ্ট পাইতেছে। আমি আশা করি, তোমার কামনা অনুযায়ী কর্ম বা বৃত্তি তুমি লাভ করিবে। শুনিলাম D.U.তে তোমার একটা চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—এখনও আছে কিনা জানি না। আমাকে সে বিষয়ে সংবাদ দিও।

তুমি আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুনঃ—অনিলবাবুর পত্র পাইয়াছি। তাঁহার কোন দোষ নাই। তিনি ঢাকায় ছিলেন না।

১৬. অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত

[জানুয়ারী, ১৯৪৭]

বাগনান পোঃ

(হাওড়া)

৮ মাঘ, ১৩৫৩

প্রীতিভাজনেষু,

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানিবেন।

সম্প্রতি আমি একটি সমস্যায় পড়িয়াছি; সেইজন্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ আপনার অজ্ঞাত নয়। 'ছন্দোমীমাংসা' নামে একখানি গবেষণা-গ্রন্থের কিয়দংশ P. R. Studentship-এর

জন্য আমাকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমার সহিত যুগ্মপরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। আমি ঐ গবেষণা মঞ্জুর করি নাই। তাহার ফলে পুনর্বিচারের জন্য আপনাকেও এবার তৃতীয় বিচারক করা হইয়াছে, দেখিতেছি। ইহাতে বুঝিতেছি—শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় উক্ত গবেষণা মঞ্জুর করিয়াছেন; এক্ষণে তিনজনের দুইজন করিলেই গবেষক বেচারী উদ্ধার হয়। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত যে ব্যাপার আছে তাহা আপনাকে জানাইতে চাহি না; আমি কেবল ইহাই ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ করিয়াছি, যে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় অতিশয় সুপণ্ডিত হইলেও 'ছন্দ' বিষয়ে তাঁহার বিশেষজ্ঞতার কোন পরিচয় আমি অবগত নই; তাঁহাকে ঐ বিষয়ের বিচারক করা হইয়াছিল কেন? আপনাকেই প্রথমে করিলে সঙ্গত হইত না কি?

জানি না, আপনি ইতিমধ্যেই আপনার মত জানাইয়াছেন কি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, এরূপ ক্ষেত্রে আপনি পূর্ব পরীক্ষকগণের রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইতে পারেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত। শ্রীযুক্ত গুপ্তমহাশয় কি কারণে উহা মঞ্জুর করিয়াছেন, আমিই বা কি কারণে উহা বৃত্তিদানের যোগ্য মনে করি নাই—ইহা জানিলে, আপনার যুক্তিগুলি আরও দৃঢ় হইতে পারিবে। আপনি যদি তাহা করেন, তবে আমার মনে হয়, বিচারকাজটি সুসম্পন্ন হইবে। এ সকল বিষয়ে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির কার্যপদ্ধতি বা নীতি আপনার অজ্ঞাত নয়; যাহাতে সেই পদ্ধতি বা নীতি যতদূর সম্ভব ন্যায়নিষ্ঠ থাকে সে বিষয়ে বাহিরের পণ্ডিতসমাজেরও কর্তব্য আছে বলিয়া মনে করি। সেই কর্তব্যবোধেই আমি আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আশা করি আপনি অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভুল করিবেন না।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৭. অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত

বাগনান

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি আপনার ঐ পরীক্ষাকর্ম সম্বন্ধে যে সুবিধা-অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতিশয় যথার্থ—আমি ইহাই চিন্তা করিয়া

আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু একটা বিষয়ে আপনি এখনও সঠিক অবগত নহেন, দেখিতেছি। 'ছন্দোমীমাংসা'র দুইখানি থীসিস-ই বহুপূর্বে দেখা ও রিপোর্ট করা হইয়া গিয়াছে! দ্বিতীয় খণ্ড আমার নিকটে অনেকদিন পড়িয়াছিল—আমি এই খণ্ডের সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশের পূর্ব্বে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকে তাহা জানাইয়াছিলাম। তিনিও তাহাতে খুসী হইয়াছিলেন, এবং সেইরূপ সাক্ষাতের ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ও দিকে Registrar বার বার Reminder দেওয়ায় আমি আমার Report পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ইহার অনেক পরে আমাকে জানানো হয় যে, ঐ দ্বিতীয় খণ্ডের পুনর্বিচার আবশ্যক হওয়ায় এবার আপনাকে তৃতীয় পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ খণ্ড আমাকে পুনরায় পাঠানো হইবে। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমি আপনাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলাম। অতএব পূর্ব পরীক্ষার Report অনেক পূর্বেই য়ুনিভার্সিটির হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা, সম্ভবতঃ, দুইজনের মধ্যে মতভেদ হওয়ায়, আপনাকে তৃতীয় বিচারকরূপে খাড়া করিয়াছেন, তাহাতে একটা majority লাভের সুবিধা হইবে। এখন বোধ হয় আপনি সব অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের উপরে যে Report দিয়াছিলাম তাহার প্রতিলিপি খুঁজিয়া পাইলাম না, কিন্তু তাহাতে আপনার অসুবিধা হইবে না, দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটা নকল পাঠাইতেছি—উহাতেই সব কথা আছে। আপনি এইখানি পড়িয়া আমাকে ফেরত পাঠাইবেন, কারণ, আমার আর কোন কপি নাই। আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই আপনার মত ব্যক্ত করিবেন ইহাই আমার বিশ্বাস, আপনার সেই মত আমার সহিত মিলিবার হয় মিলিবে, না মিলিলেও তাহা আমার যুক্তিগুলির সাহায্যেই আরও দৃঢ় হইতে পারিবে। আপনি আমার সেই যুক্তিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনার মতটিকে আরও যুক্তিপূর্ণ করিতে পারিবেন। আমার সন্তোষ তাহাতেই হইবে।

আপনাকে আর একটি প্রয়োজনে পত্র লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। 'বিশ্বভারতী'র সহিত আমার কোন পরিচয় নাই, অথচ থাকা প্রায়োজন বোধ করিতেছি। আপনি যদি মধ্যস্থ হইয়া সেই পরিচয় রক্ষা করেন, তবে বড়ই উপকৃত বোধ করিব। আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম বাংলাসাহিত্যের একটা বড় কাজ শেষ জীবনে সাধ্যমত করিবার অবসর পাইব, তাহা, বোধ হয়, আর

হইবে না। আধুনিক (এবং প্রাচীন ক্লাসিকগুলির) বাংলা পদ্য ও গদ্য রচনার—ছোটগল্প, কবিতা, ও প্রবন্ধ—প্রভৃতির চয়ন ও সম্পাদন করিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি ও সাহিত্যশিক্ষাও যেমন উন্নত, তেমনই, বাংলাসাহিত্যের প্রকৃত পরিচয়টিকে উদ্ধার করা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। এই কাজটি না করিলে—কেবল সাহিত্য সমালোচনা করিলেই বাংলাসাহিত্যের অরাজকতা ঘুচিবে না। ইংরাজীতে যেমন G. T. S. (Golden Treasury Series) ছিল, বাংলাতেও তেমনই ঐরূপ একটা Series ঠিক ঐ ভাবে সম্পাদন করিলে বাঙালীর জন্য সুপথ্যের একটি ভালো ব্যবস্থা হইবে। আমার আর সে শক্তি নাই, তবু নমুনাস্বরূপ দুই একখানি ঐরূপ চয়ন ও সম্পাদন করিবার দুঃসাহস ও দুরাশা করিতেছি। প্রথমেই বাংলা কবিতার একটি ভাল সঞ্চয়ন যথাসাধ্য (আমার আদর্শমত হইবে না) সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। উহার পরেই, একটি 'প্রবন্ধসঞ্চয়'-ও সম্পাদন করিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই দুইটির জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ দুই-ই সন্নিবিষ্ট করিবার অনুমতি চাই। কবিতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে না—অন্ততঃ ১৫টি লিরিক, হয়ত আরও বেশি, না লইলে ঐরূপ গ্রন্থ অঙ্গহীন হইবে। প্রবন্ধও অন্ততঃ ৫টি চাই। Palgrave-এর আদর্শে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সংখ্যা উহার কম হওয়া উচিত নয়—তাহাতে Wordsworth-এর মত কবির কবিতাসংখ্যা—৩৮; অতএব রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতা তাহার তুলনায় কত বেশি হওয়া সম্ভব! আমার মনে হয়, অন্ততঃ ২০টিও থাকা উচিত। আপনি এ বিষয়ে 'বিশ্বভারতী'র অনুমতি যদি করাইতে পারেন, তবে আমার এই কাজটি সুসম্পন্ন হইবে; নতুবা, হইবে না। 'বিশ্বভারতী' যদি এই কাজ বাংলাসাহিত্যের জন্য আবশ্যক মনে করেন, এবং বর্তমানে আমাকে সেই কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে এইরূপ অনুমতি দেওয়াই তাঁহাদের কর্তব্য হইবে। কারণ, আমার এই কর্মও একটা যজ্ঞকর্ম—আমি সাহিত্যের ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করিব না—বাংলাসাহিত্যেরই একটি গুরুতর অভাব পূরণের জন্য, আমার এই অতি দুর্বল—বোধ হয়, অন্তিম অবস্থায়—এই কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। যদি তাঁহাদের অনুমোদন না থাকে, তবে বড়ই দুঃখের, এমন কি লজ্জার বিষয় হইবে। আপনি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিলে বাংলাসাহিত্যেরই উপকার করা হইবে।

আশা করি, সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও স্নেহসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৬, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭]

বাগনান

১৮।২।৪৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পাইয়া সুখী ছিলাম।

আমার লেখা আপনি পাঠ করেন এবং তাহার রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জানিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। নেতাজীর ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—বইখানির "ভিতরটা" কেমন হইয়াছে? সে কথা লেখেন নাই—হয়ত এখনও পড়িতে পারেন নাই। "বঙ্গ সাহিত্যের ট্রাজেডী"র প্রথম ভাগ "অপূর্ব হইয়াছে", দ্বিতীয় ভাগ অনুরূপ হইয়াছে? তাহাতে বুঝিতেছি মূল বিষয়টির আলোচনা সুসম্পন্ন হয় নাই; কারণ উহা একটি বিচারমূলক প্রবন্ধ এবং কোন বিচারই আংশিক সুন্দর হইতে পারে না। আপনি বোধ হয় ঐ রচনার সাহিত্যিক রসটিই উপভোগ করিয়াছেন—বিচারটা বাদ দিয়াছেন। উহাতে আমি কৌতুক বোধ করিতেছি।

আপনার মহাকাব্যখানি শুনিতে খুব আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু আমাকে আপনি কোথায় পাইবেন? কলিকাতায় বড় একটা যাই না, গেলেও অন্য কাজে এবং দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকি। যদি তেমন সুযোগ-সুবিধা শীঘ্র হয় তবে আপনাকে জানাইব। কিন্তু আপনার ঐ কাব্যপাঠের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন।

ইতি—ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৭, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৭]

Bagnan P. O
(Howrah)
1. 3, 1947

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। বাংলাকবিতা চয়নের যে সংকল্প করিয়াছি তাহাতে আপনার ঐ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া সুখী হইলাম। এখনও

কাজ আরম্ভ হয় নাই নানা কারণে স্থগিত রাখিয়াছি—শুধুই ঐ কাব্য-সঞ্চয়ন নয় বাংলাসাহিত্যের নানাবিধ সম্পাদন-কর্মের একটা plan অনেক দিন যাবৎ করিয়াছি। এক্ষণে একজন উপযুক্ত publisher চাই, তাহারও চেষ্টায় আছি এবং সম্ভবতঃ মিলিবে—খুব আশা করিতেছি। তা ছাড়া আমি বর্তমানে আরও দুইখানি গ্রন্থের সম্পাদনে ব্যস্ত আছি—একখানি (বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা') শেষ করিয়াছি, দ্বিতীয়খানি—বোধ হয় নাম শুনিয়াছেন 'অভয়ের কথা' লইয়া খুব পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ইহার পর আমি ঐ কাব্য-সঞ্চয়ন আরম্ভ করিব। বর্তমান যুগের (রবীন্দ্র-যুগের) কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা নির্বাচন করিয়া উপস্থিত 'দ্বিতীয় খণ্ড' নামে সম্পাদন করিব। প্রাচীন কবিতার জন্য 'প্রথম খণ্ড' পরে প্রকাশিত করিব। কিন্তু এই কাজ আমার আদর্শ অনুযায়ী হইবে না, কারণ, সে পরিশ্রম করিবার শক্তি আর নাই। উহার জন্য গত ৫০ বৎসরের সমস্ত মাসিক পত্রিকা তন্ন তন্ন করিয়া সকল কবি ও কবিতার সন্ধান করা কর্তব্য—অখ্যাতনামা বহু কবির এমন একটি কবিতাও থাকিতে পারে যাহা বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত। তথাপি সেরূপ কিছু চেষ্টাও করিতে হইবে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে বাংলার প্রবীণ কাব্যরসিকদের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে—যাঁহারা নির্ভরযোগ্য তাঁহাদের নিকট হইতে তেমন কবির তেমন কবিতার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা সত্যকার কাব্যরসিক এবং কবি বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত এমন কবিতা পড়িয়াছেন যাহা তাঁহাদের বড় ভাল লাগিয়াছে এবং স্মরণ আছে। আমার ভয় হয়, যাঁহারা নিজে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা পারিবেন না—কারণ তাঁহাদের প্রায়ই পরের কবিতা সম্বন্ধে কোন কৌতূহল বা শ্রদ্ধা প্রায় থাকে না। যাই হোক, আমি আপনাকে আমার ঐ সম্পাদন-কর্ম সম্বন্ধে একটু আভাস দিলাম। কাজটি খুবই গুরুতর—তার কারণ, বাংলাসাহিত্য মুখ্যতঃ কাব্যসাহিত্য, এবং ভাল-মন্দ-মাঝারি কবির সংখ্যা বেশী। বালুকারাশির মধ্য হইতে স্বর্ণকণিকা আহরণ করার মত একাজ যেমন পরিশ্রম, তেমনই দৃষ্টিশক্তিসাপেক্ষ।

থীসিস্ সম্বন্ধে আমি আর কোন চিঠি (য়ুনিভার্সিটি হইতে) পাই নাই। আপনি আপনার কাজ করুন। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা দেখিলাম। তিনি উহার সম্বন্ধে অতিশয় সাধারণ ভাবে যে মন্তব্য ও প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমিও সরূপ প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু 'ছন্দোমীমাংসা'র 'মীমাংসাটা'ই বড় কথা—

তাহা যদি কোন দিক দিয়া হইয়া থাকে, তবে একটা বড় কাজ হইয়াছে বলিতে হইবে। পরিশ্রম, পড়াশুনা ও পাণ্ডিত্য—এ তিনেরই যথেষ্ট পরিচয় উহাতে আছে, কিন্তু argument ও বিচারবুদ্ধির এমন একটা অন্ধ স্বমত-নিষ্ঠা দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত hopeless বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যবিধ কাজ কিছু হইয়াছে কিন্তু মূল সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে—ইহাই আমার আপত্তির কারণ। আপনি যদি থীসিস্‌টি কোন কারণে মূল্যবান মনে করেন—তাহাতে আমি খুসী হইব, কিন্তু ঐ ধামালি-বাদ যে কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সে পক্ষে লেখকের যুক্তিও কি অতিশয় দুর্বল নহে? আরও দেখিলাম, ভদ্রলোক অমূল্যধনকেও কোন কোন বিষয়ে শিরোধায করিয়াছেন। যাই হোক্, আপনি যদি এ থীসিস্‌টি কোন হিসাবে মূল্যবান বিবেচনা করেন, তবে আমি তাহাতে খুসীই হইব। আপনার report আমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। অতুল গুপ্ত মহাশয়ের রিপোর্ট এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম। আমাব প্রীতি-সম্ভাষণ ও কুশল কামনা জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২০. অধ্যাপক অক্ষয় কুমাব সেনশর্মাকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৭]।

Kailash Chandra Ghosh Road
Baidyapara
Barisa P. O.
(24 Pargs.)
19. 3. 47.

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান অক্ষয়,

তোমার দুইখানি চিঠিই পর পর পাইয়াছি—বাগনান হইতে চলিয়া আসায় তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইয়াছে।

তুমি Radio-পত্রিকার ঐ চাকরিটির যে qualification-এর copy পাঠাইয়াছ তাহাতে, এবং অন্য অনেক কারণে, ঐ পদের জন্য চেষ্টা করিতে নিষেধ করি। আসলে উহা একজন experienced Sub-editor (কলিকাতার

কোন সুপরিচিত সংবাদপত্র—মাসিক বা সাপ্তাহিক)-এর পক্ষে সুলভ হইবে; তেমন অনেক আছে, তুমি Competition-এ পারিবে না। যদি তোমাকে কেহ সঙ্গে লইয়া হাতে ধরিয়া কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিত, তবেই তোমার পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমি তো তেমন কোন মুরুব্বি তোমার দেখিতেছি না। কেবলমাত্র Testimonial-এর কোন মূল্য নাই; আমার যেটুকু সম্মান আছে তাহা ঐ Radio-সংক্রান্ত দুর্জনদের নিকটে নাই—আমি নিজের সম্পর্কেও তাহা বুঝিয়াছি। তুমি যে experience-এর দাবী করিতে পারো, তাহা ওখানে গ্রাহ্য হইবে না—ইহা নিশ্চিত।

আমি তোমাকে যে Testimonial দিয়াছি, আবশ্যক হয়, তাহারও অধিক লিখিয়া দিব। তুমি যদি অন্যত্র কোন কাজের সন্ধান পাও আমাকে জানাইও। কলিকাতায় কোথাও কোন কাজ পাইতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকিয়া চেষ্টা করিতে হইবে—তখন আমি সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিতে পারিব।

তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১. সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৭]

Kailas Chandra Ghosh Road

Baidyapara

Barisa P. O.

(24 Pargs.)

31. 3. 47.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কলিকাতায় যা অবস্থা, তাহাতে মনে হয় কাজকর্ম এখন স্থগিত আছে। দেখা-সাক্ষাতের সুবিধাও হইবে না।

তথাপি আপনার জন্য আমি দুইটি লেখাই প্রস্তুত রাখিতেছি—একটি "বর্তমান" শীর্ষক সনেট। আরেকটি ওই "কপালকুণ্ডলা"র ভূমিকা। শেষোক্ত রচনাটিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিতে হইবে—কারণ প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় দুই সংখ্যায় বাহির হইতে পারিবে না—এক সংখ্যার পক্ষে কিছু দীর্ঘ হইবে। আমি

উহার কিঞ্চিৎ-অধিক অর্ধাংশ পৃথক কপি করাইয়া দিব। আপনার ছাপা কি এখন চলিতেছে?

আশা করি শারীরিক ভালো আছেন। আমার স্নেহসম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২২. রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৪৭]

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ রোড
১৬. ৪. ৪৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র বহু বিলম্বে পৌঁছিয়াছে। 'মৌচাকে'র জন্য লেখা এখনও দিবার সময় আছে কি? যদি ছেলেদের উপযোগী একটি গদ্য-রচনা দিলে চলে, তবে পত্রপাঠ জানাইলে পাঠাইতে পারি। লেখা আছে। কবিতা লিখিতে বিলম্ব হইবে। আপনি এ বিষয় জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।

আমার এখানে আসিতে হইলে এবার কিছু কষ্ট করিতে হইবে। কারণ Bus-এ সখের বাজার পর্যন্ত আসিয়া ঐখান হইতে প্রায় দেড মাইল পথ হাঁটিয়া তবে আমার এই বানপ্রস্থের আবাসে পৌঁছিবেন, রিক্সা পাওয়া যায় বটে কিন্তু ভাড়া বেশি। বৈদ্যপাড়া, বড়িশা—ইহাই স্থানীয় পরিচয়।

আপনি এখানে আসিলে যৎপরোনাস্তি সুখী হইব, বলাই বাহুল্য।

'জয়তু নেতাজী'র সম্বর্ধনা কিরূপ করিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না, উহা কেহ ছাপিতে রাজী হইবে কি?

আশা করি আপনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার স্নেহসম্ভাষণ ও প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৩. সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত

[মে ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghosh Road
Barisa P. O.
(24 Pargs.)
2. 5. 47.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 16. 4. 67 তারিখের কার্ড যথাসময়ে পাইয়াছি। প্রবন্ধ ও কবিতা আপনার পছন্দ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। ঐ প্রবন্ধ সম্ভবতঃ আরও দু' এক সংখ্যায় বিস্তারিত করা যাইতে পারে। আপনি এই সংখ্যার ঐ প্রবন্ধের দুইখানি ফাইল আমাকে পাঠাইয়া দিলে সুখী হইব। সম্ভবতঃ ছাপা হইয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধের জন্য দক্ষিণা যাহা পাঠাইবেন বলিয়াছেন—ঐ Crossed cheque-এ পাঠাইলেই হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন জানিয়া প্রতীক্ষায় রহিলাম। সাক্ষাতে পত্রিকা সম্বন্ধে সবিশেষ জানাইবার ইচ্ছা আছে—হয়ত আমার পরামর্শও কাজে লাগিতে পারে।

কলিকাতার ঐ অবস্থার জন্য আমার সকল কাজ উপস্থিত বন্ধ আছে—এইরূপ দীর্ঘকাল হস্তপদবদ্ধ অকর্মণ্য অবস্থা আমাকেই বড়ই নিরুৎসাহ করিয়াছে, অথচ আমার কত কাজ এখনও বাকি!

আপনার পত্রিকার যাত্রা শুভ ও জয়যুক্ত হোক।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত

[মে ১৯৪৭]

Barisa P. O. (24 Pargs.)
31. 5. 47

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই সরোজ, সেদিন অত দুর্যোগ সত্ত্বেও আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, কারণ দুপুরের পর বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল; তাই পাছে তোমাদের বৃথা কষ্ট পাইতে হয় এই

আশংকায় আমি নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হইয়াছিলাম। পরে আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম —তোমরা ঐদিন এখান হইতে আমার কলিকাতায় যাত্রা অসম্ভব জানিয়াই সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়াছিলে। পরে আর কোন সংবাদ পাই নাই—একখানা পত্র লিখিতেও পারিতে।

'বর্তমান' এখনও বাহির হয় নাই? শুনিলাম দপ্তরী-বিভ্রাটেই এইরূপ বিলম্ব হইতেছে? অবস্থা সংগীন বটে। পরবর্তী সংখ্যার কাজ বোধ হয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় কিস্তি এই মাসেই ছাপা হওয়া আবশ্যক, নহিলে পরে আর চলিবে না। আমি এই কিস্তির একটা নকল করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু ডাকে পাঠাইলে পৌঁছিবে কিনা, বা কত দিনে পৌঁছিবে তাহার ঠিক নাই, এইজন্য পাঠাই নাই। অথচ এতদিনেও আর কোন উপায়ে পাঠাইতে পারি নাই। আজ লোক মারফৎ পাঠাইতেছি—তুমিও লোক মারফৎ লইবার বন্দোবস্ত করিবে। এবারকার কপিতে কিছু কাটাকুটি আছে—লেখাও এক হাতের নয়—মাঝে এক জায়গায় কিছু যোগ করিয়াছি—সে অংশটুকু যেন যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া হয়—আমি কপিতে তাহার নির্দেশ করিয়াছি। ঐ অংশটুকুর পৃষ্ঠাসংখ্যা পাশে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। তুমি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে এবং প্রেসকে বুঝাইয়া দিবে। এবারকার প্রুফটা আমাকে একবার দেখাইয়া লওয়া বড়ই আবশ্যক—Order দিবার পূর্বে তুমি একবার Phone-এ সুরেশের ওখানে খবর দিলেই আমি বন্দোবস্ত করিব। অথবা তুমি একেবারে ওইখানে মথুরের নামে পাঠাইয়া দিলে সম্ভবতঃ পরের দিনই ফেরৎ পাইবে।

দেশের—বিশেষ করিয়া কলিকাতার অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিয়া কিছুতেই আর উৎসাহ বোধ করিতেছি না। তোমার সহিত একবার ভালো করিয়া কথাবার্তার সুযোগ এখনও হইল না। ওদিকে তো দিন আসন্নপ্রায়। যদি উপস্থিত কোন কাণ্ড না ঘটে, তবে আমি আগামী সপ্তাহে কালীকিংকরবাবুর ওখানে যাইব মনে করিতেছি— গেলে পূর্বে তাঁহাকে সংবাদ দিব।

আশা করি কুশলে আছ। আমার স্নেহসম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবে। ইতি

তোমাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৫. রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত
[আগস্ট ১৯৪৭]

Kailash Ch. Ghose Road
Barisa P. O.
9. 8. 47

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পেয়েছি। আপনি গভীর স্নেহের ও শ্রদ্ধার বশে যা করছেন তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ, কিন্তু বেশি হুড়োহুড়ি করবেন না; কারণ আমার প্রতি অনেকেরই অনেক কারণে বিরাগ আছে।

'মৌচাকে'র জন্যে একটি গদ্য-রচনা (ছেলেদের উপযোগী) লেখা আছে, কিন্তু কপি করিবার সময় নেই। এখন 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত আছি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া আপনি বোধ হয় জানেন, আমি আর বিনা দক্ষিণায় কোনখানে এক লাইনও দিতে পারিনে, কারণ এখন উহাই আমার জীবিকা এবং আমার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হওয়ায় আমি বেশী লিখতেও পারি'নে। আমার উপযুক্ত দক্ষিণা যাঁরা দেয় তাঁদেরও আমি লেখা দিতে পারিনে। একথা আপনি সকলকে বলে দেবেন। কেউ যেন কিছু মনে না করেন। অর্থকে চিরদিন অনর্থ মনে করেছিলাম বলেই আজ আমার এই শাস্তি।

আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহসম্ভাষণ জানবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৬. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[সেপ্টেম্বর ১৯৪৭]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailash Chandra Ghose Road
Barisa (P. O.)
(24 Pargs.)
18. 9. 47

প্রীতিভাজনেষু,

এইমাত্র আপনার ১২. ৯. ৪৭ তারিখের পত্র পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। 'বঙ্গদর্শন' আপনাকে সর্বাগ্রে পাঠানো হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিবেন। আমি কিছুই

বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ না পাওয়ার আরও সংবাদ পাইতেছি। পোস্ট-অফিসও আমার সহিত non-co-operation করিল? সাহিত্যিকরা ত' করিতেছেন। কিন্তু সকলেই কি সাহিত্যিক হইয়া পড়িল? যাই হোক, আমি এখনই আর একখানা পাঠাইতেছি।

গত ১০. ৯. ৪৭ তারিখে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি। তাহা আশা করি এত দিনে পাইয়াছেন। আমি ঐ পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি।

আমি অতিশয় একা ও অসহায় বোধ করিতেছি। শেষ পর্যন্ত যে দুই তিন জনকে আমি হারাইব না মনে হয়, তাহাদের মধ্যে আপনি একজন; ইহা সর্বদা মনে রাখিবেন। পরে বিস্তৃত জানাইব।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৭. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৭]

Kailash Chandra Ghose Road
Barisa P. O.
(24 Pargs.)
22. 10. 47

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কার্ড পেয়েছি। আপনি 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আমার লেখার ধোঁয়া কমে দীপ্তি বাড়ছে—এর অর্থ আমার দিক দিয়ে বুঝতে পেরেছি—তাতেও আশান্বিত হয়েছি যে, আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

'বঙ্গদর্শনে' ভাল গল্প এখনও দিতে পারছিনে, তার কারণ, ওটা সম্পূর্ণ আমার হাতের বাইরে—বড় বড় পত্রিকার থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকে, তাই এক আধটা আমি পাই। টাকা দিয়ে কেনবার শক্তি এখন নেই। তবে আমি অন্য উপায়ে ঐ গল্পের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছি। আর দুই-তিন মাসে সেটা বুঝতে পারবেন।

আগামী সংখ্যার জন্য কবিতা এখনও যোগাড় করতে পারিনি। আপনার কবিতাটা অবশ্য আছে. কিন্তু একটি খাঁটি কাব্যরসের কবিতা দরকার, আপনার কাছ

থেকে আর কত চাইব? 'শনিবারের চিঠি'তে যে অনুবাদ দেখলাম, খুব ভাল হয়েছে—বাণী গাম্ভীর হলেও ওতে আপনার কবি-ব্যক্তির স্বাক্ষর বড হয়ে উঠেছে। আমাকে পাঠালে আমি সাদরে পত্রস্থ করতাম।

আশ্বিনের 'বঙ্গদর্শন' বোধ হয় এখনও পৌছেনি; পৌছলেও হয়ত আপনি এখন বাইরে চলে গেছেন, হাতে পৌছতে দেরী হবে। 'অনুপূর্বা'র সমালোচনা এখনও শেষ হয়নি; যা বেরিয়েছে তা আপনার কেমন লাগল জানাবেন। আপনি যে আশঙ্কা করেছেন তার কোন কারণ নেই। আপনার সঙ্গে কারো তুলনা করার প্রয়োজন কি?

আপনার গদ্য-রচনার আশা এখনও ত্যাগ করিনি। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৮. শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত
[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailas Chandra Ghose Road
Barisa P.O.
(24 Pargs.)
6. 2. 48

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি 'বঙ্গদর্শন' দেখেন নাই—সম্ভবতঃ আপনাকে সেই সংখ্যা পাঠানো হয় নাই, তাই আপনি ঐ পত্র লিখিয়াছেন। আপনার কবিতাটি কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার পর 'বঙ্গদর্শন' লইয়া নানা সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়া আমি আর আপনাকে সংবাদ দিতে পারি নাই। পরে কিছুদিন যাবৎ আমি নিজে বড় অসুস্থ আছি। এ সকল কারণে আমার যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা আশা করি মার্জনা করিবেন। আমি আজই আপনার নামে ঐ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' একখানি পাঠাইবার আদেশ দিতেছি। আশা করি কুশলে আছেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৯. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailas Chandra Ghose Road
Barisa P. O. (24 Pargs.)
28. 2. 48.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সংবাদ অনেকদিন পাইনি, তাই এই চিঠি লিখছি, কেমন আছেন জানাবেন।

এর মধ্যে কলকাতায় এলে যেন খবর পাই।

'বঙ্গদর্শন' নিয়ে খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছি। যে প্রেসের উপর নির্ভর ক'রে পত্রিকাখানা দাঁড়াবার কথা, সেই প্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না, তার উপর বাজারে কাগজ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় 'বঙ্গদর্শন' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছি।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩০. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Kailas Chandra Ghose Road,
Barisa P. O. (24 Pargs.)
শুক্রবার, ১২. ৩. ৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড এইমাত্র পাইলাম। আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন—সে সংবাদ ইতিপূর্বে পাইয়াছি। এবং আপনি যে আমার সাক্ষাতের ইচ্ছা করিবেন তাহাও আশা করিয়াছিলাম।

আপনি যদি আগামী বুধবারে বিকালের দিকে (৪-৫ টা) 'বঙ্গদর্শন' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন তাহা হইলে আমি ঐ দিন সেখানে ঐ সময়ে থাকিব।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩১. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[মার্চ ১৯৪৮]

Kailas Chandra Ghose Road,

Barisa P. O. (24 Pargs.)

17. 3. 48.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আশীর্বাদী পত্র পাইলাম। আপনি 'বঙ্গদর্শন' নিয়মিত পাইতেছেন এবং উহা আপনার ভাল লাগিতেছে জানিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি।

আপনি সত্বর আপনার একখানি ফোটো (Photograph) পাঠাইবেন, যেন, দেরী না হয়। ফোটোখানি বেশ সুস্পষ্ট হওয়া চাই—খুব ছোট না হয় এবং মাথায় কোন টুপি না থাকে। আমার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। আগামী সংখ্যার (চৈত্র) পবেই আবশ্যক হইবে। আপনি উহা রেজিস্ট্রি করিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আপনার 'স্বর্ণ-সন্ধ্যা'র খাতাখানি যখনই আবশ্যক হইবে পাঠাইয়া দিব। এখনই পাঠাইতেছি না, তার কারণ আমার কোন কাজে আবশ্যক হইতে পারে। যত্ন করিয়া রাখিয়াছি, হারাইবে না।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

স্নেহধন্য

মোহিতলাল

৩২. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৮]

বড়িশা

১৯. ৭. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান বীরেন,

হঠাৎ একখানা 'ভগ্নদূত' পেয়ে তোমার কথা মনে হ'ল। তুমি 'ভগ্নদূতে' আছ তা জানি। আশা করি ভাল আছ।

আমি কিছুদিন ধরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তুমি বা বাইরের কেউ আমার খবর জানতে পারে না, সে দোষ তাদের নয়; কারণ, আমি একেবারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছি—সকলের সম্পর্ক জোর করেই ত্যাগ করেছি। তবু মাঝে মাঝে একটু দেখাশোনা করতে ইচ্ছে হয়। আমার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ যে আমি আর কোনখানে যেতে পারিনে। একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা করি। যদি পারো, আমার এইখানে এসে দেখা করলে খুসী হব। বিকেলে ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে দেখা করলেই ভালো হয়। আর, শনি রবিবারটা বাদ দিলে ভালো হয়—বোধ হয় তোমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আমি সবদিন থাকি; তবে যদি কোন কারণে, বিশেষ কোন প্রয়োজনে আমাকে কলকাতায় যেতে হয়, তাহলে আমি শনিবারেই যাই এবং রবিবারে সন্ধ্যায় ফিরি। যাবার এখন কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ, আমি অতিশয় অসুস্থ। তবু পাছে, এমন ঘটে যে, আমি কোন কারণে একবার কলকাতা যেতে বাধ্য হই, আর তুমি এসে ফিরে যাও, এই ভয়ে তোমাকে ঐ কথাটা জানালাম। অনেক দিন কলকাতায় যাইনি বলেই, যদি আগামী শনিবারে যাওয়া সম্ভব হয় এবং যাই, তাহলে তোমার আসা বৃথা হবে। কলকাতার ঠিকানাতেও দেখা করতে পারো, কিন্তু ঠিক ত' নেই, এখানে থাকাই আরও সম্ভব। তবু কলকাতার ঠিকানা দিচ্ছি।

ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত, ৩৬।জি, রসা রোড, টালীগঞ্জ। টালীগঞ্জ ব্রিজের একটু উত্তরে, Southern Avenue পার হ'য়ে, অপর ফুটপাথ ধরে একটু দক্ষিণদিকে গিয়ে ডান দিকে একটা গলির ভিতর ঐ নম্বর পড়ে। একটা মাথায়-গম্বুজওয়ালা বড় বাড়ী দেখতে পাবে, তার পরেই ঐ গলি। ভিতরে ঢুকে একটু গিয়ে ডান দিকে একটু খোলা জায়গা দেখতে পাবে, তারি শেষে একটা তেতলা বাড়ী—উপরের ফ্ল্যাট।

কিন্তু বোধ-হয় দরকার হবে না, কারণ, আমি এ শনিবারেও যে যাবো তার ঠিক নেই। অন্য কোন বারে আসতে পারলেই ভালো। তবু আমি ঐ ঠিকানা জানিয়ে রাখলাম। দেখাটা একটু শীঘ্র হ'লেই ভাল হয়।

চিঠির জবাব শীঘ্র দিও—যদি এখনই দেখা করতে না পারো।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন

সম্পাদক: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Barisa P. O

10. 9. 48

প্রীতিভাজনেষু,

গল্প পেয়েছি। আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আপনার লেখা—কাজেই সুপাঠ্য হবেই, 'বঙ্গদর্শনে'র পক্ষে তাই যথেষ্ট। এ গল্পটিতে আপনি যে গল্পবস্তু আশ্রয় করেছেন তার বক্তব্যটাই হয়েছে বড়, অর্থাৎ খুব সাময়িক—সকলের বর্তমান মনের অবস্থা ওর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সে দিক দিয়ে 'বঙ্গদর্শনে'র উপযোগী হয়েছে।

আজ শুধু প্রাপ্তি-সংবাদ দিলাম, এরপর আবার চিঠি দেবো, তাতে আরো খবর পাবেন। 'বঙ্গদর্শনে'র বিপদ এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে আপনাকে সব জানাবো।

আশা করি কুশলে আছেন। কলকাতায় এলে যেন দেখা পাই।

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আলিঙ্গন নেবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৪. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৮]

বড়িশা পোঃ

মঙ্গলবার, ৫, ১০, ৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু ডাকে জবাব দিলে সময়ে হয়ত পৌঁছবে না, এইজন্য দিই নাই। আমি এমনও ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে মঙ্গলবারে আপনার সহিত কলিকাতায় দেখা করিব—তবে 'বঙ্গদর্শন' অফিসে নয়, General Printers-এ; তাই কাল আমি কোন সংবাদ কারো মারফৎ পাঠাই নাই। কিন্তু শেষে যাইতে ভরসা হইল না; কারণ আপনি ৪-৫টার মধ্যে দেখা করিবেন

বলিয়াছেন। ওখানে যদি ৫টার দিকেই আসেন তবে খবর পাইয়া, ওখান হইতে ধর্মতলায় (সুরেশের ওখানে) আসিতে আরও বিলম্ব হইবারই কথা এবং সন্ধ্যা হইয়া গেলে আমার ফিরিবার অসুবিধা হইবে—আমি এখন High Blood Pressure-এ ভুগিতেছি। আপনার সহিত দেখা না হওয়ায় আমি যে কত দুঃখিত তাহা আপনি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন না।

আপনি আর কতদিন কলিকাতায় আছেন তাহা জানাইলে আর একবার চেষ্টা করিব—এই সপ্তাহের মধ্যেই। আপনি 'বঙ্গদর্শনে' আমার দেখা পাইবেন না। 'বঙ্গদর্শন' অফিস বা প্রেস বা কর্তৃপক্ষের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—আর্থিক সম্পর্কটাও প্রায় পরমার্থিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সব কথা আপনার শুনিবার যোগ্য নয়। আমি আপনাকে আমার পত্রে লিখিয়াছিলাম—আমার সঙ্গে দেখা-শোনা বা কোন সংবাদ দেওয়া-নেওয়া আপনি সুরেশের ঐখানে করিতে পারিবেন—এই ইঙ্গিত আপনি ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই আপনাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইল। আরও পূর্বে আপনার গল্পটি পাওয়ার পরে দ্বারভাঙ্গায় আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতেই এমন কথা ছিল যাহা আপনার মনে থাকিবার কথা।

উহারা গল্পের জন্য আপনাকে কিছু দিয়াছে কি?

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, আলিঙ্গন ও কুশল জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ—এই চিঠি 'বঙ্গদর্শন' অফিসে পাঠাইয়াছিলাম। শুনিলাম আপনি সুরেশের ওখানে আসিয়াছিলেন। কাজেই চিঠি ফেরৎ আসিয়াছে, তবু আপনাকে ডাকে পাঠাইলাম। কারণ আমার পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া খুবই উচিত। কলিকাতায় এবার আর দেখা হইল না। কিন্তু আপনার দোষ নাই; বরং আপনি দুইবার সাক্ষাতের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আপনার 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'নব-সন্ন্যাস' পাইয়াছি, পড়িয়াছি; পরে সে সম্বন্ধে লিখিব। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' আমাকে খুসী করে নাই—বরং নিরাশ করিয়াছে। দুঃখ হয় এই যে, আপনি আমাকে এ সম্বন্ধে Consult করেন নাই। করিলে ভালই হইত।

সুরেশ আমাকে আপনার 'কণ-অন্তঃপুরিকা' (যাহাতে 'পাল-বৌ' আছে—একটি শ্রেষ্ঠ গল্প) এবং নূতন বই (বাসর ?) এখনও দেয় নাই। .

শ্রীমোঃ

৩৫, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[?]

বঙ্গদর্শন

বড়িশা, মঙ্গলবার

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু,

এই মাত্র আপনার কার্ড পাইলাম। আপনি কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। দেখা যেমন করিয়াই হোক হইবেই হইবে। আমি 'বঙ্গদর্শন' অফিসে এখন আর যাই না; তার কারণ, কাজ যা কিছু এইখানে বসিয়াই করিতে পারি। বুধবারে লাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, হয়ত আপনি ঐ বারেই 'বঙ্গদর্শন' অফিসে আসিবেন ; এ চিঠি পাওয়ার সময় আর নাই। আমার শরীর এত খারাপ যে ট্রামে বাসে চলা-ফেরা করা বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। যদি আপনি দয়া করিয়া আমার এখানে আসেন, তবে অনেক কথা আছে। আসিলে সুখী হইব। আর এই শনিবারে যদি পারি কলিকাতায় কোথাও দেখা হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনি General Printers-এর মথুর বাবুর কাছে সংবাদ পাইতে পারেন। আমি সেইখানেই খবর পাঠাইব।

আপনি কতদিন থাকিবেন এবং ঐ ঠিকানাতেই কিনা, তাহা জানাইবেন।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, আলিঙ্গন জানিবেন।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৬. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন

বড়িশা

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৬.১০.৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আমার ৺বিজয়ার প্রীতিপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন ও নমস্কার পাঠাইলাম।

আমার পত্র পাইয়াছেন ? 'বঙ্গদর্শন' আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছিল কিনা তাহা আমি এখনও জানি না। অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনার কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৭. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৮]

বড়িশা (২৪ পরগণা)
৯.১২ ৪৮

সুহৃত্তমেষু,

আপনার কার্ড পাইলাম। পূর্বের পত্র পাইয়াছি। ঐ পত্রের উত্তর লিখিবার ফুরসৎ এখনো পাই নাই। পরে দিব। করুণাবাবুর চিঠি পেয়েছি।

আপনি কবির বিরহে ও স্মরণে যা লিখেছেন তাহা একটি অতিসুন্দর সাহিত্য-কর্ম হইয়াছে—উহাতে আপনার প্রাণ নগ্ন সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার অধিক এখন কিছু বলিবার অবকাশ নাই।

আমি এবারকার শীতে বড় কাবু হইয়াছি। শ্লেষ্মা ও হাঁপানি বাড়িয়াছে। তার উপর 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য সব একা করিতে হয় বলিয়া আমি একটু বিশ্রাম বা অবকাশ পাই না।

আপনি কার্তিকের 'বঙ্গদর্শন' পাইলেন কিনা এবং আশ্বিনের পাইয়াছেন কিনা লিখিবেন। কার্তিকের সম্পাদকীয় 'বঙ্গদর্শন' কেমন লাগিল?

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রণয়পূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৮. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৪৮]

বঙ্গদর্শন

বড়িশা
১০.১২ ৪৮

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু,

এই মাত্র আপনার কার্ড পেয়ে সুখী হলাম। আপনি আসছেন শুনে আরও সুখী হলাম। এবার যেন দেখা পাই।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩৯. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[জুলাই ১৯৪৯]

বড়িশা। পোঃ
(২৪ পরগণা)
১৮।৭।৪৯

স্নেহাস্পদেষু,

আমার একটু বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে ডাকিতেছি, যদি খুব অসুবিধা না হয়, শীঘ্র দেখা করিলে সুখী হইব।

আমি কিছুকাল যাবৎ অতিশয় পীড়িত আছি।

আশা করি, তুমি সুস্থ আছ।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪০. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[আগস্ট ১৯৪৯]

বড়িশা। পোঃ
(২৪ পরগণা)
১৬. ৮. ৪৯

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান বীরেন, এবারকার 'ভগ্নদূতে' তোমার লেখাটি খুব ভালো হয়েছে; পড়ে খুসী হয়েছি।

তুমি তোমার সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা কোরো—তাতে তোমার নিজের অনেক সুবিধা হবে।

স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ শনিবার বাদ দিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে।

শ্রীমোঃ

৪১. ধীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীকে লিখিত

[সেপ্টেম্বর ১৯৪৯]

বড়িশা

(২৪ পরগণা)

৩. ৯. ৪৯

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেলাম। 'নেতাজী'র ২য় সংস্করণ ছাপার ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে—সে সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ নেই।

তুমি এর মধ্যে আর আসতে পারবে না শুনে দুঃখিত হলাম। তোমাকে মাঝে মাঝে আসতে বলি, তার কারণ এলে তোমারই উপকার হবে। আমি তোমার উন্নতি কামনা করি।

তোমাদের 'ভগ্নদূতে'র স্বত্বাধিকারী মহাশয় আমাকে একটি বলিষ্ঠ লেখা পূজা সংখ্যার জন্য পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। তাতে খুবই সম্মানিত বোধ করেছি। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এখন যে রকম হয়েছে, তাতে জীবিকার জন্যেও যে সাহিত্যকর্ম আমাকে করতে হয়, তার সামর্থ্য নেই ; অনেক কাজ করবার আছে, এবং এই ভগ্ন শরীরে তা করতে হচ্ছে সাধ্যের অতীত হলেও। তবে এইটকু আশ্বাসের বিষয় যে, কাজগুলি খুব বড় কাজ—গ্রন্থ-রচনার কাজ ; কিন্তু এখন তা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় ঐ রকম অনুরোধ পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে ঠিক ধারণা পোষণ করেন না। শক্তি থাকলেও আমি এই ব্যবসায়ের বাজারে বিনা দক্ষিণায় (এবং উপযুক্ত পরিমাণ) লেখা দিতে পারতাম না, কারণ তাতে সম্মানের হানি হ'ত। দোষ আমার নয়—এই কালের এবং এই সমাজের। তারাশঙ্কর প্রভৃতিকে তিনি কি ঐ রকম অনুরোধ করতে পারতেন ? আমি ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। আবার, একথাও বলেছেন যে, খুব শীঘ্র লেখাটা চাই। এই সব কারণে আমি চিঠির উত্তর দিইনি। তিনি প্রবীণ লোক, তাঁর কাছ থেকে আমি এইরকম ছেলেমানুষি প্রত্যাশা করিনি।

আশা করি কুশলে আছ।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তোমার বাসার ঠিকানা কি ?

৪২, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[অক্টোবর ১৯৪৯]

বড়িশা
(২৪ পরগণা)
১৫. ১০. ৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার বিজয়ার প্রীতি-নমস্কার পাইলাম। আমি এবার দেরী করিয়াছি, আপনি আমার প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন ও কুশল-কামনা জানিবেন।

আবার কবে কলিকাতায় আসিতেছেন? আসিলে যেন দেখা পাই।

আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৩. বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরিকে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
৯. ১. ৫০

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান বীরেন, তোমার সংবাদ অনেকদিন পাইনি। শ্রীমান কুমুদকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়, তাকে একদিন নিয়ে এসো।

আরও দরকার হয়েছে তোমাকে—আমি তোমার সঙ্গে একটু বিশেষভাবে আলাপ করতে চাই। তুমি একদিন বেলা ২-৩টার মধ্যে আসিলে সুখী হইব। যদি আসিবার দিন স্থির করিয়া পত্র দাও, তবে আরও ভালো হয়। তুমি অবশ্য অবশ্য আসিবে—তোমায় অনেক জিনিষ দেখাবার আছে।

'ভগ্নদূতে' দৈনিক বসুমতী থেকে যে লেখাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা' পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি। উহার প্রত্যেক কথাটি আমার মনের প্রতিধ্বনি, আশ্চর্য মিল দেখছি। লেখক নারাণ ব্যানার্জীকে তুমি জানো? তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো? বড় আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছে।

আশা করি কুশলে আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৪, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৫০]

বড়িশা (পোঃ)

২০. ২. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমিও অনেকদিন আপনার সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম।

আমি এখনও কোন পত্রিকা হাতে পাই নাই। উপস্থিত publications লইয়া আছি—অনেকগুলি বই তৈয়ারি করিয়া দিতে হইল। সম্ভবতঃ এখনও কিছুদিন বই লেখার কাজই করিতে হইবে, নহিলে জীবিকা-সঙ্কট ঘুচিবে না।

আপনি এখন কি করিতেছেন? আর কোন লেখা আরম্ভ করিয়াছেন? আমার একখানি 'বিদেশী ছোট গল্প-সঞ্চয়ন' (অনুবাদ) বাহির হইতেছে, বইখানি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি।

কলিকাতার দিকে আবার কবে আসিতেছেন? আসিলে যেন দেখা পাই।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন। গোপাল ও গোপালিকাকে আমার স্নেহাশীষ জানাইবেন। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৫, বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[এপ্রিল ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ

(২৪ পরগণা)

১০. ৪. ৫০

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার আর কোন সংবাদ পাই নাই—"ভগ্নদূত" ও আর পাই না; এজন্য চিন্তিত আছি। কুমুদের সংবাদ কি? শীঘ্র কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর করিবে।

এই সময়ে আর একদিন শীঘ্র আসিলে, অনেক কথা বলিতে পারিতাম, আসিলে সুখী হইবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

৪৬. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[এপ্রিল, ১৯৫০]

বড়িশা

(২৪ পরগণা)

২০. ৪. ৫০

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাব কার্ড এবং গত সপ্তাহের 'ভগ্নদূত' পেয়েছি। তুমি কুমুদকে সঙ্গে করে একদিন শীঘ্র আসবে শুনে সুখী হ'লাম।

'ভগ্নদূতে' রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ—সে সম্বন্ধে আরও কিছু—এবং আরও সঠিক সমালোচনা হওয়া উচিত: এত বড অনাচার এবং নির্লজ্জতা আমিও কল্পনা করতে পারিনি—ঐ কাজটা যে কি কারণে কত কুৎসিত হয়েছে, তা দেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আমার কাছে সব তথ্য এবং যুক্তি জানতে পারবে। আমার সম্বন্ধে যা লিখেছ তাতে তথ্যের ভুল আছে। আমি আমার শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ 'শ্রীমধুসূদন' পাঠিয়েছিলাম—আমি নয়—আমার কয়েকজন ভক্ত জোর কবে আমাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তাব জন্যে নয়—আমি জানতাম যে, আমাকে কিছুতেই দেবে না। কিন্তু কাজটা যে ওরা এমন নির্লজ্জভাবে কববে, বিচারক কারা হয়েছিল, এবং কোন্ কোন্ বই তারা বিচারের জন্য পেয়েছিল, তা কাউকে জান্তে দিলে না। বিচারকসভা কি রকম গঠিত হয়েছিল, এবং বিচারের নীতিই বা কি নির্ধারিত হয়েছিল তাও কেউ জানলে না। বই পাঠাবার সময় দিয়েছিল সাত-আট দিন; এবং সেই তারিখের পর সাতদিনের মধ্যেই রায় বেরিয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যকে, বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে, এবং ন্যায়-ধর্মকে এমন দম্ভের সহিত অপমান কেউ কখনো করেনি।

তোমাদের কুশল কামনা করি। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৭. কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত

[মে ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
৩. ৫. ৫০

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি প্রায় দুই মাস যাবৎ আরও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার উপর জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, তবে ঘরে বসিয়া। উপস্থিত একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্যস্ত আছি—B A. ও I.A. পরীক্ষার্থীদের জন্য একখানি 'রচনা-পুস্তক'। প্রকাশিত হইলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব। আমার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' শীঘ্র প্রকাশিত হইবে—উহাও একখানা পাঠাইব।

মাঝে মাঝে এইরূপ পত্র দিলে সুখী হইব। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। কলিকাতায় আসিলে আমাকে সংবাদ দিবেন—একটু আগে যেন খবর পাই।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

স্নেহধন্য
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৮. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[জুন ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
৫. ৬. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মাতৃদায় হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাইয়াছি—মায়ের পুণ্যে।

আমার প্রকাশক (কমলা বুক ডিপো) আপনাকে 'বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন' একখণ্ড পাঠাইয়াছেন, আশা করি এতদিনে তাহা হস্তগত হইয়াছে। আমার অনুরোধ, আপনি উহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে আপনার অভিমত জানাইবেন।

দেরী হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া সমস্ত বইখানি (ভূমিকা সমেত) পড়িতে বলি।

এবার গোপাল এখনও দেশে আসে নাই—তাহার সংবাদ কি? আপনি বোধ হয় শীঘ্র আর আসিবেন না, আসিলে সংবাদ দিবেন।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ভালবাসা জানিবেন। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪৯. রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত
[জুলাই, ১৯৫০]

বড়িশা, বুধবার
১৯. ৭. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

সেই দিন যাইবার সময়ে দীনেশ বাবু বলিয়াছিলেন, আগামী শনিবারেই তিনি আবার আসিবার চেষ্টা করিবেন। আপনি তাঁহাকে বলিবেন আমি ঐ শনিবারেই এখানে একটু বৈঠকের বন্দোবস্ত করিতেছি; তিনি যেন ঐ দুইখানি খাতাই লইয়া আসেন এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র আসেন। ২টা ২॥টার মধ্যে। আপনিও তাহাই করিবেন। এ বিষয়ে একটা নিশ্চয় করিয়া পত্রবাহক মারফৎ সংবাদ দিবেন।

প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

আপনাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫০. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[জুলাই, ১৯৫০]

বড়িশা
২৬. ৭. ৫০

কবিবর,

আগামী শনিবারে খাতাপত্র লইয়া আসিতে ভুলিবেন না, বা দেরী করিবেন না।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি

কবিতামুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫১. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত
[আগস্ট, ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
৮. ৮. ৫০

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাকে তোমার পূর্বের ঠিকানায় পত্র দিয়াছি—বোধ হয় পাও নাই। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, তুমি ও কুমুদ আমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা কর নাই, শীঘ্র করিলে সুখী হইব।

আগামী ১৫ই আগস্ট ছুটি আছে—ঐ দিন ২-৩ টার মধ্যে আমার এখানে আসিলে সুখী হইব; আরও কেহ কেহ আসিবেন, এবং সম্ভবতঃ ঐ দিনের উপযোগী কিছু কবিতা পাঠ হইবে—একজন খুব শক্তিশালী কবির সন্ধান পাইয়াছি। তিনি "পাকিস্তানের পাঁচালী" ও "রামরাজ্য" নামে যে দুইটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে মুগ্ধ হইবে। অতএব ঐ দিন তোমরা আসিলে সুখী হইব।

"জয়তু নেতাজী" ও "গল্প সঞ্চয়ন" দুই-ই বাহির হইয়াছে; এবং আমার প্রাপ্য কয়খানি ইতিমধ্যে ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি ও কুমুদ দুইজনকে দুইখানি দিব—যে যে খানি পছন্দ করো।

আমার স্বাস্থ্য আরও খারাপ, বোধ হয় আর বেশিদিন নয়। সংসারের নানা সঙ্কটে বড় পীড়িত আছি।

'ভগ্নদূত' আর পাই না কেন?

তোমাদের কুশল সংবাদ মাঝে মাঝে পাইলে সুখী হইব। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫২. রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

[আগস্ট, ১৯৫০]

বড়িশা

৯. ৮. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

দীনেশ বাবুর পত্রে তাঁহার গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়াছিলাম—পরে তিনি কেমন আছেন সে সংবাদ পাই নাই। আপনি আমাকে সংবাদ দিবেন।

আগামী ১৫ই আগস্ট আমার এখানে আপনারা আসিলে অতিশয় সুখী হইব। ঐ দিন আরও দুই-চারিজন আসিবেন। দীনেশবাবু যদি সুস্থ হইয়া থাকেন তবে ঐ দিন তাঁহার কবিতা পাঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আপনি এ বিষয়ে আমাকে শীঘ্র জানাইবেন। ঐ দিন ২।৩ টার মধ্যে আসা চাই, যেন সেইরূপ না হয়।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। আশা করি সব কুশল। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৩. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[সেপ্টেম্বর, ১৯৫০]

বড়িশা

৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কার্ড এইমাত্র পেলাম। আমি আবার বড অসুস্থ হয়ে পড়েছি—এবার একটু ভয়ের কারণ হইয়াছে। এ শরীরে এই পীড়ার আক্রমণ বেশিদিন সহিবে না।

তুমি আমার এখানে এতদিনেও আর আসিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছি। অসুবিধার কথা জানি, তবু মাঝে মাঝে দেখা করিলে তোমারও লাভ, আমিও একটু মানসিক সুস্থ বোধ করি।

দীনেশবাবুর সংবাদে বিশেষ সুখী হইলাম। কবিতা ছাপা হওয়া খুবই আবশ্যক। সম্ভবতঃ ঐ একটি কবিতায় তোমাদের 'ভগ্নদূত' 'বিজয়দূত' হইয়া যাইবে। তবে খুব ভালো করিয়া ছাপিতে হইবে—একটি ভুল না থাকে ; এবং punctuation ও

শব্দগুলির যথাযথ বিন্যাস যেন ঠিক থাকে। নামটা বড় ছোট হইবে, একটু বড় হইলে ভাল হয়—পরে জানাইব।

তোমাদের কুশল কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৪. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত
[নভেম্বর, ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি : সময়ের অভাবে উত্তর দিতে দেরী হইল। আশা করি ভালো আছ।

সঙ্গের পত্রটি যথাস্থানে দেখাইলেই তুমি একখানি "সাহিত্য-কথা" পাইবে। "সাহিত্য-কথার" পর "সাহিত্য-বিচার" এক খণ্ড তোমার জন্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। ঐ বই আর আমার প্রাপ্য নহে—Edition বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলাম। যাই হোক, তবু বোধ হয় অনুরোধ করিলে একখানি দিবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৫. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[ডিসেম্বর, ১৯৫০]

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
২৬. ১২. ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন সংবাদ পাই নাই। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। যদি শরীর ভাল থাকে তাহা হইলে আগামী রবিবার ২-৩টার মধ্যে আমার এখানে আসুন—নূতন কিছু লিখিয়া থাকিলে লইয়া আসিবেন।

চিঠি উত্তরে আমাকে জানাইবেন সুখী হইব। যেন রবিবারের আগে খবর পাই। এই চিঠি আপনি কালই পাইবেন।

আমার স্নেহ-সম্ভাষণ ও কুশল-কামনা জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৬. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[জানুয়ারী, ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ

২৪ পরগণা)

১৯. ১. ৫১

শ্রীমান বীরেন্দ্র,

তোমার এই দীর্ঘ নিরুদ্দেশ অবস্থায় দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি ভাল আছ।

তোমাকে আসিতে বলা বৃথা। তবু আগামী ২৩শে জানুয়ারী যদি সম্ভব হয়—আমার এখানে আসিলে সুখী হইব।

কুমুদকেও বলিবে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৭. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

বড়িশা

কলিকাতা-৮

৬, ২, ৫১

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান বীরেন্দ্র,

৺সরস্বতী পূজার দিন আমার এখানে একটু সাহিত্য-বৈঠক করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি ও শ্রীমান্ কুমুদ ঐ দিন আমার এখানে বৈঠকে যোগ দিলে আনন্দিত হইব। আশা করি তোমাদের সব কুশল।

এবারের 'ভগ্নদূত' (নেতাজী সংখ্যা) খুব ভালো হইয়াছে।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৮. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
৬. ২. ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

সেদিন আমার এখানে আসিয়া আপনার যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিনের আনন্দ আমার পক্ষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঘটনাটিও অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। যাই হোক, আর যাহাতে এমন ঘটনা কখনো না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিব।

আগামী ৺সরস্বতী পূজার দিন পূর্বের মত একটি সাহিত্য-বৈঠক করিতে চাই; গত বৎসরে বোধ হয় আপনি আসিয়াছিলেন, এ বৎসরেও আসিতে পারিলে খুব আনন্দ পাইব।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৫৯. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১]

বড়িশা
৭. ২. ৫১

শ্রীমান্ বীরেন্দ্র,

এইমাত্র তোমার ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ পাইলাম। ইতিমধ্যে তোমাকে পুরাতন ঠিকানায় যে পত্র দিয়াছিলাম তাহা সম্ভবতঃ পাও নাই। তাই পুনরায় লিখিতেছি—৺সরস্বতী পূজার দিন আমার এখানে একটি সাহিত্য-বৈঠক করিবার

আয়োজন করিয়াছি। ঐ দিন তুমি কুমুদকে সঙ্গে লইয়া বেলা ২-৩টার মধ্যে আসিলে অতিশয় সুখী হইব।

আশা করি—তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬০. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত
[এপ্রিল, ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
১৩. ৪. ৫১

কল্যাণীয়েষু,

আগামী রবিবারে আমার সহিত দেখা করিলে সুখী হইব। বৈকালে ৪।৪॥ টার মধ্যে আসিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি; তারপর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে—অর্থাৎ সংবাদ রটিয়াছে। এবার উহারা মরিয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই শেষ অস্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে রক্ষা থাকিবে না।

কুমুদের সংবাদ কি? আসিতে পারে না? কবি দীনেশ গাঙ্গুলীর সংবাদ অনেকদিন পাই নাই—কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আশা করি তোমার সংবাদ ভালো। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬১. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[আগস্ট, ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
২০. ৮. ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন সংবাদ নেই। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষাও খারাপ—খুব কষ্ট পাচ্ছি। তবু আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে একটু আনন্দ পাই। আগামী জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আমার এখানে আসতে পারবেন কি? যদি আসেন আনন্দিত হব।

আশা করি পূর্বাপেক্ষা কিছু একটুও ভাল আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও কুশল-কামনা জানবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ বীরেন বা কুমুদের সঙ্গে দেখা হয়? হ'লে ওদের কাউকে বলবেন—যদি আসে সুখী হব।

৬২ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[সেপ্টেম্বর, ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
২. ৯. ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। অনেকদিন দেখা পাই নাই। মাঝে নিশ্চয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন?

আপনি আমার 'জয়তু নেতাজী' পড়িয়াছেন ও ভাল লাগিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়াছেন; তাহাতেই গান্ধী ও গান্ধী-কংগ্রেসের স্বরূপ আমি পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিয়াছি। 'পরিশিষ্ট' ভাগে তাহা আছে।

নূতন উপন্যাস চলছে শুনে সুখী হ'লাম। ছোট গল্প আর লিখছেন না?

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। কলিকাতায় আবার কবে আসিবেন?

আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
[অক্টোবর, ১৯৫১]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
২৭ ১০, ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৺বিজয়ার সম্ভাষণ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনিও আমার ঐ দিনের প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, আলিঙ্গন জানিবেন।

আমার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হইয়াছে, প্রায় Invalid অবস্থায়, এ যাত্রায় রক্ষা পাইব বলিয়া মনে হয় না। পুরোনো chronic ব্যাধি প্রবল হইয়াছে ; তাই বড় কষ্ট পাইতেছি।

আপনি কলিকাতায় আসিলে একবার দেখা দিবেন—অনেকদিন দেখি নাই।

আমা'র প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৪, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[ডিসেম্বর ১৯৫১]

বড়িশা

২৪. ১২. ৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বিভূতিবাবু, অনেক দিন কোন খবর পাইনি, আশা করি কুশলে আছেন।

পত্রবাহক শ্রীমান্ শোভেন বসু আমার নিত্যপরিচিত, স্নেহভাজন, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী যুবক। সে ঐদিকে বেড়াইতে গিয়াছে ; তাহার ইচ্ছা দ্বারভাঙ্গায় ঘুরিয়া আসে, এবং আপনার সহিত দেখা করিয়া আপনার উপদেশ গ্রহণ করে। আশা করি, আপনি তাহাকে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিবেন।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৫, বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯৫২]

বড়িশা—পোঃ

কলিকাত-৮

২৮. ১. ৫২

শ্রীমান্ বীরেন,

অনেকদিন তোমাদের সংবাদ পাইনি। 'ভগ্নদূত'ও আর পাই না। তোমাদের সংবাদ ভালো তো ?

আমি এবার শীতে খুবই কষ্ট পাইলাম—শরীর আর টিকে না। তার উপর লেখনীর কর্মের বিরাম নেই। দেহ-মন বড়ই অবসন্ন হইয়াছে। মাঝে মাঝে তোমাদের দেখা পাইলে একটু উৎসাহ জাগে।

আগামী ৺সরস্বতী পূজার দিন তোমরা (তুমি ও কুমুদ) যদি আসিতে পারো—খুবই আনন্দিত হইব। কুমুদকে আলাদা লিখিলাম না, তুমিই আমার হইয়া বলিও। বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে আসিলে ভাল হয়। কবি দীনেশ গাঙ্গুলীকেও আসিতে লিখিলাম।

যদি কোন কারণে না আসিতে পারো—দুঃখিত হইব। কেমন আছো সংবাদ দিও।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৬, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[জানুয়ারী ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
২৮. ১. ৫২

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন সংবাদ পাইনি ; মধ্যে বিমলবাবুর নিকটে আপনার বারাসতে যাওয়ার সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। আশা করি এখন পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ আছেন।

যদি সম্ভব হয়, আগামী ৺সরস্বতী পূজার দিন, আমার এখানে আসিলে সুখী হইব। বেলা দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আসিতে যদি এখনও অক্ষম হন, পত্রের উত্তর দিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

ভালবাসা জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৭. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[মার্চ ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
২. ৩. ৫২

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান বীরেন্দ্র, 'ভগ্নদূত' দেখিলাম। ভাল হইয়াছে। তুমি নিশ্চয় ঐ দুই সংখ্যা যথাস্থানে পাঠাইয়াছ। যদি না পাঠাইয়া থাক—অবিলম্বে 'কথাসাহিত্যে'র সম্পাদকের নামে—ঐ অংশগুলি দাগ দিয়া পাঠাইয়া দিবে। ইহাই নিয়ম।

'ভগ্নদূতের' 'রজত জয়ন্তী' সংখ্যা একখানা দিবার কথা ছিল তাহার কি হইল? এবার যখন আসিবে আনিতে ভুলিও না। কুমুদের খবর কি? তোমাদের সেই গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটিকে সাহিত্যেব নেশা ধরাইতে পারিলে এখানে যাওয়া-আসার খুব সুবিধা হইবে। সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিও। আর একদিন তাঁহাকে লইয়া আসিতে পারিলে সুখী হইব।

আশা করি সব কুশল। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

এবারকার 'কথাসাহিত্য' দেখিয়াছ? এবার আমার 'শ্রীকান্ত'কে লইয়া মর্কট নিজের নাক-কান ছিঁড়িয়াছে।

তোমার কাছে আমার যে সংখ্যা 'কথাসাহিত্য' আছে—সেখানি যেন হারায় না; পরে ফেরত দিও। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৮. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত

[মার্চ ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
২১ ৩. ৫২

স্নেহাস্পদেষু,

শ্রীমান্ বীরেন, তুমি এই মাসের প্রথম সপ্তাহে আসিবে বলিয়াছিলে—আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

ইতিমধ্যে আমার উপরে একটি গুরুতর ভার পড়িয়াছে—আগামী বৈশাখ

হইতে 'বঙ্গভারতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতে হইবে। 'বঙ্গদর্শনের' মতো নয়—ছোট পত্রিকা, কোন রকমে একটু ভদ্রভাবে এবং নিয়মিত প্রকাশ করা। তুমি কোন্ দিকে [কাগজের] সাহায্য করিতে পারিবে? একবার শীঘ্র দেখা করিলে ভাল হয়।

আশা করি ভাল আছ। কুমুদের সংবাদ কি? আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬৯. বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত
[এপ্রিল ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
২৩. ৪. ৫২

কল্যাণবরেষু,

তোমার আর কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। আমি তোমাকে যে কাজটির ভার দিয়াছিলাম তাহার কি হইল? সময় আর নাই, এই মাসের মধ্যেই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। তুমি আমাকে অন্ততঃ একটা সংবাদ শীঘ্র দিবে।

আশা করি ভাল আছ। কুমুদের সব ভালো তো? আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭০. দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত
[জুন ১৯৫২]

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
৬. ৬. ৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি আরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি—বোধ হয় এইবার মহাযাত্রা আসন্ন।

'বঙ্গভারতী'র সম্বন্ধে বিশেষ আশা করিবার নাই। যদি একবার আসিতে পারেন, সাক্ষাতে সব বলিব।

আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন জানিবেন। আশা করি এখন একটু ভাল আছেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭১. জীবনকালী রায়কে লিখিত

[জুন ১৯৫২]

বড়িশা

২৮. ৬. ৫২

প্রিয়বরেষু,

কন্যা-বিবাহের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলাম। শুভকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, এই কামনা কবি।

মেয়েকে এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি—সে চিরায়ুষ্মতী হোক এবং স্ব-পর-কল্যাণকারিণী হয়ে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করুক।

আমাব অবস্থা সবদিক দিয়েই খুব শোচনীয়। রোগের যন্ত্রণায় দিবারাত্রি কষ্ট পাচ্ছি। এবার বোধ হয় ডাক এসেছে; আমাব মনে হয় এই শেষ। আপনি আমার ভালবাসা ও আলিঙ্গন জানবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

— —

পরিশিষ্ট

তথ্যপঞ্জী

সাহিত্যচিন্তা ॥

পত্র ১। এই পত্রটি প্রকাশিত হয় 'মোসলেম ভারত'-এর ১৩২৭, ভাদ্র সংখ্যায়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩) এবং কর্ণধার ছিলেন তাঁর পুত্র আফজালুল হক। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই নজরুল ইসলামের (জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) কবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রচুর বেরিয়েছে।

একদিন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) বাসায় মোহিতলাল মজুমদার 'মোসলেম ভারতে'র কয়েকখানি সংখ্যা পান। মলাটের আরবী নক্সার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা। ঐ পত্রিকার ১৩২৭ আষাঢ় সংখ্যায় 'বাদল প্রাতের শরাব' ('পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে 'নিকটে' নামে অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় 'রিমঝিমিয়ে'-এর সঙ্গে 'শিঞ্জিনী য়ে' মিলের এই অপরূপত্বে করুণানিধানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করায় দুই কবিই একটু উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। শ্রাবণে প্রকাশিত 'খেয়াপারের তরণী' ('অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) কবিতার শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে নজরুলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দেন। এই দীর্ঘ চিঠি পড়ে উৎসাহিত হয়ে নজরুল ইসলাম মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করেন।

পরের বছর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৬৩) সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকায় নজরুলকে উদ্দেশ করে মোহিতলাল আর একটি কবিতা লেখেন—কবিতাটি "কবিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নঃ ইঃ-র উদ্দেশে" এই শিরোনামায় ১৩২৮-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ কবিতাটি এই—

: বক্ষ তোমার আতুল এ যে, কণ্ঠ কালো কিসের বিষে ?
প্রাণের দাপট ঝড়ের ঝাপট্ উড়িয়ে দিল উত্তরী' সে !
লাল সে দেখি নখের কিনার,
নয় ত রঙীন্ ছাপ সে হেনার !—
কলজেখানা টানতে ছিঁড়ে' লাগল শোণিত-চিহ্ন কি সে !

উর্ধ্ব মুখে রক্ত ছোটে,
ঠোঁটে কি তাই আলতা ফোটে ?
তাই কি হাসির গর্‌রা এমন ছুটছে আবীর-পিচকিরিতে ?
মরণ-চুমা চুঁইয়ে ঝরে আফিম-নেশার মিছরি-গীতে ?

চক্ষে তোমার ঘনায় আঁধার—সাঁঝের দীঘির অতল কালো,
মূর্চ্ছে সেথায় ডুবে-মরা কোন্ রূপসীর হাসির আলো !
এখনো তার নীলাম্বরী
দেয় গো দেখা সোপান 'পরি,
কলস-মুখের বুদ্‌বুদেরা কখন গেছে হাওয়ায় মিশে,
জলের তলে নিথর নিশা শিউরে ওঠে শ্যামার শিসে ।

তবুও কি আজ মেঘের ছায়া নামল ললাট-অলক-বনে ?
ইন্দ্রধনুর পুচ্ছ-চূড়া দেখছি যে তায় ক্ষণে ক্ষণে !
মা-যশোদার প্রাণের কূলে
আজ যে ভরা বাদর দুলে !
কৃষ্ণা তিথির কোন্ অতিথি তৃষ্ণাতে মুখ দিল স্তনে !
বৈশাখী সে বাজের জ্বালা
আজ যে ভাদর-আদর-ঢালা ।
মাথায় যে তাই মেঘের কাজল উথ্‌লেছে কার স্নেহাশিষে—
কাঁদন-কারায় বাঁধন-হারার নূতন জনম-অষ্টমী সে ।

নজরুলের তারুণ্যকে লক্ষ্য করে 'ঘরের বাঁধন' নামে তিনি আরও একটি কবিতা লিখেছিলেন—এই কবিতাটি 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। নজরুলকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর চেষ্টা ও উপদেশের বিরাম ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিরোধ দেখা দিল। ১৩২১, পৌষ সংখ্যার 'মানসী' পত্রিকায় মোহিতলালের 'আমি' নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই 'আমির' সুর নিয়েই নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সৃষ্টি, যদিও দুজনের মানসধর্মের পার্থক্য রয়েছে। 'আমি' নিবন্ধটি মোহিতলাল পরে 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (১৩৫৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে

আভাস দিয়েছেন, " 'আমি' শীর্ষক রচনাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এই রচনাটি একালের একটি সুবিখ্যাত কবিতার সাক্ষাৎ প্রেরণা এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার আহরণ-স্থান হইয়াছিল। পাছে কেহ—কোন মহামনস্বী সমালোচক—আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাস রচনাকালে আমাকে পরস্বাপহারী বলিয়া সাব্যস্ত করেন (একজন ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত ইতিমধ্যে আমাকে উক্ত কবির শিষ্য বলিয়া রায় দিয়াছেন), তাই আমি এখানে মাত্র ঐটুকু জানাইয়া রাখিলাম।" কাজী এই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। অভিমানী মোহিতলাল একটু ক্ষুণ্ণ হলেও বিচ্ছেদ তখনও আসন্ন হয়ে ওঠেনি। 'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজী মোহিতলালকে উপহার দিয়েছেন।

১৩৩১, ১০ই শ্রাবণ (১৯২৪, ২৬ শে জুলাই) শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ মিলিত হয়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল গদ্যে-পদ্যে লোকের পিছনে লেগে তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখার নিছক আমোদ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই উদ্যোক্তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নজরুল হলেন এ পত্রিকার প্রধান আক্রমণস্থল। চিঠির প্রথম সংখ্যায় কাজীকে ব্যঙ্গ করে 'গাজী আব্বাস বিটকেল', সপ্তম সংখ্যায় 'আবাহন' কবিতা বেরোয়। মোহিতলাল তখনও শনিবারের চিঠির সঙ্গে জড়িত হননি। চিঠির ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪ সালের সংখ্যায় বিদ্রোহীকে ব্যঙ্গ করে বেনামীতে সজনীকান্ত দাস (১৯০০—১৯৬২)* 'ব্যাঙ' শীর্ষক কবিতা বের করেন। কাজী ও তাঁর তরুণ বন্ধুরা এ কবিতাটি মোহিতলালের রচনা বলে ভুল করলেন। কাজী মোহিতলালকে লক্ষ্য করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' ('ফণিমনসা' গ্রন্থে নাম দিয়েছেন 'সাবধানী ঘণ্টা') কবিতা লিখলেন। ১৩৩১, কার্তিকের 'কল্লোলে' সেটি প্রকাশিত হ'ল। মোহিতলাল গেলেন রেগে। তিনি লিখলেন 'দ্রোণগুরু'—শনিবারের চিঠির বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যায় (২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪ : ৮ই কার্তিক, ১৩৩১) প্রকাশিত হ'ল এবং মোহিতলাল শনিচক্রের দলভুক্ত হলেন।

'দ্রোণগুরু' কবিতা কোন বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু 'বিস্মরণী'তে নজরুলের প্রতি অভিশাপমূলক আর একটি কবিতা রয়েছে। সেটির নাম —'সুইনবার্নের অনুসরণে'। ইংরেজি কবিতার অনুসরণ হলেও কবির মনে ছিল নিজের ও নজরুলের তুলনা।

মাথায় রাগ চাপলে যেমন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তেমনি অবস্থা হ'ল মোহিতলালের। তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সুরে কথা কইতে শুরু করলেন। ১৩৩১, ১৫ই কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে 'চামার খায় আম' বেনামীতে তিনি 'রুবাইয়াৎ-ই চামার খায় আম' ধারাবাহিকভাবে কবিতার মাধ্যমে সমগ্র নজরুল সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন।

সাময়িক উত্তেজনায় মত্ত হয়ে উঠলেও সাহিত্যের আদর্শকে মোহিতলাল ভোলেন নি। 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৪, আশ্বিন সংখ্যায় 'সাহিত্যের আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রসঙ্গক্রমে নজরুল সাহিত্যের বিচার করেছিলেন। এখানে সেই প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হ'ল—

'আমাদের দেশে খুব বর্তমান কালে এমন একটি প্রবৃত্তি দেখা দিতেছে, যাহাতে সাহিত্যের এই নীতি বা আদর্শ একেবারে উড়িয়া যাইতেছে; অতিশয় অমেধ্য এবং মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর এক শ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্ত নিশান' উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নাই, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী অভ্যুত্থান-কামনা নাই—মানবাত্মার জয়-ঘোষণা ইহাতে নাই। কাব্যে কোনও সমস্যার বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে। আধুনিক 'তরুণ' সাহিত্যিকের বালক-প্রতিভা কাব্য-কাননে 'কামকণ্টকব্রণ' মহুয়া কুঁড়ির চাষ আরম্ভ করিয়াছে। মুস্কিল হইতেছে এই যে, 'দুষ্ট-খোকা'ও বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তাহা নটেশের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্ম্যের উল্লাস হিসেবেই তাহা উপভোগ্য।······

*   *   *   *

'কাব্যে কোনও সমস্যা বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে। কিন্তু কামোল্লাস যখন বিদ্রোহের নূতন তত্ত্ব প্রচার করে, তখন তাহার যে অবস্থা হয় তাহার কিছু উদাহরণ দিব। ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল, এবং তাহা নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা কাব্য; কারণ তাহাতে কামেরই বর্ণনা আছে, কামের নামে বড় কিছুর দাবী তিনি করেন নাই। সম্প্রতি একটি কবিতায় নব-সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি! ইহাতে এক প্রকার **nihilism** বা নাস্তিক্য

নীতির উল্লাস আছে—ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠকপাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর এবং কামুক; অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস আমরা সকলে ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য-মৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"কে বলে তুমি বারাঙ্গনা মা ?" বিদ্রোহের চরম হইল বটে, কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কি ? এই উক্তিতে সমগ্র নারীজাতিকে অপমান করা হইয়াছে অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই। বারাঙ্গনা মা নয়, বারাঙ্গনা নারী বটে, তাহার সেই সুপ্ত নারীত্বের মহিমা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতায় অপরূপ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও নারীমাত্রেরই এই মহিমা বাস্তবচিত্রে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বারাঙ্গনাকে 'মা' বলিতে আপত্তি নাই—যদি নারীর মাতৃত্ব ব্যতীত আর সকল সম্পর্ক অস্বীকার করা হয়; এইজন্য বারাঙ্গনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসম্বোধন অতিশয় সত্য ও সার্থক হইয়াছিল। নতুবা কবি-প্রচারিত নব-সাম্যবাদ অনুসারে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তুমিও বারাঙ্গনা, মাও বারাঙ্গনা, অতএব মা-তে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। এ ব্যাখ্যায় বেশি দূর অগ্রসর হইতে হইলে অন্তরাত্মা কলুষিত হয়, কিন্তু এই কবিতাটি তরুণদের বড় ভালো লাগিয়াছে।

'এই যে মনোভাব ইহা কেবল সমাজ-বিদ্রোহ নয়, ইহা মানুষের মনুষ্যত্ব বিরোধী। ইহা সাহিত্য হইতে পারে না, কারণ ইহা বলবান্ মনুষ্য-হৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; যে প্রজ্ঞার বলে কবিকল্পনায় সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায় সেই প্রজ্ঞা বা শক্তি এখানে একেবারেই নাই। ইহা অলস অবশ মাংসপিণ্ডের আক্ষেপ, রিপুর তাড়না—ইহারই নাম বিদ্রোহ-ঘোষণা !'

১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠের 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'অনামিকা' কবিতা ('সিন্ধু হিন্দোলে'র অন্তর্গত) বেরুলে মোহিতলাল এই কবিতার সমালোচনা করেন এইভাবে—

'এই লেখকই (নজরুল) বর্তমান যুগ-কবি বা Representative Poet, ইনিই তরুণের মুখপাত্র। কবিতাটির নাম 'অনামিকা'। কবির প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা; তাহার কারণ তাঁহার কামতৃষ্ণা কোন

নামনির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুনযজ্ঞ তাহাকেই পাত্র করিয়া তিনি তাঁহার কাম পরিবেশন করিতেছেন। আবার নারীমাত্রেই তাঁহার সেই অনামিকা প্রেয়সী, কেননা তাহাদের কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না, তাহারা সেই এক অভিন্ন রতিরসের পাত্র বই ত' নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না—এ বিষয়ে তিনি একরকম Pan-মৈথুন-ist।

তবু মোহিতলাল নজরুলকে আজীবন ভাল বেসেছেন। তিনি তাঁর শিষ্য অনুরাগী বন্ধুদের কাছে কাজীর কবিতার অনেক প্রশংসা করেছেন, তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কাজীর ব্যাধির সমাচার পেয়ে মোহিতলাল অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। শোনা যায় কাজীর পত্নীকে তিনি নিজের সমবেদনা জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয় উক্ত চিঠির কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। 'কল্লোলযুগ' পাঠ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে কাজীর প্রতি তাঁর বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন "আমার সহিত নজরুলের পরিচয় ও তাহার সহিত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি সত্য বিবরণ আপনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন।······নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় shock—তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন অধ্যায়ের ৫৩ সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য)। মোহিত-নজরুল প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' ও 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ৫, ছত্র ২৮। আপনার 'ছন্দ' বিষয়ক প্রবন্ধটিতে আপনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। উল্লিখিত 'ছন্দ' প্রবন্ধ পাঁচ কিস্তিতে নিম্নলিখিত নামে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ছন্দ—১৩২৯ পৌষ
স্বরবৃত্ত ছন্দ—১৩২৯ মাঘ
স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব—১৩২৯ ফাল্গুন
ছন্দের শ্রেণী বিভাগ—১৩২৯ চৈত্র
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ—১৩৩০ বৈশাখ

'জিজ্ঞাসা' থেকে প্রকাশিতব্য "ছন্দ জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলি থাকবে। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা "ছন্দ-পরিক্রমা" (১৩৭২) গ্রন্থের পরিশেষ বিভাগে দেওয়া আছে। উৎসাহী পাঠক তালিকাটি দেখতে পারেন।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ৬, ছত্র ২৮। বীরেন ভায়া। বীরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত—কাজী নজরুল ইসলামের পত্নী প্রমীলার খুড়তুতো দাদা, বিরজাসুন্দরী দেবীর পুত্র।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১০, ছত্র ১৭। তোমার ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটি···বড় কীর্তি হয়ে রইল। ১৩৩০ সনের 'প্রবাসী'র মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধবাবুর "বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত" প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে। ছন্দ সম্পর্কে মোহিতলালের অভিমত সম্বন্ধে প্রবোধবাবু বলেছেন, "তিনি আমার ছন্দ-আলোচনা কখনও পুরাপুরি সমর্থন করেন নি, কঠোর সমালোচনাও করেছেন। তা হলেও আমার প্রতি তাঁর প্রীতি কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি, আর আমার ছন্দ-আলোচনাও কখনও তাঁর অনুকূল মনোভাব থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানি প্রকাশের (১৩৫২, শ্রাবণ) সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে একখণ্ড বই উপহার পাঠান।···এই গ্রন্থের ভূমিকাতেও আমার ছন্দ-চর্চার কিছু বিরূপ সমালোচনা ছিল। কিন্তু এই বিরূপতা সত্ত্বেও ওই ভূমিকাতেই তিনি লেখেন—'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য কবিয়াছিলাম।···সদ্য প্রকাশিত তাঁহার এক গ্রন্থে ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ') আমি তাঁহার আলোচনার ভাষা ও ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি।' আরও কিছুকাল পরে 'ছন্দ-পরিভাষা' নামে আমার একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (১৩৫৫, মাঘ)। এই প্রবন্ধের প্রায় পঞ্চাশটি মুদ্রিত কপি বাংলা দেশের অগ্রণী কবি, ছান্দসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ছন্দ-শিক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাই। অনেকের উত্তর পাই কিন্তু অধিকাংশ উত্তরই ছিল সৌজন্যসূচক, আমার বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক নয়। মোহিতলালের উত্তরও সহায়ক হয়নি। কিন্তু একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই মামুলি সৌজন্যের পরিবর্তে যথার্থ উৎসাহ পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সে পত্রখানি কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে, এখনও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।···যা হোক ছন্দ-পরিভাষা সম্পর্কে তাঁর ওই

হারানো পত্রখানির মূলকথাগুলি এখনও মনে আছে। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম এই—'আমি কবিমানুষ, কবি মনোভাব ও কালের রুচি অনুসারেই ছন্দ-আলোচনা করি। আপনি মতামতের অপেক্ষা করবেন না। আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করে থাকেন। সুতরাং কারো মতামতের দিকে না তাকিয়ে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারেই পরিভাষা রচনা করুন।"

-পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১২, ছত্র ১। কবি করুণানিধান। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭—৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫)। রবীন্দ্রযুগের একজন অন্যতম কবি। প্রথমে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসমূহের পরিদর্শকের কাজ করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পান। 'ঝরাফুল' 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্বা' 'শতনরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। "সাহিত্যবিতান" (আশ্বিন, ১৩৪৯) গ্রন্থে মোহিতলাল এঁর কবি-প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিয়োগে তিনি একটি গাথা (সত্যেন্দ্র-বিয়োগে : বিস্মরণী) ও একটি সনেট (সত্যেন্দ্রনাথ) স্মর গরল রচনা করেন।

-পত্র, ৪, পৃষ্ঠা ১২, ছত্র ৩। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) মোহিতলালের অন্যতম প্রিয় কবি এবং জ্ঞাতি। 'অশোকগুচ্ছ,' 'পারিজাত-গুচ্ছ', 'শেফালী-গুচ্ছ' এঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। এঁর সম্পর্কে মোহিতলাল 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (শ্রাবণ, ১৩৪৩) গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

-পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১২, ছত্র ২১। 'বেদুইন' ও 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান' মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী' (১৩২৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

-পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১২, ছত্র ২৭। সত্যেন্দ্রনাথের 'কবর-ই-নূরজাহান' পড়ে দেখো। 'কবর-ই-নূরজাহান' কবিতা 'কাব্য-সঞ্চয়নে' (১৯৩০) পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২—২৫শে জুন, ১৯২২) বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিভিন্ন রকম ছন্দের তিনি প্রবর্তন করেন বলে তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। বিভিন্ন ভাষায় কবিতার অনুবাদে তিনি অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন। এঁর অকাল-মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব শোকগাথা রচনা করেন। 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু', 'কুহু ও কেকা'. 'বেণু ও বীণা', 'বিদায় আরতি' উল্লেখযোগ্য

কাব্যগ্রন্থ। মোহিতলাল 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বিচিত্র কথা'' (ভাদ্র ১৩৪৯) গ্রন্থে—সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিয়োগে একটি গাথা (সত্যেন্দ্র বিয়োগে : বিস্মরণী) ও একটি সনেট (সত্যেন্দ্রনাথ : স্মর-গরল) রচনা করেন।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৩, ছত্র ২৭। 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' কবিতা 'বিস্মরণী'র অন্তর্গত।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৪, ছত্র ১৫। বীরেনের সঙ্গে। বীরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত।

পত্র ৫, পৃষ্ঠা ১৫, ছত্র ৩। হেম বাগচীর মত। হেমচন্দ্র বাগ্‌চী খ্যাতনামা কবি, জন্ম নদীয়ায় ১৯০৪ সালে। দীপান্বিতা এঁর প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ। বর্তমানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ আছেন। 'দীপান্বিতা' মোহিতলালকে উৎসর্গীকৃত এবং মোহিতলাল এর জবাবে 'প্রীতি-উপহার' নামে একটি কবিতা রচনা করেন—'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি পাওয়া যাবে।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৬, ছত্র ১। কবিতা 'মহাকাল' পাইলাম; 'মহাকাল' কল্লোলে প্রকাশিত, পরে 'কুটিরের গান' (১৩৪১ শ্রাবণ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৭, ছত্র ৭। বিশেষ করিয়া কাব্য ও জীবন নামক দুই সংখ্যায় সমাপ্ত যে দীর্ঘ প্রবন্ধ। 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৮) গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যাবে।

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ১৭. ছত্র ৪। রবিবাবুর 'পরশপাথর'। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা 'পরশপাথর'। 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'পরশপাথর' কবিতার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ১৭, ছত্র ৯। অজিতকুমার চক্রবর্তী (৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৩—১৪ই পৌষ, ১৩২৫) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অতি তরুণ বয়সেই তিনি সাহিত্য-সমালোচক ও জীবনীলেখক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি কবি সম্পর্কে যে আলোচনা লেখেন সেটি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ পাঠের প্রথম সমালোচনাগ্রন্থ। দেশের সাহিত্য ও অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন সেটি 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩১৯) ও 'কাব্য পরিক্রমা' (১৩৪০) গ্রন্থে তিনি অতি সুনিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এছাড়া তাঁর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) নামে একটি চরিতগ্রন্থ রয়েছে। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ২০। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'অভ্যুদয়' মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ, ১৩৪০) সম্পাদকীয়তে সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'র ১৩৩৯, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিতলাল মজুমদারের 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' ('সাহিত্যকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধের সমালোচনা করা হয়। তাছাড়া কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কাব্যের কলিযুগ' প্রবন্ধেও প্রতিবাদ করেন। মোহিতলালের 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনায় যে 'সাহিত্যে অশ্লীলতা'র অপবাদ ছিল, যতীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল তারই বিরুদ্ধে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে মোহিতলালের আপত্তি ছিল—বর্তমান চিঠির মধ্যে মোহিতলাল ঐ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মোহিতলালের এই দীর্ঘ পত্রের উত্তরে সাবিত্রীবাবু নিম্নের চিঠি লেখেন—

৩৯এ, বকুলবাগান রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা
৩-৬-৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া বিশেষ শ্লাঘাবোধ করিতেছি এই ভাবিয়া যে আপনি আমার সম্বন্ধে একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মত চিন্তা করিতেছেন এবং পরম বন্ধুর মত আমার ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে অকপটে মত প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আপনার একান্ত বাঞ্ছনীয় মনোভাবটি বর্তমান থাকিবে।

মাসের শেষে কাগজ বাহির হইতেছে—এই প্রকার নিয়ম করিয়াছি—অতএব সময় ত' আর নাই—আপনার কবিতাটি প্রথমে দিব বলিয়া প্রথম দুই ফর্মা বাদ রাখিয়া ৩য় ফর্মা হইতে কাজ চলিতেছে, তাহা বোধ হয় পূর্বেও আপনাকে জানাইয়াছি। এ ক্ষেত্রে আপনার কবিতাটি অবিলম্বে পাওয়া দরকার। বড় হইলেই যে আপনার কবিতা ছাপাইতে অসুবিধা হইবে এ ধারণা করাই আপনার ভুল হইয়াছে। আপনার কবিতার উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে আমার কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যাতেই আপনার কবিতাটি প্রথমে ছাপাইবার গৌরব অনুভব করিবার সুযোগ খুঁজিতাম না। আপনি পত্রপাঠ কবিতাটি পাঠাইবেন—যদি অসুবিধা না হয় রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইবেন।

আপনার কাছে লিখিত আমার 'পত্রে' এবং 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় আপনার বিরুদ্ধে একটি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাতে দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। আপনার প্রবন্ধ বা কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্যকে আপনি বিরুদ্ধ-বাদ বলিয়া ধরিয়া লইয়া আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। 'শনিবারের চিঠি' এবং 'অভ্যুদয়' ও 'বঙ্গশ্রী' এক পর্যায়ের কাগজ নহে তাহা জানি, কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম দিকটায় প্রত্যেক মাসে যে সুচিন্তিত, সুলিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'শনিবারের চিঠি'র প্রকৃত সুর বা আদর্শের সহিত সমঞ্জস কি? সে প্রবন্ধগুলি যে কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ হইলে পত্রিকার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং আমি যতদূর জানি, অধিকাংশ প্রবন্ধই ত' আপনার লেখা। আপনার লেখার সরল ভঙ্গী, সতেজ ভাষাবিন্যাস, প্রবল যুক্তিসমাবেশ —সবার উপর তাহার Serious drift গম্ভীর সাহিত্য-পত্রিকার উপযোগী—সেগুলি 'শনিবারের চিঠি' ছাড়া অন্য কোনও তদুপযুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তাহার মূল্য ও মর্যাদা শতগুণে বর্ধিত হইত না কি? 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষ হইতে ভালমন্দ সাহিত্য নির্বিচারে উড়াইয়া দিবার ধারাবাহিক চেষ্টাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে—বাঙ্গলা সাহিত্যের কোনও লেখকই কিছু নহে—সকলের প্রতি অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ব্যক্তিবিদ্বেষ প্রচারকেই কি 'শনিবারের চিঠি' তাহার একান্ত আদর্শ বলিয়া মনে করে নাই? বাঙ্গলাদেশে সাহিত্যসমাজ বলিয়া যদি কিছু থাকে এবং সেখানে যদি সকলের সত্যভাষণের শক্তি থাকে তবে দেখিবেন প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই তাই মত—'ভদ্রসমাজসম্মত' আদর্শ বর্জন করিয়া যে 'শনিবারের চিঠি' চালাইতে হইবে, এমনি বা কি কথা আছে? আর একটি কি ক্ষতি হইয়াছে জানেন? সাহিত্য-সমাজে হৃদ্যতা, সহৃদয়তা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি সদ্‌প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত, অজ্ঞাতে পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিবিদ্বেষের বিষাক্ত জ্বালা সংক্রামিত করিয়াছে এই 'শনিবারের চিঠি'। মঙ্গল কিছুই করিতে পারে নাই, সাহিত্যে সংগঠন বা গঠনশক্তি ধ্বংস করিয়াছে—সামাজিক প্রীতি ও অনুরক্তি অকারণে নষ্ট হইল—বহুগোষ্ঠী-সাহিত্যসমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ, ক্ষুদ্রতা, নীচতা এমনি করিয়া সাহিত্যিকগণকে আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাসী করিয়া দিল যে প্রত্যেকের অবহেলা ও অশ্রদ্ধার ভাবটাই পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিবার অবসর আছে—চিঠিতে প্রকাশিত

লেখাগুলি একত্র করিলে আমার উক্তি সমর্থন্ করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে বলিয়াই মনে করি।

স্নেহধন্য
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ২০, ছত্র ৪। কবিতাটি আজই পাঠাইতে পারিলাম না। কবিতার নাম 'সত্য-সুন্দর'। ১৬০ লাইনের কবিতা। কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৩৪০ সালের 'অভ্যুদয়ে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বছরের বৈশাখ সংখ্যা 'অভ্যুদয়ে' 'কাব্যের কলিযুগ'প্রবন্ধে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মোহিতলালকে উপলক্ষ্য করে লিখেছিলেন, "আমি স্বয়ং প্রেমিক, আমি পরমধার্মিক হয়ত বা আমি আরও কিছু। মাত্র সত্য নহি, মাত্র সুন্দরও নহি—আমিই সত্যসুন্দর।" মোহিতলাল 'সত্যসুন্দর দাস' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবন্ধাদি লিখতেন। মোহিতলাল 'সত্যসুন্দর' কবিতায় একথার জবাব দিলেন—

চোখে যা সুন্দর দেখি প্রাণে তারে সত্য বলে জানি,
সে প্রত্যয় আনন্দের—সে ত নহে বিচার-জল্পনা,
সত্য-মিথ্যা ভাগ করে যেই দৃষ্টি সে নহে কল্পনা—
সে নহে কবির সৃষ্টি, বাণী তার নহে বীণাপাণি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঐ প্রবন্ধের আর এক জায়গায় লিখেছিলেন "কাব্যের কলিযুগে বাক্যব্রহ্মের যখন এবম্বিধ অবমাননা ঘটিতে লাগিল তখন বাক্যযোগী কবির ললাটে যে লাঞ্ছনা লিখিত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।" মোহিতলাল তার জবাব দিলেন—

সুন্দর নহে সে শুধু—তার মাঝে হয় রূপান্তর
সসীমের, অনিত্যের, নিত্যরূপ নেহারি অন্তর
ভরি উঠে, সে ত নয় শূন্য ব্যোমে রসের সন্ন্যাস
কাব্যের সে কলিযুগ আজ নয়—আছে চিরদিনই।

... ...

ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর নির্দ্বন্দ্ব সে রসের আবেশে
সুন্দর দিবে কি ধরা অসুন্দরে ছাড়ি নির্বিশেষে?

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এর উত্তর দিলেন 'সত্যসুন্দর' ও 'ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর' প্রবন্ধ দুটি লিখে—'অভ্যুদয়ে'র আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৪০) তা

প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের ১৭. ৬. ৩৩ তারিখের ১০ম সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ২০, ছত্র ১১। আপনাকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম। 'ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন' অধ্যায়ের সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চার সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। 'অভ্যুদয়ে'র প্রথম ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীবাবু মোহিতলালকে পত্রিকা পাঠান। পত্রিকার প্রাপ্তিসংবাদে মোহিতলাল পত্রিকা পরিচালন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দেন।

পত্র ৯, পৃষ্ঠা ২৩, ছত্র ২। আমার কবিতা সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন। 'সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের আট সংখ্যক চিঠির উত্তরে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের ৩. ৬. ৩৩ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০, পৃষ্ঠা ২৪, ছত্র ১। আমার কবিতা যেস্থানে যেভাবে ছাপাইয়াছেন। 'সত্য-সুন্দর' কবিতাটি 'অভ্যুদয়ে'র ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ১০ পৃষ্ঠা ২৪, ছত্র ৭। লেখক কে তাহা আমি জানি। 'বঙ্গশ্রী'র ১৩৩৯ চৈত্র সংখ্যায় মোহিতলালের প্রকাশিত 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'অভ্যুদয়ের' বৈশাখ ১৩৪০ সংখ্যায়। এই অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০, শেষ অনুচ্ছেদ, 'কুমারসম্ভব'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কুমারসম্ভব' অনুবাদ 'অভ্যুদয়ে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অনুবাদ সম্পর্কে মোহিতলালের বিস্তৃত আলোচনা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত 'সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের ৩০. ৫. ৪৩ তারিখের ২৫ সংখ্যক চিঠির মধ্যে পাওয়া যাবে।

পত্র ১১, পৃষ্ঠা ২৬, ছত্র ৭, উপহার। 'কুটিরের গান' (শ্রাবণ ১৩৪১) কবিতার বই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৮, ছত্র ১৩। Swinburne-এর ভাষায় Remembrance ইত্যাদি। পংক্তি কটি সুইন্‌বার্ণের Collected Poetical Works (1924) Vol. II.

এঁর Atalanta in Calydon কবিতার অন্তর্গত। মুদ্রণে কিছু বিপত্তি ঘটেছে। সংশোধিত পাঠ হল এই—

Remembrance fallen from heaven,
And Madness risen from hell, (p. 258)
... ...
In his heart is a blind desire,
In his eyes foreknowledge of death ; (p. 269)

সুইন্‌বার্ণ (Algernon Charles Swinburne, 1837-1909) : ইংরাজ কবি। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : Poems and Ballads, A Song of Italy, Songs before Sunrise প্রভৃতি। মোহিতলালের অন্যতম প্রিয় কবি তিনি। "হেমন্ত-গোধূলি"তে সুইন্‌বার্ণের একটি কবিতার অনুবাদ ('সৃষ্টির আদিতে') আছে।

পত্র ১৩, পৃষ্ঠা ২৯, ছত্র ৪। নূতন বইখানি। 'বৈতরণী তীরে' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)।

পত্র ১৩, পৃষ্ঠা ৩০, ছত্র ৫। পূর্বে বলিয়াছিলাম। বনফুলকে লিখিত ৭. ৪. ৩৭ তারিখের পত্র।

পত্র ১৩, পৃষ্ঠা ৩১, ছত্র ২৭। দুখানি বই। 'তৃণখণ্ড' ও 'বনফুলের গল্প'।

পত্র ১৩, পৃষ্ঠা ৩১, ৩২, ৩৩। হার্ডি (Thomas Hardy : 1840-1928). ইংরাজ কথা সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : Under the Greenwood Tree, A Rain of Blue Eyes, Far from the Madding Crowd, Mayor of Casterbridge, Tes of the d'urbervilles প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় 'টেস' ও 'পেয়ার অফ্ ব্লু আইজ' অনুদিত হয়েছে। শোপেন-হাওয়ার (Arther Schopenhauer : 1788–1860), জার্মান দার্শনিক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : Uber die Vierfache Wurzel des Salzes Vom Zureichenden Grade, Die Welt als Wille und Vorstellung, Die Beiden Grundprobleme der Ethik প্রভৃতি। এঁর উদ্দেশ্যে মোহিতলাল 'পান্থ' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। 'বিস্মরণী' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। দস্তয়ভস্কি—(Fydor Mikhailovich Dostoevsky : 1821-1881) রুশ সাহিত্যের ঔপন্যাসিক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : Crime and Punishment, The Idiot, The Brorhers Karamazove প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় এঁর উপরোক্ত গ্রন্থগুলির অনুবাদ

প্রকাশিত হয়েছে। Middleton Murry—(John Middleton Murry : 1889—1957) ইংরাজ লেখক ও সমালোচক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : The Evolution of an Intellectual, Between two Worlds, Shakespeare, The Necessity of Pacifism প্রভৃতি।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ৩৪, ছত্র ১৪। এবার শেষ হইল। 'দ্বৈরথ' উপন্যাস 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৭৪ সালেব জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শেষ হয়।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ৩৫, ছত্র ৯। ভারতবর্ষে আপনার 'রূপান্তর'। 'ভারতবর্ষে'র ১৩৭৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে 'রূপান্তর' বেরুতে আরম্ভ করে।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ৩৫, ছত্র ১০। 'রূপান্তর' আববা উপন্যাসের 'আলিবাবা' গল্পের নাট্যরূপ।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ৩৬, ছত্র ২৫। আমার দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৩ সনের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যথাক্রমে 'অতি আধুনিক ছন্দ' ও ববীন্দ্রনাথের 'অতি আধুনিক কবিতা' প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ৩৯, ছত্র ১০। সনেট সম্বন্ধে একটি আলোচনা। ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'র চৈত্র সংখ্যায় 'বাংলা সনেট' নামে তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ সংশোধন করে 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ৩৯, ছত্র ১২। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ইত্যাদি। পংক্তি কটি রসেটির The House of Life, Pt. I-এর Introduction-এ আছে। রসেটি (Dante Gabriel Rossetti : 1828-1882) : ইংরাজ চিত্রকর এবং কবি। গ্রন্থ : Ballads and Sonnets প্রভৃতি।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ৪০, ছত্র ৪। আপনার গল্পের বইখানি। গল্পগ্রন্থের নাম 'বনফুলের গল্প'।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ৪০, ছত্র ১৩। মধুসূদনের শেষটিতে বড় কায়দা করিয়াছেন। 'শ্রীমধুসূদন' নাটক।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ৪০, ছত্র ১৭। 'ভূয়োদর্শন' 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ৪১, ছত্র ১১। এবারকার 'শঃ চি'র। শনিবারের চিঠি, কার্তিক, ১৩৪৫। 'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থে বনফুল সম্পর্কে আলোচনা আছে 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ৪২, ছত্র ৩০। এক রীতিতে বড় কাব্য (উপন্যাস) রচনায় ইতিমধ্যে ব্রতী হইয়াছেন। 'জঙ্গম' উপন্যাস রচনার কথা বলা হয়েছে।

পত্র ১৮ পৃষ্ঠা ৪৩, ছত্র ৫। যেমন Paradise Lost। ইংরাজ কবি জন মিলটন (John Milton : 1608-1674) রচিত প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে পিউরিটানিক ও খ্রীষ্টিয় ভাবধারার প্রধান প্রবক্তা। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: Paradise Regained, L' Allegro and Il Penseroso, Samson Agonistes, Areopagitica প্রভৃতি।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ৪৩; ছত্র ১৪। Keats-এর মত। জন কীট্‌স (John Keats : 1795-1821) ইংরাজ কবি। প্রধান গ্রন্থ: Poems, Endymion, The Eve of St Agnes. Collected Works প্রভৃতি। মোহিতলাল কীট্‌সের একটি কবিতার অনুবাদ (নিষ্ঠুরা রূপসী: হেমন্ত-গোধূলি) করেছেন।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪, ছত্র ৮। (Mathew Arnold 1822-1888) ইংরাজ কবি ও সমালোচক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: The Strayed Reveller and other Poems, Poems, Essays in Criticism, Culture and Anarchy, Literature and Dogma প্রভৃতি।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪, ছত্র ৯। Tennyson। টেনিসন (Lord Alfred Tennyson: 1809-1892) ইংরাজ কবি। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: In Memorium, Poems (2 Vols). Idylls of the King. Enoch Arden, Queen Mary প্রভৃতি। টেনিসনের দুটি কবিতার অনুবাদ (শ্যালট-বাসিনী ও নিশীথ রাতে: হেমন্ত-গোধূলি) মোহিতলাল করেছেন।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৫, ছত্র ১৬। 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ', 'শেষ শয্যায় নূরজাহান', 'বেদুঈন' কবিতাগুলি 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৫, ছত্র ২৬। সকলের উপরে আমার বেদুঈন-জীবন বোধহয় সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। ১৯১৪ সালে কলিকাতার তালতলা হাই স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগোর পদ গ্রহণ করেন। এই কাজের সূত্রে তাঁকে কিছুদিন শিলাইদহে থাকতে হয়েছিল। পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচর তাঁর কবি-জীবনকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন—"একদিন এই চরের সন্ধ্য-স্মৃতি হইতে আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম—বৈশাখের

অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তাহার সেই দিগন্ত-বিসর্পী বালুভূমির উপরে আমি যে বেদুঈন-জীবন যাপন করিয়াছিলাম, তখনও তাহার উন্মাদনা আমার শিরায়-শোণিতে বিদ্যমান ছিল ; তাই কাব্যরসিক বন্ধুগণ সেই কবিতা পড়িয়া আমার কল্পনাশক্তির তারিফ করিয়াছিলেন ; আমি যে কোথা হইতে সেই কবিতার (বেদুঈন) পটভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সে সংবাদ তাঁহারা জানিতেন না। চরের সেই রূপ আমারই দেখা রূপ—রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখিলেও তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই ; তিনি পদ্মার যে ভৈরবী মূর্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা শিখাময়ী নয়—তরঙ্গময়ী ; সে তাহার সেই ভাঙ্গনের—প্লাবনের রূপ—যাহার পরে পদ্মা যেন শ্রান্তক্লান্ত হইয়া এইরূপ বিশাল সিকতা-শয্যায় শীর্ণ তনু এলাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার যে আর এক রূপ—সেই মন্ত্রস্তব্ধ নিশীথ—নির্জনতার রূপ, যে রূপ কবিকে অর্ধরাত্রে ধ্যানাসনে বসাইয়াছে—আমি সে রূপও দেখিয়াছি ; কিন্তু ধ্যানাসনে নয়, এমন কি, পদচারণা করিয়াও নয়—বর্বর বেদুঈনের মত ধাবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া।" (শিলাইদহে রবীন্দ্র-স্মৃতি : রবি-প্রদক্ষিণ)।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৫, ছত্র ২৮। 'আবির্ভাব' কবিতা 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৫, ছত্র ২৯। 'কবির প্রতি' কবিতাটি 'স্বপন-পসারী'র অন্তর্গত। 'স্বপন-পসারীর' দ্বিতীয় সংস্করণে (শ্রাবণ ১৩৫৮) উক্ত কবিতাটি কবি 'করুণানিধানের প্রতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৫, ছত্র ৩০। 'উচ্চৈঃশ্রবা' 'স্বপন-পসারী'র অন্তর্গত। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ আছে, "উচ্চৈঃশ্রবা' শীর্ষক কবিতাটি ভিক্টর হুগোর অনুসরণে লিখিত।" ভিক্টর হুগো (Victor-Marie Hugo : 1802-1805) ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। প্রধান গ্রন্থ : Nouvellas Odes, Odes et Ballads, Cromwell, Marion Delorme, Hernani, Notre Dame de Paris, Les Miserables প্রভৃতি।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৬, ছত্র ৪। তোমার বন্ধুর কবিতা পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। তারাচরণ বসুর বন্ধুর নাম শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪২ সালের এপ্রিল-মে মাসে এঁর মৃত্যু হয়। বি. এস্‌সি. পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পাশও করেছিলেন কিন্তু পরীক্ষার ফল জেনে যেতে পারেন নি।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৬, ছত্র ১২। **রোহিনী-সংক্রান্ত যে প্রশ্ন করিয়াছ।** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিণী-চরিত্র সম্পর্কে মোহিতলাল 'শরৎ-পরিচয়' নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পরে 'বিবিধ কথা' (ভাদ্র, ১৩৪৮) ও 'সাহিত্য-বিতান' (আশ্বিন, ১৩৪৯) গ্রন্থে 'শরৎ-পরিচয়' অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ৪৬, ছত্র ২৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৭, ছত্র ৮। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনা 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৮ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে উক্ত প্রবন্ধ 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (শ্রাবণ, ১৩৫২) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৭, ছত্র ১৩। 'কাব্য-মঞ্জুষা'র নূতন পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে (১৩৬৭) ১৫০টি কবিতা আছে।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৮, ছত্র ১৬। 'দুঃখের কবি' 'হেমন্ত-গোধূলি' গ্রন্থের ও 'অ-মানুষ', 'ক্ষ্যাপা' 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৮, ছত্র ২৩। **রবীন্দ্রনাথ আমাকে কখনও অধ্যবসায়ী কবি বলেন নাই।** রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি একথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে। তাতে বার-বার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হ'তে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই। আরো অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক অধ্যবসায়ের যুগ এসেছে। এই নব-অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।" (সাহিত্যের নবত্ব: প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৮, ছত্র ২৭। শেষের লেখাটি পড়িও। 'বিচিত্রকথা' (ভাদ্র, ১৩৪৮) গ্রন্থেব শেষ প্রবন্ধের নাম 'বিচিত্র কথা' এই প্রবন্ধের মধ্যে তিনটি অধ্যায় আছে—'জীবন-জিজ্ঞাসা', 'প্রশ্ন ও তাহার উত্তর', 'আমাব কাব্য-সাধনা'। এই প্রবন্ধটি 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (২৮ শে আষাঢ, ১৩৫৮) গ্রন্থেও সংযোজিত।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ৪৯, ছত্র ১। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য (কলিকাতা আশুতোষ কলেজেব বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক) ছন্দ সম্পর্কে গবেষণা কবেই ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। মোহিতলাল উক্ত থিসিসের পবীক্ষক ছিলেন। থিসিসের প্রথমাংশ তিনি সমর্থন করায় তারাপদ বাবু বৃত্তি পান, কিন্তু শেষাংশের অনুমোদন না করায তিনি মোযাট মেডেল পান নি। তারাচরণ বসুর মাধ্যমেই মোহিতলালেব সঙ্গে তাঁব ব্যক্তিগত পবিচয় হয়। এঁর রচিত গ্রন্থ—ছন্দোবিজ্ঞান, বঙ্গসাহিত্যেব ইতিহাস। 'ছন্দোবিজ্ঞান' (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন "বর্তমান গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যাহাতে ভাষাতত্ত্ব শরীরতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষণ করিয়া ইহা প্রকৃত একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইয়া উঠে ও ছন্দোবিজ্ঞান নামের যোগ্য হয় সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে এই চেষ্টার ফলে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান বিশিষ্ট ছান্দসিকের সহিত আমার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার।···আমি ইচ্ছা করিয়াই এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দের ঐতিহাসিক আলোচনা যথাসম্ভব বাদ দিয়াছি। তাহার কারণ মৎপ্রণীত বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা নামক অন্য একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থে বাংলা ছন্দঃশাস্ত্রের ইতিহাস এবং বিভিন্ন বাংলা ছন্দের জন্ম ও ক্রমবিকাশের কাহিনী লিখিত হইয়াছে। বইখানি ইংরেজী ১৯৪৩ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিল।" এই সঙ্গে 'বিবিধ' অধ্যায়ের ১৬. ১৭. ১৯. সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৪৯, ছত্র ১৭। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের 'গানভঙ্গ' কবিতার পংক্তি। কবিতায় আছে 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে'।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫০, ছত্র ১। 'স্বপন-পসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ পরাগ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে উক্ত সংস্করণ প্রচারিত হয় নি, পরে (শ্রাবণ ১৩৫৮) বঙ্গভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণকেই মোহিতলাল দ্বিতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি কবির মনঃপূত ছিল না। একথা তিনি ১৫. ৮. ৪২ তারিখের পত্রেও ('সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক পত্র) উল্লেখ করেছেন, " 'স্বপন-পসারী'র ছাপা ও বাঁধাই আমার আদৌ পছন্দ হয় নাই—বড়ই কষ্ট বোধ করিয়াছি ; কারণ, আমার জীবদ্দশায় উহার ওই মূর্তির বদল আর হইবে না। বড় ইচ্ছা ছিল—উহার ভিতরের মত উপরটাও একটু রসোদ্দীপক হয়। আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ।" (অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত)। 'বিস্মরণী'র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাতেও এই সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেছেন, 'উপযুক্ত প্রচ্ছাদনের অভাবে তিনি দোকানে পৌঁছিয়াও ক্রেতার মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন না ; অধিকন্তু তাহার সেই মূর্তিরও মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একে কবিতা, তাহার উপর সে কবিতা এমন পৌরাণিক—তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া যদি কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকাশক—বিজ্ঞাপন দেওয়া ত দূরের কথা—তাহাকে এমন হতশ্রী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে ঐ বইখানির সম্বন্ধে মহাজনোচিত বৈরাগ্য অতিশয় আধ্যাত্মিক হইলেও বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার নিকটে গ্রন্থকারই দায়ী।" (১৩৫৩)

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫০, ছত্র ১৪। তারাচরণ বসুর প্রস্তাব ছিল 'স্বপন-পসারী'র আরবি-ফার্সি শব্দগুলির একটা glossary দেওয়া এবং অনুযোগ ছিল ঐ ধরণের ইসলামিক পটভূমিকায় রোমান্টিক কবিতা আরও না লেখার জন্য। এ সম্পর্কে কবি বলতেন "মোগলাই মেজাজ যদি না আসে তবে কি ভাবে লিখব ?" তবু 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আওরংজীব' লিখেছেন —সামুগড়ের যুদ্ধ আর লেখা হল না।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫০, ছত্র ১৬। একটি উপহার কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'স্বপন-পসারী'র মুখপাতে 'উপহার' কবিতাটি ঢাকা থাকাকালীন ২৬ ফাল্গুন ১৩৪৮-এ লেখা। প্রথম লাইন 'এখনো হয় নি সাঙ্গ শ্যামলের আলিপনা এপারের শুভ্র সিকতায়'।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫০, ছত্র ১৮। ছন্দের ঐ ভুলটি সংশোধন করিয়া দিয়াছি ‘স্বপন-পসারী’র ‘আঁধারের লেখা’ কবিতার একটি ছত্র—নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন। সুধাপান —শুধু সুখ? প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল—‘শুধু সুধাপান শুধু সুখ’। ফলে ছুটি মাত্রা বেশী হয়েছিল। তারাচরণ বসু ছন্দের ঐ ত্রুটি সম্পর্কে মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোহিতলাল পরবর্তী সংস্করণে উক্ত ত্রুটি সংশোধন করেন।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫০, ছত্র ২৯। “নাগার্জুন” George Sylvester Viereck-এর কবিতার অনুবাদ। উক্ত কবিতা ‘কালি-কলমের’ ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫১, ছত্র ১১। কিন্তু ‘বিস্মরণী’র কবি বলিয়াই আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি এককালে ছিল। “বিস্মরণী”র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন “আমি” যে কখনও কবিতা লিখিয়াছলাম তাহা এতদিনে পাঠকসমাজ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমারও মাঝে মাঝে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।” কিন্তু তাঁর এ ধারণা অমূলক সে-প্রমাণও তিনি তাঁর জীবিতাবস্থায় পেয়েছেন। ‘বিস্মরণীর’ তৃতীয় সংস্করণে সেকথা তিনি স্বীকারও করেছেন, “দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা যে সত্য নহে, ইহার প্রমাণ পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি।...আমার কবিতার যে এরূপ বাজারমূল্য আছে, তাহা আমি জানিতাম না, প্রকাশকই তাহা প্রমাণ করিলেন। কবিই বৃদ্ধ ও পুরাতন হয়, কবিতা হয় না ইহা সত্য; তথাপি আজিকার শর্টস্কার্ট-পরিধানা নবীনা কাব্যবধূদের আসরে আমার এই ‘শ্রোণীভারাদলসগমনা’, অতিদীর্ঘ চেলাঞ্চলা ও সালঙ্কারা, পৌরাণিক কবিতাসুন্দরীকে কেহ যে অনুরাগের চক্ষে দেখিবে, এমন আশা করি নাই। এখন বুঝিতেছি, ভুল আমারই।...‘বিস্মরণী’র দ্বিতীয় সংস্করণের আদর দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে বাঙালীর কাব্যরস-প্রীতির বরং আধিক্যদোষ আছে, বিপরীতটি সত্য নহে।” (১৩৫৩)

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ৫২, ছত্র ২২। তোমার সেই দীর্ঘ কবিতাটি। কবিতার নাম “রবীন্দ্র-বিয়োগ-গাথা।” এই কবিতা সম্পর্কে মোহিতলালের অভিমত তারাচরণ বসুকে লিখিত ১৫. ৮. ৪২. তারিখের চিঠিতে (সাহিত্য-চিন্তার ২২ সংখ্যক পত্র) পাওয়া যাবে।

পত্র-২১, পৃষ্ঠা ৫২, ছত্র ২৮। তুমি 'পরিচয়' পত্রিকা এবং তাহার লেখক (যথা, শচীন সেন)। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০০-১৯৬১) সম্পাদনায় 'পরিচয়' প্রথমে ত্রৈমাসিক রূপে (শ্রাবণ ১৩৩৮) বেরোয়। পরে এটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গোপাল হালদার, হিরণকুমার সান্যাল, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'পরিচয়' এখনও বেরুচ্ছে। শচীন সেন (১৯০২) 'The Indian Nation' কাগজের সম্পাদক। রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়, 'The Political Thought of Tagore' তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৩, ছত্র ৫। 'স্বপন-পসারী'র ছাপাই ও বাঁধাই আমার পছন্দ হয় নাই। মোহিতলালের জীবিতাবস্থাতেই 'স্বপন-পসারী'র সুন্দর ও শোভন সংস্করণ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১৩৫৮)। এই প্রসঙ্গে তারাচবণ বসুকে লিখিত ২৩. ৬. ৪২. তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৩, ছত্র ৯। তুমি যে ছন্দ-বিচ্যুতি ধরিয়াছ। 'স্বপন-পসারী'ব "জন্মান্তরে" কবিতায় আছে—

: পডিবে দু'খানি ছায়া নদী-সিকতায়
ম্লান চন্দ্রালোকে ; শীতে মৃদু শিহরিয়া

প্রথম দিকের সংস্করণে 'মৃদু' শব্দটি ছিল না। তারাচরণ বসু ছন্দের ত্রুটি সম্পর্কে মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, পরে মোহিতলাল সেটি সংশোধন করেন।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৪, ছত্র ১৬। তোমরা (কাহারা?) Paradise Lost অনুবাদ করিতেছ শুনিয়া বুঝিলাম। জন মিলটন-রচিত 'Paradise Lost'-এর অনুবাদ করেছিলেন তারাচরণ বসু। নিজের নাম চিঠিতে উল্লেখ করতে সঙ্কোচ হয়েছিল। এই অনুবাদ কোন পত্রিকায় বেরোয় নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করে মোহিতলালকে তিনি দেখিয়েছিলেন। অনুবাদ দেখে মোহিতলাল প্রথম বলেছিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে অনুবাদকের কোন ধারণা নেই। নিজে তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে তারাচরণ বসুকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বোঝান। দ্বিতীয় বার অনুবাদ করে দেখাতে তিনি বলেছিলেন যে, হিব্রুগন্ধী ও গন্থধর্মী বিষয়বস্তু আমাদের সাহিত্যের পক্ষে খাপ খায় না।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৪, ছত্র ২১। ঐ কাব্যের শেষ পংক্তিগুলিতে। ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২—১৮৮৮)-এর "Sohrab and Rustum" কাব্যগ্রন্থের শেষ পংক্তিগুলি হল এই—

But the majestic river floated on,
Out of the mist and hum of that low land,
Into the frosty starlight, and there mov'd
Rejoicing, through the hush'd Chorasmian waste,
Under the solitary moon : he flow'd
Right for the Polar Star, past Orgunje,
Brimming, and bright, and large : then sands begin
To hem his watery march, and dam his streams,
And split his currents ; that for many a league
The shorn and parcell'd Oxus strains along
Through beds of sand and matted rushy isles
Oxus, forgetting the bright speed he had
In his high mountain cradle in Pamere,
A foil'd circuitous wanderer :—till at last
The long'd-for dash of waves is heard, and wide
His luminous home of waters opens, bright
And tranquil, from whose floor the new-bath'd stars
Emerge, and shine upon the Aral Sea.

(C. 875-92)

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৬, ছত্র ১৮। আমি একটি কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম, বলিয়াছি। "কাব্য-মঞ্জুষা" সম্পাদনার কথা বলা হয়েছে। তারাচরণ বসুকে ১৯. ৬. ৪২ তারিখের চিঠিতে (সাহিত্য-চিন্তার ২০ সংখ্যক পত্র) মোহিতলাল এই সম্পাদনার কথা জানিয়েছিলেন।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ৫৬, ছত্র ২২। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছু লিখতে বাধ্য হইতেছি। চণ্ডীদাস সম্পর্কে লেখার সংকল্প শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি।

পত্র ২৩, পৃষ্ঠা ৫৭, ছত্র ২। আপনার মিতাকে। 'মিতা' বলতে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮—১৯৪৮) কথা বলা হয়েছে।

পত্র ২৩, পৃষ্ঠা ৫৭, ছত্র ৮। আপনাকে পূর্বপত্রে। 'ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন' অধ্যায়ের ১৪ সংখ্যক (২৬. ৯. ৪২.) চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৪,পৃষ্ঠা ৫৯, ছত্র ৫। ঢাকায় প্রায় ১৫ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ১৯২৮ জুলাই থেকে ১৯৪৪ জুন।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ৬০, ছত্র ২। Michael Sholokoff এবং Somerset Maugham। মিখাইল শলোকভ (Mikhail Aleksandrovich Sholokhoff, 1905—রুশ সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক। ১৯৬৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: And Quiet Flows the Don, The Family Man, Virgin Soil Upturned প্রভৃতি। এঁর কিছু গ্রন্থের যেমন, 'সাগরে মিলায় ডন' 'কুমারী মাটির ঘুম ভাঙছে' বাংলায় সম্প্রতি অনুবাদ হয়েছে।

সমারসেট মম (William Somerset Maugham : 1874—1965) ইংরাজ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বাঙালী পাঠকের কাছে ইনি পরিচিত কথাশিল্পী—এঁর একাধিক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। প্রধান গ্রন্থ: Of Human Bondage, The Moon and the Six pence, The Painted Veil, The Summing up, The Razor's Edge প্রভৃতি।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ৬০, ছত্র ২৪। এবার কিছুদিন ধরিয়া একটি অপ্রিয় কাজ করিতেছি। যে অপ্রিয় কাজের কথা মোহিতলাল এখানে উল্লেখ করেছেন তা হলো 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্যের দোষ উদ্ঘাটন। আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম, সাহিত্যে অশ্লীলতা, অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যে আধুনিকতা, অতি-আধুনিক প্রতিভা, অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক প্রভৃতি এ-জাতীয় প্রবন্ধ।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ৬১, ছত্র ১৭। 'সাহিত্য-বিতানের' একটি Review আপনি লিখিয়াছেন। 'সাহিত্য-বিতানের' সমালোচনা ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় করেছিলেন।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬২, ছত্র ৫। আপনার পুত্রের। পুত্র বলতে এখানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুনীলকান্তি সেনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সুনীলকান্তি সেন হিজলী আই. আই. টি-র ইংরাজীর অধ্যাপক।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৩, ছত্র ১৮। আপনার পত্রে আপনাদের সহিত আমার কুটুম্ব সম্বন্ধ। মোহিতলালের সহিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আত্মীয়তার যে

কথা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের পুত্র অরুণ সেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে জানাচ্ছেন, "আমার প্রপিতামহ গৌরমোহন সেনের সহোদর ভাই রাজমোহন সেন। রাজমোহন সেনের পৌত্র তারিণীচরণ সেন (তিনি পিতার অগ্রজ ও জীবিত।) এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা 'পুসি'র স্বামী বীরেনবাবু কাশীতে ওকালতি করেন এবং তিনি মোহিতবাবুর আত্মীয়। গ্রামে তারিণীচরণ সেনের বাড়ী আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন; বাবা পুসিদিদিকে খুবই স্নেহ করতেন। বাবার আপন পিসিমা তিন জন ছিলেন—তাঁদের কারোরই মোহিতবাবুর পরিবারে বিবাহ হয় নি; অতএব মোহিতবাবু বাবার যে পিসিমার উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে মা কিছু বলতে পারলেন না। (১৫. ৬. ৬২)।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৫, ছত্র ৫। আপনার মিতা ও শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। 'কুমারসম্ভব' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন, "যে বন্ধুগণের এই সাহচর্যে রসানুসৃতি সম্ভব হইয়াছে, কৃতজ্ঞ অন্তরে আমি তাঁহাদের স্মরণ করি। কবি-বন্ধু শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী ও কবি-ভ্রাতা শ্রীকালিদাস রায়ই তন্মধ্যে প্রধান।" এই কাব্যগ্রন্থের পরিচায়িকাও লেখেন কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯)। সেইজন্য মোহিতলাল কাব্যগ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কবিশেখরের কথা উল্লেখ করেছেন।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৫, ছত্র ২০। 'As thought a rose should shut and be a bud again.'। এই পংক্তিটি 'The Ere of Saint Agnes' কবিতার অন্তর্গত।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৫, ছত্র ২৮। আপনার সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু কালিদাসের কি হুঁস নাই। খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৭৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। প্রধান গ্রন্থ : আহরণ, সন্ধ্যামণি, পূর্ণাহুতি, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় প্রভৃতি।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৬, ছত্র ৬। 'She walks in beauty like the night'। বায়রণ-রচিত 'Hebrew Melodies'-এর 'She walks in Beauty' কবিতার পংক্তি। লর্ড বায়রণ (George Gordon Byron : 1788—1824) ইংরাজ কবি। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : Childe Harold's Pilgrimage, Don

Juan, English Bards and Scotch •Reviewers, Manfred, Hours of Idleness, Collected Works প্রভৃতি।

পত্র ২৫, পৃষ্ঠা ৬৬, ছত্র ২৮ Apologyটিও আলঙ্কারিক চাতুর্যে উপভোগী হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "কুমারসম্ভব" কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকার শেষাংশে বলেছেন, "কালিদাস সর্বদেশের সর্বকালের, বুঝিবা সর্বজনের কবি। হিমালয়কে পটভূমি করিয়া তিনি যে কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, তাহা হিমালয়ের মতই বিশাল অরণ্যানীমণ্ডিত, সহস্রনির্ঝরঝঙ্কৃত, প্রেমিক ও তপস্বীদের পরমতীর্থ, দুর্গমসুন্দর মহাশৈল। তাহাতে অধিরোহণের পথ অসংখ্য। আবার এ-যুগের পাঠকচিত্ত যে-শৈলপথে অগ্রসর হইয়া বিশেষ একটি রসনির্ঝরিণীর তীরে তীরে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ফিরিতেছে, সঙ্কীর্ণ হইলেও সেই পথ আরও অনেক বাঙ্গালী পাঠকচিত্তের পক্ষে সুগম ও সুপথ হইবে বলিয়া আশা করিয়াছি। সেই পথের ও সেই নির্ঝরিণীর সন্ধান দিবার চেষ্টা এই অল্পায়তন রচনার মধ্যে আছে। যে-পথে আমি মহাকাব্যের একটি বিশেষ রসধারার অনুসরণ করিয়াছি, সে-পথের ইঙ্গিত যদি রচনার মধ্যে না ফুটিয়া থাকে, তবে আমার আনন্দ আমাতেই রহিয়া গেল, যথেষ্ট শক্তির অভাবে অপরকে তাহার অংশী করিতে পারিলাম না।"

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ৬৯, ছত্র ৩। বঙ্কিমচন্দ্র আর অগ্রসর হয় নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ণের ইচ্ছা তখন থেকেই মোহিতলালের ছিল। বঙ্কিম-প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। পরে এই প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়ে "বঙ্কিম-বরণ" (১৩৫৬) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত 'শরৎস্মৃতি বক্তৃতা' দেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি একত্রিত হয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৫৫) গ্রন্থ বেরোয়।

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ৬৯, ছত্র ২০। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র একখানি উপযুক্ত টীকা ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'র টীকা-ভাষ্য রচনার পরিকল্পনা "কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য" (১ম, ২য় : ১৩৫৯, ১৩৬০) গ্রন্থে রূপলাভ করে। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সমগ্র 'সঞ্চয়িতা'র ভাষ্য রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ৭০, ছত্র ১। আমি এখন কিছুকাল যাবৎ দার্শনিক গ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিতেছি। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভয়ের কথা" গ্রন্থের সম্পাদন-প্রস্তুতি এসময় থেকেই শুরু হয়। এজন্যে তাঁকে দার্শনিক গ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। "অভয়ের কথা" (১৩৫৪) গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা অনেক সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দিলীপ-কুমার রায় একটি পত্রে সেকথার উল্লেখ করেছেন, "মোহিতলালের একটি ভূমিকা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম "অভয়ের কথা" বইটির গোড়ায়। এ-মূল্যবান বইটি যে এমন যত্ন ক'রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন—টীকা ও ভূমিকাসহ—এতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। কারণ "অভয়ের কথা" খাঁটি আধ্যাত্মিক বই—আজকের যুগের গণমনের ভালো লাগার কথা নয়। এ-বই যে মোহিতলালের ভালো লাগতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি।" ("অনামী", পৃ ৩৪৮)

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ৭০, ছত্র ৬। Henry James এবং Galsworthy-র দুই-চারিটি গল্প পড়িলাম। হেনরি জেম্‌স (১৮৪৩-১৯১৬) আমেরিকান সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। সাহিত্যসেবার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁকে 'Order of Merit' দেওয়া হয়। প্রধান গ্রন্থ : The American, The Europeans, Daisy Miller, The Golden Bowel, A passionate Pilgrim, French Poets and Novelists, Life of Hawthorne প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় এঁর "জীবনের খতিয়ান" "প্রেম এক মন্ত্র" নামে দু'খানি বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। গল্‌স্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy : 1867-1933) ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। প্রধান গ্রন্থ : The Forsyte Saga, A Modern Comedy, Caravan, Justice প্রভৃতি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ভাষায় তাঁর Forsyte Saga-র অনুবাদ হয়েছে।

পত্র ২৭, পৃষ্ঠা ৭১, ছত্র ২১। একালের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে তাঁর "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" (১৩৪৩) ও "বিচিত্র কথা" (১৩৪৮) গ্রন্থে আর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) সম্পর্কে আলোচনা আছে "সাহিত্য-বিতান" (১৩৪৯) গ্রন্থে। "সাহিত্য-বিতান" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৫৬) কুমুদরঞ্জন

মল্লিক (১৮৮২) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) সম্পর্কে আলোচনা আছে।

পত্র ২৭, পৃষ্ঠা ৭৩, ছত্র ৯। আমি এপর্যন্ত এই বইগুলি পাইয়াছি। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা হ'ল এই—শতদল (১৯০৬), বনতুলসী (১৯১১). উজানি (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বীথি (১৯১৫), বীণা (১৯১৬), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২২), রজনীগন্ধা (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), চুণকালি (১৯৩০), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৬৭)।

পত্র ২৭, পৃষ্ঠা ৭৩, ছত্র ২২। দুইখানি গ্রন্থও শীঘ্র ছাপা শেষ হইবে। দুইখানি গ্রন্থের নাম "বাংলা কবিতার ছন্দ" (১৩৫২) ও "বাংলার নবযুগ" (১৩৫২)।

পত্র ২৭, পৃষ্ঠা ৭৩, ছত্র ২৩। আমার একখানি নূতন কবিতার বই। "রূপকথা" (১৩৫২) কাব্যগ্রন্থ দুই মৃতা কন্যা অমিয়া ও অরুণার নামে উৎসর্গীকৃত। ১৯৩১ সালে ঢাকায় একই সময়ে মৃত্যু হয়।

পত্র ২৯, পৃষ্ঠা ৭৭, ছত্র ৭। ঐ বইখানিতেই আপনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন। "ভূস্বর্গ-চঞ্চল" (১৯৪০) গ্রন্থে নেতাজী সুভাষচন্দ্র-প্রসঙ্গ রয়েছে 'প্রথম উল্লাস' (পৃঃ ১৯-২৭) ও 'দ্বিতীয় উল্লাসে' (পৃঃ ২৯-৪২)। মোহিতলাল মজুমদারও "জয়তু নেতাজী" (১৩৫৩) নামে এক গ্রন্থ লেখেন। সুভাষচন্দ্র বসু (২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭—১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫) ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গড়ে তোলেন এবং ইংরেজদের আক্রমণ করেন। প্রধানতঃ তাঁর এই কীর্তির জন্যই ইংরেজ ভারত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁর এই অতুলনীয় কীর্তির জন্য ভারতবাসী তাঁকে 'নেতাজী' বলে এবং তাঁর মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না। জাতীয় আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর একাধিকবার কারাদণ্ড হয়। তরুণের স্বপ্ন, Indian Pilgrimage, Indian Struggle প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ৭৮, ছত্র ২। যে দৃষ্টিতে আমি সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়াছি আপনি ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭—) তাঁর নিজের বক্তব্য "The Subhash I Knew" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইখানি মোহিতলালের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। দিলীপকুমার

এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন একটি পত্রে, "নানা কারণে তিনি শেষ জীবনে আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—প্রথমত: তাঁর অপ্রিয় কোন কবির কবিতার আমি সুখ্যাতি করেছিলাম ব'লে ; দ্বিতীয়তঃ, আমার "The Subhash I knew" বইটিতে আমি লিখেছিলাম ব'লে যে, মহাপ্রাণ সুভাষ তার অসামান্য বুদ্ধি সত্ত্বেও একটি মস্ত ভুল করেছিল জাপান ও জার্মানির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে। এ-মত ছিল শ্রীঅরবিন্দেরও। তাই মোহিতলাল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও অশোভন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন সে-সময়ে।" ("অনামী", দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৫, পৃঃ ৩৪৭)। তিনি "আমার বন্ধু সুভাষ" গ্রন্থেও জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মিতালিকে সমর্থন করেন নি। তিনি ঐ গ্রন্থে বলেছেন, "কেউ আমাকে ভুল বোঝেন সেই জন্য আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে তার অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেওয়াটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা ভুল হয়েছিল বলেই আমি মনে করি। তার এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে একথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই মানিতে পারেন না। আমি এখনো দুঃখের সঙ্গে চিন্তা করি সুভাষ কী করে বিশ্বাস করতে পারলেন যে জাপানের মত একটা নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিনামূল্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার কাজে সহায়তা করবে।" (পৃঃ ১১৩)। মোহিতলাল "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৫৭) দিলীপকুমার রায়ের অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেন। পাঠকদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে সেই অংশগুলি এখানে দেওয়া হ'ল—

"…একখানি পুস্তক পড়িয়া বড়ই বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছি। বইখানি সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "The Subhash I knew"। এই পুস্তকে দিলীপকুমার তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মত অমূলক অবিচার আর কিছু হইতে পারে না। তিনি তাঁহার নিজের সাধন-জীবনের উচ্চভূমি হইতে সুভাষ-চরিত্র বিচার করিয়াছেন, তাঁহার সেই দৃষ্টিতে বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ; কারণ সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের যে পরিচয়ে তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, শেষে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কার্য-কলাপে তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক শুচিতার হানি হইয়াছে। শেষে 'আজাদ হিন্দ সেনা'র নেতাজীরূপে

সুভাষচন্দ্র যেরূপ আত্মগৌরব প্রচার করিতেন তাহাতে তাঁহার আত্মার মলিনতাই প্রমাণিত হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁহার সৈন্যদল সমক্ষে এমন কথাও নাকি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মারিবে এমন বোমা ইংরেজ কখন তৈয়ারী করিতে পারিবে না। এমন আত্মশ্লাঘা কোন সাধু ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষ করিতে পারে? মানুষ হইয়া ভগবানের দাস হইয়া—এমন দম্ভ! আমি এই পুস্তকের উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে দিলীপকুমারের সাক্ষ্য ও উক্তি-সকলের কিছু মূল্য আছে।······দিলীপকুমারের ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া মনে হয়, সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁহার এই অনুকম্পা ও অসন্তোষের কারণ—সুভাষচন্দ্র পণ্ডিচেরীর আশ্রমে যোগাভ্যাস করিতে রাজী হন নাই, তিনি আধ্যাত্মিক রস-সাধনার মূল্য বুঝিতে চাহেন নাই। কিন্তু একথা তিনি কেন ভুলিয়া যান যে, শ্রীঅরবিন্দই ভগবানের একমাত্র বিভূতি নহেন, আরও অনেক বিভূতি বা প্রকাশ তাঁহার আছে; এবং শ্রীঅরবিন্দ বড় কি সুভাষচন্দ্র বড়, সে-প্রশ্ন অতিশয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ভারতের এই যুগের যুগ-প্রয়োজনে (বিশ্বমানবের শাশ্বত প্রয়োজনে নয়) কাহার সাধনা অধিকতর মূল্যবান, ইতিহাস তাহা পরে নির্ণয় করিবে, এখন সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। ······সুভাষচন্দ্র যোগী নহেন—যোদ্ধা; বৃন্দাবনবিহারীর লীলাসহচরও নহেন; সেই বৃন্দাবনবিহারীকেই সারথি করিয়া তিনি কুরুক্ষেত্রে গাণ্ডীব ধারণ করিয়াছেন। তাই সুভাষচন্দ্র যদি ঐরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন, তবে কিছুমাত্র ধর্মভ্রষ্ট হন নাই। মহাশক্তির বরপুত্র যে, তাহাকেই ঐরূপ মহা-নির্ভয়ের উক্তি সাজে; ···শক্তিসাধনায় যে সিদ্ধ হইয়াছে সে-ই এমন কথা বলিতে পারে, নতুবা চতুর্দিকে শেল্ (shell)-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন কথা কেউ বলিতে পারিত? পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রমে বসিয়া বলিলে অবশ্যই তাহা আধ্যাত্মিক হইত না। ······একথা সত্য যে, এখনও এই আধ্যাত্মিক জাতির মধ্যে দিলীপ-কুমারের মত সাধক-পুরুষের সংখ্যাই বেশী, অগণিত বলিলেও হয়—শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত পুরুষ-বীর হাজার বৎসরেও একটা জন্মে কিনা সন্দেহ।" গ্রন্থ মধ্যেও দিলীপকুমার রায়ের উক্তির জবাব আছে।

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ৭৯, ছত্র ৩। "ভাগবতী কথা" ভাল লাগিতেছে। "ভাগবতী কথা" —ভাগবতের কাব্যানুবাদ।

পত্র।৩১, পৃষ্ঠা ৭৯, ছত্র ১। "তরঙ্গ" নাটকের প্রথম প্রকাশ-তারিখ—জুন ১৯৪৭। নাট্যকার এই চিঠি সম্পর্কে বলেছেন, "মোহিতলালের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। "তরঙ্গ" যখন তাঁকে আমি পাঠিয়েছিলাম, তখন নাট্যকার হিসাবে বাংলা দেশে আমার কোন পরিচিতিই ছিল না। একজন অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখকের নাটকটি কতখানি যত্নের সহিত দরদ দিয়ে তিনি পড়েছিলেন তাঁর চিঠিখানিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বানান ও শব্দ-প্রয়োগের ভুলগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আমার পরম উপকার করেছিলেন—যার ফলে "তরঙ্গ"র দ্বিতীয় সংস্করণে (জুলাই ১৯৫৪) সেগুলো সংশোধনের আমি সুযোগ পেয়েছি। ভুল দেখিয়ে দিয়ে তিনি যথার্থ বন্ধুর কাজই করেছিলেন। মামুলি একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দিলে আমি এতখানি খুশি হতাম না। এই চিঠি প্রাপ্তির কয়েকমাস পরেই কবি মোহিতলাল মজুমদার-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১৩৫৪)। তাঁর অনুরোধে উৎসাহিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় পাঠাবার জন্যে আমি "বাস্তুভিটা" নাটক লিখি। নাটকটি প্রথম অভিনয়েই আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরপর অভিনীত হতে থাকে। সর্বসাধারণের অনুরোধে অবিলম্বে নাটকটি আমাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হয় (১৯৪৮)। আশা ছিল, আর একটি নাটক লিখে কবি মোহিতলালকে পাঠাবো; কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকটি সংখ্যা বেরুবার পরই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার সে-আশা আর ফলবতী হয় নি। কবি মোহিতলালের এই চিঠি যে নাট্যরচনায় আমাকে কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছে আমার পক্ষে তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত।" (আজহারউদ্দীন খানকে লিখিত পত্রাংশ, ১৫. ১. ৬২) "বাস্তুভিটা" নাটকের 'স্মারক' অংশেও তিনি বলেছেন, "আমার 'তরঙ্গ' নাটক পড়ে অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বর্গীয় কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য একটি নাটিকা লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন; তাতেই উৎসাহিত হয়ে আমি "বাস্তুভিটা" রচনায় হাত দিই।" (১৭ই মার্চ, ১৯৫৪)

পত্র ৩২, পৃষ্ঠা ৮২, ছত্র ১৮। তোমার প্রধান ভুল হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত 'সাহিত্যচিন্তা' অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক (২৩.৬.৪২) পত্রে মোহিতলাল তাঁর নিজের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত চিঠি স্মরণীয়।

পত্র ৩২, পৃষ্ঠা ৮৩, ছত্র ১৫। আমার "বিচিত্র কথা"র প্রথম প্রবন্ধ পড়িবে। "বিচিত্র কথা" গ্রন্থের 'অতি পুরাতন কথা' ও 'আমার কাব্য-সাধনা' অধ্যায়ে মোহিতলাল তাঁর কাব্যজীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এ দুটি প্রবন্ধ "জীবন-জিজ্ঞাসা" গ্রন্থেও পাওয়া যাবে।

পত্র ৩২, পৃষ্ঠা ৮৫, ছত্র ১৭। সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টা Spencer, Milton এবং পরে Shelley। স্পেন্সার (William Robert Spencer: 1769-1834) ইংরেজ কবি এবং বায়রণের সমসাময়িক। গ্রন্থ: Beth-Gelert। শেলী (Percy Byshe Shelley 1792—1822) ইংরাজ কবি। গ্রন্থ: Queen Mab, Revolt of Islam, Prometheus Unbound, Defence of Poetry, Poems, প্রভৃতি।

পত্র ৩২, পৃষ্ঠা ৮৬, ছত্র ১৬। আমার প্রিয় কবি ছিলেন তিন জন Tennyson, Keats ও Landor। ল্যাণ্ডার (Walter Savage Landor: 1775-1864) ইংরাজ কবি ও গদ্য-লেখক। গ্রন্থ: Don Julian, Imaginary Conversations (5 vols), The Examination of William Shakespeare, Poemata et Inscriptiones প্রভৃতি।

পত্র ৩৩, পৃষ্ঠা ৮৮, ছত্র ১৬। আমি যদি "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন করি। "বঙ্গদর্শন"-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় শ্রাবণ ১৩৫৪-এ। কবিতা-চয়ন বিভাগের নাম তিনি দিয়েছিলেন—'মণি-মঞ্জুষা'। পত্রিকায় এই বিভাগের ভূমিকাস্বরূপ তিনি লিখেছিলেন, "এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী জীবনের এবং বাংলা ভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। "বঙ্গদর্শনে"র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব।"

পত্র ৩৪, পৃষ্ঠা ৮৯, ছত্র ৬। এই কবিতাটি আমার "বঙ্গদর্শন"এ প্রথম বাঞ্ছিত

অর্ঘ্য। কবিতার নাম 'মনোরমা'—"বঙ্গদর্শন"-এর ভাদ্র ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৩৫৫)। "ত্রিযামা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, "অনুপূর্বা" (১৩৬১) সংকলন-গ্রন্থেও পাওয়া যাবে। কবিতাটি হ'ল এই—

তোমারি মাঝে কবে যে আমি
হারানু তোমারে!
বিজন তব গহন মনে
হারানু মনোরমারে।

নিবিড়-নীল ঝঞ্ঝা-মেঘে
খুঁজিয়া ফিরে কাতর আঁখি,
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
মিলাল মোর সে নীলপাখী? ইত্যাদি

পত্র ৩৪, পৃষ্ঠা ৯০, ছত্র ৮। জেনারেলের ওখান হইতে আনাইয়া লইয়াছি, 'বরনারী' কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি। 'জেনারেলের ওখান হইতে' বলতে বোঝায় ধর্মতলা স্ট্রিটে জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'বরনারী' কবিতাটি "বঙ্গদর্শন"-এর আশ্বিন, ১৩৫৪ সংখ্যার 'মণি-মঞ্জুষা' বিভাগে উদ্ধৃত হয়েছিল।

পত্র ৩৫, পৃষ্ঠা ৯১, ছত্র ১। কবিতাটি পাইয়াছি। কবিতার নাম—'ভাঙা-গড়া' "বঙ্গদর্শন"-এর কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ও "ত্রিযামা" (১৩৫৫) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

নাচ ফরমাস করেছিনু ব'লে
নেচেই চলবে ঠাকুর?
দেখবে না চেয়ে পায়ের তলায়
মানুষ কি মরা-কুকুর? ইত্যাদি

পত্র ৩৫, পৃষ্ঠা ৯০, ছত্র ৩। আমার "অনুপূর্বার" সমালোচনা পড়িয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "অনুপূর্বা" কাব্যগ্রন্থের ধারাবাহিক সমালোচনা "বঙ্গদর্শন"-এর আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় মোহিতলাল করেছিলেন। পরে উক্ত সমালোচনা 'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৫৬) 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' শিরোণামায় সংযোজিত।

পত্র ৩৫, পৃষ্ঠা ৯৩, ছত্র ৬। আপনারই এই কবিতাটি। কবিতার নাম 'ভাঙা-গড়া'।

পত্র ৩৬, পৃষ্ঠা ৯৪, ছত্র ১। সঙ্গের কবিতাটি যথাসময়েই পাইয়াছি। কবিতার নাম 'দুরাশা'। কবিতাটি মোহিতলালের অপছন্দ হওয়ায় "বঙ্গদর্শন"-এ প্রকাশিত হয় নি। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল "হোমশিখা"-র চৈত্র ১৩৫৯ সংখ্যায়। সম্পূর্ণ কবিতাটি হ'ল এই—

দিবা নিবু-নিবু পশ্চিম পানে চাই ;
সন্ধ্যা-সবিতা করে হোথা যাই-যাই !
বিষণ্ণ তার ক্লান্ত করুণ হাসি
কুংকুম-রাগে বলে, "বড়ো ভালোবাসি
এই ধরণীর শ্যাম-শোভা-সমারোহ,
গন্ধ-বিভল মদির মধুর মোহ !
শেষ খনে তাই এঁকে দিয়ে যাই চুমা ;
স্বপন-আবেশে, হে বধূ ধরণি, ঘুমা !"
দিবা অবসান, স্নিগ্ধ সন্ধ্যামায়া
বিছালো তাহার ধূসর প্রসর ছায়া !
পৃথিবীর যতো ছবি আর যতো গান
গোধূলি-আঁধারে একে একে লীয়মান।
ছায়া-ঘন নভে ফুটিল তারার মালা ;
ঘরে ঘরে হ'লো সাঁঝের সেঁজুতি জ্বালা।
ঘাট-বাট-মাঠ গীতহীন, নির্জন ;
শুনা যায় শুধু গহনের স্পন্দন !
ঐ যে গগনে জ্বলে অগণ্য তারা
নীলপটে-আঁকা রৌপ্য কমল-পারা,—
কী বিরাট তারা, আছে কতো কতো দূরে
চিন্তিলে মন মহাবিস্ময়ে পূরে !
কতো না 'আলোক বরষ' হইয়া পার
সোনার লিখনে লিখিল লিপিকা কা'র !
আনন্দ আর অন্তরে ধরে না যে,
আলোকের বাণী আলোকের সুরে বাজে !

কতো তারকার আলোকের আবাহন
আসেনি আজিও, মিলেনি সে শুভখন।
পরিমাণহীন কোন্ সময়ের শেষে
জ্যোতি-পরসাদ পঁহুছিবে প্রাণে এসে!
কাঁপিবে আলোক দ্যুলোক ভূলোক ভ'রে
অসীম পশিবে সীমায় সুষীম ডোরে:
সেই দিন গণি' ব্যাকুল প্রতীক্ষায়
ধ্যানাসীনা ধরা অনাগত পানে চায়।

যে অজ্ঞাত জ্যোতি সকল আলোর খনি
আঁধারের বুকে পরম পরশমণি,—
প্রেম ও প্রাণের নিভৃত অমৃত-ধারা
অনুকণা যার বহে অগণিত তারা—
ঈপ্সিত সেই তীর্থের পানে চাহি'
জনমে জনমে জীবনের পথ বাহি;
দূরতম ধ্রুবতারার অমৃত ভাতি
পড়িবে বলিয়া আছি আমি প্রাণ পাতি।

পাই নাই আজো সে জ্যোতির সন্ধান,
তবুও আভাসে ভাসে রূপ অম্লান!
সেই গুহাহিত মনন-অতীত ধনে
ধ্যানেতে ধরিব, দারুণ দুরাশা মনে!
হয়তো বা কোটি কল্পকালের পরে
অণু ও মহতে মিলিবে পরস্পরে।
কবে সে করুণা-কিরণ ঝরিবে প্রাণে
বিজ্ঞানী নহে, মরমী জনেই জানে।

পত্র ৩৭, পৃষ্ঠা ৯৫, ছত্র ১। কবিতাটি পাইয়াছি। সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মোহিতলালকে 'স্বরাজ' নামে এক কবিতা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশার্থে পাঠান। উক্ত কবিতাটি মোহিতলাল কবিতার ব্যাকরণ-বিচারে 'ছড়া' নামে অভিহিত করেন এবং "বঙ্গদর্শন"-এর কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। কবিতাটি ছড়া নামে অভিহিত করায় কবি ক্ষুব্ধ হয়ে

মোহিতলালকে পত্রাঘাত করেন। উক্ত পত্রের উত্তরে মোহিতলালের বর্তমান পত্রখানি। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য "বঙ্গদর্শন" কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যা থেকে মোহিতলালের টীকা-সমেত ছড়াটি উদ্ধৃত করলাম।—

স্বরাজ (?)

[এটি কবিতা নয়—একটি 'ছড়া'; বাঙালী এককালে ছড়া কাটিতে খুব পটু ছিল। কবিতার বিষয় আর ছড়ার বিষয় এক নয়—এই রচনাটি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। বিষয়টি গম্ভই বটে, কিন্তু কথাগুলি গম্ভ করিয়া বলিলে এমন ধারালো হইত না। এইজন্য ছড়ারও একটি বিশেষ মূল্য আছে।]

ব'সে ব'সে জীবনের গোনা দিন গুণ্‌ছি,
স্বরাজ এসেছে দেশে দিনরাত শুনছি।
একমাস ধ'রে কত উৎসব চল্‌লো,
বুক ভরে' দেশবাসী 'জয় হিন্দ্‌' বললো।
কাগজেতে চলে রোজ স্বরাজের জয়গান,
সভা-শোভাযাত্রায় ভরা পথ-ময়দান।
তারি মাঝে শুনি পুনঃ বেধে গেল দাঙ্গা,
সাম্প্রদায়িক ছোরা হয়ে ওঠে চাঙ্গা।
নারীদের বুক সব হাহাকারে জ্বলছে,
গুণ্ডার উৎপাত যথারীতি চলছে।
কাগজেতে সব কথা বলা নাকি বড় দোষ,
কোন কোন নেতাদের মনে এই আপশোষ—
সম্পাদকেরা নাকি যোগাইয়া ইন্ধন,
দেশের অশান্তিকে জাগায় চিরন্তন।
সুতরাং ইহাদের মুখ বাঁধা দরকার
অন্যদিকেতে ঐ স্বাধীনতা-সরকার—
অহিংস নীতি নিয়ে সম্প্রতি ব্যস্ত,
বন্ধ তাদের আজি দিনরাত হস্ত।
শোনাচ্ছে মুখে তারা সাধু মহাযুক্তি,
শান্তির লাগি ভাই করেন এই চুক্তি—

সবাই মরুক আর তুমি হেসে সইবে,
যত সব দুঃখ পিঠে ক'রে বইবে।
এমনটি নীতি মেনে হও যদি ধ্বংস,
সেও ভালো—তোমরা যে ত্যাগীদের বংশ!
জীবন্মৃতেরা সব শুনে বলে—ঠিক্ ঠিক্:
জীবন্ত লোক যারা তেজীয়ান নির্ভীক
গর্জিয়া কয় তারা— কক্ষণো নয় নয়,
চাই মোরা প্রতিকার, সত্যের চাই জয়।
এই মোরা কাপুরুষ, এই মোরা ছাগ-মেষ,
আমরা পেয়েছি এই সত্যের নির্দেশ—
ব্যাঘ্র-সাপের হাতে মরা নয় মুক্তি,
অত্যাচারীর সাথে নেই কোন চুক্তি।
হস্তান্তর নামে মাকালের ফলকে
হাতে তুলে দিয়ে যারা সুবোধের দলকে—
সরে' প'ল ঘরে ঘরে বাধাইয়া দাঙ্গা—
হত্যায় পথঘাট হয়ে গেল রাঙ্গা,
তাহাদেরি সাথে বেঁধে রাষ্ট্রের মৈত্রী,
অহিংসবাদীদল জপ্‌চে গায়ত্রী!
লাখো লাখো দেশবাসী ভিটামাটি ছাড়লো,
গরু-জরু সবাকার মারলো ও কাড়লো।
অন্ন ও বস্ত্রের নাই নাম-গন্ধ,
প্রতিদিন প্রতিহত জীবনের ছন্দ।
এ যদি স্বরাজ হয় কিবা এর মূল্য—
মরা আর বাঁচা যদি হয় সমতুল্য?

পত্র ৩৮, পৃষ্ঠা ২৯৭, ছত্র ১৭। বঙ্কিমসাহিত্য-সমালোচনার পর রবীন্দ্র-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোহিতলালের রচনার তালিকা দিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র—

কবিতা:

হেমন্ত-গোধূলি—বঙ্কিমচন্দ্র (১-৬)

আলোচনা :

—বঙ্কিম-বরণ (১৩৫৬)

—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (১৯৫৫)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র

বিবিধ কথা—অতি আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র

বিচিত্র কথা—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম

বাংলার নবযুগ—দ্বিতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ—ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি—বঙ্কিমচন্দ্র

বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্কিম-স্মৃতি—বঙ্কিমপ্রতিভার পৌরুষ

রবীন্দ্রনাথ—

কবিতা :

স্মর-গরল—কবিবরণ

হেমন্ত-গোধূলি—রবির প্রতি

—রবীন্দ্র জয়ন্তী

মোহিতলাল-কাব্যসম্ভার—মহাপ্রয়াণ

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮—তর্পণ

আলোচনা :

—রবি প্রদক্ষিণ (১৩৫৬)

—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য ১-২ (১৩৫৯, ১৩৬০)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ

বিবিধ কথা—রবি-প্রদক্ষিণ

বিচিত্র কথা—কাব্যে আধুনিকতা

—রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

সাহিত্য-বিতান—রবীন্দ্র-কাব্যের কবি-পুরুষ

—রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা

—মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ

বাংলার নবযুগ—রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবপূজা (চতুর্দশ অধ্যায়)

বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি—বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান
—রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি
—রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী"

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সময় এসেছে।

পত্র ৩৮, পৃষ্ঠা ৯৮, ছত্র ৪। তোমার মামা। কলকাতা হিন্দু-স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ সতীশচন্দ্র সেন। 'শিক্ষা-দর্শন' অধ্যায়ে এঁকে লিখিত ২, ৪, ৫ সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ৩৯, পৃষ্ঠা ৯৮, ছত্র ১। আপনার প্রেরিত উপহার "ওআর য্যাণ্ড পীস"। রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল কাউণ্ট লিও টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) বিখ্যাত উপন্যাস "ওআর য্যাণ্ড পীস্"।

পত্র ৩৯, পৃষ্ঠা ৯৮, ছত্র ৫। অনুবাদ-কার্য—বিশেষতঃ উপন্যাস প্রভৃতির অনুবাদ সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। অনুবাদ সম্পর্কে মোহিতলালের ধারণার পরিচয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ৯.৭.৫০ তারিখে লিখিত ৭০ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। তাঁর "বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন" গ্রন্থের ভুমিকায়-ও এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

পত্র ৩৯, পৃষ্ঠা ৯৯, ছত্র ৭। আপনি কি "অভ্যুদয়" নামক কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক? "অভ্যুদয়" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯২১)। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কম্যুনিস্ট ছিলেন। তার ফলে পত্রিকাতে বামপন্থী গন্ধ থাকত। এই পত্রিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) "ইছামতী" (১৯৫০) রমেশচন্দ্র সেনের (১৮৯৪-১৯৬২) "কাজল" প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪০, পৃষ্ঠা ৯৯, ছত্র ৩। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে (১৮৯৬) মোহিতলাল "বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন" (বৈশাখ ১৩৫৭) উৎসর্গ করেন। গল্পটি সম্পর্কে তিনি বিভূতিভূষণের অভিমত চেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের অভিমতের উত্তরে মোহিতলাল বর্তমান পত্রটি লেখেন। অনুবাদ সম্পর্কে মোহিতলালের বক্তব্য পূর্ববর্তী চিঠিতেও (৩৯) পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণ "বরযাত্রী" (১৩৪৯) গল্প-গ্রন্থ মোহিতলালকে উৎসর্গ করেন।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ১০১, ছত্র ৩। আপনার বইখানি একবার চোখ বুলাইয়াছি। বিনায়ক সান্যালের গ্রন্থের নাম "সাহিত্য-সংগমে" (শ্রাবণ ১৩৫৮)।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ১০২, ছত্র ৫। আপনার একটি প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইব। "সাহিত্য-সংগমে"র অন্তর্ভুক্ত "রবীন্দ্র-কাব্যে প্রতীচ্য প্রভাব" প্রবন্ধের কথা বলেছেন।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ১০২, ছত্র ১৮। আপনি ঐ পুস্তকে আমার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন। "সাহিত্য-সংগমে" 'কবি মোহিতলাল' নামক এক প্রবন্ধ আছে। এখানে তারই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ১০২, ছত্র ২১। আমাব প্রবন্ধ-পুস্তকখানির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন। মোহিতলাল প্রবন্ধ-পুস্তক বলতে বুঝিয়েছেন তাঁর রচিত "বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি" (১৯৫১ : ১৩৫৮) গ্রন্থের কথা।

দেশ ও সমাজ

পত্র ২ পৃষ্ঠা ১১০। এই চিঠিতে পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কে মোহিতলালের তীব্র কটাক্ষ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা (১৯১৮-১৯৪৪) থেকে অবসর গ্রহণের সময় ঢাকাবাসীরা যে বিদায়-অভিনন্দন (এপ্রিল, ১৯৪৪) দেন তার উত্তরে মোহিতলাল যে ভাষণ দেন তাতে পূর্ব-বাঙলার কাছে তাঁর ঋণ, প্রেম ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ভাষণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

: আমি ঢাকায় দীর্ঘকাল বাস করিলাম—আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল আমি এখানেই যাপন করিয়াছি।...আমি আমার এই ঢাকাবাসের লাভলাভ ভাবিতেছি। আমি এখানে সুখে ছিলাম... ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার এই চাকরী আমার ধর্ম নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু যাহা পাইয়াছি তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ; আমি এইখানে আসিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনে সাহিত্যসেবার অবকাশ পাইয়াছি—আমি স্ব-সমাজ ও পর-সমাজ—সকল সমাজ এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব-মুক্ত হইয়া আত্মসাধনার সত্য মন্ত্রটিকে ধরিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং এইখানেই আমি এমন কয়েকটি মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছি, যাহাতে আমার জাতির প্রতি তথা মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। মানুষের মধ্যেই যে ভগবান আছেন, সেই ভগবান যে

আমাদের দেশ ও জাতিকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, সেই আশ্বাস পাইয়াছি। আরও যাহা পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে আমার শেষ সম্ভাষণ জানাইব।

আপনারা জানেন আমি বাংলার যে সমাজে জন্মিয়াছি সেই সমাজ ও আপনাদের সমাজে কিছু পার্থক্য আছে—সে পার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহারই কারণে দুই সমাজের মধ্যে একটা ভাবগত ব্যবধান জন্মিয়াছে। আমি দুই সমাজকেই দেখিলাম, দুই-এরই দোষগুণ বারবার মিলাইয়া দেখিলাম—বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের যে একটা জাত্যভিমান আছে—বিশেষ করিয়া এই দুর্জনের একটু বেশি মাত্রায় আছে—সেই জাত্যভিমানবশে আমি বাংলার কোন সমাজকে ছোট দেখিতে পারিনা—ঠিক সেই কারণেই আমি দুই সমাজের দোষ-ত্রুটির সম্বন্ধে সমান অসহিষ্ণু : পূর্ববাংলায় আমি যাহাদিগকে গালি দিই, পশ্চিমবাংলায় আমি তাহাদিগের গুণ কীর্তন করিয়া সেখানকার যুবকগণকে কশাঘাত করি—ফলে আমি কোথাও কাহারও প্রিয় হইতে পারি নাই। দোষ দুই বাংলারই আছে—দুই-এরই দোষ দুই প্রকারের। তথাপি, আমার বরাবর মনে হইয়াছে পশ্চিমের সমাজ আরও দুর্বল, আরও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে—বাঙালী জাতির পক্ষে সেও কম শোচনীয় নয়; বিশেষতঃ হিন্দু বাঙালীর পক্ষে সে যে কতবড় দুর্ভাগ্য তাহা চিন্তাশীল বাঙালীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এখানে আমি সে বিষয়ে কিছু বলিব না। পশ্চিমবঙ্গে সমাজ বলিয়া আর কিছু নাই—ভিতরে-বাহিরে বহুদিন যাবৎ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আপনাদের সমাজে আমি যেটুকু সমাজচেতনা দেখিলাম—বিশেষ করিয়া ব্যবহারের যে আন্তরিকতা এবং যে প্রাণপূর্ণ আত্মীয়তা লক্ষ্য করিলাম, তাহাতে আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। বাংলার পল্লী-সমাজে পরস্পরের মধ্যে যে আত্মীয়তা-বন্ধন এক্ষণে ইতিহাসগত হইয়া পড়িতেছে তাহা আপনাদের সমাজে এখনও সম্পূর্ণ মরে নাই, ইহাই আমি দেখিলাম, দেখিয়া আমারই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করিলাম, এবং ধন্য বোধ করিলাম।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১১০, ছত্র ৫। শরদিন্দুবাবুকে অনেক চিঠি লিখিয়াছি। কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯)। গ্রন্থ : ঝিন্দের বন্দী, বিষকন্যা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, রিমঝিম ইত্যাদি।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১১২, ছত্র ৫। আনন্দবাজারে রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' চোখে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' গল্প আনন্দবাজারের ১৩৪৭ পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১১২, ছত্র ১৩। আশ্বিন সংখ্যা, শনিবারের চিঠি। ১৩৪৭, আশ্বিন, শনিবারের চিঠি।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১১২, ছত্র ২৮। এবারে তারাশঙ্করের দুইটি গল্প বড় ভাল লাগিল। ১৩৪৭ পূজা সংখ্যা আনন্দবাজারে 'বন্দিনী কমলা' ও ১৩৪৭ কার্তিকের প্রবাসীতে 'কবি' প্রকাশিত হয়। 'বন্দিনী কমলা' গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮) "গল্পপঞ্চাশৎ" (১৯৬৩) গ্রন্থে রয়েছে। 'কবি' গল্পকে তারাশঙ্কর পরে উপন্যাসে (১৩৫০) রূপান্তরিত করেন। "কবি" উপন্যাস সম্পর্কে মোহিতলাল "সাহিত্য-বিতান" (১৩৪৯) গ্রন্থের 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও "কবি" উপন্যাস' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। "কবি" উপন্যাস মোহিতলালকে উৎসর্গীকৃত। 'দেশ ও সমাজ' অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক চিঠিতে তারাশঙ্কর সম্পর্কে মোহিতলালের ধারণার আর একদিকের পরিচয় পাওয়া যাবে।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১১৪, ছত্র ২৮। 'আবেদন' আবার পড়িবে। উইলিয়ম মরিসের কবিতার অনুবাদ। সম্পূর্ণ কবিতাটি নীচে দেওয়া হ'ল—

সঙ্গীতে গড়ি স্বর্গ, নরক—এমন শকতি নাই,
শঙ্কাহরণ সুরের মোহিনী খুঁজিও না মোর গানে ;
মরণের দ্রুত চরণের ধ্বনি ভুলাইতে নাহি চাই,
যে সুখ বারেক ফুরাইয়া গেছে, ফিরাইতে নারি প্রাণে।
শুকাবে না কারো অশ্রু-পাথার আমার বীণার তানে,
আমার বাণীতে ঘুচিবে না কারো নিরাশা-অন্ধকার—
শূন্য-আসরে বসি খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার!

তবু, ভরা-সুখে হিয়ায় যেদিন হরষের অবসান—
নিঃশ্বাস ফেলি' বলিবে কেবলি, কিছুই হ'ল না, হায়!
যবে ধরণীর সবই মধুময়—প্রীতিপূজা-পরসাদ,
নিমেষে গণিতে মনে হবে, এ যে বড় ত্বরা চলে যায়।
মনে হবে, সুখ পলকে পলায়, আর না ফিরিয়া চায়,— .

সেদিন, বন্ধু, আমার কথাটি মনে কোরো একবার,
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

কি কাজ আমার অন্যায় সাথে ন্যায়ের যুদ্ধ জিনে' ?—
আমি স্বপনের ফসল ফলাই—এসেছিনু অবেলায় !
আমার এ গীত-পতঙ্গ তার পাখা দুটি ফিন্‌ফিনে
মৃদুল হানিবে চন্দনে গড়া জাফ্‌রির জানালায়।
দিবারাতি যারা আলসে কাটায়, সুখাসীন নিরালায়—
তাদের সকাশে রচিবে রাগিণী—বেলোয়ারী-রঙ্‌দার !
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

ধূলার উপরে আলিপনা আঁকি, মন্দেরে বলি ভালো—
ধরিও না দোষ, ভুল বুঝিও না—ক্ষমিও আমারে, ভাই।
চৌদিকে ঢেউ গরজে ভীষণ—নিকষের চেয়ে কালো !—
তারি মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ শ্যামলে ভরিতে চাই !
জানি, কারো প্রাণে একতিল সুখ-সান্ত্বনা হেথা নাই—
দানব দলিতে চাই বাহুবল—নব বীর-অবতার !
—সে ত' নয় এই ভাঙা-আসরের দীন-হীন বীণ্‌কার !

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১১৫, ছত্র ৫। "মানসা"র 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটি পড়িবে। 'গুরু-গোবিন্দ' কবিতাটি "মানসী" কাব্যগ্রন্থে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ইহা "কথা ও কাহিনী" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১১৫, ছত্র ৬। 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে ···বন্ধ করোনা পাখা'। রবীন্দ্রনাথের "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থের 'দুঃসময়' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

পত্র ৫, পৃষ্ঠা ১১৭, ছত্র ৪। তোমার সেই 'বনমালা'র একটু note এবার দিয়েছি। কবিশেখর কালিদাস রায়ের "রাখালরাজ" কবিতায় 'বনমালা' শব্দটি রয়েছে।

গুঁজতে কানে কোথায় পাবি ফুল,
—বনমালা, পরতে সুশোভন ?
ময়ূর-নাচা এমন পাখী-ডাকা
হরিণ-চরা কোথায় সেথা বন ?

এই কবিতাটি "কাব্য-মঞ্জুষা"র পূর্ণাঙ্গ-সংস্করণের ১৩৪ সংখ্যক কবিতা। 'কবিতা-পাঠ' অধ্যায়ে মোহিতলাল 'বনমালা'র অর্থ দিয়েছেন এইভাবে— বনমালা—বনফুলের মালা; আর এক অর্থে, এক বিশেষ রকমের 'আজানুলম্বিনী' মালা। এখানে প্রথম অর্থই ঠিক। তারাচরণ বসুকে লিখিত 'শিক্ষা-দর্শন' অধ্যায়ের ৩. ৪. ১৯৪৬ সালের ১ সংখ্যক চিঠির ১৪৯ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১২০, ছত্র ২। গান্ধী-কংগ্রেসই বাঙালীর সর্বনাশ করিয়াছে। "জয়তু নেতাজী", "বাংলা ও বাঙালী" গ্রন্থে এবং 'দেশ ও সমাজ' অধ্যায়ের ৮. ৯. ১৩ সংখ্যক পত্রেও কংগ্রেস ও গান্ধীজী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১২০, ছত্র ৮। কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছি। "বাংলার নবযুগ" (শ্রীপঞ্চমী ১৩৫২), "জয়তু নেতাজী" (অগ্রহায়ণ ১৩৫৩) গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে।

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ১২১, ছত্র ৯। একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কথাবার্তা প্রায় ঠিক হইয়াছিল। "বঙ্গদর্শন" সম্পাদনার কথা। প্রথম সংখ্যা— শ্রাবণ, ১৩৫৪।

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ১২১, ছত্র ২৬। 'শনিবারের চিঠি' আমাকে যেভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছে তাহা আমার এই জীবনের একটা বড় আঘাত। পত্রগুচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ অনেক স্থানেই রয়েছে। 'সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের ৮, ১০, সংখ্যক চিঠি, 'ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন' অধ্যায়ের ২, ২৪, ৪১ সংখ্যক চিঠিতে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা আছে এবং মোহিতলাল কেন এই পত্রিকাকে সমর্থন করেন, তাও উল্লিখিত হয়েছে। শেষের দিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সংস্রবত্যাগের কথা আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি চিঠির সঙ্গে সংস্রবত্যাগের কথা 'আমি ও শনিবারের চিঠি' নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। উক্ত প্রবন্ধটি 'বিংশ শতাব্দী'র আশ্বিন ১৮৮১ শকাব্দ (আশ্বিন ১৩৬৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১২৩, ছত্র ৫। "বঙ্গদর্শন" প্রথম সংখ্যা। "বঙ্গদর্শন" প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৪।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১২৩। মোহিতলাল গান্ধী ও কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর ধারণা নানা পত্রে উল্লেখ করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, গান্ধীজীর অহিংসাবাদ বাংলার জল-হাওয়ার পক্ষে হানিকর। এমনিতেই আমরা ভাবপ্রবণ জাত, এর ওপর গান্ধীজীর অহিংসাবাদ নিলে হয়তো ক্লৈব্যের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ব। অহিংসাবাদের নিন্দা না করেও বলা যায় যে, আমাদের জন্য বলিষ্ঠ গৌরবময় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি 'সত্যাগ্রহী' নামে একটি গল্প লেখেন। গল্পটি সরোজকুমার রায়চৌধুরী-সম্পাদিত "বর্তমান" পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে গল্পটি "কলিকাতা—নোয়াখালি—বিহার" (আশ্বিন ১৩৫৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গান্ধী-বিরোধী মোহিত-লাল এই গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং "বঙ্গদর্শন"-এর আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা পরিমার্জন করে "বাংলা ও বাঙালী" (১৩৫৮) গ্রন্থে সংযোজিত হয়। গল্পের বিষয়বস্তু তাঁর মনঃপূত হওয়ায় তিনি বিভূতিভূষণকে ঐ সম্পর্কে একটি উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করেন। "নবসন্ন্যাস" এইভাবে রচিত (১ম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৫৫ ; ২য় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৫৫) হয়।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১২৬, ছত্র ৩। একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রবন্ধের নাম "ভারত মহাসাহিত্য-সম্মেলন ও বাঙালী"। "বঙ্গদর্শন"-এর আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরে "বাঙলা ও বাঙালী" গ্রন্থে সংযোজিত।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১২৬, ছত্র ৮। এই ব্যাপারে আমি একজন ব্যক্তির ব্যবহারে বড়ই মর্মাহত হইয়াছি। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। তিনি "বঙ্গদর্শন"-এ উপন্যাস লিখবেন এই মর্মে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—"আগামী আশ্বিন হইতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিনব উপন্যাস 'চিত্রগৃহ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় তারাশঙ্কর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। সেজন্য বাধ্য হয়ে আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে মোহিতলালকে লিখতে হয়েছিল, "দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর প্রথমে অসুস্থ ও পরে নানা কারণে ব্যস্ত থাকায় উপন্যাসটি এখনও প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, আরও সময় চাহিয়াছেন। অতএব

পাঠক-পাঠিকাগণকে আরও কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে। উপন্যাস না থাকিলে সাহিত্য-পত্রিকার অঙ্গহানি হয়, ইহা আমরাও বুঝি, এজন্য আমরা প্রথম হইতে সে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছি। কিন্তু গল্প ও উপন্যাস ত সকল পত্রিকাতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে, এ পত্রিকায় যদি কিছু কম থাকে, তাহাতে খুব দোষ হয় কি?" (১৩৫৪)

পত্র ৯, পৃষ্ঠা ১২৭, ছত্র ১৬। "বঙ্গদর্শন"-এ প্রকাশিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের তালিকা—

মৎস্যপুরাণ	—	ভাদ্র ১৩৫৪
বয়স	—	আশ্বিন ১৩৫৪
মন্বর	—	অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

পত্র ১০, পৃষ্ঠা ১২৮, ছত্র ১৫। তোমার মাতুল মহাশয়কে। মাতুলের নাম সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কলকাতার হিন্দুস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। এঁকে লিখিত মোহিতলালের চিঠি 'শিক্ষা-দর্শন' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

পত্র ১১, পৃষ্ঠা ১২৯, ছত্র ১৩। তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু বলিব না। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গান্ধীভক্ত ছিলেন। তিনি "গান্ধীবাণী-কণিকা" (১৩৫৫ আশ্বিন : ১৯৪৮) নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এজন্যে মোহিতলাল তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

পত্র ১১, পৃষ্ঠা ১৩০, ছত্র ১২। Lord Mountbatten-কে কিছুতে নেহেরু ধরে রাখতে পারলেন না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের শেষ বড়লাট—এঁর কার্যকালেই ভারত স্বাধীনতা পায়। জওহরলাল নেহেরু (১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯—২৭শে মে ১৯৬৪) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন অক্লান্ত যোদ্ধা ও মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র। দেশসেবার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য-চর্চাও করেছেন। Glimpses of World History, An Autobiography, Discovery of India তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পত্র ১১, পৃষ্ঠা ১৩০, ছত্র ২২। C. R. Attle ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কার্যকাল ১৯৪৫-১৯৫১।

পত্র ১৩, পৃষ্ঠা ১৩৫, ছত্র ১। অনেকদিন আগে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। পূর্ববর্তী চিঠির (১২. ৭. ৪৮) কথা বলা হয়েছে।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ১৩৭, ছত্র ৪। "বঙ্গদর্শন"-এর কাজ সবই আমাকে একা করিতে হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর যাবতীয় কাজ মোহিতলালকে করতে হত। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন সহকারী ছিল না। পুরোনো কবিতা-সংকলন (মণি-মঞ্জুষা), প্রবন্ধ-সংকলন (শ্রুতি-স্মৃতি), অনুবাদ (মাধুকরী), গ্রন্থপরিক্রমা, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভাগগুলি তাঁকে সংগ্রহ করতে হত। তদুপরি স্বনামে-বেনামে প্রবন্ধ, অনুদিত গল্প ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরাতে হত। পত্রিকার মধ্যে যদি সম্পাদকের ব্যক্তি ও চরিত্র ধরা পড়ে, তা একা মোহিতলালেরই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ১৩৭, ছত্র ১২। আপনার পত্রে করুণাবাবুর। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫)।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ১৩৮, ছত্র ৮। মোহিনীবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮২২—) ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভয়ের কথা" (পৌষ ১৩৫৪) পুস্তক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে মোহিতলাল ক্ষুব্ধ হন এবং বর্তমান চিঠিতে সেই ক্ষোভের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু মোহিনীমোহনের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে মোহিতলালের উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ "বনফুল" (১৩১৬) নিয়ে "ভারতী"র পৃষ্ঠায় 'মাসকাবারি'র প্রথম কিস্তি সুরু করেন।

"কাব্য-মঞ্জুষা"য় তাঁর 'যথাগত' ও 'সাধ' কবিতা সংকলিত করেন এবং কবি-পরিচিতি অংশে তিনি বলেন, 'রবীন্দ্র-যুগের' আধুনিক কাব্য-মন্ত্রে দীক্ষিত কবি এই কাব্যখানিতে ভাষা ও ছন্দের বিষয়ে যেমন সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি পরমবৈষ্ণব-সুলভ কৃষ্ণ-বিরহের আকুল উৎকণ্ঠা এই কবিতাগুলিতে সৌন্দর্য-প্রীতির সহিত যে ভক্তি-রস সঞ্চার করিয়াছে তাহাও কম উপভোগ্য নহে।...তিনি কেবল ভাব-জীবনেই বৈষ্ণব নহেন, বৈষ্ণব-মন্ত্রেরও দীক্ষিত সাধক। সেদিক দিয়া তাঁহার কাব্যচর্চা প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের মত ধর্ম-সাধনারই একটি অঙ্গ।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ১৩৯। "আমি মোহিতলালকে লিখিয়াছিলাম 'মহৎকে নিন্দা করিয়ো না, তাহাতে তোমার পাপ এবং শুনায় আমারও পাপ। ওসব পড়িতে আমি বেদনা পাই।' মোহিতলাল তারপর আর মহাত্মার কোন নিন্দা লেখেন নাই। এই চিঠিটা অসম্পূর্ণ এইজন্য যে মহাত্মা সম্বন্ধে কটূক্তি

থাকায় আমি ছিঁড়িয়া দিয়াছি।" (আজহারউদ্দীনকে লিখিত কুমুদ-রঞ্জন মল্লিকের পত্রাংশ)

গান্ধীচরিত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা মোহিতলালের ছিল, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তা সম্ভবপর হয় নি। তবে গান্ধীনীতি সম্পর্কে তিনি "জয়তু নেতাজী" ও "বাংলা ও বাঙালী গ্রন্থে" কিয়ৎপরিমাণে লিপিবদ্ধ করেছেন।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ১৪০। "কথাসাহিত্য" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন সুমথনাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। বর্তমাম চিঠিটি শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং উক্ত সংখ্যাই 'তারাশঙ্কর-অভিনন্দন-সংখ্যা'।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ১৪১, ছত্র ৩। একদা তারাশঙ্করকে আমিও অভ্যর্থনা করেছি। "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৩০৫) গল্প ও উপন্যাসের প্রথম রসসমৃদ্ধ আলোচনা করেন মোহিতলাল। 'প্রবাসী'র বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যায় তাঁর ''রসকলির" দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তারাশঙ্কর একথা "আমার সাহিত্য জীবন" ১ম খণ্ডে (শ্রাবণ ১৩৬০) উল্লেখ করেছেন। পরে "কবি" (ফাল্গুন ১৩৫০) উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন "বঙ্গদর্শন"-এর পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধটি 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও "কবি'' উপন্যাস' শিরোনামায় "সাহিত্য-বিতানে" (১৩৫৬) অন্তর্ভুক্ত।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ১৪২ ছত্র ২,। আপনাদের এই 'কথাসাহিত্যে' তাঁর স্মৃতি-কথা পড়ছি। 'কথাসাহিত্যে'র কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যা থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আমার কালের কথা" ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮।

শিক্ষা-দর্শন

পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৪৮, ছত্র ৩। মুখবন্ধের প্রথমেই আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কেহই বুঝিয়াও বুঝিবেনা। "এই পুস্তকে আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষায় উপযোগী কবিতাই সংকলন করি নাই, অথবা, কেবল সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাই নির্বাচন করি নাই—শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, আমি যতদূর সম্ভব নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি; আমি জানি, কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না,

সেগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে।… ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-পদ্ধতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি—ইহা কেবল একখানি সংকলন-গ্রন্থই নয়।" (মুখবন্ধ)

পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৪৯, ছত্র ১৭। তুমি 'বনমালা'র যে অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছ। এ প্রসঙ্গের উল্লেখ 'দেশ ও সমাজ' অধ্যায়ের অন্তর্গত তারাচরণ বসুকে লিখিত ১৭. ৮. ৪৩ তারিখের পত্রের শেষাংশে পাওয়া যাবে।

পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৫০, ছত্র ৫। সজনীবাবু জানিতেন না। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)—"শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক। ব্যঙ্গসমালোচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রধান গ্রন্থ: "রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য", "বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস", "পঁচিশে বৈশাখ", "রাজহংস", "কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল" প্রভৃতি।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১৫১, ছত্র ৬। আপনি এতদিন Rip Van Winkle-এর অবস্থায় বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছেন। 'রিপ্‌ ভ্যান উইঙ্কিল' গল্পটি ওয়াশিংটন আরভিং-এর প্রসিদ্ধ গল্প। গল্পটি হচ্ছে যে, রিপ্‌ একদিন বাড়ী ছেড়ে শান্তির আশায় ক্যাটাস্কিল পর্বতে বিশ্রামের জন্য গিয়েছিল —তারপর সে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। কুড়ি বছর পর তার ঘুম ভাঙতে সে দেখতে পেল যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অবাক্-বিস্ময়ে সে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল। ওয়াশিংটন আরভিং (Washington Irving : 1783-1859) আমেরিকান লেখক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম Geoffrey Cravon। প্রধান গ্রন্থ: The Sketch Book, Oliver Goldsmith, Mahomet and His successors (2 vols.), Life of Washingtion (5 vols., প্রভৃতি।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১৫৩, ছত্র ১০। আমি একদা একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। "কাব্য-মঞ্জুষা"র কথা বলা হইয়াছে।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা, ১৫৪, ছত্র ২৩। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই দায়ী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (২৯শে জুন ১৮৬৪—২৫শে মে ১৯২৪) কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এঁর প্রচেষ্টায় ও কার্যকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আগে শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র ছিল। প্রধানত এঁরই প্রচেষ্টায় এম.এ., এম. এস্‌সি ও তদতিরিক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। বাংলা

ভাষাকে এম. এ. শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা এঁর প্রধান কীর্তি। দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণের জন্য ইনি 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত। "জাতীয় সাহিত্য" নামে একটি গ্রন্থে বিভিন্ন সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৫৫, ছত্র ৪। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৪), অবিভক্ত বাঙলার কিছুকাল অর্থসচিব ছিলেন। হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে ১৯৫০ সালে পদত্যাগ করেন। নিখিল ভারত জনসংঘ নামে এক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৫৫, ছত্র ১৭। রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা"র একটি এমন ভাষ্য লিখিবার ইচ্ছা আছে। "সঞ্চয়িতা"র ভাষ্য রচনা করেছেন "কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য" (১ম ও ২য় খণ্ড; ১৩৫৯—১৩৬০) গ্রন্থে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনাগুলিকে তিনি একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের নাম "রবি-প্রদক্ষিণ" (পৌষ ১৩৫৬)।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৫৫, ছত্র ২২। 'নবযুগ' আরও একমাস পরে প্রকাশিত হইবে। "বাংলার নবযুগ" (শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২)।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৫৫, ছত্র ২৬। তোমার মামার পত্রের উত্তর দিয়াছি। পত্র-প্রাপকের মামার নাম সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কলকাতা হিন্দুস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৫৯, ছত্র ১৭। শ্রীমান পৃথ্বীশকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবেন। অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী—বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৬২, ছত্র ২৪। হরনাথ লিখিয়াছে। হরনাথ পাল। ঢাকায় তিনি অধ্যাপনা করতেন। তিনি ছিলেন মোহিতলালের ছাত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার দরুণ তিনি ১৯৫০-এ ঢাকা থেকে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি টাকী কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তাঁর রচিত গ্রন্থ "কবি মোহিতলাল", "রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য", "রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য"।

ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন

পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৬৫। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তখন ছিলেন 'উপাসনা" পত্রিকার সম্পাদক'। পত্রিকায় লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মোহিতলালকে তিনি কয়েকটি পত্র দিয়েছিলেন এবং নিয়মিত পত্রিকাও পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই চিঠির জবাবে বর্তমান পত্র।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১৬৭, ছত্র ৩। সজনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিবেন। "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১৬৮, ছত্র ৭। আপনার সংবর্ধনা সম্পর্কে আমি কালিদাস-ভায়াকে যাহা লিখিয়াছিলাম। কবিশেখর কালিদাস রায়।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ১৬৮, ছত্র ১১। আপনার মিতা। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৬৮। এই চিঠি সম্পর্কে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, " 'উপাসনা' প্রেস অনিবার্য কারণবশতঃ বিক্রয় করিয়া দিতে হইল; "উপাসনা" পত্রিকাখানি বিক্রয় না করিলেও এমন অবস্থার ফেরে পড়িয়া গেলাম যে তখনকার মত "উপাসনা" বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু স্থির করিলাম, পত্রিকা আমাকে প্রকাশ করতেই হইবে—যোগাযোগ হইয়া গেল—পত্রিকার নাম রাখিলাম 'অভ্যুদয়'—রবীন্দ্রনাথ এই নামের উপরই একটি কবিতা দিয়া আমার নব যাত্রাপথকে আশীর্বাদমণ্ডিত করিলেন—এখনও তাহা আমার সাহিত্য-সেবাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আর সকলের মত মোহিতবাবুকেও সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া লেখার জন্য অনুরোধ করিলাম, তিনি সহানুভূতির সহিত আমাকে স্নেহপূর্ণ উত্তর দিলেন।"

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১৭০, ছত্র ১। 'সেন কবি' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও 'বাগচি কবি' যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৭০। 'অভ্যুদয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪০)। সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মোহিতলালকে পাঠিয়েছিলেন। পত্রিকার প্রাপ্তি-সংবাদে বর্তমান পত্র।

পত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৭০, ছত্র ১৪। একটি কবিতা লিখিয়াছি। কবিতার নাম "সত্য-সুন্দর" ১৬০ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। 'অভ্যুদয়ে'র জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পত্র ৫, পৃষ্ঠা ১৭১, ছত্র ২৫। শেলী, ব্রাউনিং বা সেক্সপীয়ারকে টানিয়া আনিয়া। ব্রাউনিং (Robert Browning : 1812-1889) ইংরাজ কবি। তাঁর পত্নী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংও কবি। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে ব্রাউনিং-দম্পতির এক বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রন্থ : Paracelsus, Dramatis Personae, Collected Works প্রভৃতি। সেক্সপীয়ার (William Shakespeare : 1564-1616) ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি। প্রধান গ্রন্থ : Othello, Macbeth, Hamlet, As You Like It, Romeo & Julliet, King Lear, Julius Caeser, Sonnets প্রভৃতি।

পত্র ৫, পৃষ্ঠা ১৭৩, ছত্র ৭। তোমার সেই সমালোচক Hero। ড: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর প্রণীত "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯০৩-) প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সমালোচনামূলক তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আছে। "শরৎচন্দ্র", "রবীন্দ্রনাথ", "বঙ্কিমচন্দ্র", The Art of Bernard Shaw, Sarat Chandra ; Man and Artist, The Great Sentinel, A study of Rabindranath Tagore, Shakespearian Comedy তাঁর রচিত গ্রন্থ।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৭৪, ছত্র ১৩। প্রমথ চৌধুরীর মত জ্যাঠা মহাশয়কে যখন পাইয়াছ। প্রমথ চৌধুরী (৭ই আগষ্ট ১৮৬৮—২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) "সবুজপত্র" নামে মাসিকপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে অভিনব রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন এবং সাহিত্যোপযোগী মৌলিক ভাষা প্রচলিত করেন। বীরবল এঁর ছদ্মনাম। তিনি একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, সমালোচক ও কথাশিল্পী ছিলেন। এঁর রচনারীতি মোহিতলাল সমর্থন করেন নি। বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন, 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা'য় তিনি বলেছেন, "বাংলার ধাতুপ্রকৃতিতে, খাঁটি বাংলা ইডিয়মের উপরেই সংস্কৃতের প্রভাব যতটা স্বাস্থ্যকর, সংস্কৃতবর্জিত কথ্যভাষার আদর্শ ততটাই অস্বাস্থ্যকর।" (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)। প্রধান গ্রন্থ : বীরবলের হালখাতা, চার-ইয়ারী কথা, সনেট-পঞ্চাশৎ, ঘোষালের ত্রিকথা প্রভৃতি।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১৭৭, ছত্র ৫। মেদিনীপুর সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক উৎসবে (১৩৪৭, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ) মোহিতলাল ছিলেন মূল সভাপতি। 'জাতির জীবন ও সাহিত্য' নামে এক প্রবন্ধ ভাষণ হিসেবে পাঠ করেন। পরে এই ভাষণ "বিবিধ কথা" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১৭৭, ছত্র ২১। যাহা লিখিয়াছিলাম এখনও তাহাই লিখিতেছি। এই অধ্যায়ের ৭ সংখ্যক চিঠিতে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

পত্র ৯, পৃষ্ঠা ১৭৮, ছত্র ১। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮, ৭ই আগষ্ট ১৯৪১।

পত্র ১০, পৃষ্ঠা ১৭৯, ছত্র ১। শ্রীমান নিশিকান্তর কবিতা পেয়েছি। "হেমন্ত-গোধূলি"র প্রশস্তিমূলক কবিতা নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯) পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে মোহিতলালকে পাঠিয়েছিলেন। "অলকানন্দা" "দিগন্ত", "ভোরের পাখী" "দিনের সূর্য" প্রভৃতি এঁর কাব্যগ্রন্থ।

পত্র ১০, পৃষ্ঠা ১৭৯, ছত্র ১০। "বিচিত্র কথা" ও "বিবিধ কথা" বাজারে বেরিয়েছে। "বিবিধ কথা ও "বিচিত্র কথা"র প্রকাশ-তারিখ ভাদ্র ১৩৪৮।

পত্র ১০, পৃষ্ঠা ১৮০, ছত্র ১। মাদ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের কথা পড়ে খুব আশ্বস্ত বোধ করলাম। মাদ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের নাম ইন্দুকুমার রায়; হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের ম্যানেজার।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ১৮৫, ছত্র ৩। কালিদাসবাবুর বাড়ী হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছি। কালিদাসবাবু অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ১৮৫, ছত্র ১২। আমি একখানি 'কবিতা-সঞ্চয়ন' প্রণয়ন করিয়াছি। কবিতা-সঞ্চয়নের নাম "কাব্য-মঞ্জুষা" ঐ গ্রন্থের কবি-পরিচয়ে মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আধুনিক কবি-গণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন; তাঁহার কবিতায় ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা এবং তীব্র অনুভূতির সহিত আত্মস্থতা অতিশয় লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবনে ও কবিজীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়।···আর কোন বাঙ্গালী বোধ হয় ঐরূপ শিক্ষা ও ঐরূপ কর্মজীবন সত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। কর্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে কোমল করিয়া তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ পিণ্ডকে হাতুড়ির

আঘাতে নানা আকারের গঠন দেয়—যতীন্দ্রনাথের কবিতায় অগ্নিতপ্ত হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত এবং তাহার ফলে ভাব ও ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়।" "কাব্য-মঞ্জুষা"র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে তাঁর 'বহ্নিস্তুতি' 'কৃষ্ণা' 'কচি ডাব' ও 'হাটে' কবিতা সংকলিত হয়েছে।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ১৮৬, ছত্র ৭। কলিকাতায় আপনাকে দেখিয়া আমিও সাক্ষাৎ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। দিলীপকুমার রায়ও লিখেছেন, "মোহিতলালের সঙ্গে দু-তিনবারের বেশি দেখা হয়নি।···মোহিতলালের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর বেহালার বাড়ীতে। লেখায় তাঁর যে রূপ, ব্যক্তিগত লেনদেনে তার সে রূপ ছাপিয়ে প্রকাশ পেত একটি বন্ধুবৎসল মানুষের মূর্তি। তাঁর এই রূপটিই আমাদের কাছে বিশেষ করে স্মরণীয় ও বরণীয়। মানুষে মানুষে মতভেদ ও রুচিভেদ চিরদিন ছিল—চিরদিনই থাকবে। কিন্তু সব মত, রুচি ও বিচার-বুদ্ধিকে অতিক্রম করেও মানুষে মানুষে মিল হওয়া সম্ভব। মোহিতলালের সঙ্গে আমার ছিল এই জাতীয় মিল। তাই ব্যক্তিগত তিক্ততার দরুণ তিনি শেষ জীবনে আমার প্রতিও খানিকটা বিরূপ হলেও আমাকে তিনি যে স্নেহ করতেন এতে আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি।" (অনামী, ২য় সং, ৩৪৭ পৃ:)

পত্র ১৫, পৃষ্ঠ ১৮৭, ছত্র ২০। আপনার স্বর্গত পিতৃদেবের তিনটি কবিতা···আত্মসাৎ করিয়াছি। "কাব্য-মঞ্জুষা" সংকলনে দিলীপকুমারের পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'মাতৃহারা', 'সুখ-মৃত্যু', 'সৃষ্টি-রহস্য', 'তা সে হ'বে কেন' কবিতাগুলি গ্রহণ করেন। "কাব্য-মঞ্জুষা"র ছাত্রপাঠ্য সংকলনে তাঁর 'মাতৃহারা' 'তা সে হ'বে কেন' কবিতা-দুটি রয়েছে।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ১৮৭, ছত্র ২৭। আপনাদের আশ্রমের অপর কবি শ্রীমান নিশিকান্তকে আমার স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবেন। দিলীপকুমার তখন থাকতেন পাণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে। ঐ আশ্রমে ছিলেন কবি নিশিকান্ত, যিনি :কবিতায় "হেমন্ত-গোধূলি"র প্রশস্তি মোহিতলালকে পাঠিয়েছিলেন। হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬. ১০. ৪১ তারিখের চিঠির (এই অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক চিঠি) প্রথমেই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ১৮৯। 'বঙ্গশ্রী'র স্বত্বাধিকারী সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের জামাতা অবনীকান্ত ভট্টাচার্যের অনুরোধে 'বঙ্গশ্রী'তে লিখিবার অনুরোধ জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম প্রথম পত্রখানি তারই উত্তর।...প্রথম পত্রেই উপযুক্ত দক্ষিণার কথা বলা হইয়াছিল; তথাপি 'বঙ্গশ্রী'তে মোহিতলালের লেখা প্রকাশিত হয় নাই, কারণ কোন রচনাই তিনি পাঠান নাই। 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম দিকে যখন সজনীকান্ত দাস সম্পাদনা করিতেন তখন মোহিতলালের কিছু রচনা প্রকাশিত হয় এবং তজ্জন্য কয়েকখানি মূল্যবান বই নাকি সচ্চিদানন্দবাবু মোহিতলালকে দেন এ সংবাদ মোহিতলালের নিকট শুনিয়াছি।" (আজহারউদ্দীনকে লিখিত রমেশবাবুর পত্রাংশ)। সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৩৩৯, মাঘ মাসে। দু বছর সম্পাদনা করার পর তিনি 'বঙ্গশ্রী' ত্যাগ করেন।

পত্র ১৯, পৃষ্ঠা ২৯১, ছত্র ২৩। ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না। অক্ষয়কুমার সেনশর্মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। গবেষণা-সংক্রান্ত কাজে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার বাসনায় মোহিতলালকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন। তারই জবাবে মোহিতলাল ঐ সংবাদ দিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৯১—৩রা অক্টোবর ১৯৫২) ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" "সাহিত্যসাধক-চরিতমালা" প্রভৃতি এঁর প্রধান গ্রন্থ।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ১৯২, পত্র ৮। শরৎচন্দ্রের সব চাই। এই সময় মোহিতলাল পুনরায় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সমস্ত পর্ব পড়েন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অতুলনীয় সমালোচনা-গ্রন্থ "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" লেখার পরিকল্পনা করেন।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ১৯২, ছত্র ৯। মঞ্জুর মা চান। মঞ্জু মোহিতলালের পুত্র। পুরা নাম মঞ্জুলাল মজুমদার। মঞ্জুর মা অর্থাৎ মোহিতলালের স্ত্রী। তাঁর স্ত্রীর নাম তরুলতা দেবী।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ১৯৩, ছত্র ৭। আমার Retire করবার সময়ও এসেছে। মোহিতলাল ১৯২৮ জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

পত্র ২১, পৃষ্ঠা ১৯৩, ছত্র ২৩। তোমার মামার সংবাদ পেয়ে খুশী হলাম। অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগীর মামার নাম সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'শিক্ষা-দর্শন' অধ্যায়ে এঁকে লিখিত মোহিতলালের চিঠি পাওয়া যাবে।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ১৯৪, ছত্র ১১। শ্রীমান মথুর কলকাতায় আসিয়াছিল। অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দি—সিটি কলেজের অধ্যাপক। এঁকে মোহিতলাল "বঙ্কিম-বরণ" (১৩৫৬) গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

পত্র•২২, পৃষ্ঠা ১৯৫, ছত্র ১৯। তুমি চাকরী লইয়াছ বলিয়া যে লজ্জা ও ভয় পাইতেছ—তাহা আমার মতে ঠিক নয়। এই সম্পর্কে অক্ষয়কুমার সেনশর্মা জানিয়েছেন. "১৩৫০ সন নানাভাবে আমাদের পারিবারিক জীবনের পক্ষে একটি দুর্বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৲ টাকার Research Scholarship-এর মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি চাকরী পাই, Inspector of Civil Supplies-এ। Research-এর মায়া ত্যাগ করে কর্মসূত্রে মাণিকগঞ্জের পল্লী-অঞ্চলে যাই। এজন্য আমার কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ তখন কম ছিল না—তখনকার কলেজের অধ্যাপকের বেতনের চেয়ে এই পদের বেতন দুই তিন গুণ বেশী ছিল এবং আমার কাছে তখন সেটি আশু-প্রয়োজনীয় ছিল—এজন্য গুরুদেব আমাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে কিভাবে আমার কুণ্ঠা দূর করেছেন তা লক্ষ্য করবেন। ব্রহ্ম ও বস্তু—এই দুইয়ের সমন্বয়-সাধনই জীবনসাধনা—এই আশ্বাসবাক্য আমাকে সর্বপ্রকার মোহ ও নির্জীবতা থেকে রক্ষা করেছে।" (আজহারউদ্দীন খানকে লিখিত পত্রাংশ ১৭. ৫. ৬৬)।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ১৯৬, ছত্র ৬। সে চাকরী তোমার চেয়েও ভয়ানক। মোহিতলাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগোর পদ গ্রহণ করেন। তিন বছরের বেশী এ-চাকরী তাঁর সহ্য হল না। ১৯১৭-তে সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ১৯৬, ছত্র ২৬। তোমার প্রবন্ধটি ছাপা হইলেই আমাকে পাঠাইবে। ঢাকার 'শান্তি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অক্ষয়কুমার সেনশর্মার 'বাংলা গদ্যের জনকত্ব-নির্ণয়' নামক এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে সেই প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ১৯৮, ছত্র ২৭। একজন ইংরেজ মনীষী দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ইংরেজ মনীষীর নাম রবার্ট লিণ্ড (Robert Lynd : 1879-1949)।

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক রূপে তাঁর খ্যাতি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ : Old and New Masters, Dr. Johnson and Company প্রভৃতি।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ২০১, ছত্র ৫। শিষ্য সতীশ দাশগুপ্তের ত' কথাই নাই। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮২—) বাঙলাদেশে গান্ধীবাদী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর সহযোগী ছিলেন। তিনি গান্ধীবাদ ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। গ্রন্থ : "ভারতের সাম্যবাদ" "হিন্দুধর্ম ও অস্পৃশ্যতা," "তুলসী রামায়ণ" প্রভৃতি।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ২০১, ছত্র ২১। একখানি উৎকৃষ্ট বই-এর নাম "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ", প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫—)। ভ্রমণ-সাহিত্য রচনায় এঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত এবং শিল্পী হিসেবেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ" (১—৩) ছাড়া "হিমালয়ের মহতীর্থে" "যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ" "হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর" গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ২০৪, ছত্র ১১। ভিতরে একটা বড় আঘাত লেগেছে। এই পত্র লেখার কিছুকাল পূর্বে ১২ বছরের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। ১৯৩১ সালে ঢাকায় প্রায় একই সময়ে দু'কন্যা অমিয়া ও অরুণার মৃত্যু হয়।

পত্র ২৯, পৃষ্ঠা ২০৭, ছত্র ২। কিছুদিন পূর্বে আর একটি শিষ্য এমনই পূজা পাঠাইয়াছিল। অধ্যাপক অক্ষয় সেনশর্মার কথা বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে তাঁকে লিখিত এই অধ্যায়ের ২০. ৮. ৪৪ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৯, পৃষ্ঠা ২০৮, ছত্র ১। 'বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ সন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবে। উপরোক্ত প্রবন্ধের লেখকের নাম পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০শে ডিসেম্বর ১৮৬৬—১৫ই নভেম্বর ১৯২৩)। 'বঙ্গবাণী', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'রঙ্গালয়', 'হিতবাদী', 'বাঙালী', 'নায়ক' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সংবাদ-সাহিত্য-রচনায় এঁর খ্যাতি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে এঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ২৯, পৃষ্ঠা ২০৮, ছত্র ৩। তোমার কাছে "শান্তিজল" আছে। উক্ত কাব্যগ্রন্থ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ২০৯, ছত্র ৮। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদের ত্যাগের জন্য আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সম্পর্ক-চ্ছেদে

ইতিহাস 'আমি ও শনিবারের চিঠি' নামক প্রবন্ধে মোহিতলাল দিয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধ 'বিংশ শতাব্দী' আশ্বিন ১৮৮১ শঃ (১৩৬৬) সংখ্যায় প্রকাশিত।

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ২০৯. ছত্র ১৫। কবি লিখিয়াছেন—'কত মরণের······কত জ্বালা'। কবিতার পঙ্‌ক্তি-দুটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "মরুশিখা" কাব্যগ্রন্থের 'শিবস্তোত্রঃ কবিতার অন্তর্গত। 'শিবস্তোত্র' "অনুপূর্বা" সংকলন-গ্রন্থেও পাওয়া যাবে।

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ২০৯, ছত্র ২৮। তখন মনে হয় নাই যে তাহার counterfoil হিসাবে আমার চরিত্রটাও আবশ্যক হইবে। "অজয়" উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে মোহিতলাল 'আমি ও শনিবারের চিঠি' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, "এই উপন্যাসে তিনি সজনীকান্তকেই নায়ক করিয়া তাঁহার সংশ্লিষ্ট যত ক্ষুদ্রতর মানবচরিত্রের দ্বারা ঐ নায়ক-চরিত্রের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্র-চিত্রণও করিয়াছেন। ইহা যে সত্য, অর্থাৎ ঐ গ্রন্থখানি যে সজনীকান্তেরই চরিতাখ্যান তাহা শ্রীমান নিজেই সর্বত্র বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া থাকেন। ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যাহারা এককালে 'শনিবারের চিঠি'র অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন সজনীকান্তের মধ্যলীলার সেই সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁহার অসাধারণ চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। ঐ কাহিনীর একটি চরিত্রের নাম লোকনাথ ঘোষাল—চরিতামৃতকার ঐ চরিত্রে আমাকেই চিত্রিত করিয়াছেন এবং সজনীকান্তের তুলনায় সে চরিত্র যে কত দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত, 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ এবং শেষ পর্যন্ত সে চরিত্র যে কিরূপ কৃপার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অতিশয় দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। চাপিয়া ধরিলে ইহার উত্তর অবশ্য আছে। তাহা এই যে, উপন্যাস উপন্যাসই, বাস্তবের কিঞ্চিৎ ছায়ামাত্র থাকা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়; কিন্তু কল্পনায় তাহাকে রসরূপে পরিচিত করিবার জন্য কবির যথা ইচ্ছা পরিবর্তন করিবার অধিকার আছে। ঐ চরিত্রগুলির রসরূপ যে কিরূপ হইয়াছে এবং রসরূপের পরিবর্তে লেখকের নিজেরই ব্যক্তিগত মতামত ও বাস্তবনিষ্ঠার যে অভিমানমূলক ঘোষণা আছে, তাহা যে-কোন পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে; বাঙালী পাঠক যদি একবারই কল্পনার বাস্তব-সূত্রটির সন্ধান

পায়, তবে ঐ চরিতাখ্যানটি যে সর্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মত "ভূয়োদর্শন" সম্পন্ন ব্যক্তিরও অবিদিত নাই।··· ······সজনীকান্তের বৈঠকেও বন্ধুগণ এখন আমাকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন—ইহাও শুনিয়াছি। "জয়মে"র লেখক তাঁহার ঐ সুবৃহৎ চরিতামৃতটির জন্য যত কিছু ঐতিহাসিক মালমসলা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।"

পত্র ৩০, পৃষ্ঠা ২১০, ছত্র ২৮। বাল্যকালে পাড়িয়াছিলাম—When vice········· private station। উক্ত পংক্তি-কয়টি যোসেফ এ্যাডিসন-রচিত "The Campaign" কবিতার পংক্তি। যোসেফ এ্যাডিসন (Joseph Addison: 1672 1719) ইংরেজী সাহিত্যের কবি, প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিবিদ্। ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধে মার্লবোরোর জয় লাভে তিনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের অনুরোধে 'The Campaign' কবিতা লেখেন। তিনি 'Whig Examiner' নামে এক কাগজ বের করেন, 'Guardian', 'Spectator' কাগজে সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদিও লেখেন।

পত্র ৩১, পৃষ্ঠা ২১১, ছত্র ৪। আপনি যে নূতন সম্পাদন ভার পাইয়াছেন। 'বর্তমান' মাসিকপত্রিকার সম্পাদনা করেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী। প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৪।

পত্র ৩১, পৃষ্ঠা ২১২, ছত্র ২৮। আপনাকে উপহার স্বরূপ একটি ছোট কবিতা দিব! 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের রচনার তালিকা—

বৈশাখ ১৩৫৪—'বর্তমান' (কবিতা)

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৫৪—কপালকুণ্ডলার ভূমিকা।

পত্র ৩৩, পৃষ্ঠা ২১৪, ছত্র ৩। আমি এই দারুণ দুর্যোগের মুখেও একখানি মাসিক-পত্র সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছি। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার কথা—প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৪।

পত্র ৩৩, পৃষ্ঠা ২১৫, ছত্র ২২। আপনার "অনুপূর্বা" শুনিলাম প্রকাশিত হইয়াছে। অনুপূর্বার প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৩ (১৯৪৬)। মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শনের' আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেন। পরে উক্ত সমালোচনা 'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ৩৪, পৃষ্ঠা ২১৭, ছত্র ২২। Palgrave's Golden Treasury। প্যালগ্রেভ (Francis Turner Palgrave: 1824-1897) ইংরাজ কবি ও সমালোচক। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক ছিলেন। গ্রন্থ: Visions of England, Landscape in Poetry, The Golden Treasury of the lust songs and Lyrical Poems in English Language, Treasury of Sacred Songs প্রভৃতি।

পত্র ৩৪, পৃষ্ঠা ২১৮, ছত্র ১২। আগামী শ্রাবণ মাসে প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যার (শ্রাবণ ১৩৫৪) সূচীপত্র নিম্নরূপ ছিল—

১। পত্রসূচনা

২। রবীন্দ্রস্মৃতি-তর্পণ

মহাপ্রয়াণ

স্মৃতি-তর্পণ

স্মরণীয় কাব্যপংক্তি

রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ

৩। রবীন্দ্রনাথ ও স্মৃতিপূজা—ক্ষিতিমোহন সেন

৪। বঙ্গ-কবির বিদায় (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়

৫। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬। ভাগ্যবন্ত (গল্প)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। মণিমঞ্জুষা (কবিতা-চয়ন)

বাংলার কবি

রূপতৃষা

মনোহারিকা

কিশোরী

মালতী

দ্বিপ্রহরে

সধবা

৮। শ্রুতি-স্মৃতি

পলিটিক্স্

বাংলার বৈশিষ্ট্য

৯। আমার সাধ

১০। ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১১। মাধুকরী (অনুবাদ)

লয়লা-মজনু

সভ্যতা

১২। গ্রন্থ-পরিক্রমা

১৩। বঙ্গ-দর্শন (সম্পাদকীয়)

পত্র ৩৫, পৃষ্ঠা ২২০, ছত্র ৩০। আমার বড় ইচ্ছে তুমি বাংলার বৈষ্ণব-বৈরাগীর আখড়া নিয়ে এখন একটি উপন্যাস লেখ। বৈষ্ণবসমাজের নিখুঁত চিত্র সরোজকুমার রায়চৌধুরী "ময়ূরাক্ষী," "গৃহকপোতী," "সোমলতা" উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। মোহিতলাল অন্য একটি প্রবন্ধেও সরোজকুমারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, ইহাতে যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্য অপূর্ব কলানৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনই, সেই সমাজের অন্তরে পূর্ণ প্রবেশ করিবার যে মহানুভব শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহাও একটি উৎকৃষ্ট কবি-শক্তি। যে-ভূমি, যে-প্রতিবেশ ও যে-সংস্কৃতির পটভূমিকায় তিনি জীবনের এই এক নূতন রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন সে যে কত বাস্তব তাহা অনুভব করি তাঁহার স্টাইলে—ভাষার অতিশয় সংক্ষিপ্ত সরলতায়, ভাবালুতার সতর্ক সংযমে।······এ-জাতীয় উপন্যাস ইহাই প্রমাণ করে যে, জীবনের বহিরঙ্গ-শোভা যতই সাধারণ বা তুচ্ছ হউক, সত্যকার দৃষ্টি যাহার আছে,—যে পুঁথির পরিবর্তে প্রাণকে প্রামাণ্য করিয়াছে, যে 'বুলি'র বদলে মানুষকে চাহিয়াছে, এককথায়, যে এই দৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান—সে পথের উপরকার সার্বাধিক পদচিহ্ন হইতেই অনন্তের তীর্থযাত্রার সঙ্কেত ধরিয়া দিতে পারে। তাই এই উপন্যাস-ত্রয়ীর মধ্যে যে বৈরাগীর আখড়া এবং যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর যুগলচিত্র লেখকের তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কাল, দেশ ও সমাজের আবরণ ভেদ করিয়া—এমন কি, প্রকৃতি বা দেহ-সংস্কারকেও অতিক্রম করিয়া—মানুষের ক্ষুধার গূঢ়তম রূপ ও তাহার পরমতৃপ্তির আশ্বাস উঁকি দিয়াছে। (বর্তমান বাংলা সাহিত্য : "সাহিত্য-বিতান")।

পত্র ৩৮, পৃষ্ঠা ২২৫, ছত্র ১০। আপনার মিতা একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলেন। মিতা অর্থাৎ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পত্র ৩৯, পৃষ্ঠা ২২৬, ছত্র ২। প্রেরিত কবিতাটি পাইয়া সুখী হইলাম। কবিতাটির নাম স্বরাজ (?); 'বঙ্গদর্শন' কর্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল এই কবিতাটিকে 'ছড়া' নামে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-চিন্তা অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪০, পৃষ্ঠা ২২৭, ছত্র ৭। 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার চমৎকার কবিতাটি পড়িলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৫৫) কবিতার নাম 'প্যাথিবিভ্রাট'। "নিশান্তিকা" (১৩৬৪) কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি রয়েছে।

পত্র ৪১, পৃষ্ঠা ২৩১, ছত্র ২০। আপনি নির্মলকুমার বসুর লেখা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর গান্ধী-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ২৩২, ছত্র ২। 'বর্তমানে' আপনার অনুবাদটি (কবিতা) যেরূপ হইয়াছে দেখিতেছি। কোলরিজের "The Rime of Ancient Mariner" কবিতার অনুবাদ বর্তমান পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ থেকে কার্তিক ১৩৫৫ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে "প্রাচীন নেয়ে" নামে প্রকাশিত হয়। কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge : 1772-1834) ইংরাজ কবি ও সমালোচক ; অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করে তোলার অসাধারণ দক্ষতা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অহিফেনসেবী ছিলেন—অনেক কবিতা আরম্ভ করে শেষ করেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কবিতাগুলিই ইংরাজী সাহিত্যের এক পরম সম্পদ—Kubla khan, Christable ইহার উদাহরণ। প্রধান গ্রন্থ : Collected Poems, Aids to Reflection, Confessions of an Inquiring Spirit প্রভৃতি।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ২৩২, ছত্র ৯। 'শনিবারের চিঠি'তে গান্ধীভজন করাই আপনার একমাত্র মোক্ষলাভের উপায়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'শনিবারের চিঠি' ও বিভিন্ন পত্রিকায় গান্ধীজির বাণীকে কবিতার আকারে যে রূপ দিয়াছিলেন পরে সেগুলি সংগ্রহ করে "গান্ধীবাণী-কণিকা" নামে প্রকাশিত হয় (আশ্বিন ১৩৫৫ : ১৯৪৮)।

পত্র ৪২, পৃষ্ঠা ২৩২, ছত্র ১১। আমার মোক্ষ আসন্ন—আপনার পূর্বেই তাহা লাভ করিব। মোহিতলালের মৃত্যু ২৬শে জুলাই ১৯৫২ : ১০ই শ্রাবণ ১৩৫৯। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যু ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ : ৩১ শে ভাদ্র ১৩৬৭।

পত্র ৪৩, পৃষ্ঠা ২৩৩, ছত্র ১৩। শঙ্কর বাবাজীউ। জীবনকালী রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর দাস রায়।

পত্র ৪৪, পৃষ্ঠা ২৩৪, ছত্র ৮। আপনি যে গীতার অনুবাদ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গীতার যে অনুবাদ করেছিলেন পরে সেটি "রথী ও সারথী" নামে প্রকাশিত হয় (শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৭ : ১৯৫১)।

পত্র ৪৭, পৃষ্ঠা ২৩৯, ছত্র ৪। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মোহিতলাল "সাহিত্য-বিচার" (১৩৫৪) গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

পত্র ৪৮, পৃষ্ঠা ২৪০। রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য-রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাহিত্য-চিন্তা অধ্যায়ের ২৮ নং পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫০, পৃষ্ঠা ২৪২, ছত্র ৮। রমেশবাবু, বীরেন, কুমুদ। রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, কুমুদনাথ দত্ত।

পত্র ৫৩, পৃষ্ঠা ২৪৫, ছত্র ১৬। আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় shock। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-চিন্তা অধ্যায়ের প্রথম চিঠির পত্র-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫৪, পৃষ্ঠা ২৪৬, ছত্র ৩। সচ্চিদানন্দ প্রায় দেখা করতে আসে। সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক।

পত্র ৫৪, পৃষ্ঠা ২৪৭, ছত্র ১৩। 'বঙ্গভারতী'র কথা লিখিয়াছেন। 'বঙ্গভারতী'র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৩৫৯ বৈশাখ মাসে—মাত্র তিনটি সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ) সম্পাদনা করার সময় পেয়েছিলেন মোহিতলাল। প্রথম সংখ্যার সূচী—

আমাদের কথা
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
অকাল-উৎসব (কবিতা)
বাংলার বৈষ্ণব—শ্রীতারাচরণ বসু
ফুলদানি (কবিতাচয়ন):
  বর্ধবর্তন
  জাগৃহি
পুরাতনী :
  গত শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্য—
  অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মাতৃরূপা মাতা (কবিতা)—শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগচী

বিদেশী ছোট গল্প :

স্বৈরিণী—আনাতোল ফ্রাঁস (অ/মোহিতলাল মজুমদার)

বৈদেশিকী :

এক-বক্তার বৈঠক—অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্ (অ/মোহিতলাল মজুমদার)

গোষ্ঠবিহার :

সাময়িকী :

সভ্যতা

শ্রীঅরবিন্দ-কথা

বিবেকানন্দ-কথা

সত্যমপ্রিয়ম (সম্পাদকীয়)

'বঙ্গভারতী' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতি। 'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়' নামে একটি প্রকাশনাও শ্যামসুন্দর বাবুর সাহায্যে স্থাপন করেন। এই প্রকাশনা থেকে মোহিতলালের অনেকগুলি প্রবন্ধ ও সমালোচনা-গ্রন্থ বেরোয়। সম্প্রতি এই প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান উঠে গিয়েছে।

পত্র ৫৫, পৃষ্ঠা ২৪৮, ছত্র ১১। রবীন্দ্র-কাব্যের আপনি যা পরিচয় ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত করাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশকের উপকার হইবে। অমিয়কুমা[র] গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'নির্ণয়' পত্রিকায় মোহিতলালের "কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য" গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের স্ব[ত্ব] প্রকাশকের (কমলা বুক ডিপো) থাকায় বিজ্ঞাপনে প্রকাশকেরই লাভ হয়েছে।

বিবিধ

পত্র ১, পৃষ্ঠা ২৫৩, ছত্র ১। এই সামান্য ব্যাপারে আমার অনুমতি লইবার আবশ্যক ছিল না। 'কালি-কলমে' কবিতা প্রকাশ সম্পর্কে মোহিতলাল এই কথা বলেছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের রচনার তালিকা—

প্রথম বর্ষ ১৩৩৩

বৈশাখ	নাগার্জুন
জ্যৈষ্ঠ	তীর্থপথিক (বৈশাখ ১৩৩৩-এর 'উত্তরা' থেকে 'চয়নিকা'য় উদ্ধৃত)

আষাঢ়	নারী-বন্দনা
শ্রাবণ	গদ্য ও পদ্য (শ্রাবণ ১৩৩৩, প্রবাসী থেকে 'চয়নিকা'য় উদ্ধৃত)
	সাধ্বী (আনাতোল ফ্রাঁসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে গল্প)
ভাদ্র	ঘর-উদাসী
আশ্বিন ও কার্তিক	প্রেম ও ফুল
কার্তিক	সৃষ্টির আদিতে
মাঘ	বিদায়-বাদল

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩৪

বৈশাখ	স্মর-গরল
জ্যৈষ্ঠ	শ্যালট-বাসিনী (টেনিসনের The Lady of Shalott-এর অনুবাদ)
আষাঢ়	রুদ্র-বোধন
	সত্যেন্দ্র-স্মরণে
	দেয়াল-ভাঙা (ইংরেজি গল্পের অনুবাদ)
	কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
শ্রাবণ	নারী-স্তোত্র
আশ্বিন	শরৎচন্দ্রের প্রতি
কার্তিক	গান (হাইনের অনুভাবে)
অগ্রহায়ণ	রূপ-রহস্য
পৌষ	অপ্রেমিক
মাঘ	বিদায়-বাণী

[illegible]

ও মুরলীধর বসু।

পত্র ২, পৃষ্ঠা ২৫৩, ছত্র ৯। 'উত্তরা'র সুরেশই বা কি করিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—(জন্ম ১০. ৭. ৬১. কাজলকাঠি, বরিশাল) অধুনালুপ্ত 'উত্তরা' মাসিকপত্রের সম্পাদক। গ্রন্থ: 'মধুপ', 'মানসী' প্রভৃতি।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২৫৪, ছত্র ১১। ভূমীনের ঠিকানা দিয়াছ। ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত—"জীবন-জিজ্ঞাসা" গ্রন্থ মোহিতলাল এঁকে উৎসর্গ করেন।

পত্র ৫, পৃষ্ঠা ২৫৪, ছত্র ৬। এখানে যে বাসায় আছি তাহা একটা পথপ্রান্তের দোকান ঘর বলিলেই হয়। বাগনানের এই বাসাতে মোহিতলাল মাসখানেক ছিলেন। কিছুদিন পরে বাগনানে খালের ধারে একটি সুন্দর দোতলা বাড়ি পেয়েছিলেন।

পত্র ৬, পৃষ্ঠা ২৫৬, ছত্র ১০। নিশিকান্তর কবিতার খাতা কোথায় ফেলিয়াছি জানি না। নিশিকান্ত রায়চৌধুরী—কবি। পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৩৬৩)।

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ২৫৭, ছত্র ১। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবন্ধগুলিও পৌঁছিয়াছে। অক্ষয়কুমার সেনশর্মা জানিয়েছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগন্নাথ হল' কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা। আমি তখন 'জগন্নাথ হল' ছাত্রসংঘের সহ-সভাপতি। ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে নানারকম প্রতিযোগিতার—কখনও সর্ব-বঙ্গীয় ভিত্তিতে, ব্যবস্থা করা হোত। আলোচ্য প্রতিযোগিতাটি ছিল 'নিখিল বঙ্গ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা'—বিষয় "সাহিত্যে বাস্তবতা"। প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন বর্তমানে টাকী কলেজের বাংলায় প্রধান অধ্যাপক শ্রীহরনাথ পাল। (আজহারউদ্দিন খান্‌কে লিখিত ১৭. ৫. ৬৬ তারিখের পত্রাংশ)

পত্র ৭, পৃষ্ঠা ২৫৭, ছত্র ৫। তোমাদের 'বাসন্তিকা'র জন্য একটি পুরানো কবিতা (অপ্রকাশিত) একটু revise করিয়া পাঠাইতেছি, ঐ সঙ্গে 'পঁচিশে বৈশাখ' নাম দিয়া একটি ছোট কবিতা পাঠাইতেছি। এই সম্পর্কে অক্ষয়বাবু জানিয়েছেন, "এক সঙ্গে দুটি রচনা তিনি ছাত্রদের কাগজে কখনও দিতেন না—বোধ হয় আমাকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন বলে আবদার রক্ষা করেছিলেন।" (ঐ পত্রাংশ)

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ২৫৮, ছত্র ৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নিকট আমার বন্ধু গিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস—বর্তমানে উত্তরপাড়ার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মানিকচন্দ্র দাসের ভগ্নীপতি।

পত্র ৮, পৃষ্ঠা ২৫৮, ছত্র ৭। তোমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখক। গ্রন্থ: ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, বাংলা পত্র-সাহিত্য।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬১, ছত্র ৩। শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষের চিঠি পাই। অনিল বাবু প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর মালিক।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬২, ছত্র ৫। তোমার ভাই অবিনাশের অসুস্থতা। অবিনাশচন্দ্র সেনশর্মা—অক্ষয়কুমার সেনশর্মার ভ্রাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র এবং সুন্দর আবৃত্তি করতে পারার জন্য মোহিতলালের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। বর্তমানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের Dy. C. O. P. S.

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬২, ছত্র ২০। এমন ব্যক্তির কাছে এমন হৃদয়হীন ও বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের কথা বলা হয়েছে।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬২, ছত্র ২৭। তার স্থানে পার্বতীবাবুর বই নেওয়া হইয়াছে পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য—সম্পাদক 'ত্রিধারা' (কাব্য-সংকলন, ১৩৫১, ১২ই শ্রাবণ, ঢাকা)।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬৩, ছত্র ১। সুরেশ অতিশয় চতুর। সুরেশচন্দ্র দাশ—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স নামক পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের মালিক।

পত্র ১২, পৃষ্ঠা ২৬৩, ছত্র ১৯। শ্রীমতী সুলতার সংবাদ দিবে। শ্রীমতী সুলতা সেনরায় এম. এ., বি. টি.—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে বড়িশা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষায়িত্রী।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ২৬৫। তমলুক সাহিত্য-পরিষদের একটি সভায় পৌরোহিত্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি দেওয়া হয় তদুত্তরে বর্তমান চিঠি।

পত্র ১৪, পৃষ্ঠা ২৬৫, ছত্র ১। কাল নলিনীও আসিয়াছিলেন। নলিনীরঞ্জন ধর—মোহিতলালের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। কর্মোপলক্ষ্যে তমলুকে থাকার সময় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সহায়তায় মোহিতলালকে তমলুকে আনান সম্ভবপর হয়েছিল।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ২৬৭, ছত্র ৮-১১। 'কপালকুণ্ডলা'র একটি ছাত্র-পাঠ্য সমালোচনা …একখানি বাংলা স্কুলপাঠ্য রীডার লিখিতেও হইতেছে। 'কপালকুণ্ডলা'র ভূমিকা ও প্রয়োজনীয় টীকা মোহিতলাল প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর অনিল ঘোষকে দিয়েছিলেন। বইটি ছাপাও হয়েছিল কিন্তু মোহিতলালের সঙ্গে আর্থিক লেন-দেনের সর্তে গরমিল হওয়ায় বাজারে বইটি বেরোয় নি। 'কাব্যমঞ্জুষা' বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় তিনি এজাতীয় আরও বই লেখার উৎসাহ পান। যে 'রীডারে'র কথা অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে সেটি নাকি বাজারে বেরিয়েছিল, ভাল বিক্রীও হয়েছিল এবং প্রকাশ

করেছিলেন প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। বইটি সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখেছিলেন। আমি বইটি চোখে দেখি নি, খোঁজ করেও পাই নি। ঐ রীডার ছাড়া আর অন্য কোন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ তিনি লেখেন নি।

পত্র ১৫, পৃষ্ঠা ২৬৮, ছত্র ১০। শুনিলাম D. U-তে তোমার একটা চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অক্ষয়কুমার সেনশর্মা ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কিছুদিন বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা (Lecturer) করেছিলেন। তারপর আর্থিক কারণে সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগে ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে ১৯৪৮ পর্যন্ত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পান, তবে প্রারম্ভিক বেতন নিয়ে মতভেদ হওয়ায় ঢাকা কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুণ ঢাকা ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।

পত্র ১৬-১৯, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭৪। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত মোহিতলালের এই তিনটি চিঠি সম্পর্কে প্রবোধবাবু লিখেছেন, "'ছন্দোমীমাংসা' (আশুতোষ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য-রচিত) নামক গবেষণা-গ্রন্থখানা নিয়ে আমাকে বেশ একটু মুশ্‌কিলেই পড়তে হয়েছিল। মোহিতলালের অনুরোধে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বইটির পূর্ব-পরীক্ষকদের রিপোর্ট আনিয়ে নিয়েছিলাম। সেগুলি এবং মূলগ্রন্থের দুই খণ্ড আমি খুব যত্ন নিয়েই বিবেচনা করে দেখি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে পরীক্ষকতার নিয়োগপত্র আসার পূর্ব থেকেই দুই বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যক্তিগত প্রভাব এসে নিরপেক্ষ বিচারের পথকে দুর্গম করে তোলে। এসব কারণে আমি অতুলগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে বইটি সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং সম্ভব হলে দুইজনে একটি যুক্ত-রিপোর্ট দেবার প্রস্তাব করি। তাতে তিনি সম্মত হন বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যেও তিনি বইখানি পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ পান নি। অবশেষে তাঁর জন্য আর অপেক্ষা না করে আমি স্বতন্ত্রভাবেই রিপোর্ট লিখে পাঠাই। আমার রিপোর্ট গবেষকের অনুকূলই হয়েছিল। কিন্তু মোহিতলাল তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন মনে করি না।" এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-চিন্তা' অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৬ পৃষ্ঠা ২৬৮, ছত্র ৫। P. R. studentship। Premchand Roychand studentship। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১-১৯০৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর ঐ টাকার সুদ থেকে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি দিয়ে থাকেন।

পত্র ১৬, পৃষ্ঠা ২৬৯. ছত্র ১। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১)—খ্যাতনামা এ্যাড্‌ভোকেট ও সাহিত্যিক। প্রমথ চৌধুরীর, 'সবুজ পত্রে' প্রবন্ধকার হিসেবে এঁর প্রথম আবির্ভাব। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' 'নদীপথে' 'শিক্ষা ও সভ্যতা' 'সমাজ ও বিবাহ' 'ইতিহাসের মুক্তি' প্রভৃতি এঁর রচিত গ্রন্থ।

পত্র ১৭, পৃষ্ঠা ২৭১, ছত্র ১৬। Wordsworth। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (William Wordsworth : 1770-1850) প্রকৃতির কবি রূপে ইংরেজী সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর সমগ্র কবিতা "Collected Works" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ২৭২, ছত্র ৩। নেতাজীর ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের উপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা থাকার কথা রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোহিতলালকে বলেন। মোহিতলালের ইচ্ছা ছিল "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে দেশবন্ধু সম্পর্কে লিখবেন, কিন্তু তা পূর্ণ হয় নি।

পত্র ১৮, পৃষ্ঠা ২৭২, ছত্র ১০। আপনার মহাকাব্যখানি। মহাকাব্যের নাম "ইম্ফল অভিযান"—অপ্রকাশিত।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ২৭৪, ছত্র ৪। তুমি Radio পত্রিকার ঐ চাকরিটির। 'বেতার-জগৎ'-এর সহ-সম্পাদক পদের জন্য অক্ষয়কুমার সেনশর্মা চেষ্টা করেছিলেন। ১৮. ৬. ৪৬ তারিখের চিঠিতে (২৬৮ পৃঃ ১৫ সংখ্যক চিঠি) রেডিওতে চাকরীর যে প্রসঙ্গ ছিল সেটি দিল্লীতে।

পত্র ২০, পৃষ্ঠা ২৭৫, ছত্র ৯। আমি তোমাকে যে Testimonial দিয়াছি। মোহিতলালের প্রদত্ত Testimonial-এর অনুলিপি নিয়ে দিলাম—

Mohitlal Majumdar Ramna Dacca
Lecturer, Dacca University 30. 5. 1942

I have very great pleasure in certifying that Mr. Akshaya Kumar Sensarma, M. A. was my student in the Bengali Honours and M. A. Classes of this University. He is one of the few scholars of whom their teachers might be justly proud, and I have little hesitation in that even among those, I consider him to be one of the best, in as much as he is not only a scholar of the genuine type, but is also a young man of ideal conduct and character As regards his attainments, I trust, his place both in the Honours and in the M, A. Examination is a sufficient testimonial ; I need add nothing more.

I wish and pray that he may never lack help and encouragement and proper appreciation in the career that he will have to choose (evidently, that of a teacher) to enable him to persue his ideal, as well as to give of his best ; in this he will always have the best blessings of his Guru.

Sd/Mohitlal Mojumdar.

পত্র ২২, পৃষ্ঠা ২৭৬, ছত্র ১০। "জয়তু নেতাজী"র সম্বর্ধনা কিরূপ করিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না। "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থের একটি আলোচনা রমেশবাবু করেছিলেন—উক্ত আলোচনা সাপ্তাহিক 'বাতায়নে' প্রকাশিত হয়। তাঁকে লিখিত ৯. ৮. ৪৭ তারিখের চিঠির (২৫ সংখ্যক চিঠি) প্রথমে মোহিতলাল এই সম্পর্কে লিখেছেন, "আপনি গভীর স্নেহের ও শ্রদ্ধার বশে যা করেছেন তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।"

পত্র ২৩, পৃষ্ঠা ২৭৭, ছত্র ১। প্রবন্ধ ও কবিতা আপনার পছন্দ হইয়াছে। 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'বর্তমান' নামক কবিতা ও 'কপালকুণ্ডলার ভূমিকা'।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ২৭৮, ছত্র ১৭। সুরেশের ওখানে। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্সের সুরেশচন্দ্র দাশ।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ২৭৮, ছত্র ১৮। মথুরের নামে। অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দি—মোহিতলালের ছাত্র।

পত্র ২৪, পৃষ্ঠা ২৭৮, ছত্র ২৩। কালীকিংকর বাবুর ওখানে। কালীকিংকর সেনগুপ্ত—(১৮৯৩) কবি ও চিকিৎসক। গ্রন্থ: সাঁঝের প্রদীপ, মন্দিরের চাবি প্রভৃতি।

পত্র ২৬, পৃষ্ঠা ২৮০, ছত্র ৫। গত ১০. ৯. ৪৭ তারিখে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি। তারিখটি ৯. ৯. ৪৭ হবে। 'দেশ ও সমাজ' অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক চিঠি দেখুন।

পত্র ২৭, পৃষ্ঠা ২৮১, ছত্র ১। 'শনিবারের চিঠি'তে যে অনুবাদ দেখলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গান্ধীবাণী-কণিকা লিখতে সুরু করেন। ইহা গ্রন্থাকারে বেরোয় আশ্বিন ১৩৫৫।

পত্র ২৮, পৃষ্ঠা ২৮১, ছত্র ২। আপনার কবিতাটি কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে'র কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'স্বরাজ' নামে এক ছড়া-কবিতা প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-চিন্তা অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ ৩৪৫) দেখুন।

পত্র ৩২, পৃষ্ঠা ২৮২, ছত্র ১। তুমি 'ভগ্নদূতে' আছ তা জানি। শিশিরকুমার বসু (১৮৯৬)-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী পত্রিকার 'সাহিত্যের আসর' ও 'রঙ্গজগৎ' এই দুটি আলোচনা-বিভাগে 'কবি' ও 'রঙ্গরাজ' ছদ্মনামে লিখতেন।

পত্র ৪০, পৃষ্ঠা ২৮৯, ছত্র ১। এবারকার 'ভগ্নদূতে' তোমার লেখাটি খুব ভাল হয়েছে। 'ভগ্নদূতে'-র ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় স্বাধীনতা-বার্ষিকী সংখ্যায় (২৮শ সংখ্যা ১২ই আগষ্ট ১৯৪৯) "স্বাধীনতার স্বরূপ" নামে বীরেন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধ।

পত্র ৪১, পৃষ্ঠা ২৯০, ছত্র ১। 'নেতাজী'র ২য় সংস্করণ ছাপার ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থ জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৩)। দ্বিতীয় সংস্করণ কমলা বুক ডিপো থেকে বেরোয় (বৈশাখ ১৩৫৭)।

পত্র ৪১, পৃষ্ঠা ২৯০, ছত্র ২৪। তোমার বাসার ঠিকানা কি? এতকাল মোহিতলাল চিঠিপত্র দিতেন 'ভগ্নদূতে'র ঠিকানায় (১৯৮/১০ বিধান সরণি)।

সম্পাদকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েই সম্ভবতঃ ঐ ঠিকানায় চিঠি দিতে চান নি, তাই বাসার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন।

পত্র ৪৩, পৃষ্ঠা ২৯১, ছত্র ১। শ্রীমান কুমুদকে। কুমুদনাথ দত্ত।

পত্র ৪৬, পৃষ্ঠা ২৯৩, ছত্র ৩। 'ভগ্নদূতে' রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ। ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। ঐ বছর পুরস্কার পান ডঃ নীহাররঞ্জন রায় "বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব"-এর জন্য এবং সতীনাথ ভাদুড়ী "জাগরী" উপন্যাসের জন্য। পুরস্কার সম্বন্ধে কী নীতি নির্ধারিত হয়েছিল এবং কোন্ গুণের জন্য "জাগরী" পুরস্কার পেল সেই সম্পর্কেই লেখকের অভিযোগ ছিল।

পত্র ৪৭, পৃষ্ঠা ২৯৪, ছত্র ৪। একখানি রচনাপুস্তক। রচনাগ্রন্থের নাম "বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি" (১৯৫১ : ১৩৫৮)।

পত্র ৪৯, পৃষ্ঠা ২৯৫, ছত্র ১। দীনেশবাবু বলিয়াছিলেন। কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় —এঁকে লিখিত মোহিতলালের চিঠি বর্তমান সংকলনে সংকলিত হয়েছে। (পৃঃ ১৪৩, ২৪২, ২৪৩, ২৯৫, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০৪, ৩০৬)।

পত্র ৪৯, পৃষ্ঠা ২৯৫, ছত্র ৩। তিনি যেন ঐ দুইখানি খাতাই লইয়া আসেন। দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত "পাকিস্থানের পাঁচালী" ও "রামরাজ্য" নামক দুটি দীর্ঘ কবিতার পাণ্ডুলিপির কথা বলা হয়েছে। এই দুটি কবিতা মোহিতলালের অতি প্রিয় ছিল—তিনি একাই উপভোগ করতেন না, সাহিত্যবৈঠক আহ্বান করে পাঁচজনে মিলিত হয়ে উপভোগ করতেন। তাঁর এই ভালো-লাগার কথা বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে লিখিত ৫১ (পৃঃ ২৯৬) ও ৫৩ (পৃঃ ২৯৭) সংখ্যক পত্রেও পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে ৫১ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দেখুন।

পত্র ৫০, পৃষ্ঠা ২৯৫, ছত্র ১। খাতাপত্র লইয়া আসিতে ভুলিবেন না। মোহিতলাল বড়িশাস্থ বাসভবনে প্রায়ই সাহিত্যবৈঠক আহ্বান করতেন। এই বৈঠকে নিজের পরিচিত জনকে আমন্ত্রণ জানাতেন। শক্তিশালী কবির সন্ধান পেলে তাঁর কবিতা-পাঠই সারাক্ষণ চলত। 'বৈঠকে কবিতা পাঠ করার জন্য' কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বরচিত কবিতার খাতা আনার কথা বলা হয়েছে।

পত্র ৫১, পৃষ্ঠা ২৯৬, ছত্র ৬। একজন শক্তিশালী কবির সন্ধান পাইয়াছি। শক্তিশালী কবির নাম দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর "পাকিস্থানের পাঁচালী" ও

"রামরাজ্য" নামে দুটি দীর্ঘ কবিতা মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল উক্ত দুটি কবিতার প্রাসঙ্গিক পংক্তি কিছু কিছু এখানে দিলাম—

: বলতে পারো, আরো হাজার বছর পরে
কিম্বা তারও আগে
ধরণীতে জন্ম নেবেন অতি-মানুষেরা—
এই পৃথিবী স্বর্গ হবে আবার যাঁদের স্পর্শে,
নিত্যকালের মানবতাই আবার হবে জয়ী,
কিন্তু বন্ধু, আমরা তখন কই ?
যা হয় হবে একটা কিছু, যার হোক্ হবে জয়,
কিন্তু বন্ধু, সে সান্ত্বনা আমাদের তো নয়—
আমরা তো আজ হারিয়ে গেলাম,
জীর্ণ ভেলা ভাসিয়ে দিলাম ছেঁড়া শাড়ীর পালে—
এ ভেলা কি পৌঁছিবে সেই অনাগতের কালে ?

. ...

হঠাৎ যেন বাঁশতলার ঐ ঘুমেল অন্ধকারে
মিলিয়ে গেল তরঙ্গিণীর স্বর···
ছায়ায় ছায়ায় বাউল হাওয়ায় পাতার মর্মর।
খোলা মাঠে হাওয়ায় দোলা
আঁধারেরও দুয়ার খোলা,
মন যেন কোন্ মাঝিহারা অথই গাঙের নাও,
মাস্তুলে তার ভাবনা-রাঙা পাল উঠেছে ফুলে—
স্বপ্ন দেখে সোনা মিঞা
হঠাৎ যেন হাজির সে কোন্ স্বপ্ন-পুরীর কূলে।
চোখ ভরা তার মায়ার স্বপন, খুশীর ঝিলিমিলি,
মুখভরা তার কাঁচাগুয়ায় সাজা পানের খিলি ;
উপচে পড়া ঠোঁটের রসে
কচিগুয়ার খুস্নি লাগায় ঘোর—
সেদিন ছিল সোনামিঞার প্রথম কৈশোর।
বুড়ী নানীর বুকের বেড়ী সন্ত হয়ে পার
আহা, সেদিন বড় হবার প্রথম অধিকার !

প্রথম বন্ধু, প্রথম আলাপ, প্রথম দোস্তালি
মাতামাতির নেশায় রাঙা মনের মিতালি—
খেলাধূলায়, মেলামেশায়,
শিশুমনের লীলায় ভরা কত মধুর প্রীতি,
দিল্‌খুশেতে রঙীন কত ভালবাসার স্মৃতি
বায়োস্কোপের ছবির মত ভাসে চোখের তারায়
দেখে দেখে বুক ভেসে যায় অশ্রুজলের ধারায়—
এই সেদিনও ছিলো যে সব : আজ কি করে হারায় ?
এমন সোনার জমানাকে জবাই করলো কে ?
কোন্ হারামী বদ্-তমিজে ?
বলতে গিয়ে বেরোয় না বোল,
সোনা মিঞা তাকিয়ে থাকে বোবায়-ধরা চোখে।

আবার যেন পেছন থেকে চেনা-চেনা কার দুখানি
নরম হাতের ডগায়
হঠাৎ এসে সোনা মিঞার আঙুল ছুঁয়ে যায়—
'আবার হবে সোনা মিঞা, আবার হবে
আবার দেশে সত্যকালের জন্ম হবে,
মানুষ আবার মানুষ হবে
জালিমরা সব নিপাত যাবে
তরঙ্গিনী, বকুলবালা আবার আসবে ফিরে
আজকে না হয় হারিয়ে গেলাম অশ্রুমতীর তীরে।
কিসের দুখ্যু, কিসের ভয় ?
বলছি আমি, হবে জয়
দেখছোনা এই লক্ষ নারী—মহাসতীর অংশ আমরা
বুকের রক্তে ধুইয়া গেলাম পাপ !
নতুন কইরা সূর্য্যি উঠবো,
কইয়া গেলাম সত্য হইবো,
বুকে তুইযা লইয়া গেলাম সকল অভিশাপ।

কাইন্দ না আর সোনা ভাই,
হাসিমুখে বিদায় দেও আজ, আমরা যাই।'
শিরশিরানি কেমন একটি গা-ঝিম্‌ঝিম্‌ দীর্ঘশ্বাসে
সোনা মিঞার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে।
মিথ্যা মিথ্যা আশার ফাঁকি—
আর কি সেদিন আইব নাকি ?
পোড়া মাটির শিলায় কি আর প্রাণের পলি পড়ে ?
আর কোনোদিন ফুল-ফসলে ভরে ?

(পাকিস্তানের পাঁচালী)

: বুকে বুকে ক্ষয়ের বাসা
কাশলে ঝরে দু'কশ বেয়ে কলজে-পচা খুন—
গোটা কয়েক মরা গরু, হাড়-প্যাকাটি পাঁঠা,
লিকলিকে লোক, জীর্ণ শিশু, পাঁজর কাঁপে নিঃশ্বাসে,
সারা বছর গরুর মত
লাঙল টেনে পায় না খুদ আর নুন,
পাঁচ দালালে লুঠ করে খায় শেষের কণাটিও।
... ...
আইন গেঁথে গেঁথে মাইন সাজাও
খাদ্য ভেজালে নর-শিকারীর
প্রাণ-মৃগয়ার বাজনা বাজাও—
ভুখা রেখে দেশ তৈরী আকালে
কালো গুদামের অন্ধ পাতালে
ধন-লক্ষ্মীর জারজপুত্র
মুনাফাখোরের কুশীদরক্তে
তাজা লাল-কন্যা নিত্য জোগাও।
... ...
ঘটা করে বাজিয়ে বিষাণ
চোরের নায়ে সাধুর নিশান—

দাদারা সব সদলবলে
ভারত মহাসাগর জলে
ফেলছে নতুন সেতুবাঁধার টোপ।
গিলতে হয়তো গেলো, না হয়
চুপটি করে থাকো সবাই, মাথা তুললেই কোপ।
বাইরে বসে মহামান্য 'ভেটিকান'-এর পোপ
খৃষ্টবাদের রায়গুণাকর
ঘটা করে কান মলছে 'গীতার'
মরা যীশুর নিতম্বেতে পরায় নতুন ইজার।
রোম পুড়ে যায় অগ্নিদাহে
সিংহাসনে 'নীরো' বাজায় গিটার,
কে জানে সেই লাল আগুনের উঠলো কত মিটার?

(রামরাজ্য, পঞ্চম অধ্যায়)

পত্র ৫১, পৃষ্ঠা ২৯৬, ছত্র ৯। "জয়তু নেতাজী" ও "গল্প-সঞ্চয়ন": দুই ই বাহির হইয়াছে …দুজনকে দুইখানি দিব। কমলা বুক ডিপো থেকে "জয়তু নেতাজী"র দ্বিতীয় সংস্করণ ও "বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন" (বৈশাখ ১৩৫৭) প্রকাশিত হয়। কুমুদনাথ দত্তকে "জয়তু নেতাজী" ও বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীকে "বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন" মোহিতলাল উপহার দেন। উপহারের তারিখ ৩০ শে শ্রাবণ ১৩৫৭।

পত্র ৫৪, পৃষ্ঠা ২৯৮, ছত্র ৩। পত্রটি যথাস্থানে দেখাইলেই। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস "সাহিত্য-কথা" গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক (১৩৪৫)।

পত্র ৬০, পৃষ্ঠা ৩০১, ছত্র ৪। এবার উহারা মরিয়া হইয়াছে। "জয়তু নেতাজী" গ্রন্থটি কংগ্রেসী সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে এরকম সংবাদ মোহিতলালের কানে এসেছিল। গান্ধীজি সম্পর্কে অনেক বিরূপ সমালোচনা ছিল বলে সরকার তাঁকে সুনজরে দেখে নি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২. ৯. ৫১ তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন, "গান্ধী ও গান্ধী-কংগ্রেসের স্বরূপ আমি পূর্ণ উদ্ঘাটন করিয়াছি। পরিশিষ্ট ভাগে তাহা আছে।"

পত্র ৬৭, পৃষ্ঠা ৩০৫, ছত্র ১। তুমি নিশ্চয়ই ঐ দুই সংখ্যা যথাস্থানে পাঠাইয়াছ। একবার কথায় কথায় মোহিতলাল কবিশেখর কালিদাস রায়কে

বলেছিলেন, "আমাকে আর বাণ মেরে কী হবে? আমি তো ভীষ্মের শরশয্যায় শুয়ে আছি।" অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য মোহিতলালের অনেক শত্রু ছিল। প্রমথনাথ বিশী তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর সঙ্গে মোহিতলালের হৃদ্যতা ছিল—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভাদ্র ও কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় যথাক্রমে "গণ-সাহিত্য", "জার্নালিজম্ ও সাহিত্য" নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। "সাহিত্য-বিতান" গ্রন্থে তাঁর রচনা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন—পণ্ডিত-ভাবুক, সমালোচক ও কবি বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি আছে, সেই খ্যাতির বিস্তার কামনা করিয়া তিনি নাটক ও উপন্যাস-রচনাতেও সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নাই বলিয়া আমি এই জি. বি. এস.-শিষ্য আধুনিক একলব্যের শরসন্ধানচাতুরীর কথা কিছুই বলিতে পারিবনা; তবে, আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র রস—Satire, এবং Satire-সৃষ্টিই এযুগের শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম—ইহাই যাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম-মত, তাঁহার উপন্যাস-গুলি যদি তাহারই আনুষ্ঠানিক নিদর্শন হয়, তবে বলিতে বাধ্য হইব যে তিনি তাহাতে সিদ্ধকার্য হইতে পারেন নাই; কারণ সেগুলির মধ্যে প্লটের যে নিরঙ্কুশ গতি আছে, এবং চরিত্র-গুলিতে যে স্বপ্ন-সুলভ কাল্পনিকতা আছে—তাহার কোনটাতেই Satire-এর প্রেরণা নাই—কল্পধেনুর ভাবুকতা, সূক্ষ্ম-চিন্তা ও বাহিরের উপরে মনের রং ফলাইয়া সার্থক ডায়েরী-রচনার কৃতিত্ব আছে। তথাপি আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন শক্তিমান লেখক। (২য় সং পৃ ৪০৯-৪১০)। মোহিতলাল বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশায় এত কাতর ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে শেষের দিকে তাঁর সমস্ত চিন্তা বাংলাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এজন্যে বাংলা ও বাঙালীর বিরুদ্ধ সমালোচনা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে এই নিয়ে মতদ্বৈধ হয়। "বাংলা ও বাঙালী" (১৩৫৮) গ্রন্থে মোহিতলাল প্রমথ বিশীর অভিমতকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, "একদা ঐ সম্প্রদায়ের এক মহাবীর বাঙালী আমাকে যাহা বলিয়াছিল. তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ না থাকিলেও তেমন কথা আমি পূর্বে কাহারও মুখে শুনি নাই। বিস্মিত

হইবার কারণ ছিল না এজন্য যে, তিনি নিদারুণ গান্ধী-ভক্ত—অতএব হিন্দুস্থানীর প্রেমে 'দেওয়ানা' হওয়া তাঁহার কর্তব্য। তার উপর তিনি একজন লেখনী-লম্পট সাহিত্যিক, নামে ও বি-নামে সাহিত্যের সব রকম মুখভঙ্গি করিতে ওস্তাদ—এমন নির্ভীক কির্তাভজাও দুর্লভ। একালে এ-হেন মহাপুরুষের মুখে কোন কথাই বাধে না, বরং আকার যত ছোট হয়, আওয়াজ ততই বড় হইয়া থাকে। একদিন সেই 'বিশ্বকর্মা' পুরুষটি আমার কথার প্রতিবাদে সহসা সত্যাগ্রহদীপ্ত-লোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—এদেশ ও এই জাতি এমনই জঘন্য যে জাতটার তো কথাই নাই, এদেশের মাটি পর্যন্ত তু'লিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে এবং বিহারের মাটি দ্বারা পুনরায় ভরাট করিয়া লইতে পারিলে, তবে এদেশ মানুষের বাসযোগ্য হইতে পারিবে। বিহারভুক্ত বাংলায় বাঙালীদের উপরে বিহারীরা যে উৎপীড়ন করিতেছে তাহার সমর্থন করিয়া এই ধর্মপুত্রটি বাঙালীর বিরুদ্ধে বহু কটূক্তি করিয়াছে। (নিবেদন ১লা শ্রাবণ ১৩৫৮)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষের সম্পাদনায় 'কথা-সাহিত্য' নামে এক সাময়িক পত্রিকায় প্রমথনাথ বিশী মোহিতলালকে কটাক্ষ করে লেখা শুরু করলেন। পত্রিকার আড্ডায় মোহিতলালের ভীষ্মের শরশয্যার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাঁর কথাটাকে অবলম্বন করেই প্রমথনাথ একটি ধাঁধার মাধ্যমে মোহিতলালকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করেন—

: সপ্ত সন্তানের পিতা ভীষ্ম যদি, তবে
বিচিত্রবীর্যের বল কত পুত্র হবে?

মোহিতলালের সাতপুত্র, তাই এই কটাক্ষ। তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন—ভাবতে পারেন নি যে তাঁকে অশ্লীলভাবে আক্রমণ করা হবে। বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর হয়ে 'ভগ্নদূত'-এর আসরে পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন একটি ধাঁধার মারফৎ—

: তেরো ছেলের পিতা হয়ে মহর্ষি হন যদি,
বলতে পারে ক'টায় ব্রহ্ম-ঋষির গদি।

পত্র ৬৭, পৃষ্ঠা ৩০৫, ছত্র ৪। 'ভগ্নদূতে'র রজত-জয়ন্তী সংখ্যা। এই সংখ্যার প্রথম প্রকাশকাল থেকে পঁচিশ বছর ধরে যেসব প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের লেখা 'ভগ্নদূত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকের একটি করে লেখা সংকলন করে রজত-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

পত্র ৬৭, পৃষ্ঠা ৩০৫, ছত্র ৬ গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটিকে। ধনী ব্যবসায়ী সলিলকুমার বল্লভ।

পত্র ৬৭, পৃষ্ঠা ৩০৫, ছত্র ১০। আমার 'শ্রীকান্ত'কে লইয়া মর্কট নিজের নাক-কান ছিঁড়িয়াছে। "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" (জন্মাষ্টমী ১৩৫৭) গ্রন্থ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন। প্রমথনাথ বিশী (১৯০১—) লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, সমালোচক, নাট্যকার ও কথা-সাহিত্যিক। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ, রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ, মৌচাকে ঢিল, জোড়াদীঘির উদয়াস্ত, কেরী-সাহেবের মুন্সী প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ।

পত্র ৬৯, পৃষ্ঠা ৩০৬, ছত্র ১। তোমাকে যে কাজটির ভার দিয়াছিলাম। 'বঙ্গভারতী' পত্রিকায় একটি বিশেষ বিভাগে সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে লঘুসুরের কিছু সমালোচনামূলক মন্তব্য লেখার জন্য মোহিতলাল তাঁকে বলেছিলেন। পরে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

—আজহারউদ্দীন খান

পত্র-প্রাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। জন্ম: ১৯. ৯. ১৯০৩ (নোয়াখালী, পূর্ববঙ্গ)। শিক্ষা: এম. এ., এল-এল. বি.। পেশা: জজিয়তী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সাহিত্যচর্চা। 'কল্লোল' পত্রিকা মারফৎ মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়। গ্রন্থ: বেদে, চাষাভূষা, কাঠ-খড়-কেরোসিন, প্রথম কদমফুল, শতগল্প, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১-৪), কল্লোলযুগ, অমাবস্যা প্রভৃতি। ঠিকানা: ২৩ রজনী সেন রোড, কলকাতা-২৬।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম: ১৪.২. ১৯১৬ (আসানসোল)। শিক্ষা: বি. এ.। পেশা: সাংবাদিকতা। ১৯৩৪-এ বনফুল 'সাহিত্যসমিতি'র সভায় মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়। গ্রন্থ: বুনো পশু, নারীশিক্ষা-বিধান, অহল্যা, নতুন কবিতা। ঠিকানা: ব্লক ৪, ফ্ল্যাট ৭, গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, ১৩১ নেতাজী সুভাষ বসু রোড, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০।

অক্ষয়কুমার সেনশর্মা। জন্ম: ১৯১৯ (ঢাকা, পূর্ববঙ্গ)। শিক্ষা: এম. এ.। পেশা: বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গানুবাদক; সাময়িক পত্র-পত্রিকার লেখক। ১৯৩৭-৩৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের ছাত্র। ঠিকানা: ৯সি মোহনলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৪।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কপিঞ্জল। জন্ম: ১. ৩. ১৮৮২ (কোগ্রাম, বর্ধমান)। শিক্ষা: বি. এ.। পেশা: মাথরুণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকতা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), কাব্যচর্চা। অন্যতম শক্তিশালী কবিরূপেই মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়। গ্রন্থ: শতদল, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কাব্য-সম্ভার প্রভৃতি; ঠিকানা: কোগ্রাম, নূতন হাট, বর্ধমান।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। শঙ্কর উপাধ্যায়, বইবাহিক, বাসবদত্তা, শ্রীপ্রকাশ, ভীমভাদুড়ী। জন্ম: অক্টোবর ১৯২১ (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)। মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঢাকায় নীলক্ষেতের বাড়ীতে, পরে বড়িশায় যোগাযোগ। গ্রন্থ: মহালয়, অগ্নিসম্ভব, অ্যালবার্ট হল, ইস্পাতের স্বাক্ষর, ওয়ার এণ্ড পীস্, আনা কারেনিনা, দুচোখের দেখা, গৃহস্থবধূর ডায়েরী প্রভৃতি। ঠিকানা: ১৩ পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭।

জীবনকালী রায়। দ্বিজদাস শর্মা। জন্ম : জানুয়ারী ১৮৮৭ (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ) ; মৃত্যু : ৩০. ৮. ১৯৬২। পেশা : কবিরাজী। কলকাতার ৯০ আমর্হাস্ট স্ট্রীটের কবিরাজী দোকানে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং উহা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল ; বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক।

জ্যোতির্ময়ী দেবী। জন্ম : ২৩. ১. ১৮৯৪ (জয়পুর, রাজস্থান)। 'রাজ-যোটক' গ্রন্থের কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে মোহিতলালের সঙ্গে পত্রালাপ ; সেকালের কড়া পর্দাপ্রথার ফলে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। গ্রন্থ : ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, ব্যাঙ মাষ্টারের মা, সময় ও সুকৃতি প্রভৃতি। ঠিকানা : ২জি, কার্তিক বোস লেন ; কলকাতা-৬।

তারাচরণ বসু। জন্ম : ১৯১৯ ; মৃত্যু : নভেম্বর ১৯৬৩। শিক্ষা : এম. এ. (সংস্কৃত ও বাংলা), পঞ্চতীর্থ, কাব্যরত্ন, বিনয়-বিশারদ। পেশা : প্রথমে বড়িশা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পরে (১৯৪৯) বড়িশা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা। অনুরাগী পাঠক হিসাবেই মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য। গ্রন্থ : মোহিতলালের স্মর-গরল—কবি ও কাব্য।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীসঞ্জয়। জন্ম : ১৯১০ (পোয়ালডিহা, ঢাকা)। পেশা : সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা। 'গোলটেবিল' নাটক লিখে আনন্দবাজারে ১৮ বছরের পাকা চাকরী থেকে বিতাড়িত। 'বাস্তুভিটা' নাটকের মাধ্যমেই মোহিতলালের সঙ্গে আলাপ। গ্রন্থ : রণ ও রাষ্ট্র, মহাযুদ্ধে সোভিয়েট, অন্তরাল, মশাল, তরঙ্গ, কেউ দায়ী নয়, একাংক-সপ্তক, মাটি ও মানুষ প্রভৃতি। ঠিকানা : দেশবন্ধুনগর, চব্বিশ পরগণা।

দিলীপকুমার রায়। জন্ম : ২২. ১. ১৮৯৭ (কলকাতা)। শিক্ষা : বি. এস্-সি. (অনার্স), কলকাতা, ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা : সুরস্রষ্টা গায়ক এবং গ্রন্থকার। কবিতার মুগ্ধ পাঠক হিসাবে মোহিতলালের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ; গ্রন্থ : অনামী, সাঙ্গিতিকী, ভূস্বর্গ চঞ্চল, দোলা, দেশে দেশে চলি উড়ে, তীর্থঙ্কর, অঘটন আজো ঘটে, স্মৃতিচারণ, Among the Great, Eyes of Light, যুগর্ষি অরবিন্দ, আমার বন্ধু সুভাষ প্রভৃতি। ঠিকানা : হরিকৃষ্ণ মন্দির, গণেশখণ্ড রোড, পুণা-৫।

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম : ২৪. ৮. ১৯০৮ (ইছাপুরা, বিক্রমপুর ; ঢাকা)। শিক্ষা : বি. এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা : ইস্টার্ন রেলের করণিক, বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত। মোহিতলালের বাগনানে থাকাকালীন আলাপ, পরে

বড়িশায় ঘনিষ্ঠতা। গ্রন্থ: তেইশে জানুয়ারী, কাগজের নৌকা, জাদুঘর। ঠিকানা: ১১/৩১, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জন্ম: ১৯১৫ (চট্টগ্রাম)। শিক্ষা: এম. এ.। পেশা: বিভিন্ন সরকারী কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা। এম. এ. পড়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের ছাত্র। গ্রন্থ: আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য ও শিল্পলোক, মোহিতলালের কাব্য-পরিক্রমা, রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য, দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ)। ঠিকানা: বি ১৫/৫৮ লেক প্লেস, কল্যাণী, নদীয়া।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্ম: ৯. ৪. ১৯০৫ (বাটিকামারি, ফরিদপুর: পূর্ববঙ্গ)। শিক্ষা: এম. এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা: খুলনা, দৌলতপুর কলেজে বাংলার অধ্যাপনা, বর্তমানে সেণ্ট জেভিয়ার্'স কলেজে বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় 'কালি কলম'-এ লেখার সময় মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। গ্রন্থ: কুটিরের গান, নিশান নাও, সাহিত্য-প্রবাহ, শীত্-রাত্রি, ইংরেজী সাহিত্যের ধারা; ঠিকানা: ১২৯ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯।

পরিমল গোস্বামী। এককলমী। জন্ম: ১৮৯৯ (রতনদীয়া, ফরিদপুর)। শিক্ষা: এম. এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; পেশা: সম্পাদক 'যুগান্তর'-সাময়িকী, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। 'শনিচক্রে' মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম আলাপ। গ্রন্থ: ঘুঘু, ট্রামের সেই লোকটি, মারকে লেঙ্গে, শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প, সপ্ত-পঞ্চ, স্মৃতি-চিত্রণ, দ্বিতীয়-স্মৃতি প্রভৃতি।

পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী। জন্ম: ১৯০৯ (পাটগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা)। শিক্ষা: এম. এ. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা: খুলনা গার্লস কলেজের বাংলার অধ্যাপক, পরে (১৯৪৮) বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা, বর্তমানে উক্ত কলেজের নৈশ শাখার বাংলা বিভাগের প্রধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় ছাত্র হিসাবে মোহিতলালের সংস্পর্শলাভ ও পরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক; ঠিকানা: ৪সি, স্কট লেন, কলকাতা-৯।

প্রবোধচন্দ্র সেন। জন্ম: ২৭. ৪. ১৮৯৭ (ত্রিপুরা)। শিক্ষা: এম. এ. (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা: খুলনা দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা (১৯৩২-৪২), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৪২-৬২), অতঃপর বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ (১৯৬২-৬৫); বর্তমানে

অবসরপ্রাপ্ত। মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় কবি নজরুল ইসলামের বন্ধুত্ব-সূত্রে, পরে ছন্দ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচয় গভীর হয়। গ্রন্থ: ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ধর্মবিজয়ী অশোক, বাঙলার ইতিহাস-সাধনা, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি, ছন্দ-পরিক্রমা প্রভৃতি। ঠিকানা: 'রুচিরা,' পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুল। জন্ম: ১৯ ৭. ১৮৯৯, (মনিহারি, পূর্ণিয়া, বিহার)। শিক্ষা: এম. বি. বি. এস. (পাটনা মেডিক্যাল কলেজ)। পেশা: ডাক্তারী। 'শনিবারের চিঠি'র আসরে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম আলাপ, পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত; কিন্তু অবাঙালী ও অহিন্দু সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ মতামতের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ। গ্রন্থ: বৈতরণী-তীরে, রাত্রি, মৃগয়া, জঙ্গম, স্থাবর, বনফুলের ছোটগল্প, হাটে-বাজারে, অগ্নীশ্বর, শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর, শিক্ষার ভিত্তি, বনফুলের কবিতা, রবীন্দ্র-স্মৃতি প্রভৃতি। ঠিকানা: রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ফ্ল্যাট নং ৩, পি ১৯৬. সি. আই. টি স্কীম, কলকাতা-৫৪।

বঙ্কুবিহারী মাইতি। পরিচয়-প্রকাশে অনিচ্ছুক।

বিনায়ক সান্যাল। জন্ম: ১৮৯৭, (শান্তিপুর, নদীয়া)। শিক্ষা: এম. এ. (ইংরাজী ও বাংলা) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা; মৌলানা আজাদ কলেজ, পরে অধ্যক্ষ শান্তিপুর কলেজ, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে" 'দুরাশা' শীর্ষক কবিতা প্রেরণের সূত্রেই মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, পরে "সাহিত্য-সংগমে" গ্রন্থে 'কবি মোহিতলাল' নামক প্রবন্ধ প্রকাশের পর থেকেই সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত। গ্রন্থ: সাহিত্য-সংগমে, রবিতীর্থে, রূপরেখা, ঝিনুক নিয়ে খেলা। ঠিকানা: ৮৬।১। পি-৬, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জন্ম: জুন ১৮৯৬ (পাণ্ডুলী, দ্বারভাঙ্গা, বিহার)। শিক্ষা: বি. এ. (কলকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা: দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সচিব, 'ইণ্ডিয়ান নেশন' দৈনিক পত্রের কর্মাধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধানশিক্ষক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত; সাহিত্য-চর্চা। 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সম্প্রীতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত। গ্রন্থ: রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ, নীলাঙ্গুরীয়, স্বর্গাদপি গরীয়সী, কাঞ্চনমূল্য, দুয়ার হতে অদূরে, পঙ্কপল্লব, বরযাত্রী, সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার প্রভৃতি। ঠিকানা: কাঁঠালবাড়ী, দ্বারভাঙ্গা, বিহার।

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী। জন্ম : ২৮. ১২. ১৯১৩, (চিথোলিয়া, ময়মনসিংহ, পূর্ববঙ্গ)। শিক্ষা : এম. এ. পর্যন্ত (ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা : শিক্ষকতা, করণিক, অভিনয়, স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই লেখা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পড়ার সময় মোহিতলালের ছাত্র। গ্রন্থ : আজ অভিনয় বন্ধ, গান্ধীহত্যার কাহিনী, মুক্তি (শিশু নাটক)। ঠিকানা : ৮ডি জয় মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৫।

ভবতোষ দত্ত। জন্ম ১৯২৬ (ঢাকা)। শিক্ষা : এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি. লিট. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা। ১৯৪৩ সালে বি. এ. পড়ার সময় মোহিতলালের সান্নিধ্যলাভ এবং স্নেহধন্য ছাত্র। গ্রন্থ : ঈশ্বরচন্দ্র-গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যবাণী, বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব। ঠিকানা : ২০/১/৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯।

মাণিকচন্দ্র দাস। জন্ম : ২৯. ৯. ১৯২৫ (শ্রীরামপুর, হুগলী)। শিক্ষা : এম. এ., বি টি, ডিপ. ই., এল. টি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা : প্রধানশিক্ষকতা। ছাত্রজীবনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে মোহিতলালের সমালোচনা-গ্রন্থ পান—এই সূত্রে মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়। ঠিকানা : ৩৪২ জি. টি. রোড, মাহেশ, পোঃ রিষড়া, হুগলী।

মুরলীধর বসু। জন্ম : ৫. ৯. ১৮৯৭ ; মৃত্যু : ২৮. ১২. ১৯৬০। শিক্ষা : এম. এ. (ইতিহাস) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা : শিক্ষকতা (১৯২২-১৯৪৫) মিত্র ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর, কলকাতা। সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা কালি-কলম, সংহতি, তরুণের স্বপ্ন। 'কালি-কলম' সম্পাদনার সময় মোহিতলালের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। জন্ম : ২৬. ৬. ১৮৮৭ (পাতিলপাড়া, বর্ধমান) ; মৃত্যু : ১৭. ৯. ১৯৫৪ খড়্গপুর। শিক্ষা : বি. ই. (বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ)। পেশা : বাস্তুকার। শক্তিশালী কবি ও সমালোচক রূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। গ্রন্থ : মরুমায়া, সায়ম্, অনুপূর্বা, কাব্য-সম্ভার, কাব্য-পরিমিতি প্রভৃতি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী। জন্ম ২৭. ১১. ১৮৭৮ (যমশেরপুর, নদীয়া)। মৃত্যু : ১. ২. ১৯৪৮ কলকাতা। শিক্ষা : বি. এ. প্রেসিডেন্সি ও ডাফ্ কলেজ। পেশা : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চাকরী ও সাহিত্য-চর্চা। গ্রন্থ : লেখা, রেখা, নাগকেশর, মহাভারতী, কাব্য-মালঞ্চ, রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য প্রভৃতি।

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : ১৮৯৮ (ইছাপুরা, বিক্রমপুর, ঢাকা)। শিক্ষা : বি. এ. (বিদ্যাসাগর ও সিটি কলেজ)। পেশা : বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের চাকরী , বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। ১৯৪০ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়, বাগনান ও বড়িশায় বসবাস-কালে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। ঠিকানা : ৩৮, প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড, কলকাতা-৩৩।

রমেশচন্দ্র সেন। জন্ম ২২. ৭. ১৮৯৪ (কোটালিপাড়া, ফরিদপুর, পূর্ববঙ্গ) ; মৃত্যু ১. ৬. ১৯৬২ (কলকাতা)। শিক্ষা : বি এ. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা : কবিরাজী ও সাহিত্যচর্চা। লেখকের রচিত উপন্যাস ও 'সাহিত্য-সেবক সমিতি'র (প্রতিষ্ঠাতা লেখক স্বয়ং) মাধ্যমে মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়, পরে ঐ সমিতির তিন বছরের (১৯৪৫-৪৭) জন্য মোহিতলালকে সভাপতিত্বে বরণ। গ্রন্থ : শতাব্দী, কুরপালা, গৌরীগ্রাম, মালঙ্গীর কথা, পূব থেকে পশ্চিমে, কাঁজল, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জন্ম : ১৮৮৫ (কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ)। মৃত্যু : ২৫.৮.১৯৫৯। গ্রন্থ : নির্মাল্য, মন্দাকিনী, পদ্মরাগ, বাংলার বাঁশী প্রভৃতি।

শ্যামসুন্দর মাইতি। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। জন্ম : ২৮. ১১. ১৮৮০ (পাটগ্রাম, মাণিকগঞ্জ ঢাকা) ; মৃত্যু : ১৯৫২ কলকাতা। শিক্ষা : বি. এ.। পেশা : শিক্ষকতা, ফরিদপুর জিলা স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক, ১৯১৬ কলকাতার হিন্দুস্কুলে প্রধানশিক্ষকতা। হিন্দুস্কুলের কার্যকালে মোহিতলালের সংস্পর্শ লাভ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে মোহিতলালের সঙ্গে আলোচনা ও পত্রালাপ ; বেনামে সাময়িক পত্রাদিতে রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত রচনা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী। জন্ম ২০,৮. ১৯০১ (মলিহাটি, মুর্শিদাবাদ)। শিক্ষা : বি. এ. ন্যাশনাল কলেজ। পেশা : সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা ; স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান। সম্ভবতঃ ১৯৩০ সালে 'নবশক্তি'র সম্পাদক থাকাকালে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা। গ্রন্থ : ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা, শতাব্দীর অভিশাপ, কালোঘোড়া, কৃশানু, অনুষ্টুপছন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি ; ঠিকানা : ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬।

সত্যেন জানা। জন্ম : ১.৯ ১৯০৮ (কাঁথি, মেদিনীপুর)। শিক্ষা : বি. এ. বি. এল. (শান্তিনিকেতন, আশুতোষ কলেজ, রিপন ল কলেজ)। পেশা : ওকালতী। তমলুক সাহিত্য পরিষদের সাহিত্যসভায় মোহিতলালের পৌরোহিত্য করার সূত্রে প্রথম আলাপ, পরে নবপর্যায় "বঙ্গ-দর্শনে" 'বউ কথা কও' শীর্ষক কবিতা প্রকাশের পর আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত। গ্রন্থ : সাগরিকা, রবি-তর্পণ, পনেরো আগস্ট প্রভৃতি। ঠিকানা : তমলুক, মেদিনীপুর।

সত্যেন্দ্রনাথ সেন। পরিচয় জানা যায় নি।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : ১৬.১২.১৮৯৮ (লোকনাথপুর, নদীয়া); মৃত্যু : ৩.৩.১৯৬৫ (কলকাতা)। শিক্ষা : বি. এ.। পেশা : হিন্দুস্থান বীমা সমিতির প্রচারসচিব; জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। 'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাঠে মুগ্ধ এবং 'উপাসনা' সম্পাদনার সময় তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ। গ্রন্থ : পল্লীব্যথা, মধুমালতী, অতসী, রক্তরেখা, কাব্য-সঞ্চয়, অলস্ত তলোয়ার, সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষ, খৃষ্টানুসরণ, কাব্য-সাহিত্যের ধারা প্রভৃতি।

হীরেণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : ১২.৭.১৯১১ (কলকাতা)। পেশা : বহুকর্মে নিযুক্ত জীবন। মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্রাবস্থায় শিক্ষকরূপে মোহিতলালের প্রথম সান্নিধ্যলাভ, ছাত্র ও শিক্ষকের এই যোগাযোগ মোহিতলালের জীবনান্ত পর্যন্ত ছিল। গ্রন্থ : বিরহ-মিলন কথা, জতুগৃহ, বৃহদারণ্য; ঠিকানা : ২৪ রাম চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭।

হেমেন্দ্রকুমার রায়। জন্ম : ১৮৮৮ (কলকাতা); মৃত্যু : ১৮.৪.১৯৬৩। পেশা : সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ও সাহিত্যচর্চা। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখক, মোহিতলালের সঙ্গে 'ভারতী' বৈঠকেই আলাপ ও হৃদ্যতা। গ্রন্থ : আলেয়ার আলো, বেনোজল, যাঁদের দেখেছি (১-২), এখন যাঁদের দেখছি, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, যখের ধন, জয়ন্তের কীর্তি, দেড়শো খোকার কাণ্ড প্রভৃতি।

আজহারউদ্দীন খান্